জসীম উদ্‌দীন

ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়

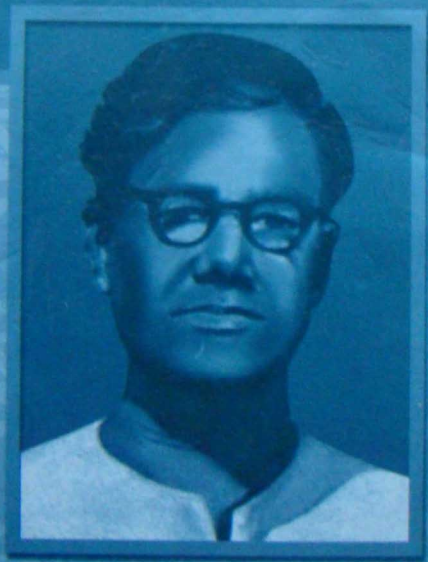

জসীম উদ্‌দীন

কবিমানস ও কাব্যসাধনা

১৯৬৭ সালের দাউদ পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ

ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়

নওরোজ সাহিত্য সম্ভার

১২৩৮২৮৫
৩৫০/-

JASIM UDDIN : Kobimanos O Kabbosadhona A Reference Works on Country-Poet Colled 'PallyKabi' Jasim uddin. Published by Eftakher Rasul George, on be-half of Nawroze Sahitya Samvar/Nasas Dhaka 46 P. K. Ray Road (Banglabazar) Dhaka 1100. First Published : 1967. 6th Re-print 2012. Price Tk. Three Hundred Fifty Only.

ISBN : 984-702-068-X

স্বত্ব : তুহিন মুখোপাধ্যায়

স
১৭২২৩০
৮৯৯'৪৪২০০৯
ক-২০

প্রকাশনায়	নসাস নওরোজ সাহিত্য সম্ভার'-র পক্ষে ইফতেখার রসুল জর্জ ৪৬ পি. কে. রায় রোড বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
প্রথম প্রকাশ	১৯৬৭
ষষ্ঠ মুদ্রণ	২০১২
প্রচ্ছদ	নাসিম আহমেদ
কম্পোজ	ক্রেস মিডিয়া' পক্ষে নসাস ঢাকা'-র কম্পিউটার বিভাগ ৪৬ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মুদ্রণে	প্রান্তিকা মুদ্রণী ৪৩ ডি. এন. এস রোড, ঢাকা-১২০৪
মূল্য	তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেব **সীতানাথ মুখোপাধ্যায়**
পরমারাধ্যা স্বর্গীয়া জননী **সাবিত্রী দেবীর** স্মৃতির উদ্দেশে
অকৃতার্থ সন্তান
সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়

ষষ্ঠ মুদ্রণ প্রসঙ্গে

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও গবেষক স্বর্গত ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জসীম উদ্‌দীন' গ্রন্থটি ১৯৭৬ সালে ইষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে প্রথম প্রকাশিত। জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় সমৃদ্ধ এ বইটি পাঠক মহলে ব্যাপক সমাদর লাভ করে এবং ১৯৬৭ সালে দাউদ পুরস্কারে ভূষিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা থেকে বইটি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালীন গ্রন্থকার কর্তৃক সংশোধিত হয়। বহু প্রসংশিত এ বইটি চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পেরে আমরা গর্ব অনুভব করছি। সে সাথে স্বর্গত ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

প্রথমত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থটিতে মুদ্রণজনিত যে সব ভুলত্রুটি রয়ে গিয়েছিলো, বর্তমানে সংস্করণে তা সংশোধন করে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থেকে যায়, সেজন্যে আমরা বিদগ্ধ পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

পল্লীকবি জসীম উদদীনের ওপর গবেষণা মূলক এ-গ্রন্থটি যদি গবেষক ও ছাত্র সমাজের উপকারে আসে, তবেই আমাদের এ প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে মনে করবো।

—প্রকাশক

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় গ্রাম-বাংলার যে রূপলোক নির্মিত হয়েছে, তা দীর্ঘকাল ধরে আমাকে আকর্ষণ করে এসেছে। এ আকর্ষণের সূত্রেই একদা মনে আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল জসীমউদ্‌দীনের সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নে ব্রতী হওয়ার। দু' একটা প্রবন্ধও লিখেছিলাম 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যটি নিয়ে। অধুনালুপ্ত 'সোনার বাংলা' ও 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার পাতায় তার নিদর্শন আজও মিলতে পারে। তারপর বহুদিন নানা ঝঞ্ঝাটে এদিকে আর মনোনিবেশ করতে পারি নি। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত রাজশাহী কলেজে অধ্যাপনা কালে জসীমউদ্‌দীন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি এবং তা সুধী মহলে কিছুটা প্রশংসা পায়। প্রকৃতপক্ষে ঐখানেই বর্তমান গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত্র হয়। ১৯৬৩-৬৪ সালে চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপনাকালে গ্রন্থটি প্রণয়নে কিছুটা প্রযত্ন নেই। গ্রন্থের কাজ কিছুটা এগিয়ে যেতেই কর্মক্ষেত্র বদলের তাগিদ আসে। ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করি এবং এখানেই গ্রন্থের বড় অংশটা শেষ করি। আলোচ্য গ্রন্থে আমি জসীমউদ্‌দীনের কবি-প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণের সাথে সাথে তাঁর সামগ্রিক সাহিত্য-কর্মের বিস্তৃত পরিচয় দানের প্রয়াস পেয়েছি। কবির সকল কাব্য ও কবিতার বিশ্লেষণ এবং বিচারনার চেষ্টা যেমন এতে রয়েছে, তেমনি রয়েছে তাঁর লোকনাট্য ও বিবিধ গদ্য রচনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্য-সংবলিত আলোচনা। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি তাই অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এ গ্রন্থে জসীমউদ্‌দীন সম্পর্কে রসিক মহলে কিছুটা ঔৎসুক্য জাগাতে পারলে, নিজকে কৃতার্থ মনে করব।

গ্রন্থটি রচনায় আমি বিভিন্ন মহল থেকে যথেষ্ট উৎসাহ ও সহানুভূতি পেয়েছি। যাঁরা এক্ষেত্রে আমাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন, তারা সবাই ধন্যবাদের পাত্র। এ প্রসঙ্গে যাঁর কথা সর্বপ্রথম মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন আমার সমধর্মিণী শ্রীমতী পারিজাত দেবী, এম. এ। ইতিহাস ওঁর আলোচনার বিশেষ ক্ষেত্র হলেও, সাহিত্য-রসবোধও যে ওঁর বেশ সূক্ষ্ম তা জসীমউদ্‌দীনের সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে ওঁর সাথে নানা কথা আলোচনা করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছি। ওঁর পরামর্শ ও প্রেরণা আমাকে এ দীর্ঘ কলেবর গ্রন্থ সম্পূর্ণ করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এ গ্রন্থ যদি কিছুটা সার্থকতা অর্জন করে থাকে, তবে তার মূলে রয়েছে ওঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ গ্রন্থ প্রণয়নে আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান যুগিয়েছে আমার চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপনাকালীন বাংলা বিভাগের কৃতী ছাত্র পরম কল্যাণীয় মুহম্মদ আবু মুসা। 'মাটির কান্না' কাব্যটির কপি যখন কোন ক্রমেই সংগ্রহ করা যাচ্ছিল না, তখন সে চট্টগ্রাম কলেজ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত একটি বই থেকে প্রায় সকল কবিতা নিজ হাতে নকল করে পাঠিয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এ ছাড়া নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করেছেন স্বয়ং কবি জসীমউদ্‌দীন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ মযহারুল ইসলাম, রাজশাহী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আবদুর রশীদ, চট্টগ্রাম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক দিলওয়ার হোসেন ও ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শ্রীরণজিৎ কুমার চক্রবর্তী। আমার সহকর্মীরা সবাই আমাকে কমবেশি উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের সবার নাম পৃথকভাবে উল্লেখ না করে এখানে সবারই উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

এ গ্রন্থ প্রকাশনার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে ইষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশ মহাশয় আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তিনি ব্যবসায়িক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য

না রেখে আমার মত অখ্যাতনামা এক ব্যাক্তিকে গ্রন্থকার হিসাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়ে পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন বলতে হয়। প্রসঙ্গতঃ পুরাতন সাহিত্যকর্মী সুবোধ কুমার দাশগুপ্ত মহাশয়কেও ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি। সুবোধবাবু এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রথমাংশ পড়ে আমাকে যে উৎসাহ দিয়েছিলেন তা' গ্রন্থটি প্রণয়নে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। শ্রীরমেন্দ্র ঘটক চৌধুরী এ গ্রন্থের প্রুফ দেখে দিয়ে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

পরিশেষে এ গ্রন্থের মুদ্রণ সংক্রান্ত কয়েকটি ত্রুটির দিকে সহৃদয় পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। প্রথমতঃ, মুদ্রণ বিভ্রাটজনিত প্রচুর বানান ভুল রয়ে গিয়েছে, দ্বিতীয়তঃ অনেক শব্দের অবাঞ্ছিত বিকৃতি ঘটেছে, তৃতীয়তঃ, বিরামচিহ্ন স্থাপনে বিভ্রাটের দরুন কিছু কিছু বাক্যে অর্থগত অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে এবং চতুর্থতঃ, শব্দ বিশেষের স্থানচ্যুতি ও সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত শব্দের আগম বক্তব্যের স্বচ্ছতাকে কোন কোন ক্ষেত্রে বিঘ্নিত করেছে। প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি উৎকট প্রমাদের দিকে সহৃদয় পাঠকের দৃষ্ট আকর্ষণ করছি। গ্রন্থের ৩১ নং পৃষ্ঠার সপ্তম পংক্তিতে আচার্য দীনেশচন্দ্রকে আশ্চর্য দীনেশচন্দ্র হতে দেখে আমিই আচার্যান্বিত হয়েছি সবচেয়ে বেশি। ৪৫ নং পৃষ্ঠায় অষ্টম পংক্তিতে মনসুরউদ্দীনকে 'মনসুরউদ্‌দীন হতে দেখেও কম অবাক হই নি। আর একটি প্রমাদের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করছি। 'রাখালী কাব্যের অন্তর্গত' মেনাশেখ' কবিতাটি প্রায় সর্বত্র 'মোনাশেখ' ছাপা হয়েছে। মুদ্রণের এত ত্রুটি সত্ত্বেও রসিক পাঠক এ গ্রন্থের বক্তব্য অনুধাবনে বিশেষ বড় রকমের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হবেন না, এ বিশ্বাসেই গন্থটি দেশের পাঠক সমাজের হাতে তুলে দিচ্ছি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা বিভাগ
১লা জানুয়ারী, ১৯৬৭

সূচীপত্র

১। জসীমউদ্‌দীন ঃ কবিতায় গ্রামের দিকে সংকেত ৯
২। জসীমউদ্‌দীন ও পল্লী-পথিক কবিবৃন্দ
৩। জসীমউদ্‌দীন ঃ কবি-প্রতিভা ও কাব্যচারিত্র্য
৪। জসীমউদ্‌দীন ও লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য ২৭
৫। জসীমউদ্‌দীন ঃ কবিমানস ৩৯
৬। জসীমউদ্‌দীন ঃ সাহিত্য-সাধনার রূপরেখা ৪৫
৭। জসীমউদ্‌দীনের সাহিত্যকর্ম ঃ রূপবৈচিত্র্য ৫৮
৮। জসীমউদ্‌দীনের কাব্য-পরিক্রমা ৬২
রাখালী ৬৪
নক্‌সী কাঁথার মাঠ ৯৬
বালুচর ১১৫
ধান খেত ১২৭
রঙিলা নায়ের মাঝি ১৩৮
সোজন বাদিয়ার ঘাট ১৪৬
হাসু ১৬৭
রূপবতী ১৭৯
পদ্মাপার ১৯৩
এক পয়সার বাঁশী ১৯৯
মাটির কান্না ২০৮
সকিনা ২৩৭
মা যে জননী কান্দে ২৪৩
হলুদ বরণী ২৪৮
জলের লেখন ২৫৪
কাব্যানুবাদ ঃ পদ্মা নদী দেশে ২৬১
ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে ২৬৪
মাগো জালিয়ে রাখিস্ আলো ২৬৮
৯। জসীমউদ্‌দীনের কবি-কর্ম ঃ শিল্পপ্রকরণ ২৭৪
১০। জসীমউদ্‌দীন ঃ নাট্য পরিক্রমা ৩০১
১১। জসীমউদ্‌দীন ঃ বিবিধ গদ্য রচনা ৩১৪
১২। জসীমউদ্‌দীন ঃ লোকগীতি সংগ্রহ ও সম্পাদনা ৩২৬
১৩। উপসংহার ৩২৮
১৪। পরিশিষ্ট ঃ ৩৩১
(ক) কবি জসীমউদ্‌দীন [জীবনের রেখাচিত্র] ৩৩১
(খ) জসীমউদ্‌দীন গ্রন্থপঞ্জী ৩৩৩

জসীমউদ্‌দীন ঃ কবিতায় গ্রামের দিকে সঙ্কেত

জসীমউদদীন বাঙলা কাব্যে একটি প্রিয় নাম। কোন লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী না হয়েও তিনি যে জন-চিত্ত জয়ে সক্ষম হয়েছেন, তা তাঁর সৃষ্টিকর্মেরই এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দেয়। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাঙলা কাব্যের আসরে জসীমউদদীনের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ তখনও নিত্য নতুন সৃষ্টির বৈচিত্র্যে রসিক পাঠকের মনোহরণ করে চলেছেন। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গশীর্ষে সমাসীন। তাঁর 'রক্তমাতাল করা' কবিতা ও গান সেদিন তরুণদের প্রাণে যে উন্মাদনার সঞ্চার করেছিল, তার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি। এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বাণী উচ্চারণ করে এগিয়ে এলেন শক্তিমান 'আধুনিক' কবিরা। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ কবির রচনায় রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্তির যে সচেতন প্রয়াস দেখা গিয়েছিল, নজরুলে যে প্রয়াস যুগ-জীবন-জিজ্ঞাসার প্রকাশে উচ্চকণ্ঠ, তাই প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাস, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ শক্তিশালী কবিদের হাতে একটা রীতিমত আন্দোলন রূপে দানা বেঁধে উঠেছিল। এঁদের এ বিদ্রোহ অক্ষমের আস্ফালন মাত্র ছিল না। উপযুক্ত শক্তি দ্বারা সমর্থিত ছিল। বস্তুতঃ এই আধুনিক কবিরা আধুনিক শিক্ষাদীক্ষাজনিত চিৎ-প্রকর্ষের ফলে সম্পূর্ণ নতুন জীবন-দৃষ্টি ও কাব্যবোধের অধিকারী হয়েছিলেন। একদিকে নতুনতর জীবন-জিজ্ঞসা, যুগচেতনা ও বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় দানে, অন্য দিকে কাব্যবস্তুর বৈচিত্র্যসাধনে, নতুন বাকভঙির প্রবর্তনায়, অভিনব রূপ-প্রতীকের ব্যবহার -নৈপুণ্যে ও কাব্যের দেহে মননের দীপ্তি সঞ্চারে অসাধারণ মৌলিকতার পরিচয় দিয়ে এঁরা রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কাব্যধারার বিরুদ্ধে একটা সাহসিক চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথই যে বাঙলা সাহিত্যের শেষ কথা নয়, আরো মানুষ আছে, আরো ভাষা আছে— তাই বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন এ বিদ্রোহী কবিগোষ্ঠী । এঁদের বিদ্রোহী মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করি বিষ্ণু দের একটি কবিতায় ঃ[১]

'রবীন্দ্র ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দেই রেখা আর রং
সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে হাজার ছন্দের
রুদ্ধ উৎস খুঁজে পাই খরস্রোত নব আনন্দের।'

কাব্যের নূতন দিগন্তের অন্বেষায় এঁরা কথা ও সুরের পরিবর্তন ঘটিয়েই ক্ষান্ত হন নি, বাঙলা কাব্যের পরিমণ্ডল পর্যন্ত বদলিয়ে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে বাঙলাদেশকে আমরা প্রত্যক্ষ করি তা মূলতঃ 'গ্রাম-বাঙলা' । 'যন্ত্রযুগ লালিত

১. ২৫ শে বৈশাখ শীর্ষক কবিতা। 'নাম রেখেছি কোমলগন্ধার কাব্য দ্রষ্টব্য।

বণিক-সভ্যতার পাদপীঠ কলকাতা, তাঁর কাব্যে কোনো দিন প্রাধান্য পায় নি।' পরবর্তী রবীন্দ্রানুসারী কবিরাও পল্লীপ্রকৃতির রূপেই মুগ্ধ ছিলেন। এমন কি জীবন-দৃষ্টির অভিনবত্ব ও প্রকাশকলার অনন্যতা সত্ত্বেও জীবনানন্দের কাব্যেও পল্লীপ্রকৃতির এলায়িত রূপের স্বীকৃতি আছে। তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও 'রূপসী বাংলা' কাব্য এর সাক্ষ্য বহন করছে; কিন্তু আধুনিক কবিরা প্রায়শঃ পল্লীকেন্দ্রিক জীবনের আকর্ষণকে উপলক্ষ্য করে নাগরিক জীবনের অস্থিরতা, ক্লান্তি, অবসাদ, যন্ত্রণা-বেদনাকেই মুখ্যতঃ সত্য বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। কলকাতা শহরকেই বিশেষ করে কাব্যের বিষয় করে তুলেছিলেন আধুনিক কবিরা। তার কারণ, বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়; "আমাদের জীবনের কেন্দ্র এখন সরে এসেছে শহরে, শহর এখন জীবনকে রূপায়িত করে, ধ্বংস করে, পরিপূর্ণ করে। শহরের মধ্যে, শহরে প্রাণের মধ্যে আমরা বাঁচি।"[১] কবি প্রত্যেক্ষ করেছেনে—'জীবন ফেনিল হয়ে উঠেছে শহরের—স্বার্থের সংঘাতে, বিলাসিতার লাস্যে, দারিদ্র্যের ভয়াবহতায়, উপচে পড়ছে কূল ছাপিয়ে —মর্মান্তিক সংগ্রামে, অর্থগৃধ্নুতার পিশাচবৃত্তিতে, সভ্য মানুষের জটিল প্রণয়ে, রসবোদ্ধার সৌন্দর্য উপাসনায়, ভাঁড়ামি'ত, বোকামীতে, হাস্যস্রোতে, নিষ্ঠুরতায় বিচিত্র বহুমুখী জীবন ; প্রাণের অফুরন্ত, তপ্তপ্রাপ্ত লীলা।"[২] এতদিন পল্লীই ছিল আমাদের জীবনের ভারকেন্দ্র, এখন তার সে স্থান নিল শহর। স্বভাবতই কাব্যের অঙ্গন থেকে পল্লীর বিদায়ের করুণ সুর বেজে উঠল। বাঙলা কবিতার এ ক্ষেত্র বদলের সাথে সাথে তার গোত্রও বদল হল। তার প্রকৃতি বদলের অনুষঙ্গ হিসেবেই তার বেশভূষা ও ভঙিমায় রূপান্তর ঘটল। কবিতা যেন পল্লীবধূর মধুর স্বভাব-সুন্দর সরল রূপ পরিহার করে লাস্যময়ী নগর-নটিনীর নয়ন ধাঁধানো রূপে দেখা দিল। সে হয়ে দাঁড়াল আমাদের কাছে একটা প্রহেলিকা।

বাঙলা কাব্যের প্রকৃতি যখন এমনি করে পালটে যাচ্ছিল, বহু শতাব্দীর ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তা যখন সাধারণ পাঠক-চিত্তে আবেদন সৃষ্টির স্বাভাবিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছিল, দেশের বৃহত্তর জনমানস থেকে তা যখন ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিল, তখন 'দূরাগত রাখালের বংশীধ্বনির' ন্যায় জসীমউদ্‌দীনের কবিতা আমাদের পল্লীর মাধুর্যময় রূপের দিকে আকর্ষণ করার প্রয়াস পেয়েছিল। জসীমউদ্‌দীন যুগ ও জীবনের সকল ঘাত-প্রতিঘাত এড়িয়ে গিয়ে, সকল জটিলতা পরিহার করে বাঙলা কাব্যের পুরনো ঐতিহ্য-ভিত্তিক ধারায় কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পুরাতন পল্লীগীতি ও গাথার রাজ্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে, পল্লীর অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ সাদামাটা জীবনের অপূর্ব মাধুর্যকেই তিনি কাব্য-মহিমা দান করে বিস্ময়ের চকম সৃষ্টি করলেন। 'গেঁয়ো মাঠের সজল-শীতল বাতাসের' ন্যায়ই তাঁর কবিতা সেদিন অনেক ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত নাগরিককে তৃপ্তি দিয়েছিল। বস্তুতঃ আধুনিক যুগে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্যেও যখন নাগরিকতার জয়জয়কার চলছিল, তখন জসীমউদ্‌দীনই প্রথম বলিষ্ঠভাবে পল্লীর দিকে—তার চাষাভুষা, তার ক্ষেত-খামার, তার নদী-নালার দিকে, তার অসাধারণ সাধারণতার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কাব্যের মাধ্যমে। একথা সত্য, পল্লীর প্রতি একটা মমত্বময় আকর্ষণ রবীন্দ্রানুসারী আরও অনেক কবির কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। তবে তাঁদের কাব্যে পল্লী কখনই খুব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নি। তাঁরা পল্লীকে দেখেছেন নগরের বাতায়ন পথে। রোমান্টিকতার বাতাবরণ সৃষ্টি করে তার একটা মোহময় রূপের ছবি তাঁরা

১. বুদ্ধদেব বসু —'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', পৃঃ ২৫।
২. বুদ্ধদেব বসু —'হঠাৎ আলোর ঝলকানি ', পৃঃ ২৭।

সর্ব সমক্ষে তুলে ধরেছিলেন তা ঠিক; কিন্তু তা কখনই আত্মার যোগে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নি। কবিতার প্রকাশকলায় এঁরা ছিলেন রবীন্দ্রানুসারী; সুতরাং অনেকটাই নাগরিক রুচির অধিকারী। পল্লীপ্রকৃতির স্বভাবধর্মের যথার্থ প্রতিফলন তাঁদের কাব্যের ভাষায় তাই অনুপস্থিত। এখানেই অন্য কবিদের উপর জসীমউদ্‌দীনের জিত। জসীমউদ্‌দীন পল্লীর সন্তান। "সরল শ্যামলের প্রতিমূর্তি যে গ্রাম তারই পরিবেশ তাঁর ব্যক্তিত্বে, তাঁর উপস্থিতিতে।[১] পল্লীর সাথে তিনি একাত্ম— তাকে দেখেছেন প্রেমিকের মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে একান্ত মুখোমুখি হয়ে, অন্তরের সকল সহানুভূতি উজাড় করে দিয়ে। পল্লীও তাই যেন তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে আপন সহজ, নিরাভরণ রূপ নিয়ে ; অনাবৃত করে দিয়েছে তার সকল হৃদয়-ঐশ্বর্য। ভাষায়, ভাবে, ভঙ্গিতে জসীমউদ্‌দীনের কবিতা যেন পল্লীরই অনাড়ম্বর সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি। আধুনিক কাব্যের সমস্ত জটিলতা, দুর্বোধ্যতা ও কৃত্রিমতা থেকে তা আশ্চর্য রূপে মুক্ত। উপরন্তু এমন একটা আন্তরিকতার স্পর্শ রয়েছে তাঁর কাব্যে যা অতি স্বাভাবিকভাবেই জনচিত্ত আকর্ষণ করে। জীবনের সাথে স্বাভাবিক যোগে বিধৃত বলেই (অবশ্য সে জীবন পল্লীকেন্দ্রিক) জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের আবেদন এত বেশী— নাই বা রইল তাতে প্রসাধন পরিপাট্য, ভাষার কারুকলা, নভোস্পর্শী কল্পনার ঐশ্বর্য! জসীমউদ্‌দীনের লোকপ্রিয়তার রহস্যও ঐখানেই নিহিত।

জসীমউদ্‌দীনের 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য আমাদের এ ধারণাকেই পুষ্ট করে। তিনি বলেছিলেন, "নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্যখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এ যেন সেই পুরাতন পল্লীকে ফিরিয়া পাইলাম —সেই পল্লীর পথঘাট—এ যেন কত চেনা হৃদয়ের দরদ দিয়া আঁকা। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের দু'টি ডাগর চোখ, পল্লী-রাখালের চোখ-জুড়ানো কালো রূপ, মুসলমান লেঠেলদের মারামারি, বাঙালীর বিবাহ-বাসর, গিন্নীর ঘরকন্না এই সকল দৃশ্যে বুক জুড়াইয়া গেল। এই পল্লী -দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ছিল— এখনও হয়ত কিছু কিছু আছে। কিন্তু এ সকল হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। এই হারানো জিনিস নতুন পাওয়ার যে আনন্দ, কবি জসীমউদ্‌দীন তাহা আমাদিগকে দিয়াছেন।"[২] আধুনিক যুগে সাহিত্যে নাগরিকতার প্রবল প্রভাবের দিনে বাঙলা কাব্যে পল্লীর পুনঃপ্রতিষ্ঠাই জসীমউদ্‌দীনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। দীনেশচন্দ্রের ভাষায়, তিনি "দেশের পুরাতন রত্নভাণ্ডার নতুন ভাবে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনাগত রাজ্যের বার্তা বহিয়া আনিয়াছিলেন।"[৩] এ কাজ যে কত সুকঠিন ছিল তা দীনেশচন্দ্র বেশ অনুধাবন করেই বলেছিলেন, "জানি না শহরে থাকিয়া কবি তাঁহার এই সবুজ প্রাণ, বঙ্গজীবনের অতুলনীয় গ্রাম্যসম্পদ —ঘরকন্নার এই সাঁঝের ভোগ হারাইয়া ফেলিবেন কিনা।" কারণ "সর্বগ্রাসী শহরের মায়াজাল কাটাইয়া পল্লীর অনাবিল ভাব ও স্ফূর্তি বজায় রাখা বড় শক্ত।"[৪] জসীমউদ্‌দীনের অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের রচনা সম্পর্কে দীনেশচন্দ্রের এ আশঙ্কা অনেকটা সত্য প্রমাণিত হলেও তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনায় 'পল্লীর অনাবিল ভাব ও স্ফূর্তি' অনেকটা বজায় রাখতে পেরেছেন বলে অসাধারণ কৃতিত্বের দাবিদার। আধুনিক কাব্যে উপেক্ষিত পল্লীকে নতুন কাব্যিক মহিমা দান করে, পল্লীর মৃতপ্রায় অথচ আশ্চর্য রূপে

---

১. অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত—' কল্লোল যুগ', পৃঃ ১৮৩।
২. দীনেশচন্দ্র সেন -'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' বিচিত্রা, বৈশাখ ১৩৩৯।
৩. দীনেশচন্দ্র সেন -'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' বিচিত্রা, বৈশাখ ১৩৩৯।
৪. দীনেশচচন্দ্র সেন- 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' বিচিত্রা, বৈশাখ ১৩৩৯।

জীবন-ঘনিষ্ঠ সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করে, তিনি বাঙলা কাব্যের প্রাচীন ও নবীন ধারার মধ্যে একটা ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট যোগসূত্র স্থাপন করে বাঙলা কাব্যের আত্মিক অপমৃত্যু রোধ করেছেন। আধুনিক যুগ-স্বভাবের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পল্লীজীবন ও প্রকৃতি অবলম্বনে কাব্য রচনা করে তাকে জনচিত্তের ঘনিষ্ঠতর করে তুলতে পেরেছেন বলেই জসীমউদ্‌দীন দেশবাসীর ভালবাসা পেয়েছেন এবং কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাঁর কাব্যবস্তুর পল্লীনিষ্ঠ রূপের জন্যে তিনি পল্লীকবি আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন। অবশ্য একথা স্মরণ রাখতে হবে যে "পল্লীকবির" সাধারণ সংজ্ঞা তাঁর সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। তিনি আধুনিক কালেরই শিক্ষিত কবি--পল্লীসাহিত্যের ঐতিহ্যকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়ে কাব্যচর্চা করেছেন।

তবু আধুনিক বাঙলা কাব্যে জসীমউদ্‌দীন এক ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়। অতি আধুনিক কাব্যের সাথে তাঁর কাব্যের চরিত্রধর্মের পার্থক্য এতই বেশী যে, এদের মধ্যে কোন সম্পর্কই আবিষ্কার করা শক্ত। আধুনিক কাব্য নগর-চেতনায় নতুন খাতে প্রবাহিত। নাগরিক মনের ঐশ্বর্য-প্রবণতা, জটিল চিন্তা ও বুদ্ধি-বিলাস, সুতীব্র ও সুতীক্ষ্ম বিশ্লেষণপরায়ণতা, অন্তর্মুখিতা এ সাহিত্যে বিশেষ রূপে ক্রিয়াশীল। নাগরিক জীবনেরই ন্যায় এ সাহিত্য গণ্ডী অতিক্রমণের নেশায়, নিত্য নতুনের অন্বেষায় চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ, অতৃপ্ত। তার চলার ভঙ্গিতে, হাব-ভাবে কত ছলাকলারই প্রকাশ না লক্ষ্য করা যায়। স্বভাবে তার অন্তহীন জটিলতা। দেহভঙিমায়, প্রসাধন পারিপাট্যে সে জটিলতারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। পুরাতনকে অস্বীকার করে, গতানুগতিকতাকে পরিহার করে এ সাহিত্য বিদ্রোহীর মনোভাবেরই পরিচয় দিয়ে আসছে জন্মলগ্ন থেকে। পক্ষান্তরে জসীমউদ্‌দীন এবং রবীন্দ্রানুসারী অন্যান্য অনেক কবিই বাঙলার পুরাতন ঐতিহ্যভিত্তিক কাব্যধারাকে স্বীকার করে কাব্য-সাধনা করেছেন আজীবন। বিশেষতঃ জসীমউদ্‌দীন নাগরিক জীবনের সর্বগ্রাসী প্রভাবকে প্রায় এড়িয়ে গিয়ে পূর্ব বাঙলার পল্লীর নিঝুম অন্তঃপুরে বসে তার সাদামাটা রূপটির অনুধ্যান করেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। পুরাতন পল্লীগীতি, গাথা ও মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে উপকরণ নিয়ে তাকে নিজস্ব খাঁটি কবি-কল্পনা দ্বারা কিছুটা রঞ্জিত ও পরিমার্জিত করে জসীমউদ্‌দীন পল্লীজীবন ও প্রকৃতির অনাবিল মাধুর্যের ছবি অঙ্কন করে গিয়েছেন একের পর এক। এ কাজে কোন ক্লান্তি, কোন অনীহা জাগে নি তাঁর মনে। জসীমউদ্‌দীন ও রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মনোভঙির এ বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করেই সমালোচক বলেছেন ; .... "বিশ শতকে বাস করেও বিশ শতকের ইংরেজী কাব্যের আত্মানুসন্ধানের নব নব পরীক্ষায় এঁরা কিছু মাত্র আকৃষ্ট হন নি। ....

.... নগরজীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, বেদনা, আশাভঙ্গ, ব্যর্থতা ও নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মানবাত্মার আর্ত ক্রন্দন এঁদের শ্রবণে পৌঁছে নি? আসলে এঁরা গ্রাম-জীবনের কবি—গ্রামের মায়া ও মমতা, স্নেহ ও অনুভূতি এঁদের ধরে রেখেছিল।"[১] তাই 'বিশ শতকের প্রখর সূর্যালোকে' এঁরা 'বৈষ্ণব যুগের ছায়া ভরা' পল্লীর স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনায় উৎসাহ বোধ করেছেন। একই যুগে বাস করে সে যুগের শিক্ষাদীক্ষা, ধ্যান-ধারণার সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও এঁদের পক্ষে এটা করা সম্ভব হয়েছে, তার কারণ পাশ্চাত্য দেশসমূহের ন্যায় ব্যাপক শিল্প-বিপ্লবজনিত পরিস্থিতির ফলে নগর আমাদের সমগ্র জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পল্লীকে একেবারে কোণঠাসা করতে পারে নি এবং

১. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়—'রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজ', পৃঃ ১০।

সামগ্রিকভাবে জনমানসে তেমন কোন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। দারুণ নাগরিকতার প্রভাবের দিনেও তাই লক্ষ্য করি দেশের বৃহত্তর জনমানস পল্লীকেই আশ্রয় করে রয়েছে। জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে বাঙলার সে স্বভাবধর্মই জয়ী হয়েছে। তাই কাব্যে 'আধুনিকতার' প্রবক্তা না হয়েও জসীমউদ্‌দীন আধুনিক যুগের কবি। এ কথা না বুঝে যাঁরা জসীমউদ্‌দীনের কাব্যকে 'যুগবিরোধী' বা 'যুগ-জীবনের ব্যতিক্রম' বলেন, তাঁরা অবশ্যই ভুল করেন। একই কালে এমন আপাত-বিরোধী অথচ বাস্তব প্রতিবেশের দ্বারা সমর্থিত কাব্যধারার বিকাশ বিস্ময়ের ব্যাপার হলেও সমাজ-বিবর্তনের নিয়ম-বিরোধী নয়। সমাজ বিবর্তনের যে ধারায় আমাদের দেশে নগর-চেতনা প্রবল হয়ে কাব্যে-সাহিত্যে নিজ প্রতিষ্ঠা কায়েম করেছে, জীবনের প্রায় সকল স্তরে মৌল পরিবর্তনের সূচনা করেছে, তারই প্রতিক্রিয়ায় অনেক কবি ও সাহিত্যিকের মনে পল্লীচেতনা দেখা দিয়েছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই পল্লীর সাদামাটা নিস্তরঙ্গ জীবন ও প্রকৃতির এলায়িত রূপের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি পড়েছিল। বিশেষতঃ বাঙলা দেশে যেখানে নাগরিক জীবন বৃহত্তর জনসমষ্টিকে পল্লীর যুগ যুগান্তের স্নেহবন্ধন ও আবেষ্টনী থেকে বাইরে টেনে নিয়ে আসতে পারে নি, সেখানে জীবনের ন্যায় সাহিত্যে পল্লীর ভূমিকা কখনই অন্য দেশের ন্যায় গৌণ হতে পারে না। এদেশে জীবনের ন্যায় সাহিত্যে নগর ও পল্লীর সহাবস্থানটা যেন ইতিহাসের অভিপ্রেত। অথচ সাহিত্যের এ দু'ধারার অসঙ্গতিটাও আমাদের কম শিরঃপীড়ার কারণ হয় নি। অন্য দেশের সাহিত্যেও নাগরিক ধারার পাশাপাশি যতই ক্ষীণ হোক, একটি লৌকিক ধারা প্রবাহিত হচ্ছে লক্ষ্য করা যায়। দু'ধারা প্রকৃত পক্ষে বিরোধ না ঘটিয়ে, মাঝে মাঝে পরস্পর মিশ্রিত হয়ে যায় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান চলতে থাকে। কবি ও শিল্পীরা অবলীলাক্রমে লোকসাহিত্যের মালমশলা আত্মসাৎ করে নিজেদের সৃষ্টি-কর্ম চালিয়ে যান। কিন্তু আধুনিক কালে বাঙলা সাহিত্যে দু'ধারার এ স্বাভাবিক সম্পর্ক রক্ষিত হয় নি। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট লোকসাহিত্য বিশেষজ্ঞ ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন—"প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যেই সাহিত্য-সংস্কৃতির দুইটি ধারা আছে—একটি লৌকিক ও আর একটি শিক্ষাগত।....লৌকিক ও শিক্ষাগত ধারা দুইটি অনেক সময় পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যায় এবং ইহাদের মধ্যে আদান প্রদান চলিতে থাকে — Folk materials being absorbed by poets and artists (A. H. Krappe. SDFML., p. 404)। কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব হয় নাই; কারণ ইহার শিক্ষাগত (Literary) ধারাটি এখানে স্বাধীনভাবেই যে কেবল উদ্ভূত হইয়াছে তাহা নহে—ইহার সঙ্গে লৌকিক ধারাটির অনেক বিষয়ে বিরোধও দেখা যায়। সেই জন্যই বাংলায় লোকসাহিত্য ও উচ্চতর সাহিত্যের এত বেশী ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে।"[১] বলা বাহুল্য সাহিত্যের শিক্ষাগত ধারাটি, যাকে উচ্চতর সাহিত্য হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে, তা আমাদের বর্তমান নাগরিক সাহিত্য, আর লৌকিক ধারাটি পল্লীজীবন নির্ভর লোকসাহিত্য। আমাদের সাহিত্যের এ দু'ধারার ব্যবধানটা একটা অস্বাভাবিক অবস্থা হিসেবেই মেনে নেওয়া চলে; কিন্তু তাকে কখনই পরিণাম বলে গ্রহণ করা যায় না। তাই তো দেখতে পাই আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েও জসীমউদ্‌দীন লোকসাহিত্যের আকর্ষণে সাড়া দিয়েছেন—লোককাব্যের ভাণ্ডার থেকে রস সংগ্রহ করে, লোকজীবন নিয়ে কাব্য-সাধনায় অগ্রসর হয়েছেন। এক বা দেড় শতাব্দীর নাগরিক সভ্যতা লোকসাহিতের প্রতি আমাদের আকর্ষণকে একেবারে লুপ্ত করে দিতে পারে নি। এ প্রসঙ্গে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তি

---

১. ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য—'বাংলার লোকসাহিত্য ঃ সংজ্ঞা ও প্রকৃতি', পৃঃ ২৬ (১ম সংস্করণ)।

বিশ্লেষণধর্মিতা, সৌন্দর্যবোধ ও পরিমার্জনপ্রিয়তা দুইয়েরই পরিচয় রয়েছে তাঁর কাব্যে। এ ক্ষেত্রে জসীমউদ্‌দীন অনন্য সার্থকতার দাবিদার। পল্লী নিয়ে কবিতা লেখাই যথেষ্ট নয়, পল্লীপ্রকৃতির সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে-বিধৃত কবি-ভাষা সৃষ্টি করা তার চেয়ে অনেক শক্ত কাজ। এ বিশেষ দিকে জসীমউদ্‌দীনের সাফল্য আজও অন্য কোন কবির অনায়ত্ত। জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি একান্তই তাঁর নিজস্ব। তৃতীয়তঃ পল্লীজীবন নিয়ে সার্থক কাব্য সৃষ্টি করতে হলে লোকসাহিত্যের সাথে যে ব্যাপক ও গভীর পরিচয় দরকার এবং বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার প্রয়োজন তা জসীমউদ্‌দীনের অনেকেরই চেয়ে বেশী ছিল। মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল, বৈষ্ণব কাব্য থেকে শুরু করে মৈমনসিংহ গীতিকা, বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত অজস্র বৈচিত্র্যপূর্ণ পল্লীগীতি প্রভৃতি সব কিছুর সাথে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল। বহুকাল পল্লীগীতির সংগ্রাহক রূপে তিনি বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সে সূত্রে একদিকে তিনি লোকসাহিত্যের প্রাণৈশ্বর্যের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, অপর দিকে অসংখ্য পল্লী নর-নারীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তাদের জীবন ও চরিত্রে সুগভীর অর্ন্তদৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেন। পল্লী নিয়ে কবিতা লিখেছেন হয়তো অনেকেই ; কিন্তু জসীমউদদীনের ন্যায় ব্যাপক ও গভীর মানসিক প্রস্তুতি কারও ছিল না। তাই পল্লী কাব্যের ক্ষেত্রে জসীমউদ্‌দীনের সার্থকতা সার্বধিক।

জসীমউদ্‌দীন সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হল, কোন যুগসমস্যার কথা উল্লেখমাত্র না করে (এ ক্ষেত্রে 'মাটির কান্না' কাব্যটি অবশ্যই ব্যতিক্রম) কোন 'ইজমের' দোহাই না দিয়েও, তিনি দেশের গণমানসের অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাব্যে অনেকটা রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। শত দুঃখ-দৈন্য, আঘাত-বেদনা, দারিদ্রের নির্মম কশাঘাত, লাঞ্ছনা ও অপমানের মুখে দাঁড়িয়েও এ শক্তি পরাভব মানে না। ঘরে ঘরে স্নেহ-প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে সে জীবনকে ভরসা দেয়, কষ্টে অধীর হলেও জীবনকে অস্বীকারের প্রয়াস পায় না, হাসি মুখে দুঃখ-বেদনাকে সহ্য করার অঙ্গীকার করে। মোট কথা জীবনের প্রতি শ্রদ্ধায় জসীমউদ্‌দীনের কাব্য ভাস্বর। আর তাই তাঁর কাব্যকে দিয়েছে একটা মহিমা।

এ যুগে পল্লীজীবন ও ঐতিহ্য নিয়ে সার্থক কাব্য-সৃষ্টির আর একজন দাবিদার রাঢ়ের কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক । কুমুদ রঞ্জনের মত পল্লীপ্রাণ কবি বিরল। তাঁর এই পল্লী-প্রীতি সাধারণ পল্লী আনুরাগ নয়, এ তাঁর নিজ গ্রাম কোঁগাওর প্রিত 'জননীবোধে ভক্তি'। এর সাথে একটি সহজ বৈষ্ণব ভক্তিভাবের সুর বিজড়িত রয়েছে। "কুমুদ রঞ্জন শুধু পল্লীপ্রিয় নহেন, তিনি পল্লীনিষ্ঠ । এ দিক দিয়া তাঁহার প্রীতি ও নিষ্ঠা প্রগাঢ়। .... দেশের মাটির উপর কবির গভীর মায়া কবিতার বিষয়ে ও ভাবে আর কাব্যের নামে অভিব্যক্ত।"[১] কুমুদ রঞ্জন মেঠো সুরে পল্লী মানুষের —চাষী, জেলে, জোলা ইত্যাদি সাধারণ মানুষের —সুখ দুঃখ ছোঁয়া জীবনের গান গেয়েছেন। 'আমার এ বাঁশের বাঁশী, মাঠের সুরে আমার সাধন,' রবীন্দ্রনাথের এ কথা কুমুদ রঞ্জনের কবিতার পক্ষে বর্ণে বর্ণে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর কাব্যের ভাষা যেমন সরল ও নিরাভরণ, তার ভাব তেমনি অনুভূতি -গাঢ়। রাঢ়ের বিশেষতঃ অজয় তীরের, পল্লী -প্রকৃতি তাঁর কাব্যে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবে এ কথা মনে রাখা উচিত, পল্লী কুমুদ রঞ্জনের কাব্যের খুব একটা বড় অংশ জুড়ে থাকলেও তাঁর কাব্যের একমাত্র অবলম্বন নয়। স্বদেশানুরাগ, ইতিহাস, পুরাণপ্রীতি তাঁর কাব্যে বেশ একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাই কুমুদ রঞ্জনের কাব্যবস্তুর কিছুটা বৈচিত্র্য আছে। অবশ্য পল্লীর

---

১. ডক্টর সুকুমার সেন—'বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস' ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩১।

শান্ত রূপের ধ্যানেই কুমুদ রঞ্জন বেশী তৃপ্তি পেয়েছেন। পল্লীনিষ্ঠ কুমুদ রঞ্জনের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতই পল্লীনিষ্ঠ জসীমউদ্‌দীনের তুলনা মনে আসে। বস্তুতঃ দুই কবির কাব্যসাধনার সাধর্ম রসিক সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কবি-সমালোচক কালিদাস রায় জসীমউদ্‌দীনের 'রাখালী' কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে কুমুদরঞ্জনের সাথে তাঁর তুলনা টেনে বলেছেনঃ

'বঙ্গ সাহিত্যের Pastoral Songs লেখার জন্য কবি কুমুদ রঞ্জনের খ্যাতি আছে। কবি কুমুদ রঞ্জন রাঢ় দেশের লোক। রাঢ় দেশের রীতিপ্রকৃতি ও পল্লীজীবনটি কুমুদ রঞ্জনের কবিতায় বেশ ফুটিয়াছে। জসীমউদ্‌দীন Pastoral Poems লিখেছেন—রাখালিয়া সুরে। পুস্তকের নাম রাখালী। জসীমউদ্‌দীন যে দেশের পল্লী-প্রকৃতির আবহাওয়ায় ও পল্লীসমাজে বাল্য-কৈশোর যাপন করিয়াছেন, সে দেশ ভৌগোলিক হিসাবে বাংলাদেশ হইলেও রাঢ় দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। দেবমাতৃক রাঢ় দেশের নর-নারীর জীবন ও প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য পূর্ববঙ্গ হইতে রীতিমত বিভিন্ন। জসীমউদ্‌দীনের রাখালিয়া গান পূর্ববঙ্গের নদীর চড়া হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। তাই ইহা বঙ্গ সাহিত্যের অভিনব সম্পদ।

"তারপর কুমুদ রঞ্জন বঙ্গের পল্লী-প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন হিন্দুর চোখে । শ্রীমান জসীমউদ্‌দীন তাহাকে বাঙ্গালীর চোখে দেখিয়াছেন অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন। সে হিসাবেও কবিতাগুলির অভিনবত্ব আছে।'[১] কুমুদ রঞ্জনের কাব্যিক সার্থকতা হয়তো জসীমউদ্‌দীনের চেয়ে কম নয়। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হয় বৃহত্তর বঙ্গপ্রকৃতির বিচিত্রতর জনজীবনের যে প্রকাশ জসীমউদদীনের কাব্যে হয়েছে, কুমুদ রঞ্জনের কাব্যে তা হয় নি। কুমুদ রঞ্জনের কাব্যের পরিধি অপেক্ষকৃত সংকীর্ণ ; রাঢ়ের বীরভূম ও অজয় নদের চতুষ্পার্শ্বেই তা সীমাবদ্ধ। তাছাড়া তাঁর কাব্যের প্রকাশও তেমন মাধুর্যমণ্ডিত নয়। রাঢ়ের প্রকৃতির রুক্ষ্মতা যেন তাঁর কাব্যের দেহেও কতকটা সংক্রমিত হয়েছে। জসীমউদদীনের কাব্যের পরিধি অনেক বিস্তৃত, তার প্রকাশও অনেক বেশী মাধুর্য মণ্ডিত । বৃহত্তম বঙ্গ প্রকৃতির শ্যামশ্রী তাঁর কাব্যদেহে প্রতিবিম্বিত। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে পল্লী কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত নয়। সামগ্রিকভাবে বঙ্গ-প্রকৃতির উদার রূপটিই তাঁর কাব্যে স্বচ্ছভাবে ধরা দিয়েছে।

জসীমউদ্‌দীনের এক পূর্বসূরী ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসও পল্লী-প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ ছিলেন। তাহলেও তাঁর কাব্যে পল্লী পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ করে নি। তাঁর কাব্যে পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক আবেষ্টনের রূপ ও রস পাওয়া গেলেও, গোবিন্দচন্দ্রের মানসিকতা ঠিক পল্লীমুখীন ছিল না। গোবিন্দচন্দ্রের রচনায় বাসনাবলি কবিচিত্তেরই সুতীব্র দাহ যেন পরিস্ফুট। ভাবনুভূতির তীব্রতা তাঁর কাব্যের প্রায় সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। পরিবেশ সূত্রে পল্লীপ্রকৃতির উপস্থিতি তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষ হলেও তিনি মূলতঃ আধুনিক রোমান্টিক কবিদের ন্যায় সুতীব্র হৃদয়াবেগের অধিকারী ছিলেন; পল্লীচিত্র অঙ্কনের চেয়ে আপন হৃদয়ের দুঃখ বেদনা, বাসনা, বিরাগ ইত্যাদির প্রকাশেই যেন তিনি বেশী মনোযোগী। পল্লী-প্রকৃতির প্রতি বিশেষ অনুরাগ সত্ত্বেও মনোভঙ্গির এ বৈশিষ্ট্যেই জীবনানন্দ দাশ সম্পূর্ণ নুতন পথের পথিক। গোবিন্দচন্দ্রেরই ন্যায় তাঁর কাব্যে 'পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক আবেষ্টনের রূপ ও রস পাওয়া যায়'— একথা বলেছেন ডক্টর সুকুমার সেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার পরই তিনি যা বলেছেন তাতে জীবনানন্দের কবিধর্মের অনন্যত্ব পরিস্ফুট

১. কালিদাস রায় —'সম্মেলনী', ১লা পৌষ, ১৩৩৬।

হয়ে উঠে। তিনি বলেছেন, 'জীবনানন্দের অবলম্বিত বিশিষ্ট শিল্প-কৌশলে সে প্রাকৃতিক আবেষ্টন শেষ অবধি কতকগুলি যেন সিম্বলের অন্তর্ভুক্ত।'[১] তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও 'রূপসী বাংলা' কাব্যে পল্লী-প্রকৃতির স্বীকৃতি থাকলেও, তিনি যথার্থ পল্লী-চিত্র অঙ্কন না করে কবি মানসের ব্যর্থতাবোধজনিত বেদনাকাতরতা (morbidity) কেই ফুটিয়ে তোলার জন্যে নানা খণ্ড -দৃশ্য ও চিত্রকে 'সিম্বল' (প্রতীক) রূপে ব্যবহার করেছেন। নাগরিক জীবনধারার প্রভাব, ইংরেজী নতুন কবিতার প্রতি ঝোঁক, রবীন্দ্র-রীতি থেকে অপসারণ প্রচেষ্টাই তাঁকে নতুন কাব্যচেতনা দানে সাহায্য করেছিল। ইমেজিস্ট কাব্যশিল্পের উপর নির্ভর করেই তিনি এ দুটি কাব্য লিখেছিলেন। তাঁর বিশেষ ভাব-প্রতিমাই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও 'রূপসী বাংলা' কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে । অবশ্য কাব্য-সাধনার প্রথম পর্যায়ে জীবনানন্দও যে বিংশ শতকের দ্বিতীয় -তৃতীয় দশকের অনেক কবির মত পল্লী -রোমান্সের ছবি এঁকেছিলেন, তার নজীর মেলে । ১৩৪৪ সালের মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত তাঁর 'পলাতক' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তবু জীবনানন্দ কাব্যক্ষেত্রে যথার্থ 'পল্লীতীর্থের পথিক নন, আপন বিশিষ্ট মানস-ভাবনা প্রকাশে খণ্ড খণ্ড পল্লীদৃশ্য ও চিত্রকে 'সিম্বল' (প্রতীক) রূপে ব্যবহার করেছেন মাত্র। জীবনানন্দের মানসিকতা নাগরিকের —তাঁর কাব্যের ভাবনার জটিলতা ও প্রকাশকলার অভিনবত্বে তা পরিস্ফুট।

কুমুদ রঞ্জনের পর পল্লীবিষয়ক কবিতা রচনায় রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও কালিদাস রায় কিছুটা বৈশিষ্টের অধিকারী। এঁরা উভয়েই পল্লীজীবনের মাধুর্য সম্পর্কে বেশ অবহিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে, সমালোচকের ভাষায়, "যতীন্দ্রমোহন বাগচী মশাই জীবনের স্নিগ্ধতার সকল দিকগুলিই অপূর্ব আবেগে ও মমতায় উদ্ভাসিত করে গেছেন।"[২]

যতীন্দ্রমোহনের 'কাজলা দিদি' ও 'অন্ধবধূ'র মত কবিতা দুর্লভ শিল্প- সার্থকতার দাবিদার। তাঁর কবিতার সৌন্দর্য প্রসন্ন সরলতায়। তাঁর "কবিতার প্রধান গুণ চিত্রলিপি কুশলতা। ছন্দে ও শব্দে তাঁহার অধিকার নির্বাধ। বিষয়েও বিচিত্রতা আছে ।"[৩] তবে এটা স্বীকার করতেই হয় যতীন্দ্রমোহন ছন্দে ও ভাষায় গোড়া থেকেই রবীন্দ্রপন্থী। তিনি এক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান আবশ্যক বোধ করেন নি। কবি কালিদাস রায় 'যতীন্দ্রমোহনের সমানধর্মী'। তাঁর রচনায়ও প্রগাঢ় পল্লীপ্রীতি লক্ষ্য করা যায়; তবে তাতে রোমান্টিক রঙ বেশ জোরালো। সরলতা ও সহৃদয়তা কালিদাস রায়ের রচনার প্রধান গুণ।

তাঁর কবিতায় ভাব ও অর্থের জটিলতা নেই। ভাষা ও ছন্দ ব্যবহারে একটা স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর রচনায় বর্তমান। কালিদাস রায়ের রচনায় অতীত ও বর্তমান জীবনের রোমান্টিক রস-কল্পনার মাধুর্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। রাঢ়ের মানুষের জীবন-সম্পর্কিত ধ্যানধারণার ছাপও তাঁর রচনায় দুর্লক্ষ্য নয়। বিশেষতঃ বৈষ্ণব কাব্যের রসকল্পনা তাঁকে যথেষ্ট উদ্দীপিত করেছে। তবু পল্লী-চিত্র অঙ্কনে তাঁর নিষ্ঠার অভাব নেই। কালিদাস রায়ের 'কৃষাণীর ব্যথা', "পল্লীর ঘাটে' ইত্যাদি কবিতার সরলতা ও সহৃদয়তা উপভোগ্য। কবি করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ও পল্লী-প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ ছিলেন। তাঁর কবিতার সংখ্যা বেশি নয়। তবে তাঁর রচনারীতি 'অনায়াস সরল ও চিত্রকুশল'। তাঁর কবিতায় ভক্তিরস

---

১. ডক্টর সুকুমার সেন—'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ', ৪র্থ , পৃঃ ৩৩৬।
২. শুদ্ধসত্ত্ব বসু—'আধুনিক বাঙলা কাব্যের গতি প্রকৃতি', পৃঃ ৮৯।
৩. ডক্টর সুকুমার সেন —'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস', ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৯।

কিছুটা 'বৈষ্ণবতা-ঘেঁষা'। পল্লী নিয়ে কিছু কবিতা লিখেছিলেন সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'পল্লী ব্যথা' (১৯২০) নামক কাব্যের কয়েকটি কবিতায় তিনি সমকালীন পল্লীজীবনের নিরানন্দের ছবিই তুলে ধরেছিলেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের অনেক কবিতা লেখকই 'পল্লীজীবনের নিরাবিল শান্তি সুখের বর্ণনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন।' অথচ বাস্তবে অল্পবিত্ত পল্লীজীবন দিন দিন মানুষের কাছে কষ্টময় ও দুর্বহ হয়ে উঠছিল। সে জন্য পল্লী ছেড়ে অনেকেই নগরে পাড়ি জামিয়েছিল, কলকাতা শহর ও উপকণ্ঠে কলকারখানায় মজুরের সংখ্যা-স্ফীতি ঘটিয়েছিল। পল্লীবাসীর দুঃখময় জীবনের দিকে যেমন এসময় কবিদের দৃষ্টি পড়েছিল, তেমনি নগরে শ্রমজীবীদের কদর্য জীবনযাত্রার দিকেও নজর পড়েছিল। সাবিত্রীপ্রসন্ন সেই দুঃখ দৈন্য ও নিরানন্দ জীবনেরই বাণী ফুটিয়ে তুললেন তাঁর কাব্যে। স্বাভাবতই তাঁর কাব্যের সুর গতানুগতিক পল্লীকাব্যের সুর থেকে অনেকটা পৃথক। সাবিত্রীপ্রসন্ন পল্লী নিয়ে কবিতা লিখলেও তাঁর জীবনচেতনা যুগধর্ম বিরহিত নয়; ভাষা ও ভঙ্গিতে তিনি অবশ্য রবীন্দ্রানুসারীদেরই সগোত্র। কবি বন্দে আলী মিয়া 'ময়নামতীর চর' (১৯৩২) নামে একটি কাব্য লিখে 'পল্লীতীর্থের' অন্যতম পথিকের মর্যাদা পেয়েছেন। কাব্যটিতে নদীমাতৃক পূর্ব বাঙলার চর অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জীবনধারার সুন্দর ছবি অঙ্কিত হয়েছে। কাব্যটি রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল। বন্দে আলীর এই জাতীয় অন্যান্য রচনা হচ্ছে 'মধুমতীর চর' 'পদ্মানদীর চর' ইত্যাদি কবিতা-সংকলন। বন্দে আলীর রচনায় পল্লী-কাব্যের সরলতা ও সহৃদয়তার পরিচয় অনুপস্থিত নয়। কাব্যসাধনায় অন্যত্র বন্দে আলী রবীন্দ্রানুসারী হলেও, এ বিশেষ ক্ষেত্রে জসীমউদ্‌দীনের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন বলে মনে হয়। 'মরাল' কাব্য রচয়িতা কাজী কাদের নওয়াজের কিছু কিছু কবিতায় পল্লীর শ্যামল প্রকৃতির চিত্র উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। এঁরা ছাড়া পল্লী নিয়ে অল্প বিস্তর কবিতা লিখেছেন, এমন কবির সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়।

মোট কথা সাহিত্যে নাগরিকতার সর্বাত্মক প্রভাবের দিনেও পল্লীপ্রকৃতির আকর্ষণ বোধ করছেন বহু কবি ও সাহিত্যিক। কারণ পল্লী আমাদের জীবনে এখনও কিছুটা সক্রিয় শক্তিরূপেই বিরাজ করছে। তবু একথা স্মরণ রাখতে হবে "নব্য বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদে যে urbanity গুণ দেখা যায় প্রাচীন সাহিত্যে তাহা বিরল" —এই urbanity গুণের অভাবেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পল্লীকবিতা parochial বলে অনুভূত হয়। মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের সাধনায় বাংলা সাহিত্য আজ চূড়ান্ত নতুন রূপ লাভ করেছে —তার দৃষ্টি আজ সংকীর্ণ ভৌগোলিক গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বপথে প্রসারিত। প্রমথনাথ বিশী বলেন, "ইহাদের কৃপায় বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে পরিণত হইয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু একথা ঠিক যে, বাংলা সাহিত্য বিশ্বপথিকে পরিণত হইয়াছে। এখন আর তাহার পক্ষে পূর্বতন পল্লীগৃহে বা গোষ্ঠগৃহে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব।"[১] অসম্ভব জেনেও যে আধুনিককালে এত বেশী সংখ্যক কবি ও সাহিত্যিক 'পল্লীতীর্থের' পথিক হয়েছেন, তাই বিস্ময়ের ব্যাপার। শুধু তাই নয়, এঁদের মধ্যে জসীমউদ্‌দীন, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচী— বিশেষতঃ জসীমউদ্‌দীন এ সাধনায় যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন ও সার্থকতার অধিকারী হয়েছেন, তা কবি-প্রতিভার দুর্মর রহস্যেরই ইঙ্গিত দেয়।

১. প্রমথনাথ বিশী— মুখবন্ধ —'কাব্যবিতান', (১ম সংস্করণ) পৃঃ

জসীমউদ্‌দীনঃ কবি-প্রতিভা ও কাব্যচারিত্র্য

নিয়ম নয়, তার ব্যতিক্রমটাই মানুষকে আকর্ষণ করে সবচেয়ে বেশী —এ হচ্ছে এক সহজ জীবন-সত্য। বিশেষ করে, সেই ব্যতিক্রম যদি গভীরতর কোন তাৎপর্য-নির্দেশক হয় তা হলে তার আকর্ষণ হয় অপ্রতিরোধ্য। নব্য নাগরিকতার জয়গানে মুখর আমাদের আধুনিক বাংলা কাব্যের অঙ্গনে জসীমউদ্‌দীনের পল্লীকাব্যের 'মেঠো সুরের' আলাপন ছিল তেমনি একটি গভীর তাৎপর্য-নির্দেশক ব্যতিক্রম। নব্য -নাগরিকতার বিরোধী বলেই নয়, বৃহত্তর দেশ ও জনমানসের গভীর হতে নিঃসৃত হয়েছিল বলেই এই নতুন সুর নব্য-নাগরিকতার কোলাহলকে অতিক্রম করেই আমাদের অন্তরে পথ খুঁজে নিতে পেরেছিল। তাছাড়া যে urbanity-র অভাবে অধিকাংশ পল্লীকবিতা parochial বলে মনে হয়, জসীমউদ্‌দীনের পল্লী-কাব্যে সেই urbanity"র সদ্ভাব ঘটায় তা নাগরিক মানসের কাছেও নতুন তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। তাই দেশের প্রায় সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের আবেদন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল।

আবির্ভাব-লগ্নেই তাই লক্ষ্য করি, জসীমউদ্‌দীনের কাব্য সুধী মহলের অভিনন্দন লাভ করেছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য, ইংরেজ কবি বায়রনের মতই তাৎক্ষণিক (immediate) ছিল। বায়রন তাঁর Childe Herold কাব্যের জন্যে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন। জসীমউদ্‌দীনও কল্লোলের পৃষ্ঠায় তাঁর অপরূপ সৃষ্টি 'কবর' কবিতাটি প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিখ্যাত কবি বলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। পরবর্তী সৃষ্টি 'নকসী কাঁথার মাঠ ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্য তাঁর এ কবিখ্যাতিকে দিয়েছিল দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। সমালোচকরাও কার্পণ্য করেন নি তাঁর এ কবি-মহাত্ম্যকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে। কোন দ্বিধা জাগে নি তাঁদের মনে। তাই তো দেখি, 'কবর' কবিতা প্রকাশের পরে পরেই প্রখ্যাত সাহিত্যরসিক দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন ফরোয়ার্ড নামক কোন সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় 'An young Mohammedan poet নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে। তাতে নজরুল ইসলামের পরেই মুসলমান কবি হিসেবে জসীমউদ্‌দীনের স্থান নির্দেশ করেন। দীনেশচন্দ্র কবিকে মৌখিক প্রশংসা জানিয়েই ক্ষান্ত হন নি; 'কবর' কবিতাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্যে পাঠ্য করে দিয়ে কবিকে দান করলেন অভাবিত -পূর্ব সম্মান। পরবর্তীকালে 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্য প্রকাশিত হলেও দীনেশচন্দ্র সমান উৎসাহ নিয়ে কবির কাব্যের অন্তরঙ্গ আলোচনা করে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। দীনেশচন্দ্র একজন নিরলস সাহিত্য-প্রেমিকের ন্যায়ই জসীমউদ্‌দীনকে দেশবাসীর চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন। জসীমউদ্‌দীন সম্পর্কে তাঁর বিচার যে অভ্রান্ত ছিল, তা প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তী কালে দেশবাসীর কাছে জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের সমাদর থেকে। বস্তুতঃ একমাত্র নজরুল ইসলাম ছাড়া বাংলা দেশের আর কোন মুসলমান কবির ভাগ্যে এরূপ সাদর অভ্যর্থনা জোটে নি বহুদিন।

বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসে জসীমউদ্‌দীনের স্থান যে একমাত্র নজরুল ইসলামেরই পরে এমন কথা কাজী আব্দুল ওদুদ সাহেবও অকপটে বলেছেন। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের ভূমিকা' আলোচনা প্রসঙ্গেই তিনি বলেছিলেন, "নজরুল ইস্‌লামই হচ্ছেন এ যুগের প্রথম বাঙালী মুসলমান যিনি সমস্ত দেশের সম্ভ্রম ও

সমাদর লাভ করলেন। তাঁর পরে সমস্ত দেশের সমাদর লাভ করেছেন মুসলমান পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন।[১] ওদুদ সাহেব অন্যত্র এঁদের সাহিত্য-সাধনার বিশেষ তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, "এঁরা ধন্য হয়েছেন এই জন্য যে একালের মুসলমান সমাজের অন্তরে তার সাহিত্যিক সার্থকতা সম্বন্ধে এক নব আশার সঞ্চার এঁরাই করতে পেরেছেন।"[২] এই উক্তি নজরুল ইসলাম এবং জসীমউদ্‌দীনের সাহিত্য প্রতিভার মূলগত বৈশিষ্ট্যেরই দ্যোতক। বাঙলাদেশের বৃহত্তর জনসমাজের নিগূঢ় প্রাণস্পন্দনটি এঁদের কাব্যে ধরা পড়েছিল বলেই যে এঁদের কবিখ্যাতি এত ব্যাপক হতে পেরেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুই প্রতিভার সাযুজ্য তাই আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। প্রায় একই কালে নজরুল ও জসীমউদ্‌দীন দুই কবি সম্পূর্ণ নতুন কাব্যচেতনার পোষকতা করে বাঙলা কাব্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এঁদের কাব্যচেতনার উৎস অভিনবত্ব ও শক্তিসীমা সম্পর্কে হুমায়ুন কবীর তাঁর 'বাংলার কাব্য' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন, তা উভয় প্রতিভার মূলগত ঐক্যকে যেমনি পরিস্ফুট করে তুলেছে, তেমনি তাঁদের সীমিত সার্থকতার কারণটিও নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করেছে। অধ্যাপক কবীর এই দুই কবির প্রতিভার প্রতিশ্রুতির মূলে লক্ষ্য করেছেন, ইস্‌লামের বিপ্লবী সাম্যবাদজনিত মুসলিম সামাজিক জীবনের ঐক্য। তাঁর মতে "সমাজ জীবনের এই ঐক্যে নজরুল ইস্‌লামের প্রতিশ্রুতির মূল প্রতিষ্ঠিত এবং সেই জন্যই দেখা যায় যে নিপীড়িত জনমানসের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার সাধনা তাঁর রচনায় সবল কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল। ঐতিহ্যের লংঘন তিনি করেন নি--পুরাতন পুঁথি-সাহিত্যের আবহাওয়ায় লালিত বলে বাঙলার বিপুল মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর আছে সহজ আত্মীয়তা। ভাষা ও ভঙ্গিতে নজরুল ইস্‌লামের কাব্যে যে বিপ্লবধর্ম, পুরাতন ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই তার পরিচয় মেলে। দেশের গণমানসের অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাব্যে যতটুকু রূপান্তরিত করতে পেরেছেন, জসীমউদ্‌দীনের কাব্য-সাধনার ঠিক ততখানি সিদ্ধি। উভয় ক্ষেত্রেই পশ্চাদমুখী বলে সে শক্তি কল্পনা ও আবেগের নতুন রাজ্য জয়ে অগ্রসর হতে পারে নি। মানস-সংগঠনের রূপান্তর হয় নি বলে দু'জনের বেলায়ই সৃজনী প্রতিভা অল্পদিনেই নিঃশেষ হয়ে এল। আজ আত্মকেন্দ্রিক পুনরাবৃত্তির মধ্যেই তাঁদের সাধনা সীমাবদ্ধ"।[৩] অধ্যাপক কবীরের বক্তব্য থেকে দুই প্রতিভার মৌল ঐক্য সম্পর্কে যে কয়টি সাধারণ সত্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে এই ঃ এক, উভয়েই মুসলমান সমাজের বিপ্লবী সাম্যবাদজনিত ঐক্যবোধ এবং পুরাতন পুঁথি-সাহিত্যের আবহাওয়ায় লালিত হয়েছেন বলে বাংলার বিপুল মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে রয়েছে তাঁদের আত্মিক যোগ। দেশের নিপীড়িত জনমানসের আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেওয়ার একটা চেষ্টা উভয় ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। তাই দেখি নজরুল নিপীড়িতের মর্মবেদনাকে ভাষা দিয়েছেন, সুর দিয়েছেন 'অগ্নিবীণা, 'বিষের বাঁশী'র ঝংকারে ; আর জসীমউদ্‌দীন একটু স্বতন্ত্র মানসধর্মের তাগিদেই ঐ নিপীড়িত মানুষের বাস্তব দুঃখ বেদনা, প্রেমানুভূতির ব্যর্থতাকে নির্বাক বেদনাভরে চিত্রায়িত করেছেন সরল রেখায় ও রঙে। পল্লী রাখালের বাঁশীর সুরেও তার করুণ কোমল গুঞ্জরণ অবশ্য মাঝে মাঝে ধ্বনিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গেই সমালোচকের উক্তি ঃ 'নজরুল ইসলামের পর জসীমউদ্‌দীনের আবির্ভাব যেন

১. কাজী আবদুল ওদুদ--'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', শাশ্বতবঙ্গ, পৃঃ ৭৬ (১ম সংস্করণ)
২. কাজী আবদুল ওদুদ : 'বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারা' শাশ্বত বঙ্গ, পৃ : ২৬৯। (১ম সংস্করণ)
৩. হুমায়ুন কবীর--'বাংলার কাব্য' (২য় সংস্করণ) পৃ : ৯০।
৪. সঞ্জয় ভট্টাচার্য--'আধুনিক কবিতার ভূমিকা', পৃঃ ২৪।

গায়কের পর চিত্রশিল্পীর আবির্ভাব"[৪] —অনেকটাই যথার্থ বলে গ্রহণ যোগ্য। দুই, নজরুল ও জসীমউদ্‌দীন উভয়েই পুরাতন ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনকামী—নজরুলে সে চেতনা বেশী প্রবল, ভাষা ও ভঙ্গিতে তার স্পষ্ট প্রকাশ। এই অর্থে তাঁরা দুইজনেই কিছুটা পশ্চাদমুখী—দেশের গণমানসের সাথে তাঁদের যোগ মুখ্যতঃ ঐ পুরাতন ঐতিহ্যের সূত্রে। মানস সংগঠনের এই বৈশিষ্ট্য যুগধর্মের প্রভাবেও কোন বড় রকমের পরিবর্তনকে ধাতস্থ করতে পারে নি বলেই দু'জনের সৃজনী প্রতিভা অল্পদিনে নিঃশোষিত হয়েছে। তাই তাঁদের কাব্য-সাধনার প্রথম পর্যায়ে যে সজীবতা ও প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, তা শেষের দিকে পুনরাবৃত্তির একেঘেঁয়েমিতেই পর্যবসিত হয়েছে।

সাধারণভাবে অধ্যাপক কবীরের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হলেও নজরুল এবং জসীমউদ্‌দীনের প্রতিভার মূলগত সত্য নির্ণয়ে আমাদের সন্ধানী দৃষ্টিকে কিছুটা অন্যত্র প্রসারিত করা উচিত। দুই কবির প্রতিভার স্বভাবে অনেকটা ঐক্য থাকলেও বাস্তব কারণেই যে দুজন অনেকটা ভিন্নপথের পথিক হয়েছিলেন, তা আমরা কোনমতে অস্বীকার করতে পারি না। তা ছাড়া দুজনেরই প্রতিভার বিকাশধারা এক রকম হয়েছে এমন মনে করা যথার্থ নয়। একথাও স্মর্তব্য যে, যুগধর্মে দুইয়ের সাড়া দানের পদ্ধতিটাও উভয়ের মানস প্রবণতার পার্থক্যানুযায়ী ভিন্নতর হয়েছিল। তাছাড়া দুইজনের কবিত্ব-শক্তির তারতম্য যে যথেষ্ট ছিল তাও মনে রাখা প্রয়োজন। মোট কথা, সমস্ত বিষয়টাই কিছুটা বিস্তৃত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

প্রথমেই নজরুল প্রসঙ্গে সমালোচকের নিগূঢ় সন্ধানী দৃষ্টি প্রয়োগ করে দেখা যাক। তা হলে আমরা দেখতে পাব, পুরাতন পুঁথিসাহিত্যের ঐতিহ্য ও আবহাওয়ায় লালিত হলেও, নজরুল প্রকৃত পক্ষে সর্ব বিষয়ে পশ্চাদমুখী ছিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণরূপে দেশ, কাল ও সমাজ-সচেতন। রোমান্টিক কবির অতীতপ্রীতি, সুতীব্র সৌন্দর্যানুভূতি ও প্রেমাকুলতা সত্ত্বেও যুগধর্মের স্বীকৃতি রয়েছে তাঁর সকল রচনায়। তাঁর কাব্যবস্তুর বৈচিত্র্য, ভাষা ও ভঙ্গির বিপুব পরবর্তীদের কম প্রভাবান্বিত করে নি। পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও তিনি বর্তমানের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। কাব্যের ভাববস্তু গ্রহণে ও দেহ নির্মাণে তিনি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও তাঁদের কনিষ্ঠ সমসাময়িক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বারা কিছুটা যে প্রভাবান্বিত হয়েছেন, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সমসাময়িক অনেক কবির সাথেই তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এই সূত্রে তিনি অন্যকে প্রভাবান্বিত করেছেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিজেও কিছুটা প্রভাব বরণ করেছেন। এমন কি অতি আধুনিক কবিরা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে অসাধারণ মৌলিকত্বের পরিচয় দিলেও, নজরুলের সমাজ-সচেতন মনোভঙ্গির প্রভাবকে অনেকেই বরণ করে নিয়েছেন। মোট কথা নজরুলের মানস-সংগঠনে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যা অনেকটা অতীতাভিসারী হলেও যুগচেতনা বিরহিত নয়। সামাজিক মানুষ হিসেবে আধুনিক জীবনের জটিলতার প্রভাব তিনি অনুভব করেছেন, আর তাতে সাধ্যমত সাড়াও দিয়েছেন। তাঁর দেশ-ভাবনা সমাজ-ভাবনা ও কাল-ভাবনায় সূক্ষ্ম মননশক্তির কোন পরিচয় উপস্থিত নেই কিন্তু একটা অসামান্য হৃদয়বোধের স্পর্শ সর্বত্র রয়েছে। আধুনিক কবির জটিল জীবনজিজ্ঞাসা বুদ্ধি ও মনন-শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নজরুল হৃদয়াবেগে তাড়িত। এই আবেগের মাত্রাধিক্য কাব্যের শিল্প সার্থকতার পরিপন্থী হয়েছে অনেক জায়গায়। নজরুল আধুনিক যুগের মানুষের দুঃখ-বেদনা, তার নানাবিধ সামাজিক সমস্যার কথা অতি দরদ দিয়ে বলেছেন, কিন্তু তা প্রকাশে কোন ঐতিহাসিক বা দার্শনিক প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন নি। যুগঝঞ্ঝার প্রভাব তিনি তীব্রভাবে অনুভব

করেছিলেন—তাই তাঁর কাব্যে একটা অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, বিক্ষোভ, বেদনার তরঙ্গ দোলা সব সময় লক্ষ্য করা যায়; তাকে অতিক্রম করে জীবনের একটি সুস্থির, কল্যাণময় রূপের সাক্ষাৎকার লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ সকল বিরোধ, সকল অসামঞ্জস্যের মধ্যে ঐক্য আবিষ্কারের জন্য যে স্থিতপ্রজ্ঞের মনোভাব ও সুতীক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন, তা তাঁর ছিল না। যুগজীবনের তরঙ্গে দোল খেয়ে চলেছেন কবি জীবন-ভর, আত্মস্থ হবার অবসর তাঁর কোথায়? তাই তো নজরুল কাব্যে পুরাতন ঐতিহ্যবোধের সাথে আধুনিক জীবনচিন্তার পূর্ণ সঙ্গতি বিধান সম্ভব হয় নি। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মনোভঙ্গি ও ঝঞ্ঝাময় যুগ পরিবেশ তাঁর বিরোধী ছিল। তথাপি নজরুল প্রতিভা বিশিষ্ট—তাঁকে আধুনিক অতি বাঙলা কাব্য অস্বীকার করতে পারে নি, চরিত্রের যথেষ্ট গরমিল সত্ত্বেও।

জসীমউদদীনের প্রতিভা এ'জটিলতা থেকে আশ্চর্য রূপে মুক্ত। তিনি বাল্যে পুঁথি সাহিত্যের হাওয়ায় লালিত হলেও, পূর্ব বাংলার লোকগীতি গাথার মধ্যেই অচিরে খুঁজে পেয়েছিলেন আপন আত্মার উৎসারণের পথ। এই পথেই তিনি সারা জীবন কাব্যসাধনা করেছেন। লোকগীতি-গাথার মোহকর প্রভাব তাঁর কবি-সত্তাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে, তিনি সারা জীবনেও তা থেকে সামান্য দূরে সরে আসতে পারেন নি ('মাটির কান্না' কাব্যে এবং অন্যত্র কালেভদ্রে সে চেষ্টা দেখা গেলেও, তা জয়যুক্ত হয় নি)। আধুনিক জীবনের কোন জটিলতাই তাঁকে স্পর্শ করে নি, না বিষয়বস্তুতে, না ভাবে, না ভাষা-ভঙ্গিতে। অবশ্য বাংলাদেশের গ্রাম আজও জীবনের যোগে লোকসাহিত্য-সম্পদকে কিছুটা সরস করে রাখতে পেরেছে বলে, জসীমউদদীনের কাব্য এখনই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি। তথাপি লক্ষ্য করার বিষয় জসীমউদদীন কি জীবনাচরণে, কি কাব্যের বিষয় ও ভাষার পরিচর্যায় আধুনিকতাকে অনেকটাই এড়িয়ে গিয়েছেন। আধুনিক জীবনের জটিলতা সম্পর্কে তিনি যেন কেমন একটু নির্লিপ্ত। সামাজিক মানুষের দুঃখ-বেদনার ছবি তিনি বেশ সহানুভূতি সহকারেই এঁকেছেন; কিন্তু কোথাও তাঁর রচনায় নজরুলের মতন কোন সমাজ সচেতন মনোভঙ্গি আনুভূতিক তীব্রতায় প্রকাশ পায় নি। কাব্যের ভাষা এবং ভঙ্গিতেও বিশেষ কোন বিপ্লব তিনি সৃষ্টি করেন নি—তবে তাতে কিছুটা অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছেন বৈকি। পুরাতন পল্লীগীতি গাথার শব্দ, বাক্য, উপমা ও ছন্দের সাথে স্বভাবের রাজ্য থেকে গৃহীত শব্দ, উপমার সংমিশ্রণে তিনি তাঁর কোন কোন কবিতা এবং কাব্যে ভাষার যে নকসী কাঁথা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন তা তাঁর উচ্চাঙ্গের শিল্পবোধের পরিচয় বহন করে। পল্লীর আবহের যথার্থ কাব্যরূপ দানে তাঁর ভাষাভঙ্গি আশ্চর্য রূপে সার্থক; কিন্তু আধুনিক জীবনের জটিলতা প্রকাশের পক্ষে তাঁর এ ভাষা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সারা জীবন তিনি পল্লীকাব্যের পুরাতন খাতেই লেখনী চালনা করেছেন। তা থেকে সরে এসে আধুনিক কাব্যের সাথে যোগ স্থাপনের কোন জোর তাগিদ তিনি অনুভব করেন নি। মাঝে মাঝে আধুনিক জীবন-ভাবনা ও যুগজিজ্ঞাসার প্রভাবে নতুন বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি ভাষা ও ভঙ্গিতে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করে প্রমাণ করে দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে খাত পরিবর্তন প্রায় অসম্ভব। বক্তব্যের নতুনত্ব যে ভাষাভঙ্গিরও নতুনত্ব দাবি করে, এ সত্যের উপলব্ধি তাঁর ঘটেছিল এমন কোন প্রমাণ আমরা কোথাও পাই না। কাব্য-সাধনার এক পর্যায়ে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে নজরুলের বাণীভঙ্গিকে প্রয়োগ করেছেন, বক্তব্যেও নজরুল-কাব্যের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি করেছেন ('মাটির কান্না'র কিছু কিছু কবিতায়); কিন্তু তাতে নজরুল-কাব্যের সেই হৃদয়াবেগ সঞ্চারিত হয় নি। তাঁর প্রথম যুগের লেখা 'বালুচর' ও 'রূপবতী' কাব্য দুটির কিছু কিছু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভূতি ও প্রেমব্যাকুলতার

পরিচয় পাওয়া যায়, কোথাও বা বুদ্ধদেব বসু ও জীবনানন্দ দাশের কাব্যবস্তুর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু সেখানেও বাণীভঙ্গিতে তিনি বিশেষ মাধুর্যের সঞ্চার করতে পারেন নি। একমাত্র যথার্থ পল্লীকবিতার ক্ষেত্রে জসীমউদ্‌দীন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর অনুসারী কবিও দু' চারজন জুটেছেন। মোট কথা অতীতচারী রোমান্টিক মনোভঙ্গির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নজরুল ছিলেন যুগধর্মী দেশ-কাল-সমাজ সচেতন কবি। যুগের আলোড়ন, বিক্ষোভ-বেদনা সব কিছুই তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত। তাই তাঁর কাব্যের গণ্ডী অতীত থেকে বর্তমানে প্রসারিত; ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও তাতে আছে। কাব্যবস্তুর বৈচিত্র্যে ও প্রকাশকলার নৈপুণ্যে তিনি অনেক অগ্রসর। জসীমউদ্‌দীন গণ্ডীবদ্ধ—কাব্যের বিষয়ববস্তু, প্রকাশভঙ্গি ও জীবনদৃষ্টিতে গণ্ডী অতিক্রমণের চেষ্টা কোথাও বিশেষ ফলবতী হয় নি। তিনি জীবনদৃষ্টিতে মূলতঃ পশ্চাদমুখীই রয়ে গিয়েছেন। 'মাটির কান্না'য় তিনি আপন মৌল স্বভাবের কিছুটা ব্যতিক্রম রূপে দেখা দিয়েছেন, এটা সত্যি—কতকগুলো কবিতার বক্তব্যে আধুনিক মনের প্রক্ষেপ স্পষ্ট; কিন্তু তা উপযুক্ত শিল্পচেতনা সমর্থিত হয় নি বলেই তেমন কোন মহৎ তাৎপর্য লাভ করে নি।

জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের প্রকৃতি সম্পর্কে সমালোচকের উক্তি যথার্থ —"গ্রাম্যজীবন ও গ্রাম্য পরিবেশ তাঁর কাব্যের উপাদান যুগিয়েছে এবং তাঁর কবিতার কলাকৌশলের মধ্যে গ্রাম্য আবহকে আমরা মূর্ত হতে দেখি।"[১] কাব্যের ভাষায়, উপমাদি ব্যবহারে কথঞ্চিৎ পরিমার্জন ও অনুশীলনের ছাপ ব্যতীত তাতে আধুনিকতার মর্জির বিশেষ স্বীকৃতি নেই। সমালোচকদের মতে তাঁর কাব্যকলার যদি কোন উৎস খুঁজে পেতে হয় তা হলে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল, ময়মনসিংহ গীতিকা ও অজস্র পল্লীগীতি গাথার দিকে। সমকালীন কাব্যে তার সমর্থন তেমন মিলে না। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রানুসারী অন্যান্য কবিরা পল্লীর কথা নিয়ে কাব্য-কবিতা লিখলেও তাঁদের অধিকাংশেরই দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষাভঙ্গিতে আধুনিকতার অনেকটা স্বীকৃতি আছে। এঁদের অধিকাংশের পল্লীচেতনা নাগরিক জীবনের নানা সমস্যার সজ্ঞান প্রতিক্রিয়াজাত। জসীমউদ্‌দীনের পল্লীচেতনা কোন মানসিক প্রতিক্রিয়াজাত নয়। পল্লীবৃত্তের মধ্যেই তাঁর সকল ধ্যান-ধারণা যেন সীমায়িত—তাই তাঁর কাব্যে একই কথা, একই ভাব, একই সুরের পুনরাবৃত্তি দুর্লক্ষ্য নয়। নুতন কথা, নতুন ভাব প্রকাশের চেষ্টা প্রায় কোথাও বিশেষ সার্থকতা মণ্ডিত হয় নি। পল্লী নিয়ে যখন তিনি কথা বলেন তখন তিনি স্বাভাবিক, আর যেই সে গণ্ডী অতিক্রমণের চেষ্টা করেন অমনি তিনি কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েন। তাঁর 'মাটির কান্না' কাব্যটির সমালোচনা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক যা বলেছেন তাতে জসীমউদ্‌দীনের ঐ যথার্থ কবি -স্বভাবের ইঙ্গিতই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন, "যদিও এ কাব্যগ্রন্থে কোন কোন পংক্তি বা উপমায় জসীমউদ্‌দীনের কবিত্ব-শক্তি বিদ্যুতের মত ঝলকিয়ে ওঠে, তবু বলবো তিনি ক্রমেই তাঁর কাব্যের প্রসাদগুণ হারিয়ে ফেলছেন। আধুনিক হয়ে ওঠার ঘর্মাক্ত চেষ্টায় তাঁর বর্তমান কবিতাগুলো ভারাক্রান্ত, ক্লান্ত। তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্য স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে চাচ্ছেন দেখে আহত হয়েছেন তাঁর ভক্ত পাঠকগোষ্ঠী। তিনি যখন শাপলা লতা, বিলের কাজল জল, নিঝুম রাতের বাঁশীর সুর, ধান কাউনের অথই রঙের মেলা, রঙ্গিলা নায়ের মাঝি, বাউ কুড়ানী আর উড়ানী চর নিয়ে কবিতা লেখেন তখন তিনি নিঃসন্দেহে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কবিতার এ পরিমণ্ডলেই তিনি সিদ্ধি খুঁজে পেয়েছেন।"[২]

---

১. সৈয়দ আলী আহসান ঃ 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', পৃঃ ৩২৪ (প্রথম সংস্করণ)।
২. শামসুর রাহমান ঃ 'পূর্ব বাংলার কবিতা', সম্পর্কে 'সওগাতে' প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে।

জসীমউদ্‌দীনের কবিতার শ্রী, ছাদ ও মর্জি একান্তই পল্লীর। "কিন্তু তাই বলে তিনি পরিপূর্ণভাবে গ্রাম্যকবি নন। তার কারণ উপমায়, রূপক প্রয়োগে তিনি যথেষ্ট অনুশীলনের পরিচয় দিয়েছেন এবং কাব্য-কাহিনী নির্মাণে উপন্যাসের গঠন প্রকৃতিকে অবলম্বন করেছেন।"[১] তাছাড়া একথা স্বীকার করতেই হয় পল্লীগাথা ও গীতিকায় পল্লী কবিরা যেভাবে পল্লীকে ফুটিয়ে তুলেছেন, জসীমউদ্‌দীন ঠিক ঠিক তাঁদের সে রীতি অনুসরণ করেন নি। অজ্ঞাত, অখ্যাত, নিরক্ষর পল্লীকবিদের রচনায় কখনই সচেতন শিল্প-প্রয়াস দেখা যায় না। তাই তার বেশভূষার দেখা যায় প্রচুর অসঙ্গতি। জসীমউদ্‌দীন আধুনিক কালের নিষ্ঠাবান শিক্ষিত শিল্পী ; তাঁর রচনায় স্বাভাবিকভাবেই সচেতন শিল্প- প্রয়াস লক্ষিত হয়। পল্লীকাব্য তাঁর হাতে অনেক বেশী শ্রী-সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে অশিক্ষিত পল্লীকবির রচনা থেকে প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কাব্যের পল্লী শিল্পীর চোখে দেখা পল্লী—তাঁর মনের বিস্তৃত ক্যানভাসে তা রংয়ে রেখায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। এখানেই তাঁর মনোভঙ্গির আধুনিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তথাপি জসীমউদ্‌দীন পল্লী নিয়ে কাব্য লিখতে গিয়ে কোন দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হন নি। তার কারণ তাঁর বাল্য ও কৈশোর কেটেছে পল্লীর এমন এক সামাজিক পরিবেশে যেখানে পুঁথি ও লোকসাহিত্যের রসধারায় পুষ্ট হয়েছে তাঁর মন। পরবর্তীকালে পল্লীগীতি সংগ্রাহকের ভূমিকায় নেমে তিনি এ সবের অন্তঃসৌন্দর্যের সন্ধান পান এবং পারিপার্শ্বিক জীবনে তার সমর্থন পেয়ে আরও বেশি আকৃষ্ট হন এদিকে। তাছাড়া বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে যান্ত্রিক নাগরিক সভ্যতার বিরুদ্ধে দারিদ্র্যক্লিষ্ট মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্ত মানুষের প্রথম সচেতন প্রতিক্রিয়ার কালে সৃষ্ট বলে, তাঁর কাব্য একটা অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিল। এখনকার মত পল্লীর সাথে তখনও দেশের অধিকাংশ মানুষের মানসিক বিচ্ছেদ ঘটে নি, সে কথাও স্মরণ রাখা দরকার। জসীমউদ্‌দীনের কবি-কর্ম তাই সে দিনকার নাগরিক সমাজেও কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর কবিতা যেন, "গেঁয়ো মাঠের সজল- শীতল বাতাসের স্পর্শ নিয়ে নগরের উর্ধ্বশ্বাস ঘর্মাক্ত জীবনে একটা স্বস্তির বাণী বহন করে এনেছিল। তিনি কাব্যরাজ্যে নতুন 'পাঠশালা' সৃষ্টির জন্যে অভিনন্দিত হয়েছিলেন।"[২]

জসীমউদ্‌দীনের কবি-কর্মের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র যথার্থই বলেছেন—"তিনি সর্বদা তাঁহার অপরিশোধনীয় পল্লী-মাতৃকার ঋণ শোধ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। —কাহারও কাছে দান পাওয়ার জন্য হাত বাড়ান নাই।"[৩] হাত তিনি বাড়িয়েছেন, পল্লী-মাতৃকার কাছেই ; তাঁর সঞ্চিত রত্নরাজি তিনি অনেক সময় আপন কবিতার মূলধন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অন্য কোন সাহিত্যের দ্বারস্থ হন নি। তবু বিশেষ কালের বিশেষ বাণীকে অস্বীকার করে খুব বেশী দূর যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, তা জসীমউদ্‌দীন আপনার সীমাবদ্ধ কাব্যিক সার্থকতা দ্বারাই প্রমাণ করে দিয়েছেন। আজ থেকে চার পাঁচ দশক আগে যখন জসীমউদ্‌দীন কাব্য-সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তখনও যন্ত্রযুগের প্রসার তত ঘটে নি, আর নগর আমাদের জীবনের সর্বদিকের নিয়ামক হয়ে ওঠে নি—যদিও তার

---

১. সৈয়দ আলী আহসান ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', পৃঃ ৩২৪ (প্রথম সংস্করণ)

২. ১৩৩৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা, বিচিত্রায় দীনেশচন্দ্র সেনের 'নকসী কাঁথার মাঠ', শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৩. ১৩৩৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা বিচিত্রায় দীনেশচন্দ্র সেনের 'নকসী কাঁথার মাঠ', শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

সবগ্রাসী প্রভাব ক্রমশঃই প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছিল। তাই 'পল্লীকবিতা'র দু' একটি সুর তখনও 'দূরাগত রাখালের বংশী ধ্বনির' মতই আমাদের কানে প্রবেশ করে প্রাণে এক আকুলতা জাগাত। আজ সে পারিপার্শ্বিক একেবারেই যেন পাল্‌টে গিয়েছে। যন্ত্রযুগের একাধিপত্য স্থাপিত হওয়ার ফলে নগর-জীবনের দ্রুত বিকাশ ঘটছে ; সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ভারকেন্দ্র এখন প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই নগরে সরে এসেছে। পল্লী এখন প্রায় সকল দিক দিয়েই নগর-নির্ভর হয়ে পড়েছে। পল্লীবাসীর ধ্যান, চিন্তা, উৎসব-অনুষ্ঠান, বেশভূষা, চাল-চলন সব কিছুতেই নাগরিকতার প্রভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। পল্লীতে বাস করেও লোকে এখন নগরের স্বপ্ন-সুখের মোহাবেশ অনুভব করে। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মধারা নগর থেকে পল্লীতে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। পল্লী-মানুষের চিন্তাধারা ও রুচি বদলে যাচ্ছে, স্বভাবের সরলতা এক্ষণে চারিত্রিক জটিলতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। পুরাতন পুঁথিসাহিত্য ও পল্লীগীতি গাথার রসে এখন আর তাদের মন ভরে ওঠে না। আধুনিক যুগের পত্র-পত্রিকা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, কবিতার জৌলুসে তাদের মন আকৃষ্ট হচ্ছে, নতুনের সাথে পরিচয়ে তাদের চিত্ত-চমৎকৃতি ঘটেছে। পল্লী-রাখাল, নৌকায় মাঝির কণ্ঠে এখন পল্লীগীতির পরিবর্তে শহুরে সিনেমার গানও শোনা যায়। গ্রাম্য-বিবাহ মজলিসে এখন পিতৃপিতামহের কীর্তি বর্ণন, পুঁথিপাঠ ইত্যাদির পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পর্কিত নানা কথার আলাপন, রাজনীতির আলোচনা থেকে শুরু করে মাইকের উচ্চ রবে ধ্বনিত সিনেমার চটুল গানও শোনা যায়। নারী-কণ্ঠের গীতি এখন স্তব্ধ। ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানেও পূর্বের সেই অনাড়ম্বর ভাবটি বজায় নেই। পল্লীর ছেলে এখন সাদামাটা ধুতি, লুঙ্গি, জামা পরে খুশী নয়; তারাও কোট-প্যান্ট, কমপক্ষে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে ভদ্র সভ্য-ভব্য হতে ইচ্ছুক। পল্লীর মেয়ে এখন হয়ত চোখে কাজল নাকে নোলক পরা পছন্দ করে না, সাদামাটা শাড়ীতে তার মন ভরে না। পাতায়-ছাওয়া কুড়েঘরে এখন যেন তাদের মন টিকে না। পুরাতন কালের ন্যায় ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান নিয়েই তারা তৃপ্ত নয় ; তারা এখন সভাসমিতি করে, রাজনীতির চর্চা করে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কথা চিন্তা করে। রাখালিয়া গান, জারী, মুর্শিদী, যাত্রাগান ইত্যাদিতে আর তারা তৃপ্ত নয়, এখন তারা থিয়েটার, সিনেমা দেখার আগ্রহ বোধ করে বেশী। পল্লীর শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশে থেকেও তারা শহরের ইট-পাথরের রাস্তা, দালান কোঠা, বিজলীবাতির আলো ঝলমল রূপের ধ্যানে বিভোর। শহরের ধনৈশ্বর্যের জৌলুসে তাদের চোখ ঝল্‌সে গিয়েছে, তারাও তাতে নিজ নিজ অংশ দাবি করতে উৎসুখ হয়েছে। পল্লীজীবন ও প্রকৃতির সকল মাধুর্যই আজ আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে বসেছে। নাগরিক সভ্যতার প্রভাবে পল্লীবাসীর জীবন-ভঙ্গিমার এ বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের ফলে পল্লী তার সকল বৈশিষ্ট্য হারাতে বসেছে। ফলে পল্লী আজ আর কল্যাণ ও শান্তির আশ্বাসে আমাদের মুগ্ধ করে না। পল্লী থেকে আমাদের দৃষ্টি আজ পরিপূর্ণভাবেই নগরের দিকে ফিরেছে। বাঙলা কাব্যের অঙ্গন থেকে পল্লীও তাই বিদায় নিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিচ্ছেন পল্লীর রূপকার কবিরাও। এ বিদায় দৃশ্যের কারুণ্যে বিগলিত-ব্যথিত কবিচিত্তেরই দীর্ঘ নিঃশ্বাস যেন ঝরে পড়েছে কবি কালিদাস রায়ের একটি চমৎকার কবিতায়। আমরা কবিতাটি উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করতে পারলুম না ঃ

" বিদায় নিল লুকুচুরি শিউলি যুঁই এর বনে
বিদায় নিল সজল চোখে ন'বছরের ক'নে।
বিদায় নিল কাঁচপোকা টিপ, নয়নে কাজল

নাকটি হ'তে নোলক মোতি, চরণ হতে মল।
বিদায় নিল লালপেড়ে আধ ঘোমটাটি বধূর
সরল সভয় তরল চোখের চাউনি সুমধুর।
সুবাসভরা টেক্কা খোঁপার চারু চিকন ছবি,
তাদের সাথে বিদায় নিল কবি। ....
ধনপতি সাধুর পায়ের উদ্ধত দাপট
ভেঙে দিল খুল্লনা মার চণ্ডীপূজার ঘট
ধান দুর্বার আশিস্ গেল, মায়ের হাতের ফোঁটা
হৃৎকমলের পাপড়ি ঝরে রইল শুধু বোঁটা।
যুগের হাওয়া বদলে গেল, নিভিয়ে দিল ঝড়
বঙ্গামাতার আঁচল আড়ের দীপটি মনোহর।
কবির যত পুঁজিপাটা বিদায় নিল সবি
তাহার সাথে বিদায় নিল কবি।"[১]

জসীমউদ্‌দীন নিজেও শেষ জীবনে সে বিদায় দৃশ্যেরই অভিনেতাদের দলে ছিলেন। তাঁর কাব্যেরও পুঁজিপাটা যেন ফুরিয়ে এসেছিল। তাই দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল পল্লীকাব্যের আসর থেকে তাঁর সরে যাওয়ার মৌন আয়োজন। তিনি পল্লী থেকে শহরের দিকেই যেন পারি জমাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। শহরের সাথে সম্পর্কের দীর্ঘতার সাথে সাথে পল্লীর সাথে তাঁর সম্পর্কে চিড় খেয়ে চলেছিল বহুদিন থেকেই। তাই বিশ-শতকের চতুর্থ দশকের পর থেকেই লক্ষ্য করি তাঁর কাব্যের মাধুর্য কেমন যেন ফিকে হয়ে আসছিল। তাঁর কাব্য-সাধনার ধারার সাথে যাঁরা প্রথম থেকে পরিচিত ব্যাপারটা তাঁদের নজর এড়ায় না। তবু মনে হয় পল্লীমাধুর্যের স্মৃতির কন্টক খোঁচা তিনি শেষ পর্যন্ত অনুভব করে গেছেন। তাই পল্লীকাব্যের চূড়ান্ত বিদায়ের দিনে তিনি সেই হারানো পল্লীসুরের এক আধটি কলিকে কাব্যে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। শহরের প্রাচীর ক্রমশঃই উঁচু হয়ে উঠে পল্লীকে তাঁর দৃষ্টিসীমার আড়াল করে ফেলছিল। শুধু স্মৃতির সুরভির মত পল্লী তাঁকে আনমনা করে তুলত এই যা।

জসীমউদ্‌দীন ও লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য

জসীমউদ্‌দীনের কাব্য-সাধনার অভিনবত্বের ইঙ্গিত দিয়ে জনৈক সুধী সাহিত্যরসিক বলেছেন, "জসীমউদ্‌দীন এ যুগের যত কিছু উত্তাপ ও উত্তেজনা থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে গিয়ে পূর্ব বাংলার প্রাণকেন্দ্র গ্রামগুলোর নিঝুম অন্তঃপুরে আপনাকে স্থাপন করতে পেরেছিলেন। পূর্ব বাংলার গ্রাম্য জীবনের নিস্তরঙ্গ রূপ, গ্রাম্য কলহ-দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে অনন্তকাল প্রবাহিত তার একটা অপেক্ষাকৃত মৃদু শান্ত ধারা জসীমউদ্‌দীনকে আশ্রয় করে যেন কথা কয়ে উঠতে চেয়েছে। গ্রামকেন্দ্রিক, নদীমাতৃক পূর্ব বাংলার প্রকৃতিতে ও মানুষের জীবনে যে অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য আবহমান কাল থেকে চলে আসছে যার রূপ আমরা দেখে আসছি

১. কালিদাস রায়—'কবির বিদায়', বেতার জগৎ, 'শারদীয়া', সংখ্যা ১৮৭৯ শকাব্দ দ্রষ্টব্য।

লোকসাহিত্যও নাগরিকসাহিত্যের বিষয় ও রূপকে অনেক সময় আপনার করে নেয়। আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া মোটেই শক্ত নয়। এ সম্পর্কে স্বয়ং জসীমউদ্‌দীন বলেন : "আমাদের আদি যুগের বাঙলা সাহিত্য সংস্কৃত ও লোক-সাহিত্য হইতে রসধারা গ্রহণ করিত। সেই জন্য আমাদের ইংরেজী পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্য গ্রামীয় সাহিত্য হইতে পৃথক ছিল না। .... সাহিত্য গীত হইত বলিয়া দেশের আপামর জনসাধারণ তাহাতে রসগ্রহণ করিতে পারিত। সেকালের রচকেরা যেমন পল্লীসাহিত্য হইতে রসধারা গ্রহণ করিতেন, সেকালের লোক-কবিরাও তেমনি মধ্যযুগের ভদ্র-সাহিত্য হইতে প্রচুর ভাবধারা গ্রহণ করিয়াছেন। "চণ্ডীমঙ্গলের' দুর্গার কাচলীর বর্ণনা, 'মনসামঙ্গলের' নৌকার বর্ণনা ও ঐয়োদের বর্ণনা, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখদের রচিত পদাবলী সাহিত্যের বহু পদে ইহার সাক্ষ্য রহিয়াছে।"[১] কিন্তু উনিশ শতকে ইউরোপ থেকে এক সম্পূর্ণ নতুন সভ্যতা, নতুন ভাবচৈতন্য এসে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের জাতীয় চেতনাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলায়, লোকসাহিত্যের সাথে ভদ্র-সাহিত্যের সে যোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে উনিশ শতকে রচিত আশ্চর্য রূপে সমৃদ্ধ আমাদের বাঙলা সাহিত্য দেশের বৃহত্তম জনমানস থেকে দূরেই সরে রইল। "যদিও মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনায় দেশের গ্রামীয় ভাবধারার অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের সাহিত্যরস পান করা মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে আরও সুগম হইল ; কিন্তু তাঁহাদের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিমা এতই পৃথক যে, দেশের জনগণ সেখানে প্রবেশ করিতে পারিল না।"[২]

জসীমউদ্‌দীন বাঙলা সাহিত্যের এই দুই ধারার ব্যবধান ঘুচিয়ে সাহিত্যকে জনমানসের নিকটবর্তী করে সামগ্রিকভাবে বাঙলা কাব্যের ধারাবাহিকতাকেই যেন প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং তা করতে গিয়ে তিনি আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা লব্ধ নাগরিক চেতনাপুষ্ট মন নিয়েও পল্লীর দ্বারস্থ হয়েছেন—ঐ সূত্রে লোকসাহিত্যের সুবিশাল ঐশ্বর্য ভাণ্ডারকে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি লোকসাহিত্যের মালমশলা নিয়েই তাঁকে যুগের প্রয়োজনানুসারে পরিমার্জিত ও পরিশোভিত করে, নানা আঙ্গিকে পরিবেশন করে তাকে অনেকটাই ভদ্র-সাহিত্যের মর্যাদা দিতে পেরেছেন।

জসীমউদ্‌দীনের পক্ষে যে এরূপ করা সম্ভব হয়েছে তার কারণ তিনি জন্ম ও ঐতিহ্যসূত্রে পল্লীজীবন ও সাহিত্যের সাথে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন ; শিক্ষাসূত্রে ও কর্মসূত্রে লোকজীবন ও সাহিত্যের সাথে তাঁর পরিচয় আরও নিবিড় হয়েছিল। আবার ঐ শিক্ষাসূত্রেই তিনি আধুনিক সাহিত্যের বিশালতা, শক্তিমত্তা, প্রকাশ বৈচিত্র্য, দেহসৌষ্ঠব সম্পর্কেও বিশেষ মনোযোগী হয়েছিলেন। তাই লক্ষ্য করি লোকজীবন তাঁর রচনার প্রধান অবলম্বন হলেও লোকসাহিত্যের মালমশলা—ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, প্রভৃতিকে ব্যাপকভাবে সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে কাজে লাগিয়েও তিনি পুরাতন পল্লীকাব্যের সামান্য মার্জিতরূপের পুনরাবৃত্তি করেন নি। ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার ব্যবহারে তাঁর রচনায় আধুনিক কালের সচেতন শিল্পীমানসের পরিচয় যেমন বিধৃত, জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও ভাবনার রূপায়ণে বিচিত্র আঙ্গিকের ব্যবহারেও তা তেমনি পরিস্ফুট। তিনি কবিতা লিখেছেন, গান রচনা করেছেন, কাব্যোপন্যাস ফেঁদেছেন। আবার গদ্যরীতির আশ্রয়ে জীবন-স্মৃতি, ভ্রমণকাহিনী, রূপকথা যেমন লিখেছেন, তেমনি নাটক এবং উপন্যাসও

---

১. জসীমউদ্‌দীন, 'বাঙলা লোকসাহিত্য',—মোহাম্মদী, মাঘ, ১৩৬২।
২. জসীমউদ্‌দীন, বাঙলা লোকসাহিত্য,—মোহাম্মদী, মাঘ, ১৩৬২।

লিখেছেন। তাঁর প্রায় সকল রচনারই উপজীব্য পল্লীমানুষের জীবন ও পল্লীপ্রকৃতির শান্তরূপ ; কিন্তু পল্লীকবিদের মত গতানুগতিক বিবৃতি ও বর্ণনায়ই তা নিঃশেষিত নয়। তিনি বিষয়ের উপস্থাপনায় উচ্চাঙ্গের কলাকৌশল প্রয়োগের ক্ষমতা দেখিয়েছেন—কোথাও কবির ন্যায় আপন অনুভব ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ করেছেন, কোথাও ঔপন্যাসিকের ন্যায় বিষয়নিষ্ঠা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, চরিত্র সৃষ্টি ও বর্ণনা শক্তির স্বাক্ষর রেখে দিয়েছেন। আবার কোথাও শিশুর মন-ভোলানো রূপকথার আশ্রয় নিয়েছেন, বৈঠকী ঢঙে আপন স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। কোথাও বা পল্লী নর-নারীর বৈচিত্র্যহীন জীবন থেকেই দু একটি আশ্চর্য নাটকীয় সম্ভাবনাময় দৃশ্যকে তুলে ধরেছেন নাটকেরই আঙ্গিকে—সর্বত্র নাট্যকারের নিরাসক্তি অবশ্য বজায় রাখতে পারেন নি ; গীতিকবির অন্তরাবেগ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে মাঝে মাঝে। মনোভঙ্গির এসব বৈশিষ্ট্যে তিনি তো আধুনিকতারই দাবিদার। অথচ তাঁর রচনায় পল্লীসাহিত্যের আমেজটি প্রায় কোথাও হারিয়ে যায় নি। পল্লীর শ্যামল শস্যক্ষেত্র, গাছপালা, জঙ্গল-ঘেরা পল্লীকুটির, এর নদীনালা,খাল, বিল, ডোবা, মাঠ, পথঘাট সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। পল্লীর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলনপূর্ণ জীবন-বৈচিত্র্যের চিত্রায়ণেও তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। পল্লীনারীর ঘরকন্না, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান, গ্রাম্যকলহ ও দাঙ্গা হাঙ্গামার বর্ণনায় জসীমউদ্‌দীনের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রশংসা করতে হয়। পল্লীর চাষী, মুসলমান, নমঃশূদ্র, জেলে, বৈরাগী, বেদে প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জীবন তাঁর রচনায় মুখ্যতঃ অবলম্বিত হয়েছে ; তা ছাড়া পেশা সূত্রে গ্রাম্য লেঠেল, জমিদারের নায়েব, গ্রাম্য ঘটক, মৌলবী, মুন্সী, গ্রাম্য মাতব্বর, ফকির ইত্যাদি নানাস্তরের লোক তাঁর রচনায় বিচরণশীল। এদের হাব-ভাব ভাষা ও ভঙ্গির যথার্থ রূপটি ফুটিয়ে তুলতে জসীমউদ্‌দীন চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। তাঁর পল্লীজীবন-ভিত্তিক প্রায় সকল রচনার ভাষাতেই পল্লী-আবহের স্বীকৃতি রয়েছে। পল্লী নর-নারীর মুখের ভাষায় মাঝে মাঝে তিনি পুরোপুরি গ্রাম্য বাকভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন, অথচ ভাবে কোথাও গ্রাম্যতার প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর বক্তব্যের সরলতা ও পরিচ্ছন্নতা প্রায় সর্বত্রই রক্ষিত হয়েছে। একটা অকৃত্রিম কবিত্ববোধ ও আন্তরিকতার স্পর্শ থাকায় তাঁর অনেক সৃষ্টিই 'অপজাতের হয়েও উঁচু জাতের হতে পেরেছে।' পল্লী নিয়ে লেখা জসীমউদ্‌দীনের কাব্য ও অন্যান্য রচনা তাই শিক্ষিত রুচিরও তৃপ্তি বিধানে সমর্থ হয়েছে, পল্লীপথচারী হয়েও নগরের রাজসভায় প্রবেশাধিকার পেয়েছে। এটাই বাঙলা কাব্যে জসীমউদ্‌দীনের কৃতিত্ব।

পল্লীগীতি, গাথা ইত্যাদি লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য আশ্রয় করে সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস নজির বিহীন নয়। খোঁজ করলে পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যেই তার হদিস মিলবে। সকল দেশেই জনসাধারণ নামক বিশাল মানবগোষ্ঠীর ভাবনা, চিন্তা ও রুচির প্রতিফলন ঘটেছে এই লোকসাহিত্যের গীতি, গাথা, রূপকথা, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদির মধ্যে। তাই এ সবের সাথে যথার্থ পরিচয় ব্যতীত দেশের জনসাধারণকে সত্যিকার ভাবে জানা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। বিশেষতঃ দেশের বৃহত্তর জনমানসের কথা যাঁরা সাহিত্যে প্রকাশ করতে চান, স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের লোকসাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হয়। তাঁরা লোকসাহিত্যের পুনরাবৃত্তি করেন না, লোকসাহিত্যের মালমশলা অবাধে প্রয়োগ করে বিশিষ্ট কলাকুশলতার গুণে এমন এক নতুন জিনিস সৃষ্টি করেন, যাতে লোকসাহিত্যের আমেজটি থেকে যায়, অথচ শিল্পগুণে তা সর্বশ্রেণীর পাঠকের চিত্তজয়ে সমর্থ হয়। সাহিত্যে লোকজীবনকে মর্যাদা দানের এ নতুন প্রচেষ্টা আধুনিকালে মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চেতনারই ফল। বাঙলা

সাহিত্যে জসীমউদ্দীন এই ঐতিহ্যাভিত্তিক সাহিত্য রচনায় অসাধারণ উৎসাহী ছিলেন। পূর্ববঙ্গ গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকার জীবনরস সমৃদ্ধ কাহিনীগুলো, বাঙলার মাঠে ঘাটে হতেনো অকস্র বিচিত্র পল্লীগীতি, রূপকথা, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদি জসীমউদ্দীনকে ঐতিহ্যাভিত্তিক সাহিত্য-সাধনার অনুপ্রেরণা দিয়েছে। রাতের কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকও পৌরাণিক কাহিনী, গীতি-গাথা, বৈষ্ণব পদ ইত্যাদির প্রভাবে পল্লী কেন্দ্রিক কাব্য রচনা করেছেন। আরও অনেকেই কম-বেশী পল্লীসাহিত্যের শরণাপন্ন হয়েছেন প্রায় ঐ একই কালে। এজন্য এঁদের বিশেষ পরিপার্শ্বিক, মানসধর্ম ও সমকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজের পল্লীচেতনা অনেকটাই দায়ী। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই বিশ্বসূত্রে বাঙলা দেশেও বুদ্ধিজীবী সমাজে লোকসাহিত্যের ঐশ্বর্য সম্পর্কে চেতনা দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর প্রচেষ্টায় এদেশে লোকসাহিত্যের অনুসন্ধান ও আলোচনা আরম্ভ হয়। বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে দীনেশচন্দ্র সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতিমোহন সেন, চারুচন্দ্র দে, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, জসীমউদ্দীন প্রমুখ মনীষীদের প্রচেষ্টায় বিশাল লোকসাহিত্যের দ্বার আমাদের জন্য খুলে যায়। দেশের পুরাতন বস্তুভাণ্ডারের চাবিকাঠি হস্তগত হওয়ার ফলে অনেকেই সে সম্পদকে কাজে লাগানোর আগ্রহ বোধ করেছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিশপ পার্সীর "Reliques of Ancient English Poetry" (প্রাচীন ইংরেজী কবিতার নিদর্শন) বহু কবি ও সাহিত্যিকের দৃষ্টি এদিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। এই সংগ্রহই কিশোর কবি স্কটকে পল্লীসাহিত্যের মাধুর্যের দিকে আকৃষ্ট করে। তিনি শুধু স্কটল্যান্ডের গ্রাম্যগাথা সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হন নি, এসব গ্রাম্যসাহিত্যের অনুসরণে বহু খণ্ড কবিতা ও গাথা রচনা করে জগতে রসপিপাসুদের কাছে লোকসংস্কৃতির জন্যে একটা উচ্চ আসন প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজ লিখিত ও সঙ্কলিত 'Lyrical Ballad' গুলোও বোধহয় এই একই প্রেরণায় লিখিত। স্কটের Eve of St. John কিংসলীর 'The Sands of Dee, লং ফেলোর 'The Wreck of Hesper', রসেটির 'Stratton Water' এবং মরিসের 'Shameful Death' ইত্যাদি গাথাগুলো পুরানো লোকগাথার ঐতিহ্যেই রচিত। তবে এগুলো পুরাতনের অনুকৃতি মাত্র নয়। এসব রচনায় ঘটনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, বর্ণনার বিস্তৃতি, মনস্তাত্ত্বিক কৌতূহল ও ভাষায় যে উচ্চতরের শিল্পশৈলী লক্ষ্য করা যায় তা যুগোচিত শিক্ষা ও রসবোধের সমুন্নতির লক্ষণ। জসীমউদ্দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'সকিনা' ইত্যাদি কাহিনীকাব্য বা কাব্যোপন্যাসও পুরাতন গীতিকা বা গাথার লক্ষণাক্রান্ত অথচ আধুনিকতার গুণযুক্ত। অবশ্য জসীমউদ্দীনের লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যাভিত্তিক কাব্যসাধনা বিচিত্র আঙ্গিকের পরিচয়ায় যে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে এমন আর কোন কবি-সাহিত্যিকের বেলায় ঘটে নি। আসল কথা, লোকজীবন ও লোকসাহিত্য নিয়ে এমন ব্যাপক ও একনিষ্ঠ সাধনা আধুনিক যুগে অন্যদেশে কেউ করেছেন কিনা জানি না, বাঙলা দেশে যে কেউ করেন নি, তা এক প্রকার নিশ্চিত।

বাঙলার লোকসাহিত্যের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে লোকগীতির অজস্র ধারা। গানের দেশ এই বাঙলা—এর মাঠে গান, ঘাটে গান, নদীর বুকে, ধূধূ বালুচরে প্রবাহিত গানের স্রোত। পল্লীর কুটিরে কুটিরে সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে, কোথায় গান নেই? এর চাষীর মুখে গান, রাখাল বালকের মুখে গান, নৌকার মাঝির মুখে গান, পথের ভিখারী, গাঁয়ের বৈরাগী-বোষ্টম, বাউল-ফকির সবারই মুখে গান। এই গানেই বাঙালীর সহজিয়া মন

মুক্তি পেয়েছে। 'বাঙালী তার দুঃসহতম জীবনযাত্রার শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও জীবনের সৌন্দর্যকে অব্যাহত রেখেছে তার এই সহজ মনের গান দিয়ে।'[১] 'বাঙলার নদ-নদী বিধৌত শ্যামল প্রকৃতি যেন 'অশ্রুত কোন গানের ছন্দে চিরতরঙ্গায়িত। যার দেখবার চোখ আছে, শোনবার কান আছে, সেই সত্য বলে তা অনুভব করবে। আর যে একবার সে ছন্দায়িত রূপ, সে মধুর স্পর্শ অনুভব করেছে মনে, সেই পাগল হয়েছে। সে ছন্দ, সে সুরের অনুভব জসীমউদ্‌দীনের হয়েছিল ; তাই তো তাঁকে বলতে শুনি, "বাঙলার গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা, মেঘনা, মোরাই, বলেশ্বরী নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া শ্যাম মাটির উপর রূপালী গান ছড়াইয়া কল কল নাদে বহিয়া চলিয়াছে। যেন কোন অদৃশ্য সুরকার নদী-তরঙ্গের রূপালী তারে তারে তার কোমল অঙ্গুলীর স্পর্শ দিয়া বাঙলার শাশ্বত কালের ভাটিয়ালী সুর আকাশে-বাতাসে ছড়াইয়া দিতেছে।—সারাটি জনম ধরিয়া আমি বাঙলার এই রূপ দেখিয়াছি। দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।....."[২] এই রূপমুগ্ধতাই তো জসীমউদ্‌দীনকে বাঙলার প্রাণের সুর ফুটিয়ে তুলতে প্রেরণা দিয়েছে কাব্যে, গানে। এমন যে রূপপাগল কবি, তিনি যে বাঙলার কবিগান, তর্জা, পাঁচালী, পাঁওতালী, কুমুর, বামালী, পটুয়া, জাগগান, বারমাস্যা, মেয়েলী গান, গম্ভীরা, ভাদু, ভাওয়াইয়া গান, বেটু, টপ, কীর্তন, যাত্রার গান, সত্য পীর ও মাণিক পীরের গান, ইসলামী গাজীর গান, মারফতী, মুর্শিদী গান, জারী গান, দেহতত্ত্ব, বাউল, ভাটিয়ালী গান, ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের গান, মৈমনসিংহ গীতিকা, ছেলে ভুলানো ছড়া, ফসলকাটার গান, মেঘ রাজার গান, ছাদ পেটানো গান ইত্যাদি অন্তহীন বৈচিত্র্যপূর্ণ গানের সুরে আচ্ছন্ন হয়ে যাবেন তাতে আর আশ্চর্য কি। তাই তো জসীমউদ্‌দীনের কাব্য-সাধনা তথা সাহিত্য-সাধনা লোকসঙ্গীতের বিচিত্র সুরে নিয়ন্ত্রিত হতে দেখে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। নাগরিকতার প্রভাবে আমরা এসব থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি বলেই জসীমউদ্‌দীনের কাব্য আমাদের কাছে মনে হয় 'বহু দূরের ওপার হতে ভেসে আসা কোন অপরিচিত গানের সুর'—যা আমাদের হৃদয়ে দোলা দেয় ; কিন্তু চেতনাকে তেমন নাড়া দেয় না। কিন্তু এ সুর তো আমাদের ঘরের পাশেই পল্লী প্রান্তরে প্রান্তরে আজও কেঁদে ফিরছে ! আমরা তার খবর রাখি না বলেই তার মাধুর্য তেমন অনুভব করি না। পল্লীরূপ-মুগ্ধ জসীমউদ্‌দীন আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও পল্লীগীতি, গাথার মোহকর প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি পল্লীগীতি, গাথার সুরে শুধু সাড়াই দিলেন না, তাতে একেবারে প্রায় ডুবেই গেলেন—এ রহস্যের মূল কোথায় তা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি তাঁর কবি-প্রতিভার স্বরূপ ও কাব্যচারির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে। এ যেন কবির আপন স্বভাবেই প্রত্যাবর্তন—'ঘরের ছেলের ঘরে ফিরে আসা।'

জসীমউদ্‌দীন তাঁর বিশিষ্ট কবিমনটির পুষ্টির উপযুক্ত খাদ্য পেয়েছিলেন মহাযুদ্ধের কাহিনীকাব্য ও গ্রাম্য গীতি-গাথার রাজ্যে। একজন আধুনিক কালের শিক্ষিত কবির এমন অদ্ভুত মানসিকতার কথা চিন্তা করে অনেকেই হয়তো তাজ্জব বোধ করেন ; কিন্তু জসীমউদ্‌দীনের মানসপ্রকৃতি গভীর ভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে জসীমউদ্‌দীনের পক্ষে এই-ই স্বাভাবিক। জসীমউদ্‌দীনের কবি-সত্তাটি বেড়ে উঠেছিল পল্লীর সুদৃঢ়

---

১. রণজিৎ কুমার সেন : "বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য', - 'বাঙালী ঐতিহ্যে বাংলার লোকসঙ্গীত' পৃঃ ৪৩।

২. জসীমউদ্‌দীন : বাংলার লোকসাহিত্য', মোহাম্মদী, মাঘ, ১৩৬২।

আবেষ্টনীতে, তা পুষ্ট হয়েছিল পুঁথিসাহিত্য ও লোকসাহিত্যের রসধারায়—আধুনিক শিক্ষা সে সুদৃঢ় বেষ্টনী ভেদ করে তাঁর ভেতরের প্রকৃতিকে নাড়াই দিতে পারে নি। আধুনিক শিক্ষার যা কিছু প্রভাব তা তাঁর কাব্য-সাহিত্যের বহিরঙ্গেই সীমাবদ্ধ। লোকগীতি-গাথার মধ্যে বাঙলার অজস্র পল্লীর অজস্র মানুষের জীবনবৈচিত্র্যের যে সন্ধান জসীমউদ্‌দীন পেয়েছিলেন, জীবনাভিজ্ঞতায় তার বাস্তব সমর্থন পেয়ে তিনি স্বভাবতই এসবের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। লোককবিরা একান্ত স্বভাবের ভাষায় গ্রামীণ মানুষের জীবনের যে বিশ্বস্ত রূপ অঙ্কন করেছেন, তা জসীমউদ্‌দীনকে ঐ পথে বৃহত্তর ও ব্যাপকতর শিল্প সার্থকতার ইঙ্গিত দিয়েছিল। বিশেষতঃ পল্লীগীতির মধ্যে তিনি লোকচিত্তের যে ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, গীতিকা বা গাথার রাজ্যে নর-নারী জীবনের যে মহিমময় রূপের সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন—তা তাঁকে পল্লীজীবন নিয়ে নতুন কাব্য লিখবার উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকায় তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সাদামাটা পল্লী নর-নারীর জীবন প্রেমে, ত্যাগে, দুঃসহ ক্লেশবরণের ক্ষমতায় কিরূপ সজীব ও জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। শুধু কি তাই ! পল্লী নর-নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনা, আধ্যাত্মিক পিপাসা, প্রাত্যহিক জীবন-চর্চার শত তুচ্ছ অভিজ্ঞতা—হতাশা, ব্যর্থতা, বঞ্চনা, স্নেহ-ভালবাসার অজস্র প্রকাশ সুরময় হয়ে উঠেছে অফুরন্ত গানের অন্তহীন বৈচিত্র্যে। এত সম্পদের উত্তরাধিকার যাঁর হাতের মুঠোয়, যার প্রয়োগে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, স্বভাবের সমর্থন পান সবচেয়ে বেশী, সে সব ছেড়ে তিনি আধুনিকের ন্যায় ব্যক্তির জটিল মনের গহীনে অভিসারে বেরোবার গরজ বোধ করবেন কেন? সেখানে সার্থকতার নিশ্চিতি কোথায়? তাছাড়া যেখানে স্বভাবের সাড়া নেই সেখানে সচেতন প্রয়াস সত্ত্বেও খুব বেশী সার্থকতা অর্জন বোধ হয় সম্ভব নয়। কবি নিজেই সে চেষ্টার ব্যর্থতার প্রমাণ নিয়ে হাজির হয়েছেন আমাদের সামনে। সে আলোচনার পুনরাবৃত্তি এখানে নাই বা করলাম।

পল্লী পরিমণ্ডলেই জসীমউদ্‌দীন তাঁর কাব্য-সাধনা, তথা সাহিত্য-সাধনার সিদ্ধি খুঁজে পেয়েছেন। আর এ সাধনায় তাঁর পথপ্রদর্শকের কাজ করেছে আমাদের সুবিশাল লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। জসীমউদ্‌দীন খণ্ড খণ্ড কবিতায় পল্লীজীবনের ও প্রকৃতির অজস্র বৈচিত্র্যের খণ্ড ক্ষুদ্র রূপের প্রক্ষেপ ঘটিয়েছেন, গানে গানে সে জীবনের বিচিত্র অনুভবকে প্রকাশ করেছেন, তার অন্তর্জগতের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছেন। আবার উপন্যাসধর্মী কাব্যের আধারে, লোকনাট্যের আঙ্গিকে সে জীবনের আনন্দ-বেদনা, প্রেম-ভালবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সামাজিক রূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা-ও অপূর্ব। পল্লীকাব্য, গীতিগাথা ও পুঁথিসাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত মালমশলা তিনি সুনিপুণ শিল্পীর ন্যায় কাজে লাগিয়েছেন—কাব্যের ভাববস্তুর সৌষ্ঠব বর্ধনে, দেহ নির্মাণে ও আবহ সৃষ্টিতে। তাঁর কাব্যের নর-নারীরাও যেন পল্লীকাব্যের আসর থেকে সামান্য সাজ বদল করে নেমে এসেছে। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'সকিনা' কাব্যের নায়ক-নায়িকারা মৈমনসিংহ গীতিকার মহুয়া, মলুয়া, দেওয়ানা মদিনা প্রভৃতি পালার নায়ক নায়িকাদেরই যেন অনেকটা প্রতিরূপ। অবশ্য মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে, বৈষ্ণব পদাবলীতেও এদের সঞ্চরণ লক্ষ্য করা যায়। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্যের 'রূপাই ও সাজু,' সোজন বাদিয়ার ঘাটের,' 'সোজন ও দুলী', সকিনা কাব্যের 'আদিল ও সকিনা', অনায়াসেই আমাদের মহুয়া পালার 'নাদেরচাঁদ ও মহুয়া', মলুয়া পালার 'চাঁদবিনোদ ও 'মলুয়া', দেওয়ানা মদিনার 'দুলাল ও মদিনার' চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পল্লীগীতিকার নর-নারীদের ন্যায়ই জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের নর-নারীরা কমবেশী এক ছাঁচে ঢালা।

নদেরচাঁদ, চাঁদবিনোদ, দুলাল, রূপাই, সোজন, আদিল এরা যেন একই প্রেমাকুল পুরুষের বিভিন্ন রূপ; আবার মহুয়া, মলুয়া, মদিনা, সাজু, দুলী, সকিনা এরা যেন প্রেমরাজ্যের প্রদীপ শিখারূপিণী সেই এক নারীরই সামান্য রূপভেদ মাত্র। এদের প্রেমে পূর্বরাগেরই যেন আধিপত্য, মিলন, মান-অভিমানের কথাও সামান্য আছে বটে। মাঝে মাঝে অবশ্য বিরহের সুর প্রবল হয়ে উঠে একটা কারুণ্যের অনুভূতিতেও আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়। প্রেমের পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন, বিরহের ছবি অঙ্কনে তিনি বৈষ্ণব কবিদেরই যেন অনেকটা পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। গীতিকার নর-নারীদের প্রেম-ভালবাসার ছবি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়ই পর্যবসিত ; জসীমউদ্‌দীনের রচনায় বর্ণনার বিস্তৃতি আছে, মনস্তাত্ত্বিক কৌতূহল আছে, চরিত্রবিশ্লেষণের প্রয়াস আছে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই প্রেমচিত্র জটিলতা বর্জিত। এদের প্রেম ধ্রুবতারারই ন্যায় একক লক্ষ্যে নিবদ্ধ। বাধা যা এসেছে তা বাইরে থেকে। প্রেমের জন্য তারা সকল রকম দুঃখ-কষ্টকে বরণ করে নিয়েছে, নিদারুন তপস্যা করেছে, আত্ম বিসর্জন দিতেও পিছ পা হয় নি। একটা জিনিস লক্ষ্য করার বিষয় পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, প্রভৃতির সর্বত্রই প্রেমের রাজ্যে নারী একক মহিমায় ভাস্বর—প্রেমের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন, দুঃখ বরণে নারীরাই সব সময় অগ্রণী। জসীমউদ্‌দীনের কাব্যেও তার অন্যথা হয় নি। প্রেমের শ্রেষ্ঠ ভাষা অশ্রু—জসীমউদ্‌দীনের কাব্যেও নর-নারী অশ্রু দ্বারাই প্রেমের তর্পণ করেছে শেষ পর্যন্ত। পল্লীগীতিকার নর-নারীদের মত জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের নর-নারীরাও একমাত্র যে শাসন মেনে চলেছে তা হচ্ছে হৃদয়ের শাসন। সমাজনীতি কোথাও খুব প্রবল হয়ে উঠে প্রেমকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। পল্লীগীতিকার মতো জসীমউদ্‌দীনের কাব্যেও প্রেমের রোমান্টিক অনুভূতিরই প্রকাশ হয়েছে বেশী ; বাস্তব সমাজ প্রতিবেশের চেয়ে প্রেমভাবনা আধিপত্য বিস্তার করেছে বেশী ; তবুও জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে পল্লীসমাজের প্রাত্যহিক জীবনধারার চিত্র কিছুটা স্পষ্টতর রেখায় ধরা পড়েছে। কালধর্মের পার্থক্য ও শিল্পচেতনার নতুনত্বে জসীমউদ্‌দীনের কাব্য অবশ্যই অনেকটা স্বতন্ত্র মহিমা লাভ করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের বিষয়বস্তুতেই শুধু নয়, কাব্যের দেহেও লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যের ছাপ পড়েছে। লোকসাহিত্যের গীতি, গাথা, ছড়া বিশেষতঃ মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলো থেকে শব্দ, উপমা, অলঙ্কার এমন কি ছন্দোভঙ্গি পর্যন্ত তিনি আপন কাব্যদেহ বয়নে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। এতে করে তাঁর কাব্যের সাথে পল্লীগীতি-গাথার একটা সহজ আত্মীয়তার সম্পর্ক বেরিয়ে পড়ে। পল্লীকাব্যের জন্যে যথার্থ আবহ সৃষ্টির অনুরোধে তিনি শুধু পল্লীর প্রাকৃতিক দৃশ্য যোজনা করে পল্লী নর-নারীর কতকগুলো চরিত্র সমাবেশ করেই ক্ষান্ত হন নি, যে পরিবেশে তারা মানুষ তাকে জীবন্ত করে তোলার জন্যে অজস্র পল্লীগীতির সাহায্য নিয়েছেন। পল্লীগীতির সুর-ঝংকারে যথার্থ আবহটি ধরা পড়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। কারণ এই লোকগীতিগুলোর মধ্যে মানবাত্মার যে উৎসার, তা পরিবেশের সহজ স্বীকৃতিতে প্রায়শই হৃদয়স্পর্শী। তাই লক্ষ্য করি জসীমউদ্‌দীন তাঁর কাহিনী কাব্যগুলোর প্রায় প্রতিটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের শীর্ষদেশে এক বা একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ গীতিপংক্তি উদ্ধৃত করেছেন। পংক্তিগুলো এমনভাবে চয়ন করেছেন যাতে ঐ বিশেষ পরিচ্ছেদ বা বিশেষ অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনা, চরিত্র বা পরিবেশের দ্যোতনা তাতে থাকে। শুধু তাই নয়, মূল কাব্যদেহের মাঝে মাঝে পল্লীকাব্যের বহু তাৎপর্যপূর্ণ পংক্তি এমনভাবে জুড়ে দিয়েছেন যে, বোঝারই সাধ্য থাকে না যে, ঐ সব বাক্য ভিন্ন কাব্য থেকে গৃহীত। উদাহরণ স্বরূপ মৈমনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালার কিছু পংক্তি আমরা উদ্ধৃত করছি ঃ

(ক) নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভসুদর ভাই
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই॥

(খ) সাক্ষী হইও চান্দ সূরুয সাক্ষী হইও তুমি,
ঘর দোয়ার ছাড়িয়া আজি বৈদেশী হইলাম আমি॥

(গ) ভাঙ্গা ঘর পড়িয়া রইছে চালে নাইরে ছানি
পিঞ্জিরা করিয়া খালি উইড়াছে পক্ষিনী॥

(ঘ) পাষাণ আমার মাও বাপ পাষাণ আমার হিয়া
কেমনে ঘরে যাইবাম ফিইরা তোমারে মারিয়া॥

(ঙ) বাড়ী নাইরে ঘর নাইরে বন্ধো যথায় তথায় থাকি।
উইরা ঘুইরা ফিরি যেমন বনের পশুপংখী।

এ কাব্যপংক্তিগুলো তিনি হুবহু ব্যবহার করেছেন এমন নয়, কাব্যের প্রয়োজনে সামান্য রদবদল করে নিয়েছেন অনেক জায়গায়। তবু এই সব পংক্তির প্রতিধ্বনি তাঁর কাব্যে এত স্পষ্ট যে, বুঝতে কোন অসুবিধাই হয় না যে, এগুলো কোথা থেকে গৃহীত হয়েছে। অন্যত্র খণ্ড-কবিতা ও গানেও তিনি এরূপ কাব্যপংক্তির প্রচুর সাহায্য নিয়েছেন—যেমন "জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ" (মহুয়া), "আমার বাড়ীতে যাইওরে বন্ধু বইতে দিবাম পিরা, জলপান করিতে দিবাম সালি ধানের চিরা" (মহুয়া) ইত্যাদি।

জসীমউদ্‌দীনের মনোযোগী পাঠক 'মৈমনসিংহ গীতিকার' সাথে পরিচিত থাকলে এ ধরনের প্রচুর নিদর্শন জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে ছড়িয়ে আছে দেখতে পাবেন। পল্লীকাব্য থেকে শব্দ, উপমা, ছন্দ ইত্যাদির নানা সূত্র গ্রহণ করে নক্‌সী কাঁথার মতো করেই কবি আপন কাব্যদেহ বয়ন করেছেন। এতে করে তাঁর কাব্যের সাথে পল্লীকাব্যের ভাব, ভাষা, ছন্দের একটা সাদৃশ্য সব সময়েই থেকে গেছে, যদিও তাঁর কাব্য পল্লীকবির রচনা থেকে অনেক মার্জিত ও পরিশোভিত। আপন শিক্ষা ও রুচি অনুসারে এ ধরনের কাব্যের দেহসৌষ্ঠব বিধান করতে গিয়ে তিনি বিস্মৃত হন নি যে, এর ভাষার পরিমার্জন ও অন্য কাব্য থেকে এতে শব্দ, উপমা, বাক্য ইত্যাদি গ্রহণের একটা সীমা আছে। সে সীমা অতিক্রম করতে গেলেই ব্যর্থতা অনিবার্য হয়ে উঠবে। জসীমউদ্‌দীন এইভাবে পুরনো পল্লীকাব্যের সম্পদকে আপন কাব্য-দেহের সৌষ্ঠব বর্ধনে প্রয়োগ করে এবং ভাষার যথোচিত পরিমার্জনা দ্বারা একে একদিকে বাংলা কাব্যের পুরাতন ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন, অন্যদিকে আধুনিক রুচিরও কিছুটা পরিতৃপ্তি বিধানে সক্ষম হয়েছেন; কিন্তু পল্লীকাব্যকে তিনি নতুন কোন তাৎপর্য দান করতে পেরেছেন বলা যায় না। তিনি পল্লীকবির চিত্রকে আরও কিছুটা বর্ণাঢ্য করে তুলতে পেরেছেন, তাকে কিছুটা বিস্তৃতি দিতে পেরেছেন, এই যা।

তবু বাঙলা কাব্যে তথা সাহিত্যে লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য প্রয়োগে সার্থক শিল্প সৃষ্টিতে জসীমউদ্‌দীনের ক্ষমতা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি অবলীলাক্রমে লোকগীতি গাথার সম্পদ আপন কাব্যের সার্থকতার জন্যে প্রয়োগ করেছেন। শুধু বিষয়বস্তু নয়— কথা, সুর ও রং পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন। তাঁর যে কোন একটি কাব্য বিশ্লেষণে সে সত্য ধরা পড়ে। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'সকিনা' ইত্যাদি যে কোন কাহিনী-কাব্য বা কাব্যোপন্যাস বিশ্লেষণ করলে তাঁর লোকসাহিত্যের সম্পদ প্রয়োগ পদ্ধতিটি কত সুন্দর ও সার্থক, তা বেশ বোঝা যায়। এগুলো মূলতঃ নর-নারীর প্রেমচিত্র, তবে সমাজের গণ্ডী

বহির্ভূত নয়। কাব্যগুলো রচনায় জসীমউদ্‌দীন পল্লীগীতি, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদির কাছে কত ঋণী তার স্বীকৃতি কাব্যের দেহেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাওয়া যায়। কাব্যের পরিচ্ছেদশীর্ষে বিশেষ পরিচ্ছদের ভাবের কুঞ্চিকা স্বরূপ যে সব গীতিপংক্তি, ছড়া ইত্যাদির সমাবেশ করা হয়েছে, সেগুলো কাব্যদেহ বয়নে বিভিন্ন ভাবসূত্রের কাজ করেছে। শুধু কি তাই, মৈমনসিংহ গীতিকা, পল্লীগীতি ও পুঁথি-সাহিত্যের অনেক সুন্দর পংক্তি ও উপমা ক্ষেত্রবিশেষে সামান্য পরিবর্তিত রূপে কাব্য-দেহের বুনুনিতে প্রযুক্ত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর "নক্‌সী কাঁথার মাঠ" কাব্যটিকে সুন্দর কাঁথার মতো করে বোনা"[১] লেখা বলেছিলেন। কত গ্রাম্য গান বা গানের পংক্তিই না জসীমউদ্‌দীন কাব্যের বুনুনিতে কাজে লাগিয়েছেন। তার বৈচিত্র্য রীতিমত উপভোগ্য। কাব্যের পরিচ্ছেদ শীর্ষে উদ্ধৃত রাখালী গান, মুর্শিদী গান, মেঘরাজার গান, আসমান সিংহের গান, মেয়েদের বিবাহের গান, গাজীর গান, মহররমের জারী, ছেলে ভুলানো ছড়া, কবিগান, বিচ্ছেদ গান, বাউল গান, খেলার ছড়া, বিচার গান, মেয়েলী গান, জারীনাচের গান, বশীকরণ মন্ত্র, বসন্তরোগের মন্ত্র ইত্যাদি অজস্র গানের তাৎপর্যপূর্ণ পংক্তিগুলো তাঁর কাব্যের প্রতি পরিচ্ছদের ভাববীজরূপে কাজ করেছে। তাছাড়া কাব্যবর্ণিত চরিত্রগুলোর স্বাভাবিকতা বজায় রাখার অনুরোধে তিনি পল্লীকবিদের রচনা থেকে বহু পদ গ্রহণ করেছেন এবং ঐগুলো কোন কোন চরিত্রের কথোপকথনে জুড়ে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে কাব্যের মধ্যে পল্লীগীতি জুড়ে দিয়েছেন যথার্থ আবহ সৃষ্টির খাতিরে। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ', ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', —দুটি কাব্যেরই ভূমিকায় জসীমউদদীন পল্লীকবিদের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন এবং ঋণ গ্রহণের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেছেন। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ', কাব্যের ভূমিকায় তিনি বলেছেন—"এই গ্রন্থের চরিত্রগুলি সবই গ্রাম্য। আমরা যে ভাবে ভাবি, তাহারা সে ভাবে ভাবে না। আমাদের হইতে তাহাদের জীবন একেবারে ভিন্ন রকমের। তাই গ্রন্থের চরিত্রগুলির ভিতরে কথোপকথন জুড়িতে আমি যতদূর পারিয়াছি, তাহা গ্রাম্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই জন্য আমি প্রাচীন পল্লীকবিদের অনেক পদ কোন কোন চরিত্রের কথোপকথনে জুড়িয়া দিয়াছি।"[২] 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', কাব্যের ভূমিকায় প্রায় একই প্রসঙ্গে বলেছেন—"তাহাদের মুখ দিয়া আমি যে সব কথায় অবতারণা করিয়াছি, তাহার মাঝে মাঝে আমি গ্রাম্য কবিদের রচনা হইতে পদ বিশেষ জুড়িয়া দিয়াছি। তাহা ছাড়া এই পুস্তকের স্থানে স্থানে আমি পল্লীগীতি সাহিত্যের রচনারীতি অবলম্বন করিয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সাক্ষী থাকিও চন্দ্রসূর্য' প্রভৃতি লাইনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে পল্লীগ্রামের পারিপার্শ্বিক রচনায় বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।"[৩] কবি কাব্যের প্রয়োজনে পল্লীকবিদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণে কোন দ্বিধা বোধ করেন নি এবং অসংকোচে সে ঋণের কথা স্বীকার করেছেন। শুধু 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', নয়, 'সকিনা' এমন কি সর্বশেষ কাব্য 'মা যে জননী কান্দে' সম্পর্কেও একথা কম-বেশি সত্য যে, কবি কাব্যের প্রয়োজনে পল্লীকবিদের রচনা থেকে প্রচুর ঋণ গ্রহণ করেছেন; কিন্তু তাতে জসীমউদ্‌দীনের কবি-মহিমা খর্ব হয় নি। এ সব কাব্যে মৈমনসিংহ গীতিকার নর-নারীদের অন্তরাবেগ প্রকাশের ভাষায় আশ্চর্য প্রতিধ্বনি শোনা যায়। গীতিকায় বর্ণিত চরিত্রগুলোর সাথে জসীমউদ্‌দীনের সৃষ্ট চরিত্রগুলোর ঐক্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তা সত্য; তবে জসীমউদ্‌দীনের স্বকীয়তার পরিচয়ও রয়েছে যথেষ্ট। কাব্যের

১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ', কাব্যের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। ১ম সংস্করণ, ১৩৩৬।
২. 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ', কাব্যের কবি লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৩. সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

ঘটনা বিন্যাসে, প্রকৃতি বর্ণনায়, চরিত্র-বিশ্লেষণে মনস্তাত্ত্বিক কৌতূহল প্রকাশে, ভাষার পরিমার্জনায় তিনি যথেষ্ট স্বকীয় ক্ষমতার পরিচয় দিতে পেরেছেন। অন্যান্য রচনার মধ্যে গান রচনায় জসীমউদ্‌দীন মূলতঃ পল্লীকবিদের রীতির অনুসারী। তিনি কখনও পল্লীগীতির দুই-একটি পংক্তি অবলম্বনে নতুন গান লিখেছেন, কখনও পুরাতন পল্লীগীতিকেই মেজে ঘষে একটা নতুন রূপ দিয়েছেন। জসীমউদ্‌দীন রচিত বহু বিখ্যাত পল্লীগীতি আজ দেশের লোকের মুখে মুখে ফিরে তাদের বিশেষ পরিচয়টি হারিয়ে ফেলে একেবারে অজ্ঞাতনামা পল্লীকবিদের গানের সাথে মিশে গিয়েছে। পল্লীগীতিকারদের সাথে এমন করে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁর লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যের সাথে আত্মিক যোগেরই ইঙ্গিত দেয়। জসীমউদ্‌দীনের বিভিন্ন খণ্ড-কবিতা এই পর্যায়ের সৃষ্টি নয়। এগুলোতে পল্লীসাহিত্যের প্রভাব অত প্রত্যক্ষ নয়। যেখানে কবিতার বিষয় পল্লী নির্ভর, সেখানে শব্দ চয়নে, উপমা ব্যবহারে তিনি পল্লীসাহিত্যের প্রভাব কিছুটা বরণ করে নিয়েছেন। তাঁর অন্যান্য রচনার ন্যায় এসব ক্ষেত্রেও একটা সরলতা ও সহৃদয়তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তবে তাঁর ভাষা এসব ক্ষেত্রে একটু বেশী পরিমার্জিত। খণ্ড কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর সর্বাধিক সার্থকতা ঘটেছে 'কবর', 'পল্লীজননী', 'রাখাল ছেলে', ইত্যাদি গুটিকয়েক কবিতায়। এসব কবিতার পূর্ব সূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। এতে এক দিকে বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার সমৃদ্ধির পরিচয় ফুটে উঠেছে, আর একদিকে সুতীক্ষ্ণ শিল্পচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। ভাষায়, ভঙ্গিতে জসীমউদ্‌দীনের শিল্পসার্থকতা এসব ক্ষেত্রে রীতিমত ঈর্ষার বস্তু। পল্লীজীবন ও পল্লীকাব্যের সাথে নিবিড় পরিচয় থাকলেই এমন কবিতা লেখা যায় না। অন্যত্র খণ্ড-কবিতার ক্ষেত্রে জসীমউদ্‌দীন কিছুটা রোমান্টিক মনের কল্পনা-বিলাসকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁকে ভাষায় ভাবে অক্ষম রবীন্দ্র-নজরুল অনুসারী বলেই মনে হয়। তিনি যেন পল্লীর দিক থেকে একবার কিছু দিনের জন্যে দৃষ্টি ফিরিয়ে আপনার মনে নানা ভাবের রঙ ফেরানোর খেলার দিকে নজর দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর কবি হৃদয়ের তেমন সারা না থাকায় এসব রচনা প্রায়ই নীরস মনে হয়। গতানুগতিক ছন্দে তিনি গতানুগতিক প্রেম-সৌন্দর্যের ভাবনা ব্যক্ত করতে গিয়ে কেমন যেন colourless, পানসে হয়ে পড়েছেন। তিনি মাঝেমাঝে খেয়ালের বশে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশের মত আধুনিক কবিদের রচনার প্রতিধ্বনি করেছেন নিতান্ত আধুনিক ঢঙে। রূপবতী কাব্যের 'সোনার মেয়ে' ও 'উষাবতী সেন' কবিতা দুটোতে তাঁর প্রয়াস অনেকটা হাস্যকর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তিনি এসব ক্ষেত্রে যেন স্বধর্মচ্যুত। অবশ্য 'মাটির কান্না' নামে বহুপরবর্তী কাব্যে তিনি পল্লীকবিতার জের টেনেও বেশ কিছু সংখ্যক কবিতায় যুগ-মানুষের দুঃখ বেদনায় সহানুভূতি জানিয়ে কিছুটা আধুনিক মনের পরিচয় দিয়েছেন।

জসীমউদ্‌দীনের প্রধান পরিচয় 'কবি' হলেও কাব্যই তাঁর একমাত্র সাহিত্যকর্ম নয়। তিনি পল্লীজীবন-ভিত্তিক লোকনাট্য, রূপকথা এমন কি উপন্যাস পর্যন্ত লিখে তাঁর সাহিত্য-সাধনার বৈচিত্র ও ব্যাপকতা ঘটিয়েছেন। 'লোকনাট্য' ও 'রূপকথা' রচনায় তিনি লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যকে ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ করেছেন। তিনি লোকনাট্য রচনার ব্যাপারে বাংলাদেশের মালদা অঞ্চলে প্রচলিত আলকাফ, রংপুর ও ময়মনসিংহের 'তামাসা' ও ঢাকা-ফরিদপুর, যশোহর অঞ্চলে প্রচলিত 'যাত্রাগান' ইত্যাদি লোকনাট্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তাছাড়া কথোপকথনের ঢঙে রচিত বিভিন্ন গ্রাম্যগানের মধ্য থেকেও নাটকীয় উপাদান সংগ্রহ করেছেন।[১] জসীমউদ্‌দীন পল্লীর বিভিন্ন অঞ্চলে রূপকথা সংগ্রহ করে

১. এ সম্পর্কে 'জসীমউদ্‌দীনের নাট্যসাধনা' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

সেগুলোকে নতুন রূপ দিয়েছেন। ক্ষেত্র বিশেষে তিনি গাজীগানের কলির সাথে গদ্যকথার বুনট দিয়েও রূপকথা লিখেছেন। যেমন রংপুর অঞ্চলের গাজী গানের ঢঙে তিনি 'ডালিমকুমার' নামক রূপকথাটি লিখেছেন। নিতান্ত একালে জসীমউদদীন আপন জীবনস্মৃতিমূলক কিছু গদ্য গ্রন্থ রচনা করে জীবনকথার সঙ্গে দেশভ্রমণের কথাও বর্ণনা করেছেন। সর্বশেষে উপন্যাস[১] লিখে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন এযুগের মানুষ তিনি পারিপার্শ্বিক জীবন সম্পর্কে রয়েছে তার অসীম কৌতূহল। তবে উপন্যাসটির পাত্রপাত্রীরাও পল্লী নরনারী তাদের দুর্ভাগ্যের কথা বলে কবি চোখের জল ফেলেছেন, আমাদের হৃদয়ও দ্রবীভূত করে তুলেছেন। আবার তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে গিয়ে লেখক যেমন আশান্বিত হয়েছেন, আমাদের মনেও তেমনি প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছেন। পল্লীর আকর্ষণ যে বারবার তার জীবনে ফিরে এসেছে তার সাহিত্য সাধনার শেষ পর্বে রচিত এ উপন্যাসটি তার প্রমাণ। জসীমউদদীনের সামগ্রিক সাহিত্যকর্ম স্পষ্টতঃ দু' ধারায় প্রবাহিত হয়েছে একটি মধ্যযুগের কাব্য, গাথাগাথা, গীতির ঐতিহ্যের খাতে প্রবাহিত, অপরটি মূলতঃ রবীন্দ্র-নজরুলের রোমান্টিক ধারার ক্ষীণ অনুকরণের নালায় প্রবাহিত। প্রথম ধারাটি প্রশস্ত ও বেগবান, দ্বিতীয়টি অনেকটা মন্দস্রোত, অগভীর ও সংকীর্ণ। বিস্ময়ের কথা এই যে, যুগধর্মে যে ধারাটি প্রবল হওয়ার কথা তা হয় নি। পল্লীসাহিত্যের ঐতিহ্যের সাথক উত্তরণেই জসীমউদদীনের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। যুগজীবন- জিজ্ঞাসার প্রভাবে তার শিল্পী মন তেমন সাড়া দেয় নি। তাই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাহিত্যের নতুন দিগন্তে তিনি তেমন সাথকতার অধিকারী নন।

জসীমউদদীন ঃ কবিমানস

জসীমউদদীনের কবি-কর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে ঃ তিনি সমকালীন কবিত্বের বাঁধা রাজপথটা না ধরে, কেনই বা পল্লীকাব্যের ধূলি ধূসরিত গ্রাম্য রাস্তা ধরে অগ্রসর হলেন? একি নিছক একটা খেয়াল, না কবি-স্বভাবেরই একটা বিশেষ প্রবণতা? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে যথেষ্ট সাহায্য করবে এ ভরসায় আমরা এখানে একজন রসিক কাব্যসমালোচকের উক্তি উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছেনঃ "কোনো বিশেষ কালের কবিতার ধারা অনুসরণের অভিজ্ঞতায় এ সত্যটি বার বার ধরা পড়ে যে, এক যুগে বাস করলেই সেই যুগের সব কবি সমধর্মী, সমবিশ্বাসী, সমবোধময় অথবা সমানমনা হতে বাধ্য থাকেন না।.... সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা-দীক্ষার পরিমাণ, বংশগত ঐতিহ্য, বিত্তগত অবস্থা ইত্যাদি নানা ব্যাপারের ওপর এক একটি মনের বিশেষ মননস্বভাব নির্ভর করে।"[২] এর সাথে আর একটি কথা জুড়ে দিলেই বক্তব্যটি সম্পূর্ণতা লাভ করবে বলে আমার বিশ্বাস। তা হচ্ছে এই যে, ঐ বিশেষ মননস্বভাবটি মানুষের যাবতীয় মানসিক প্রয়াসকে নিয়ন্ত্রিত করে। অন্যান্য প্রয়াসের মত কাব্য রচনার ব্যাপারটিও এক রকম মানসিক প্রয়াস। তাই জসীমউদদীনের কবি-কর্মের বিচারেও তার ঐ বিশেষ মানসিক প্রয়াসটির তাৎপর্য

১. ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত উপন্যাস 'বোবা কাহিনী'।
২. হরপ্রসাদ মিত্র—'বাংলা কবিতার কথা', সাহিত্যের নানা কথা, পৃঃ ১৭৫।

অনুভবন করতে হবে। জসীমউদ্‌দীন তাঁর কালের প্রায় সকল কবি থেকেই প্রকৃতি ও মর্মমর্মের পূজক ছিলেন, তাই তাঁদের সাথে তাঁর কম-চিন্তার পার্থক্যও সুস্পষ্ট। তিনি তাঁর কর্ম-কর্মে বিশেষ সামাজিক পরিবেশ, নিজস্ব বংশগত ঐতিহ্য, বিত্তগত অবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন।

বাংলার প্রধানতঃ পল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে যে বিশাল মুসলমান সম্প্রদায়, কৃষি যাদের প্রধান উপজীবিকা, তাদের মধ্যেই জসীমউদ্‌দীনের আবির্ভাব। এরা যুগ যুগ ধরে পল্লীতে বাস করে স্বভাবতই পল্লীকেন্দ্রিক জীবন দৃষ্টি ও জীবন-ভঙ্গিমার অধিকারী। কৃষিভিত্তিক সমাজের লালনভূমি পল্লীর শ্যামল প্রকৃতির স্নিগ্ধতা, জীবন-ভঙ্গিমার সরলতা, সহজ ধর্মনিভরতা ও অদৃষ্টবাদিতা এদের সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জসীমউদ্‌দীনের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের অনেকটাই কেটেছে এ পল্লীতে, সেখানকার মাঠ-ঘাট, নদী তীরে, বালুচরে সাধারণ মানুষের মধ্যে। জন্মসূত্রে পল্লীর সাথে তাঁর এই যোগ পরবর্তীকালে বিশেষ বিশেষ কর্মসূত্রে আরও অন্তরঙ্গ ও গভীর হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। ঐ পল্লীর শ্যামল-সুষমা তাঁর চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে প্রতিবিম্বিত। পল্লীপরিবেশে পালিত, লালিত, বর্ধিত জসীমউদ্‌দীনের মানসিক গঠনে পল্লীপ্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য ও মাধুর্য যে অনেকটা সাহায্য করেছে, তা স্বীকার করতেই হয়। জসীমউদ্‌দীনের স্ফুটনোন্মুখ কবি-প্রতিভার বিকাশে পল্লী যেন Meet nurse for a poetic child (কবিপুত্রের উপযুক্ত ধাত্রী)-এর কাজ করেছে। বস্তুতঃ জসীমউদ্‌দীনের মনের পুষ্টি সাধনে বিচিত্ররূপা বঙ্গপ্রকৃতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারপর বংশগত ঐতিহ্য ও বিত্তগত অবস্থার কথা। বাংলার বিপুল মুসলমান কৃষক সম্প্রদায় যে পুঁথিসাহিত্যের রসধারায় নিজেদের তৃষ্ণা মিটিয়ে এসেছে কয়েক যুগ ধরে, জসীমউদ্‌দীনও বংশগত ঐতিহ্য সূত্রে বাল্যকাল থেকেই তার প্রভাব অনুভব করে এসেছেন। ঐ বিশেষ পরিবেশ সূত্রেই গ্রাম্যগীতি, গাথা, রূপকথার রসধারাও তাঁর মানসিক পুষ্টির সহায়ক হয়েছিল। ঐতিহ্যসূত্রে পুঁথিসাহিত্য, গ্রাম্য-গীতিগাথা, রূপকথার সাথে অবাল্য ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁকে পল্লীসংস্কৃতির প্রতি বেশ শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল ; এ শ্রদ্ধাই আরও পুষ্ট হয়ে পল্লীর প্রতি ভালোবাসায় পরিণত হয়েছিল, যখন জীবনের যাত্রাপথে পল্লীগীতির সংগ্রাহক হয়ে তিনি বছরের পর বছর বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে লোকসাহিত্যের অজস্র সম্পদ আহরণ করেছিলেন। দরদী কবিপ্রাণের অধিকারী জসীমউদ্‌দীন গীতি-সংগ্রাহক রূপে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তীর্থ পরিক্রমাকালে পল্লীজীবনের আপাত নিস্তরঙ্গ অথচ আশ্চর্য সজীব রূপের সাক্ষাৎ পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সরল ও সহৃদয় 'পল্লীমানুষে'র চরিত্রমাধুর্য এবং পল্লীপ্রকৃতির অনাবিল রূপ দুই-ই তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। বিত্তগত অবস্থা বিবেচনা করলেও বলতে হয়, জসীমউদ্‌দীন পল্লীর মাটির সাথে যুগ-যুগান্তরের বন্ধনে জড়িত স্বল্পবিত্ত কৃষিজীবী মানুষেরই আত্মীয় ছিলেন। তাই 'যে আছে মাটির কাছাকাছি' তার জন্যে কান পেতে থাকতে তাঁর কোন অনীহাই ছিল না। বরং এ মাটির মানুষের প্রাণ-প্রবাহের মধ্যে তিনি আপন হৃদস্পন্দন অনুভব করে, এদের সাথে একটি সহজ আত্মীয়তার যোগ অনুভব করেছিলেন। তাঁর কবি-স্বভাব স্বভাবতই পল্লীপ্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে আপনার প্রকাশ-স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পেয়েছে। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষাসূত্রে আধুনিক কাব্যের প্রতি যে সামান্য আকর্ষণ তিনি বোধ করেছিলেন, তাও ক্রমে ফিকে হয়ে গেল। তাই বা বলি কেনো? আধুনিক শিক্ষাসূত্রেই তো তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লীগীতি সংগ্রাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ গীতি সংগ্রহের কাজে যে শিক্ষা তাঁর হলো, তা তাঁকে পল্লীর হৃদয়ের দিকেই আরও বেশী করে আকর্ষণ করেছিল।

জসীমউদদীনের এ বিশেষ মনোভঙ্গির মূলে আর একটি বিশেষ শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল, তা হচ্ছে ইসলামী সাম্যবাদ প্রভাবান্বিত মুসলিম মানসের অপূর্ব সমাজ চেতনা। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর এই বিশেষ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তাঁর 'বাঙলার কাব্য' গ্রন্থটিতে। তিনি লক্ষ্য করেছেন মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে মুসলিম প্রভাবের সবচেয়ে বড় অবদান পল্লী কাব্যতার ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছে। এর কারণ তাঁর মতে—"ইসলামের মধ্যে যে বিপ্লবী সাম্যবাদ নিহিত ছিল, তাতে কেবল অবিনশ্বর থেকে নশ্বরের দিকে মানুষের দৃষ্টি টানে নি, মানুষের সমাজেও রাজসভা ও অভিজাত্যের সংকীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে দরিদ্র জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের মধ্যে কাব্যের উপাদান খুঁজেছে।"[১] বাস্তবিকপক্ষে মুসলিম কবি রচিত অজস্র জারীগান, কবিকথা, গীতি গাথার মধ্যে পল্লীর সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ক্ষুদ্র আশা আকাঙ্ক্ষা, স্নেহ প্রেম প্রভৃতিই আশ্চর্য রূপে মূর্ত হয়ে রয়েছে। জসীমউদদীনের ক্ষেত্রেও এ বিশেষ ধর্মদর্শনজাত জীবন চেতনা যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে মনে করলে নিশ্চয়ই ভুল করা হবে না।

জসীমউদদীনের কবি-মানসের সংগঠনে সমকালীন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংঘঠনও অনেকটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল, তা নগরবাসী মধ্যবিত্ত জীবনে একটা দারুণ হতাশা ও নৈরাশ্যের সঞ্চার করেছিল। বাস্তবিকই নগরবাসী মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী ও পল্লীর স্বল্পবিত্ত মানুষের জীবন দিন দিন দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। বর্তমানের দুঃখ দুর্দশা থেকে দূরে সরে এই সময় কবিরা বিগতপ্রায় পল্লীজীবনের নিরাবিল শান্তি-সুখের বর্ণনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। পারিপার্শ্বিকে যে আশ্বাস তাঁরা খুঁজে পান নি, তাকে কল্পনায় খুঁজে বের করেছিলেন পল্লীর নিস্তরঙ্গ জীবনে, প্রকৃতির শ্যাম শোভায়। পল্লীর সন্তান জসীমউদদীন হয়ত এতে কিছুটা ভরসা পেয়েছিলেন। বস্তুতঃ সমকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজের পল্লীচেতনা জসীমউদদীনের মনোভঙ্গিকে আরও বেশী পল্লী-নির্ভর করে তুলতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে বিশ্বের অন্যান্য সভ্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টায় পল্লিগীতি, গাথা, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদি সংগ্রহের যে একটা উদ্যম দেখা দিয়েছিল তার ফলে শিক্ষিত সমাজের অনেকেরই দৃষ্টি ফিরেছিল পল্লীর দিকে। ১৯২২ সালে চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত ও আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশিত হলে সাহিত্য সমাজে রীতিমত আলোড়ন দেখা দেয়। পল্লীর জীবন-বাস্তবের আশ্চর্য উজ্জ্বল আলেখ্য সংবলিত এ গীতিকা সংগ্রহ তরুণ জসীমউদদীনের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। পল্লীর সন্তান জসীমউদদীন তাঁরই চোখে দেখা একান্ত করে জানা পল্লী-প্রকৃতির এমন নিরাভরণ অথচ প্রাণমাতানো রূপ, পল্লী-নরনারীর প্রেম-ভালবাসা সমৃদ্ধ অথচ দুঃখ-দৈন্যক্লিষ্ট এমন সজীব মূর্তি সাহিত্যে আর কোথাও প্রত্যক্ষ করেন নি। এ নতুন অভিজ্ঞতা তাঁর নবস্ফুট কাব্যবোধকে অনেকটা বলিষ্ঠতা দিয়েছিল। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে পল্লিগীতির সংগ্রাহক হিসেবে যে অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি তাঁর ঘটেছিল, তাতে তিনি পল্লীজীবন ও পল্লীসাহিত্যে এক আশ্চর্য ঐক্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এর অন্তর্সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পল্লী নিয়ে নতুন কাব্য লেখার উদ্যম অনুভব করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে অনেক কবি ও সাহিত্যিকের জীবনে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র এ আলোড়ন সৃষ্টিকারী ভূমিকা আমাদের এর প্রায় দেড় শতাব্দী পূর্বের ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের

---

১. হুমায়ুন কবীর—'বাঙলার কাব্য', পৃঃ ৩৭ ২য় সংস্করণ)।

অনুরূপ একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের পল্লীজীবন ও তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যখন নষ্ট হতে বসেছিল, তখন বিশপ পার্সীর (percey) সংগৃহীত 'Reliques of Ancient English poetry"(১৭৬৫ খ্রীঃ) গ্রন্থটি এমনি করে সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিল পল্লীকাব্যের বিস্মৃতপ্রায় ঐশ্বর্যের মূল্য অনুধাবন করতে। ফলে ইংরেজী সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। গ্রে, গোল্ডস্মিথ, কুপার, ক্র্যাব, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, স্কট প্রমুখ বহু কবির দৃষ্টি পল্লীর দিকে ফেরাতে পার্সীর এ পুরাতন কবিতার সংগ্রহ যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে আমাদের পল্লীপ্রীতি প্রবল হয়ে ওঠার আরও একটি কারণ লক্ষ্য করা যায়। এটা ঠিক যে, যন্ত্রযুগের ক্রমঃপ্রসারণের ফলে নগর-চেতনা তখন বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্যেও পল্লীর ভূমিকা অনেকটা গৌণ হয়ে এসেছিল ; কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হয় যে, বাস্তব জীবনে পল্লীর তখনও একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল। অন্যদেশে যেমনই হোক, আমাদের দেশে নগর তখনও পল্লীকে ততটা কোণঠাসা করতে পারে নি। সমকালীন অসহযোগ আন্দোলনের 'গ্রামে 'ফিরে যাও' আহ্বান নতুন করে পল্লীর গুরুত্ব উপলব্ধিতে দেশবাসী শিক্ষিত সমাজকে বিশেষ সাহায্য করেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউয়ে কলকাতা শহরে ছিটকে এসে পড়ে তরুণ জসীমউদ্‌দীন যে তিক্ত অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছিলেন (এ প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিকথামূলক রচনা 'যাঁদের দেখেছি' দ্রষ্টব্য), তাতে স্বাভাবিকভাবেই শহরের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা হয়ত কিছুটা বেড়েছিল এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় পল্লীপ্রীতি আরও গভীর হয়ে উঠেছিল। তবে অসহযোগের মত একটা নেতিবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন জসীমউদ্‌দীনকে পল্লী নিয়ে সাহিত্য-সাধনার খুব যে একটা প্রেরণা দিয়েছিল, এমন মনে করার কোন সঙ্গত কারণ দেখছি না। কারণ এ আন্দোলন আমাদের সাহিত্যের অন্য কোন ক্ষেত্রেও কোন বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রেখে যেতে পারে নি। এ আন্দোলন সমাজের নিতান্ত উপরের স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল—এর মর্মমূলে সাড়া জাগাতে পারে নি। তা না হলে পল্লীতে ফিরে যাওয়ার আহ্বান, নিছক আহ্বানেই পর্যবসিত হত না।

জসীমউদ্‌দীনের কথা অবশ্য আলাদা। তিনি তো পল্লীরই সন্তান। পরিবেশ ও ঐতিহ্য সূত্রে পল্লীজীবন ও সাহিত্যের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল অতি শৈশবেই। এই বাল্যবয়সেই তাঁর মনে পল্লীসাহিত্যের প্রতি একটা নিগূঢ় আকর্ষণ জাগিয়ে তুলেছিলেন তাঁর পিতার সম্পর্কে এক অন্ধ নানা। এ লোকটি সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীন অনেক শ্রদ্ধা ও প্রীতির কথা বলেছেন নিজ স্মৃতিকথাতে। ইনি ছিলেন রূপকথা, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদির এক ভাণ্ডারবিশেষ; তাঁর গল্প বলার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। জসীমউদ্‌দীন বাল্যস্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর এ নানার প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর মনের গঠনে তাঁর নানার গল্প-কেচ্ছার যাদুর প্রভাব যে অনেকখানি, তার স্বীকৃতি রয়েছে 'মধুমালা' লোকনাট্যটির শেষে সংযোজিত লোকনাট্য বিষয়ক আলোচনায় 'মধুমালা' নাটকের উৎস ও সৃষ্টি কলাকৌশল সম্পর্কিত বক্তব্যে। জসীমউদ্‌দীনের কবি-মানসের পল্লীমুখীনতার মূলে তাঁর এই বিস্মৃতপ্রায় নানার প্রভাবকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। বাল্যের এ প্রভাবই পরবর্তীকালে শিক্ষা-দীক্ষা, ঐতিহ্যচেতনায় পরিপুষ্ট হয়ে সমসাময়িক কতকগুলো সামাজিক ও সাংস্কৃকিতিক সংঘটনের আনুকূল্যে এক পল্লীপ্রাণ কবিমানসের জন্ম দিয়েছিল।

আধুনিক যুগে জন্মে, আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার অধিকারী হয়েও যে জসীমউদ্‌দীন সমকালীন কবিত্বের বাঁধা রাজপথে অগ্রসর হলেন না, তাতো ঐ বিশেষ মানসিকতার জন্যে। তিনি ইচ্ছা

করলেও বোধ হয় পারতেন না; কারণ স্বভাবের সাড়া না থাকলে কবিত্বের প্রকাশ কখনই অনায়াস ও সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। প্রসঙ্গতঃ জনৈক সাহিত্যরসিকের তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিটি মনে পড়ে ঃ 'A poet cannot Write the poetry he wants to write but only the poetry that is within him'[১] কবি আপন ইচ্ছামত কবিতা লিখতে পারেন না, কেবল যে কবিতা তাঁর স্বভাবে আছে, তাকেই ফুটিয়ে তুলতে পারেন। যে কোন খাঁটি কবির রচনাই এ সত্যের সমর্থন করে। জসীমউদ্‌দীনের কাব্য-সাধনায়ও এ সহজ সত্য আর এক বার প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা ও সাহিত্যের প্রভাবে তিনি প্রথম প্রথম রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখের রচনার অনুকরণে কিছু কিছু কবিতা লিখেছিলেন; কিন্তু তাতে স্বভাবের সাড়া না থাকায় কোন উল্লেখযোগ্য সার্থকতা দেখা দেয় নি। পল্লীর সন্তান জীবনমূলে পল্লীর ঐতিহ্যের সাথে স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত ছিলেন। তাই যখন তিনি রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের অনুকরণে কবিতা লিখবার চেষ্টা করছিলেন, তখনও পল্লীগীতি, গাথা, ছড়া, প্রবাদ, রূপকথার মোহকর প্রভাবের দোলা বোধ করছিলেন। পল্লীর চাষী, চরের মানুষদের সাথে তিনি কত রাত কাটিয়েছেন গল্প শুনে, গান শুনে। তিনিই কি জানতেন,পল্লীপ্রকৃতি কি নিদারুণভাবেই না তাঁর ভিতরকার কবিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে তাঁরই অজানিতে, অলক্ষ্যে, অতি সংগোপনে, ধীরে ধীরে? তাই তো যেদিন 'কল্লোলের' পৃষ্ঠায় 'কবর' নামে বিখ্যাত কবিতাটি প্রকাশিত হয়ে সকল রসিক কাব্য-পাঠককে চমকে দিয়েছিল, সেদিন কবি নিজেও বোধহয় কম চমকিত হন নি। হয়ত তিনি নিজেই বারবার বিস্ময়ে নিজেকে প্রশ্ন করেছেন—"এ আমি কি লিখলাম?" নিজের কবিতার রূপ ও রসের অভিনবত্ব সম্পর্কে সেদিনই জসীমউদ্‌দীন সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, যেদিন এক সহৃদয় পাঠকের কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসার বাণী ঝরে পড়েছিল তাঁর উদ্দেশ্যে ঃ "দূরাগত রাখালের বংশীধ্বনির মত তোমার কবিতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। তোমার কবিতা পড়ে আমি কেঁদেছি।"[২] এই যে কবির আপন স্বভাবধর্মে আস্থাবান হয়ে ওঠা, এটাই তো যথার্থ কবি-আত্মার জাগরণ। এর পর থেকেই পল্লী নিয়ে কাব্য রচনা করতে শুরু করলেন। বলা বাহুল্য অতি অল্প দিনেই জসীমউদ্‌দীন বাংলা কাব্যে একটি বিশিষ্ট কবি-প্রতিভা বলে স্বীকৃতি পেলেন—অসাধারণ জনপ্রিয়তাও অর্জন করলেন।

জসীমউদ্‌দীনের কবি-কর্মে তাঁর স্বভাবধর্মই জয়ী হয়েছে। আর এ স্বভাবধর্মের বিকাশে পল্লী পরিবেশের সুনিবিড় আত্মীয়তা, বংশগত ঐতিহ্য, বিত্তগত অবস্থা, ইসলামের বিপ্লবী সাম্যবাদ প্রভাবিত মুসলিম সমাজ-চেতনা, বাল্যের শিক্ষা-দীক্ষা, পরবর্তীকালে পল্লীগীতি সংগ্রাহক হিসেবে লব্ধ সমৃদ্ধ জীবনাভিজ্ঞতা, সমকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজের পল্লীচেতনা অনেকটা সহয়াক হয়েছিল। ফলে আমরা লক্ষ্য করি, জসীমউদ্‌দীনের জীবনে ও কর্মে পল্লী এক নিয়ামক শক্তিরূপে দেখা দিয়েছিল এবং সেই হেতু তিনি সমকালীন কবিত্বের বাঁধা পথ ছেড়ে কাব্যের মেঠো পথটাকেই সার বলে গ্রহণ করেছিলেন। স্বভাবধর্মের সাড়া ছিল বলেই পল্লীকাব্যের ক্ষেত্রে তিনি হয়েছেন অসাধারণ সার্থকতার অধিকারী। জসীমউদ্‌দীনের কবি-কর্মের সার্থকতা সম্পর্কে কল্লোলযুগের অন্যতম চিন্তানায়ক ও বিদ্রোহী শিল্পী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যা বলেছেন তা যথার্থ ঃ 'কবিতায় জসীমউদ্‌দীনই প্রথম গ্রামের দিকে সংকেত, তার চাষাভুষো, তার খেত-খামার, তার নদী-নালার দিকে। তার অসাধারণ সাধারণতার দিকে। যে দুঃখ সর্বহারার হয়েও সর্বময়, যে দৃশ্য অপজাতের হয়েও উঁচু

---

১. Sir I for Evans ; A Short History of English Literature, পৃ ৫১

২. দীনেশচন্দ্র সেনঃ জসীমউদ্‌দীনের নিকট লিখিত পত্রাংশ ('যাদের দেখেছি', জসীমউদ্‌দীন, পৃঃ ৭১)

কাব্যের। কোনো কারুকলার কৃত্রিমতা নেই, নেই কোনো প্রসাধনের পরিপাটি। একেবারে লোকসুলভ মন স্পর্শ করবার আকুলতা। কোনো 'ইজ্‌মের' ছাঁচে ঢালাই করা নয় বলে তাঁর কবিতা হয়তো জনতোষিণী নয়; কিন্তু মনোতোষিণী।'[১] এর ওপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

জসীমউদ্দীনের কবি-কর্ম রসিক ও সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল আপন বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্বেই। তাঁর সম্পর্কে অধিকাংশ সমালোচকই যা বলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে এই: 'জসীমউদ্দীন মনেপ্রাণে পল্লীদরদী বলে পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখের চিত্র তাঁর লেখনীতে যেমন চমৎকারভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে বাংলার আর কোন কবির লেখায় তেমনটি হয় নি।' 'লোককবি বা পল্লীকবি হিসেবে জসীমউদ্দীন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।' 'বাংলা ভাষায় পল্লীসাহিত্যে তাঁর অবদান তুলনা বিহীন।' এমনি ধরনের দুচারটি ইঙ্গিত-পূর্ণ মন্তব্য করেই জসীমউদ্দীন সম্পর্কে নিজেদের কর্তব্য শেষ করেছেন অধিকাংশ সমালোচক। একথা বললে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না যে, বাঙলা সাহিত্যে জসীমউদ্দীনের কাব্য-সাধনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য নির্ধারণের দায়িত্ব এখনও কোন রসিক সমালোচক পালন করেন নি। হয়ত পল্লীকাব্যের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁদের উপযুক্ত চেতনার অভাব, এবং নাগরিকসুলভ উন্নাসিক মনোবৃত্তিই এজন্যে দায়ী। তা ছাড়া জসীমউদ্দীনের কাব্য-কাঠামোর সরলতা, তাঁর ভাষা ও ছন্দের সহজবোধ্যতা, কাব্যবস্তুর অসাধারণ সাধারণতা ও জনপ্রাহ্যতা তাঁকে অনায়াসবোধ্য করে তুলেছে সাধারণ পাঠকের কাছে। তাই পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও মনোযোগ সহকারে আজ আর কেউ তাঁর কাব্য পড়েন না। এটা কাব্যরসিকদের পক্ষে একটা মস্ত ক্ষতি বলেই আমাদের ধারণা। শহরের ইট-কাঠের জাঁতাকল আজ সমুদয় প্রাণের রস চাপা পড়েছে। তাই তো আজ আর মানুষ প্রকৃতির হাতছানিতে সাড়া দেওয়ার গরজ বোধ করে না। জসীমউদ্দীনের কাব্যে সেই অবারিত, উদার প্রকৃতিরই তো অফুরন্ত অথচ অপূর্ব কবিতার প্রকাশ ঘটেছে—সেই প্রকৃতি শুধু শুধু কতকগুলো মাঠ, ঘাট, নদী, খালবিল, গাছপালার সমষ্টি নয়, তা আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষের অশ্রুহাসিতে স্নিগ্ধ, আশ্চর্যরূপে সজীব এক সত্তা। তাকে দেখবার চোখ ও বুঝবার মন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। জসীমউদ্দীনের সেই চোখ সেই মন ছিল বলেই তো তাঁর কাব্যে পল্লীজীবন ও পল্লীপ্রকৃতির এমন অনায়াস মাধুর্যময় প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। তাঁর অনুসারী কবি কাজেম ইজদানী, আবদুল হাই মাশরেকী প্রমুখ কতকটা সে কবিদৃষ্টির অধিকারী বলেই পল্লীকাব্যের এ অবহেলার দিনেও সাহসভরে ঐ পথে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁদের সার্থকতা দৈশিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্যেই। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারায় পল্লীর সাথে পল্লীকাব্যের দিনও আজ গতপ্রায়। এর পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাও ক্ষীণতর হয়ে আসছে প্রতিদিন। আধুনিক বাঙলা কাব্যের ইতিহাসে পল্লী নিয়ে জসীমউদ্দীনের কাব্য-সাধনা তাই যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় সত্ত্বেও একটা সাময়িক পরীক্ষা রূপেই থেকে গেল, নব কল্লোলে আমাদের কাব্যের প্রবাহকে সঞ্জীবিত করে তুলল না।

এতদসত্ত্বেও রসিক কাব্যপাঠকদের কাছে জসীমউদ্দীনের কাব্যের মূল্য অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আর সে মূল্য কাব্যবস্তুর বৈশিষ্ট্যের জন্য যতটা না হোক, তার চেয়ে ঢের বেশী কবিস্বভাবের স্বাভাবিকতা ও আন্তরিকতা, অনুভূতির গভীরতা ও জীবনের প্রতি অসীম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্যে। তাঁর অনেক কবিতাই হয়ত পরানুভূতিকতার উচ্চ শিখরে পারে নি; কিন্তু 'কবর' ও 'পল্লীজননীর মত কবিতা, 'নকসী কাঁথার মাঠ', ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাটের' মত কাব্যোপন্যাস কবিত্বের সকল মাপকাঠিতেই উত্তীর্ণ হয়ে, এমন ভাবনা করা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না।

---

১. আবদুল মান্নান সৈয়দ—'কাজলদীঘি', পৃঃ ১৮৩-৮৪।

জসীমউদ্‌দীন : সাহিত্য-সাধনার রূপরেখা

সুন্দর সাধনার পথে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে তবে শিল্পী-সাহিত্যিক পৌঁছুতে পারেন তাঁর বাঞ্ছিত রসলোকে। তাঁর রসলোকে যাত্রার ইতিহাস তাই বিচিত্র দুর্গম পথ-পরিক্রমারই ইতিহাস। শিল্পীর পরপারে বসে এই রসলোকের বার্তা যাঁরা সংগ্রহ করতে উৎসুক, সেই রসলোকের স্বরূপ শিল্পীর কৃতি ও তাঁর মহিমার কথা আলোচনা করে যাঁরা পেতে চান অপার্থিব আনন্দের স্পর্শ, তাঁদের কাছে এ পথ-পরিক্রমার ইতিহাস, শিল্পীর সৃষ্ট রসলোকে পৌঁছার পথের মানচিত্র রূপেই কাজ করতে পারে, তাতে সন্দেহ নেই। জসীমউদ্‌দীনের সাহিত্যের রসলোকে পৌঁছার মানচিত্রও তাই তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনারই ইতিহাস। সে ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীত তাঁর শিল্পীমহিমাকে, তাঁর শিল্পকৃতিকে বোধ হয় কখনই পুরোপুরি জানা সম্ভব নয়। এ প্রবন্ধ থেকেই আমরা জসীমউদ্‌দীনের সাহিত্য-সাধনার পথরেখা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হচ্ছি। এর ফলে কবি সম্পর্কিত আমাদের অনেকগুলো অমীমাংসিত জিজ্ঞাসার জবাব যেমন মিলবে, তেমনি কবির সাহিত্য-সাধনার মূল প্রকৃতি অনুধাবনে আমাদের সামর্থ্যও অনেকটা বেড়ে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এবার কবির সাহিত্য-সাধনার সরণী ধরে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা যাক।

কবি-সাহিত্যিক হওয়া ছিল জসীমউদ্‌দীনের কৈশোরের স্বপ্ন। পরিণত বয়সে আপন জীবনস্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে জসীমউদ্‌দীন তাঁর সেই কৈশোরের ভাবনার কথা কেমন স্বপ্নালু মন নিয়েই না বলেছেন : "পদ্মা তীরে আমার বাড়ী। সেই নদীর তীরে বসিয়া নানা রকমের কবিতা লিখিতাম, গান লিখিতাম, গল্প লিখিতাম। বন্ধুরা কেহ সে সব শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, কেহ বা সামান্য তারিফ করিতেন। মনে মনে ভাবিতাম, একবার যদি কলিকাতায় যাইতে পারি, তবে সেখানকার রসিক-সমাজ আমার আদর করিবেনই। কতদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি। কলিকাতার মোটা মোটা সাহিত্যিকদের সামনে আমি কবিতা পড়িতেছি। তাঁহারা খুশী হইয়া আমার গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিতেছেন"[১]। বড় কবি-সাহিত্যিক হওয়ার এ স্বপ্ন কিন্তু একেবারে বৃথা যায় নি। সাহিত্য-সাধনার পুরস্কার স্বরূপ জয়মাল্য তাঁর জুটেছিল পরবর্তী কালে। দেশের গণ্ডী ছাড়িয়েও তাঁর কবিখ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করেছে ভিন্ন দেশে। খুব বড় কবি হয়তো তিনি নন ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ব্যতীত বাঙলার আর কোন কবিই বোধ হয় তাঁর মত খ্যাতির অধিকারী হতে পারেন নি। তাঁর কাব্যরচনার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিক কবিত্বশক্তিই যে এর মূল, তা অনেকেই জানেন। কিন্তু কেমন করে জসীমউদ্‌দীন কাব্য-সাধনার এ বিশিষ্ট পথের সন্ধান পেলেন ও সে সাধনায় জয়যুক্ত হলেন, সে ইতিহাস হয়তো অনেকেই জানেন না। সে ইতিহাস খুব চমকপ্রদ কিছু না হলেও কিছুটা কৌতূহল উদ্দীপক তো বটেই। জসীমউদ্‌দীনের কবি-প্রতিভাকে বুঝতে হলে সে ইতিহাস জানার আবশ্যকতা রয়েছে। সে ইতিহাসের মালমশলা আমরা অন্য কারো কাছ থেকে বিশেষ পাই নি, জসীমউদ্‌দীন নিজেই জীবনস্মৃতিচারণ উপলক্ষে সে মালমশলা সরবরাহ করে আমাদের কিছুটা সহায়তা করেছেন। আমরা তা সম্বল করেই কবির কাব্য-সাধনার ধারাটি অনুধাবন করার চেষ্টা করছি।

বড় কবি হওয়ার স্বপ্ন প্রাণে নিয়ে অনুযোগ ও খেদোক্তির আন্দোলনের ঢেউয়ে সওয়ার

---

১. জসীমউদ্‌দীন—'যাদের দেখেছি', পৃষ্ঠা ১।

হয়ে কিশোর-কবি যেদিন কলকাতা পৌঁছলেন, সেদিন 'স্বদেশীর খেয়াল' না কবিত্বের নেশা কোনটা তাঁকে বেশী করে আকর্ষণ করেছিল বলা শক্ত। বোধহয় স্বদেশীর খেয়ালই প্রথম দিকটায় প্রবল ছিল ; কিন্তু শহর কলকাতার অনাত্মীয় পরিবেশের রূঢ়তা ও দারিদ্রের তাড়না কবির এ স্বদেশীর খেয়ালে ভাটা ধরিয়ে দিয়েছিল অতি অল্পদিনেই। তা ছাড়া স্বদেশীর খেয়ালে ইংরেজের স্কুল ছেড়ে-আসা ছেলে জসীমউদ্‌দীন জাতীয় বিদ্যালয়ে বিজাতীয় শিক্ষার কণ্ডুয়ন দেখেও বিশেষভাবে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। ঘরের ছেলে তাই আবার ঘরে ফেরার জন্যে খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই সর্বাত্মক হতাশার পরিবেশের মধ্যেও কিন্তু জসীমউদ্‌দীন আপনার সযত্ন পোষিত কবি-স্বপ্নটি সার্থক করে তোলার পথ খুঁজছিলেন। যে কলকাতার সাহিত্যিকদের সামনে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়ার স্বপ্ন দেখে এসেছেন তিনি পদ্মাতীরের বাড়ীতে বসে, সে কলকাতায় সশরীরে হাজির হয়েও তিনি শূন্যহাতে কারও সাথে দেখা না করে ফিরে যাবেন, তাও কি কখনও হতে পারে। ঘরে ফেরার প্রবল তাগিদ সত্ত্বেও তাই তিনি কলকাতার সাহিত্যিকদের কাছে কিছুটা পরিচিত হয়ে যাবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করতে পারলেন না। ঐখানেই যে তাঁর সাহিত্যিক-মুক্তির সবচেয়ে বড় ভরসা! প্রথমেই তিনি তাঁর অন্যতম প্রিয় লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে সাক্ষাৎ করলেন—অবশ্য তাও অনেক খড়কুটো পোড়ানোর পর; কিন্তু চারুবাবুর কাছ থেকে তেমন উৎসাহ না পেয়ে তিনি অনেকটা দমে গেলেন। দৈবক্রমে তমিজউদদীন খান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎকারের ফলে তিনি কবি মোজাম্মেল হক সাহেবের সংস্পর্শে আসার প্রেরণা লাভ করেন। মোজাম্মেল হক সাহেব তখন মুসলিম তরুণদের নানাভাবে সাহিত্য-সাধনায় উৎসাহিত করছেন। তাঁর সাথে কবির এই সাক্ষাৎ বিশেষ আনন্দের হয়েছিল—তিনি তাঁর কাছ থেকে প্রশংসা, উৎসাহ ও আশ্বাস পেলেন।

এই প্রসঙ্গেই নজরুল ইসলামের সাথে কবির যোগাযোগের কথা এসে যায়। মোজাম্মেল হক সাহেবের পরামর্শক্রমে জসীমউদ্‌দীন বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির কলেজ স্ট্রীটস্থ অফিসে একদিন নজরুলের সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন। প্রাণখোলা হাসিতে ভরা নজরুল কবির কবিতার অনেক প্রশংসা করলেন। মনোযোগ দিয়ে তার কবিতাগুলো পড়লেন এবং বন্ধুবান্ধবদের শোনালেন। তিনি ভরসা দিলেন তাঁর কবিতা বিভিন্ন মাসিক পত্রে ছাপিয়ে দেওয়ার। কবির কাছ থেকে ভরসা ও উৎসাহ পেয়ে কিশোর-কবির স্বপ্ন রঙীন চোখে নতুন প্রত্যাশার আলো দেখা গেল। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলেন, আবার বিদ্যালয়ের ছাত্রের দলে ভীড়ে গেলেন। কিন্তু তিনি পূর্বের ছাত্রটি আর রইলেন না, এবার থেকে তিনি রীতিমত কবি হওয়ার সাধনায় লেগে গেলেন। পরোক্ষভাবে তাঁর কলকাতা যাওয়ার ফল তাই ভালই হল বলতে হয়। গ্রামে ফিরেই তিনি নজরুল ইসলামের উপদেশ মত কবিতার নকল পাঠিয়ে দিলেন। সুন্দর উৎসাহপূর্ণ চিঠি এল কবির কাছ থেকে—"ভাই শিশুকবি! তোমার কবিতা পেয়ে সুখী হলুম। আমি দক্ষিণ হাওয়া। ফুল ফুটিয়ে যাওয়া আমার কাজ। তোমাদের মত শিশু কুসুমগুলিকে যদি আমি উৎসাহ দিয়ে আদর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারি, সেই হবে আমার বড় কাজ। তারপর আমি বিদায় নিয়ে চলে যাব আমার হিমগিরির গহন কুহরে।"

নজরুল জসীমউদ্‌দীনকে মৌখিক উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। তিনি নিজে চেষ্টা করে 'মোসলেম ভারত' এবং চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'সাধনা' পত্রিকায় তাঁর লেখা ছেপে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর কাছ থেকে এ উৎসাহ পেয়ে জসীমউদ্‌দীনের কাব্যপ্রতিভা বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ পেল। দুঃখের বিষয় পরবর্তীকালে নজরুল ইসলামের সাথে আন্তরিক

ইচ্ছা সত্ত্বেও জসীমউদ্‌দীন নিবিড় যোগ বজায় রাখতে পারেন নি। যুগের হুজুগে মেতে উঠা কবিকে কাছে পাওয়া বড়ই শক্ত ব্যাপার ছিল। চারিদিকে তাঁর মুগ্ধ ভক্ত ও বন্ধুর দল তাঁকে নিয়ে টানাটানি করছে, বড় ব্যস্ত কবি। তাই তো কবির ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভের সুযোগ বড় একটা হয় নি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন উপলক্ষে কবির সাথে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটেছিল বটে ; কিন্তু সে সব কবির কাব্যব্রতকে তেমন সাহায্য করতে পারে নি। কবি তখন রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউয়ে দোল খেয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন—তাঁর তখন 'শিশুকবির' মনের অবস্থা বোঝার সময় ছিল না। তাইতো দেখছি কবিজীবনের সূচনায় নজরুল ইসলামের প্রভাব যদি বা কিছুটা ক্রিয়াশীল ছিল, পরবর্তীকালের সাহিত্য-সাধনায় সে প্রভাব ক্রমশঃই যেন গৌণ হয়ে এসেছিল। জসীমউদ্‌দীন যেন কবির কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে অনেকটা সঙ্কুচিত হয়েই আপন গ্রাম্য পরিবেশে ফিরে এসেছিলেন।

জসীমউদ্‌দীন তখন স্কুলের গণ্ডী পেরিয়েছেন। শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তিনি বাংলাদেশের বড় বড় কবিদের রচনার সাথে পরিচিতও হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ কবিদের রচনা তাঁর ভাল লাগত, সে সবের প্রভাবও তিনি অনুভব করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভিতরকার বিশিষ্ট কবি-স্বভাবটি তাঁকে ক্রমশঃই যেন ভিন্ন পথে প্রবলতরভাবে আকর্ষণ করছিল। সেই স্বভাবের তাগিদেই তিনি গ্রাম্যজীবন নিয়ে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন এবং গ্রাম্যকবিদের রচিত গ্রাম্যগানগুলোর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কবির রচনারীতি ক্রমশঃই বদলে যেতে লাগল—কাব্যের বক্তব্যে ও ভাষায় সমকালীন কাব্যধারার ব্যতিক্রম স্পষ্ট হয়ে উঠল। সাথে সাথে পত্রিকার সম্পাদক মহলেও বিরূপ ক্রিয়া দেখা গেল ; তাঁর কবিজীবনে এক নতুন সংকট দেখা দিল। এ সংকট সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীন জীবনস্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ "আমার কবিতার রচনা-রীতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্বে রবীন্দ্ররচনা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যাহা লিখিতাম বহু কাগজে তাহা ছাপা হইয়াছে। এমন কি প্রবাসী কাগজে পর্যন্ত আমার লেখা প্রকাশিত হইয়াছে ; কিন্তু গ্রাম্য-জীবন লইয়া গ্রাম্য ভাষায় যখন কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম তাহা কেহই পছন্দ করিল না। কাগজের সম্পাদকেরা আমার লেখা পাওয়া মাত্র ফেরত পাঠাইয়া দিতেন। সবটুকু হয়ত পড়িয়াও দেখিতেন না। সেই সময় আমার মনে যে কি দারুণ দুঃখ হইত তাহা বর্ণনার অতীত।"[১] এ দারুণ মানসিক সংকট মুহূর্তে বারবার কবির মনে উদিত হয়েছিল উদারচেতা দিলদরিয়া কবি নজরুল ইসলামের প্রথম সাক্ষাতের সেই মধুর স্মৃতি। তাঁর মনে কেমন এক বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠল, "একবার যদি কবি নজরুলের সঙ্গে দেখা করিতে পারি, নিশ্চয়ই তিনি আমার কবিতা পছন্দ করিবেন।"[২] আর তাঁর আনুকূল্য পেলে কাব্যের নতুন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা হয়তো সহজ হয়ে যাবে, এমন একটা ধারণাও তাঁর হয়েছিল। এই সময়ই তাঁর সংগৃহীত কিছু গ্রাম্যগান দেখে সাহিত্যিক যতীন্দ্রমোহন সিংহ জসীমউদ্‌দীনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কলিকাতা

---

১. জসীমউদ্‌দীন—যাদের দেখেছি, 'নজরুল প্রসঙ্গ', পৃঃ ২৯।
২. জসীমউদ্‌দীন—যাদের দেখেছি, 'নজরুল প্রসঙ্গ', পৃঃ ৩০।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান, লোকসাহিত্য-প্রেমিক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সাথে দেখা করতে। দীনেশচন্দ্র তখন পল্লীগীতি, গাথা সংগ্রহের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তাঁর সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' তখন সুধী মহলে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি বাঙলার তরুণদের আহ্বান জানিয়েছেন লোকসাহিত্যের সম্পদ উদ্ধার ও অনুসন্ধানের কাজে এগিয়ে আসতে। কবি আর একবার পাড়ি জমালেন কলকাতার উদ্দেশ্যে।

স্বদেশীর খেয়াল তখনও কবির মাথা থেকে দূর হয় নি। তিনি কংগ্রেস অফিসের সাময়িক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কংগ্রেস সাহায্য তহবিলের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে করতে কলকাতা এসে উপস্থিত হলেন। এবার স্বদেশীয়ানাটা কিন্তু একান্তই গৌণ ব্যাপার ছিল, তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ঐ উপলক্ষ্যে নিজ কাব্যব্রতের সার্থকতার জন্যে নজরুল ইসলামের সমর্থন আদায় করা। সুবিস্তৃত জনারণ্য কলকাতা নগরীতে তিনি কাউকে বড় একটা চিনেন না। ভরসা ছিল কোনক্রমে একবার নজরুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ পেলেই তাঁর সমস্যা মিটে যাবে। কবি সেই আশায় মুসলিম পাবলিশিং হাউসে উপস্থিত হলেন। সেখানে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে নজরুল দর্শনের সৌভাগ্য তাঁর ঘটল। বন্ধু-বান্ধব পরিবৃত মহাব্যস্ত কবি ঝড়ের মত এলেন, ঝড়ের মতই চলে গেলেন হুগলীতে। তরুণ কবির কথা শোনার সময় পর্যন্ত তাঁর হল না। হাওড়া ষ্টেশন পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করে কবি ফিরে এলেন। সহায়, সম্বলহীন, কবি চোখে অন্ধকার দেখলেন। সারাদিন অনাহারে থেকে ফুটপাথেই রাতটা কাটিয়ে দিলেন। একটা নিদারুণ হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। ভাগ্যক্রমে পরদিন ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও পরিচয় হল শহর কলকাতার পথেই। তাঁর সাথে তিনি দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হলেন। দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ জসীমউদ্‌দীনের জীবনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তাঁর ভাবী সৌভাগ্যেরই যেন প্রথম বিদ্যুৎচমক। জসীমউদ্‌দীন এ সাক্ষাৎকারের স্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে আবেগভরে লিখেছেন ঃ "যে খাতাখানায় গ্রাম্য গানগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলাম দীনেশবাবু সেই খাতাখানার কয়েকটি পাতা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আবার সেই খাতায় মনোনিবেশ করিলেন। তারপর আবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন। শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে আমার সকল অন্তর কম্পিত হইতেছিল। এই সেই ডাক্তার সেন, যাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রাত জাগিয়া পড়িয়াছি ; পদ্মাতীরে কত গভীর রজনীতে যাঁহার বই পড়িয়া, দারিদ্র্যের কাহিনী জানিয়া নিজের জীবনকে এক উচ্চতর আদর্শে গড়িয়া লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমার সকল অন্তর সালাম হইয়া যেন তাঁহার সামনে লুটাইয়া পড়িতে চাহিতেছিল। আমি যেন এক গ্রহ হইতে আর এক নূতন গ্রহচক্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।"[১] বাস্তবিক দীনেশচন্দ্রের সাথে এই সাক্ষাৎকার কবির জীবনে এক মহা ঘটনা। তাঁর পরবর্তী জীবন ও সাহিত্য-সাধনার এক চূড়ান্ত নিয়ামক শক্তিরূপে কাজ করেছে এ মহাজন সংস্পর্শ ও সাহচর্য।

---

১. জসীমউদ্‌দীন—যাঁদের দেখেছি, 'দীনেশচন্দ্র প্রসঙ্গ', পৃঃ ৭১-৭২

দীনেশচন্দ্র জসীমউদ্‌দীনকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাম্যগীতি ও গাথার একজন সংগ্রাহক হিসেবে নিয়োগ করলেন। তখনকার সময় বিচারে তাঁর একটা ভালো আয়ের পথ হল। কপর্দকশূন্য অবস্থায় অবহেলিত, উপেক্ষিত জসীমউদ্‌দীন যখন কলকাতার রাস্তায় দিশেহারা হয়ে ঘুরছিলেন তখন তাঁকে সুন্দর ও সার্থক জীবনের আশ্বাস বয়ে এনে দিলেন দীনেশচন্দ্র । দীনেশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল তাঁর মন। তিনি বাড়ি ফিরে এলেন, পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে গ্রাম্যগীতি সংগ্রহের কাজও যথারীতি চালিয়ে যেতে লাগলেন। কয়েক মাস বাদেই দীনেশচন্দ্রের সাথে আবার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে গেল। কবি জানতেন যে, দীনেশবাবু নতুন কবি ও সাহিত্যিকদের যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে থাকেন। চোখের সামনেই তো দেখতে পেলেন কত তরুণ লেখক দীনেশবাবুর সস্নেহ প্রসংসায় ধন্য হয়ে হাসি মুখে বিদায় নিচ্ছে। জসীমউদ্‌দীনও সুযোগ বুঝে একদিন তাঁর স্বরচিত কবিতার খাতাটি দীনেশচন্দ্রের দিকে এগিয়ে দিলেন। দীনেশচন্দ্র জসীমউদ্‌দীনকে একজন ভাল গীতি সংগ্রাহক হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কবিতা লেখার বাতিকটাকে তিনি তরুণের সখ ও খেয়াল বলেই মনে করলেন। আর বাঙলাদেশটা তো ঐ ধরনের সখের কবিতে ভরা। তাই তিনি জসীমউদ্‌দীনকে নিজ কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কবিতা না পড়েই তাঁর খাতাখানা ফিরিয়ে দিলেন। জসীমউদ্‌দীন মনে বড় আঘাত পেলেন; কিন্তু দমলেন না। 'কল্লোল' তখন সাহিত্য সমাজে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। জসীমউদ্‌দীন কার্যসূত্রে 'কল্লোল' কর্তৃপক্ষের সাথে পরিচিত ছিলেন। ঐ সূত্রেই তাঁর বিখ্যাত 'কবর' নামে কবিতাটি প্রকাশের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। অনেক গড়িমসির পর 'কল্লোলে'র কোন সংখ্যায় একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় অতি ছোট অক্ষরে কবিতাটি ছাপলেন 'কল্লোল' কর্তৃপক্ষ। গ্রাম্য-গান সংগ্রহের কাজে পত্রালাপ উপলক্ষ্যে জসীমউদ্‌দীন 'কল্লোল' প্রকাশিত তাঁর কবিতাটি দীনেশবাবুকে পড়ে দেখতে অনুরোধ জানালেন। 'দূরাগত রাখালের বংশীধ্বনির' মতো সে কবিতা দীনেশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি কবিত্বময় ভাষায় কবিতাটির প্রশংসা করে কবিকে পত্র দিলেন। সরল শিশুর মত অভিমানী জসীমউদ্‌দীন দীনেশচন্দ্রকে লিখলেনঃ "এমন কত কবিতাই ত রচনা করেছি; কিন্তু কোন ভাল মাসিক পত্রিকাই তা ছাপায় না। কবিতা লিখে আর কি হবে?"[১] প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকার সেই প্রত্যাখ্যানের বেদনা যেন এ চিঠিতে অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ল। এর মাসখানেক বাদেই 'ফরোয়ার্ড' নামক ইংরেজী পত্রের তিলক সংখ্যায় দীনেশচন্দ্র জসীমউদ্‌দীনের কবিতার প্রশংসা করে, 'An young Mohammedan poet" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি মুসলমান কবিদের মধ্যে নজরুল ইসলামের পরই জসীমউদ্‌দীনের স্থান নির্দেশ করেছিলেন। তিনি জসীমউদ্‌দীনের কবিতার উৎকর্ষের দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কবর' কবিতার অংশবিশেষ অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। এ প্রবন্ধটি যে জসীমউদ্‌দীনকে কাব্যিক প্রতিষ্ঠা দানে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল তা তাঁর নিজের সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতিতেই প্রকাশ। "এই প্রবন্ধ বাহির হওয়ার পর বাঙলাদেশের বহু বড় বড় মাসিক পত্র হইতে আমি কবিতা পাঠাইবার আমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। ইহার পর নিজের কবিতা ছাপাইতে আমাকে আর বেগ পাইতে হয় নাই।"[২]

---

১. জসীমউদ্‌দীন—'যাঁদের দেখেছি', দীনেশচন্দ্র প্রসঙ্গ', পৃঃ ৬৭-৬৮।

২. জসীমউদ্‌দীন—'যাঁদের দেখেছি', পৃঃ ৭২।

পল্লীরূপমুগ্ধ দীনেশচন্দ্র জসীমউদ্‌দীনের রচনায় বাঙলার পল্লীর সে হারানো শ্রী যেন নূতন করে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর তা তাঁকে এমন দুর্নিবার ভাবে আকর্ষণ করেছিল যে তিনি জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের একজন অনুরাগী পাঠক হয়ে পড়লেন। জসীমউদ্‌দীনের কবিকৃতীর প্রতি তিনি তাঁর অন্তরানুরাগ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি তাঁকে দেশবাসীর চোখের সামনে তুলে ধরার সংকল্প নিয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র শুধু প্রবন্ধ লিখেই যে কবিকে উৎসাহিত করেছিলেন তা নয়, তিনি তাঁর 'কবর' কবিতাটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত করে দিয়েছিলেন। জসীমউদ্‌দীন তখন বি .এ. ক্লাসের ছাত্র। ঐ ছাত্রাবাস্থায় তাঁর কবিতার যে আদর হল, বাঙলাদেশের আর কোন কবি বা সাহিত্যিকের ভাগ্যে তা ঘটে নি। দীনেশচন্দ্রের আনুকূল্যে কবির আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছিল। তিনি কবির কাব্যগুলোর সমালোচনা লিখে সুধীমহলের রুচি ও দৃষ্টিভঙিকে তাঁর কাব্যের পক্ষে অনেকটা অনুকূল করে তুলেছিলেন। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' প্রকাশের পর তিনি 'বিচিত্রা'র পাতায় বিস্তৃত সমালোচনা লিখে কবির প্রতিভার স্বীকার আদায়ে সাহায্য করেছিলেন, আবার 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্য প্রকাশের পরও বলিষ্ঠ সমর্থন দিয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন। জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের প্রতি শিক্ষিত সমাজের মনোযোগ আকর্ষিত হয়েছিল এবং তিনি একজন দরদী পল্লীপ্রাণ কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্রের সস্নেহ সমর্থন ব্যতীত জসীমউদ্‌দীনের কাব্যিক প্রতিষ্ঠা অর্জন বোধহয় মোটেই সহজ হত না। জসীমউদ্‌দীনের নিজের ভাষায় বলতে গেলেঃ "দীনেশবাবু ইন্দ্রজালের ভেল্কির মত তাঁকে এক একটি অবস্থা থেকে তুলে ধরেছেন।"[১] বস্তুতঃ দীনেশচন্দ্রের স্নেহ ও আনুকূল্য চারিদিকের উপেক্ষা থেকে আত্মরক্ষা করে জসীমউদ্‌দীনকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ দিয়েছিল।

সাহিত্যের ইতিহাসে এমন সস্নেহ পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থনের সুযোগ বিরল। জসীমউদ্‌দীন কিন্তু এই দিকে মহা ভাগ্যবান ব্যক্তি। বহু মনীষীর স্নেহ ও আনুকূল্য লাভ তাঁর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠাকে সহজতর করে দিয়েছিল। দীনেশচন্দ্র ছাড়া তিনি আরও বহু সাহিত্যিকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন —এঁদের মধ্যে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহ ও সমর্থন তাঁকে বাঙলাদেশের কবি ও সুধী সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে খুবই সাহায্য করেছে। ছাত্রাবস্থায়ই পল্লী নিয়ে লেখা জসীমউদ্‌দীনের কবিতাগুলো সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পড়বার জন্যে কলকাতা চলে আসলেন তখন তাঁর 'রাখালী' ও 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্য প্রায় বছরখানেক হয় ছেপে বেরিয়েছে। কিছু কিছু কবিখ্যাতিও তাঁর হয়েছে। জসীমউদ্‌দীন তখন তাঁর কবিতার বইগুলো বাঙলাদেশের বিভিন্ন সাহিত্যিকদের উপহার দিয়ে তাঁদের মতামতের জন্যে ছুটে বেরিয়েছেন। বন্ধু মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় দীনেশরঞ্জন দাশের মারফত শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের সাথে অনেক আগেই তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তিনি 'নক্‌সী কাঁথার মাঠের একটি ক্ষুদ্র ভূমিকাও লিখে দিয়েছিলেন। তাতে তিনি পল্লীজীবনের রূপকার এই তরুণ কবির প্রতি তাঁর অন্তরের স্নেহ উজাড় করে দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ কাব্যটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলার জন্যে নানা পরামর্শ দিয়ে কবিকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁরই পরামর্শে 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্যের প্রতি অধ্যায়ের শীর্ষ দেশে পল্লীগীতি , গাথা, ছড়া, প্রবাদের তাৎপর্যপূর্ণ পংক্তি সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল । শুধু কি তাই,

১. জসীমউদ্‌দীন—'যাঁদের দেখেছি ', পৃঃ ৭২।

কাব্যেরও বহু সংশোধন ও রদবদল করা হয়েছিল তাঁরই উপদেশ অনুসারে। অবনীন্দ্রনাথ এ বইয়ের আকর্ষণ সম্বন্ধে ভূমিকায় যা বলেছেন তা যথার্থ । তাঁর মতে, "এই লেখার মধ্য দিয়ে বাংলার পল্লীজীবন আমার কাছে চমৎকার একটি মাধুর্যময় ছবির মত দেখা দিয়েছে।"[১] অবনীন্দ্রনাথ জসীমউদ্‌দীনের কাব্যসাধনার সহায়তা যেমন করেছেন, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনেও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। 'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়' নামে স্মৃতিচারণ গ্রন্থে তিনি অবনীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর স্নেহ-সম্পর্কের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা জসীমউদ্‌দীনের জীবনে অবনীন্দ্রনাথের ব্যাপক প্রভাবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর পরিচয়ের সুযোগ তখনও হয় নি। যদিও ইতিপূর্বে কলকাতা এসে জসীমউদ্‌দীন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে 'শেষ রক্ষা' নাটকের অভিনয় উপলক্ষ্যে দূর থেকে রবীন্দ্রনাথকে একবার প্রত্যক্ষ করেছিলেন; কিন্তু আলাপের সুযোগ পান নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধ্যায়ানের কবি, তাঁর কাব্য পাঠে তিনি এক আশ্চর্য মাদকতা বোধ করেন, তাঁর বিস্ময় কেবলই বেড়ে যায়। জসীমউদ্‌দীন জানতেন কবি তরুণ সাহিত্যিকদের উৎসাহ দানে অকৃপণ। তাঁর প্রতি কি কবির দৃষ্টি পড়বে না! কবির কাছ থেকে একদিন না একদিন সাদর আহ্বান আসবেই এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু কবির কাছ থেকে সে আহ্বান তো এল না ; জসীমউদ্‌দীনও মনে মনে অভিমান করে দূরেই সরে রইলেন। কিন্তু সেবার (১৯৩০) কবি হঠাৎ গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন; অবশ্য শীঘ্রই তিনি আরোগ্য লাভ করে কলকাতায় ফিরে এলেন। জসীমউদ্‌দীনের মনোভাব বদলে গেলে— ভাবলেন কবি এখন বয়োবৃদ্ধ; অভিমান করে বসে থাকলে শেষটায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ নাও আসতে পারে। তাই এবার নিজের গরজেই কবির সাথে দেখা করার জন্য প্রস্তুত হলেন। রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ করা তাঁর পক্ষে তেমন কঠিন কিছু কাজ ছিল না। কারণ বন্ধু মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে তিনি ইতিপূর্বেই অনেকবার জোড়াসাঁকোর বাটীতে অবনীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এবার তিনি 'রাখালী' ও 'নক্‌সী কাঁথার মাঠের অর্ঘ নিয়ে স্বয়ং কবির দরবারে হাজির হলেন। কবির সাথে এ সাক্ষাৎকার জসীমউদ্‌দীনের ভাষায় ঃ "আমার সমস্ত অন্তর ভরিয়া দিয়াছিল।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য দুখানা পড়ে তাতে পল্লীজীবনের অকৃত্রিম মাধুর্যের পরিচয় পেয়ে কবিকে প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে শান্তিনিকেতনে এসে থাকবার আহ্বান জানালেন। হৃদয়ের আগ্রহ সত্ত্বেও কবির আহ্বানে সাড়া দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু এই সাক্ষাৎকার উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর হৃদয়ে যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঞ্চার হল তা তিনি সারাজীবন লালন করেছেন মনে মনে। রবীন্দ্রনাথ কবিকে শুধু মৌখিক সাধুবাদ জানিয়েই ক্ষান্ত হন নি, শান্তিনিকেতনে গিয়ে পত্রযোগে তাঁর বইয়ের প্রশংসা করে যে পত্র দিয়েছিলেন তা জসীমউদ্‌দীনের কবি-কর্মের সার্থকতায় সন্দিহান সমালোচকদের একেবারে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ জসীমউদ্‌দীনের অকৃত্রিম কবি স্বভাবটিকে বুঝতে পেয়েছিলেন। তাই তাঁর কাব্য সম্পর্কে তিনি বিনা দ্বিধায় মন্তব্য করেছিলে ঃ "অতি সহজে যাদের লিখবার ক্ষমতা নেই, এমনতর খাঁটি জিনিস তাঁরা কখনই লিখতে পারে না।"[২] রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত এ জয়পত্র কবিকে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ জসীমউদ্‌দীনের 'মেঠো সুরের' কাব্যের একজন অনুরাগী পাঠক ও

---

১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্যের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২. 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্য সম্পর্কে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত কবির পত্র থেকে

পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়ালেন। উপদেশ ও উৎসাহ দিয়ে তাঁর কাব্যসাধনার পথকে সুগম ও প্রশস্ত করে তুলতে কবির প্রচেষ্টার বিরাম ছিল না। জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে যে পল্লীপ্রকৃতিকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন তা তাঁর একেবারে অপরিচিত নয়। বহুদিন তিনি কাব্যোপলক্ষ্যে পদ্মার তীরে তীরে, পল্লীতে পল্লীতে কাটিয়ে পল্লীপ্রকৃতির ঐশ্বর্যময় রূপ নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে বাঙলার পল্লীপ্রকৃতির তথা লোকজীবনের যে মাধুর্য রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন তা বাংলার আর কোন কবির কাব্যে তিনি দেখেন নি। জসীমউদ্‌দীনের রচনা পড়ে কবি তাই অসাধারণ তৃপ্তি বোধ করেছিলেন। সেই থেকে জসীমউদ্‌দীন কবির স্নেহাকর্ষণে একেবারে বাঁধা পড়ে গেলেন। কবির দরবারে তিনি একজন নিয়মিত অতিথি হয়ে দাঁড়ালেন। কালক্রমে তিনি কবির একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ও গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিলেন। কবির দরবারে —তা সে জোড়াসাঁকোতেই হোক, তিনি প্রায়ই ছুটে গিয়েছেন কবির সাথে প্রাণের কথা বলবার জন্যে। কবির সাথে পরিচয় সূত্রে তিনি সমকালীন বাংলার বহু গুণীজ্ঞানী সাহিত্যিকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ অনেক গুণী ব্যক্তির সাথে তাঁর যোগ ঘটেছিল এবং তা তাঁর প্রতিভা বিকাশের পথে সহায়ক হয়েছিল। চারিদিকে যখন অভিযোগ উঠেছিল তাঁর কাব্যের ভাষা ও ছন্দের গতানুগতিকতা সম্পর্কে তখন রবীন্দ্রনাথই ভরসা দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ জানতেন পল্লী নিয়ে লেখা কাব্যে যথার্থ পল্লীজীবনের আমেজ সৃষ্টি করতে হলে ভাষা ও ছন্দের ঐ আটপৌরে রূপটি সংরক্ষণ করা আবশ্যক। পল্লীর অকৃত্রিম রূপের প্রকাশের জন্যে অকৃত্রিম সহজ ও সাদামাটা পল্লীর ভাষাই সবচেয়ে উপযুক্ত বাহন। এ সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীন 'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়' নামক স্মৃতিগ্রন্থে অকপটে অনেক কথাই ব্যক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ 'রাখালী' ও 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে'র মধ্য দিয়ে বাংলার পল্লীকে আর একবার যেন নতুন করে দেখতে পেয়েছিলেন। সে দেখা যেমন তেমন করে দেখা নয়, একেবারে দ্রষ্টব্য বস্তুর মর্মমূলে পৌছার চেষ্টা। প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ কবি জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে তাঁর প্রাণের পিপাসা মিটানোর অনেক জিনিসেরই সমাবেশ লক্ষ্য করেছিলেন। পল্লীপ্রকৃতি ও জীবনের রহস্যানুসন্ধানী কবির কাছে জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে যেন পল্লীকে প্রত্যক্ষ করার এক একটি জানালার কাজ করেছিল। তাই তো তিনি সাগ্রহে জসীমউদ্‌দীনের কাব্যগুলো পড়তেন। তিনি যে তাঁর কাব্যের কিরূপ মনোযোগী পাঠক ছিলেন, তা একটি সাধারণ ঘটনা থেকেই বেশ বোঝা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন তাঁর 'বালুচর' কাব্যটি প্রকাশিত হলে জসীমউদ্‌দীন কবির মতামতের জন্যে এক কপি বই তাঁর কাছে পাঠান। 'বালুচর' কাব্যের পটভূমি পল্লীর হলেও, এ কাব্য ছিল মূলতঃ প্রেমের কবিতার সঙ্কলন। রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন 'বালুচরে' তিনি পদ্মার চরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা পাবেন; কিন্তু তার পরিবর্তে যখন শুনতে পেলেন প্রেমের মৃদু গুঞ্জরণ, তখন স্বভাবতই একটু হতাশ বোধ করেছিলেন। পাছে জসীমউদ্‌দীন মনে কষ্ট পান এ জন্যে এর প্রসংশা বা নিন্দামূলক কোন কথাই তিনি প্রকাশ্যে বলেন নি। কিন্তু সাক্ষাৎমত তাঁকে রীতিমত অনুযোগ দিয়েছিলেন। জসীমউদ্‌দীন তাঁর স্বভাবের ক্ষেত্র থেকে দূরে যাবেন একথা রবীন্দ্রনাথ কখনই পছন্দ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ উপদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতা কবির কাব্যসাধনার নিষ্ঠাকে অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এম. এ. পাশ করার পর রবীন্দ্রনাথেরই আনুকূল্যে জসীমউদ্‌দীন বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী গবেষণা সহকারী (Research

Assistant) নিযুক্ত হয়েছিলেন। ঐ পদে তিনি প্রায় ছ বছর কাজ করেছিলেন। এ সময় তিনি কিছুদিনের জন্যে ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়ই বাসা বেঁধেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসার প্রচুর সুযোগ তাঁর হয়েছে। জসীমউদ্‌দীনের 'ধান খেত', 'রঙিলা নায়ের মাঝি', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ,'হাসু', প্রভৃতি কবিতা ও গানের বই একালেই প্রকাশিত হয়। বইগুলোর মধ্যে শেষোক্ত দুটি বইয়ের সৃষ্টির পিছনে তাঁর শান্তিনিকেতনের কয়েকটি মধুর স্মৃতি কাজ করেছে।

কবি সময় ও সুযোগ পেলেই মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে যেতেন। একবার শিল্পাচার্য নন্দলালের সাথে শান্তিনিকেতনে গিয়ে তিনি প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বাসায় তাঁর ভাইঝি হাসু নামে ছোট একটি মেয়ের স্নেহাকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। এই হাসুকে উপলক্ষ্য করেই তাঁর 'হাসু' কাব্যের কবিতাগুলো লেখা হয়েছিল। তাঁর 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যটির রচনার পিছনেও আর একটা মধুর স্মৃতি কাজ করেছে। প্রভাতকুমারের স্ত্রী 'সুধাদির' অনুরোধে ঐ মেয়েটি অতুল প্রসাদের 'ওগো সাথী, মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে' গানটি গেয়ে কবিকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলেছিল। ঐ মেয়েটির রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেনঃ "পাতলা একহারা চেহার, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। নতুন ধানের পাতার সমস্ত বর্ণসুষমাকে যেন তাহার সমস্ত গায়ে মাখাইয়া দিয়াছে।"[১] জসীমউদ্‌দীনের নিজের উক্তিতেই আমরা জানতে পারি তিনি 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' পুস্তকের নায়িকা 'দুলী'র রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে মনে মনে এ মেয়েটিকেই কল্পনা করেছিলেন এবং তারই কণ্ঠে গাওয়া অতুল প্রসাদের গানটি তিনি পুস্তকের উভয় অংশেই শীর্ষদেশে উদ্ধৃত করেছিলেন। এই গানই নাকি তাঁকে কাব্য লেখার অনেকটা প্রেরণা দিয়েছিল। এ সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীনের 'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

যে কথা বলছিলাম, জসীমউদ্‌দীনের কাব্যসাধনার বিকাশে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে'র মত 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যেরও উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। তিনি কবির কাব্য সম্পর্কে মৌখিক প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁকে পল্লীজীবন নিয়ে কাব্য, নাটক ইত্যাদি লিখতে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও প্রেরণা না পেলে 'বেদের মেয়ে' 'পল্লীবধূ', 'মধুমালা', ইত্যাদি লোকনাট্যের রচয়িতা জসীমউদ্‌দীনকে আমরা পেতাম কিনা সন্দেহ। তিনি নাট্য রচনায় কোন রূপ সার্থকতার অধিকারী হতে পারবেন এ ভরসাই তাঁর ছিল না। অবনীন্দ্রনাথ তো তাঁকে বলেই দিয়েছিলেন নাটক লেখায় তাঁর হাত নেই। দ্বিধাগ্রস্ত জসীমউদ্‌দীনকে উৎসাহ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন —"অবন কি বোঝে। তুমি লেখ নাটক। আমি অভিনয় করিয়ে দেব।"[২] তিনি শুধু উৎসাহ উপদেশ দিয়েই কর্তব্য শেষ করেন নি, জসীমউদ্‌দীনের অনুরোধে একটা নাটকের প্লট পর্যন্ত বলে দিয়েছিলেন। অনেক পরবর্তীকালে জসীমউদ্‌দীন পল্লীবধূ' নামে যে নাটকটি লিখেছিলেন, তার প্লটটি রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত উল্লিখিত প্লট। অবশ্য 'পল্লীবধূ' প্রকাশের বেশ কয়েক বছর আগেই তিনি পদ্মাপার' ও 'বেদের মেয়ে' (১৯৫১) নাটক দুটি রচনা করে লোকনাট্য রচনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। তবু লোকনাট্য রচনার প্রেরণা জসীমউদ্‌দীন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই যে পেয়েছিলেন, এ সত্যের অন্যথা হবার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ জসীমউদ্‌দীনের প্রতিভার

---

১. জসীমউদ্‌দীন–'ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিনায়' পৃঃ ১৮।

২. জসীমউদ্‌দীন–'যাদের দেখেছি' পৃঃ ৮৮।

স্বরূপটি বুঝতে পেরেছিলেন এবং একে স্বভাবের হাতে চালু রেখে এর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথটি প্রশস্ত করে তুলতে কোন চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। রবীন্দ্রনাথের কাছে জসীমউদ্‌দীন নানাভাবে ঋণী, যেমন --ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনি কাব্যজীবনে। এ ধরনের কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি রয়েছে জসীমউদ্‌দীনের জীবন-স্মৃতিমূলক রচনা 'যাঁদের দেখেছি', ও 'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়' গ্রন্থে।

এই ভাবে কাব্যসাধনার প্রায় শুরু থেকেই বহু কবি-মনীষীর সস্নেহ সমর্থন, সাহচর্য ও আনুকূল্য লাভ করার সৌভাগ্য জসীমউদ্‌দীনের হয়েছিল। এতে করে তাঁর প্রতিভার বিকাশ যেমন সহজ হয়েছে তেমনি তাঁর দ্রুত সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার পথও সুগম হয়েছিল। 'রাখালী' থেকে 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ও 'হাসু' বছর ন' দশের ব্যবধান, এ স্বল্পকাল মধ্যেই জসীমউদ্‌দীন বাঙলা কাব্য জগতে 'পল্লীকবি'র অভিনব জীবনদৃষ্টি ও রচনাকৌশল নিয়ে আবির্ভূত হয়ে রীতিমত একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পল্লীগীতি -গাথার মোহন সুরে মুগ্ধ তাঁর হৃদয় রাধা কাব্যের উপকরণ খুঁজতে ছুটে গিয়েছে পল্লীর প্রান্তে, মাঠে-ঘাটে, এক দুর্নিবার আকর্ষণে। এই জসীমউদ্‌দীন কবি হিসেবে কিছুটা আত্মবিস্মৃত —সে বিস্মৃতির প্রভাবেই তাঁর কাব্যের বেশভূষায়ও লক্ষ্য করা যায় যুগচরিত্রের সাথে অসঙ্গতি। তবু স্বাভাবিক কবিত্ববোধের অধিকারে ও উপযুক্ত কলা-কৌশল প্রয়োগের ক্ষমতায় তিনি তাঁর কাব্যকে এমন একটা মহিমা দিতে পেরেছিলেন, যার জন্যে দেশের সুধী সমাজের দৃষ্টি পল্লীকাব্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, নাগরিকতার চূড়ান্ত বিরুদ্ধতার দিনেও। অবশ্য সমকালীন বিশ্বের বিভিন্ন সভ্য দেশে লোকশিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি যে অনুরাগ দেখা দিয়েছিল, তা জসীমউদ্‌দীনের কাব্যসাধনার সার্থকতার পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। অন্যান্য দেশের ন্যায় লোকশিল্প ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন সাধনের চেতনা উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে আমাদের দেশেও ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। বিশ শতকে পারিপার্শ্বিক কারণে তা আরও প্রবল হয়ে উঠে আমাদের এক আন্তর্জাতিক চেতনার সাথে যুক্ত করে দিয়েছিল। বিশ শতকে লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি আমাদের এই অনুরাগ তাই বিশিষ্ট যুগ-চেতনা বটে। ফেলে আসা পল্লীর দিকে দৃষ্টি ফেরানোর মধ্যে অনেকেই পশ্চাদমুখিতার মুখব্যাদান কল্পনা করে অনেকটা বিরূপ বোধ করলেও এ ছিল আসলে যন্ত্রযুগাশ্রয়ী নাগরিক মানুষের আপন ঐতিহ্যানুসন্ধানের একটা প্রয়াস। এতে বিশ্বের সকল সভ্য সমাজেরই সায় ছিল। জসীমউদ্‌দীনের কবি-কর্মের সার্থকতার মূলে এ বিশিষ্ট যুগ-চেতনা তথা পল্লী ঐতিহ্যচেতনার সমর্থন ছিল বলেই তিনি এত বেশী সার্থক। তাইতো লক্ষ্য করি ১৯৩৯ সালে মিসেস মেরী মিলফোর্ড কৃত তাঁর 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্যের অনুবাদ, The Field of the Embroidered Quilt"বিশ্বের লোকসাহিত্য রসিকদের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল। প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে নানা বিদেশী ভাষায় এর অনুবাদ তারই প্রমাণ। ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল মাত্র এক যুগের সাধনায় জসীমউদ্‌দীন এইভাবে এক দুর্লভ সম্মান ও সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছেন পল্লী নিয়ে কাব্য লিখে। এর পরেও জসীমউদ্‌দীন একই খাতে সাহিত্য-সাধনা চালিয়ে গেলেও 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র কাব্যিক -সাফল্য তাঁর অনায়ত্তই থেকে গিয়েছে।

১৯৬৯ সালে UNESCO-র উদ্যোগে 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থাও কবির প্রাথমিক সাহিত্য-সাধনারই উৎকর্ষের স্বীকৃতি দিচ্ছে। কবির এই কালের রচনার মধ্যে 'রঙিলা নায়ের মাঝি' নামক গীতি সংকলনটিও নানা কারণে উল্লেখের

দাবি রাখে। তিনি বইটিতে পল্লীকবিদের রচিত কিছু পল্লীগীতি সংগ্রহের পাশেই অনেকগুলো স্বরচিত পল্লীগীতি সন্নিবিষ্ট করে, রচনায় তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতারই পরিচয় তুলে ধরেছেন। অজস্র পল্লীগীতি রচনা করে, পল্লীকবিদের রচিত গান সংশোধন করে তিনি পল্লীগীতির হৃদয়-ঐশ্বর্য ও বৈশিষ্ট্যের দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রখ্যাত গায়ক আব্বাসউদ্‌দীন এ কাজে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁর অনেক গানে সুর দিয়ে সে সবকে জনপ্রিয় করে তুলতে আব্বাসউদ্‌দীনের দান কম নয়। শিশুদের জন্যে কবিতা লেখাও কবি শুরু করেন এই কালেই। এসব রচনায়ও তিনি পল্লীর ছড়া, প্রবাদ, কিংবদন্তী, রূপকথা, গীতিকা বা গাথা ইত্যাদির সাহায্য নিয়েছেন। লোকসাহিত্যের মালমশলা নানাভাবে কাজে লাগিয়েও জসীমউদ্‌দীন আপন সাহিত্য-সাধনার বৈচিত্র্য সম্পাদনে যে কতটা মনোযোগী ছিলেন তা বিভিন্ন ধরনের খণ্ড কবিতা, গান, কাহিনী, কাব্য রচনার প্রচেষ্টা থেকেই বেশ বোঝা যায়। পরবর্তীকালে তিনি আরও বিচিত্র পথের পথিক হয়েছেন; কিন্তু শিল্পসার্থকতায় কখনই প্রথম যুগের রচনাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। তবে সার্থকতার নির্দশন সেখানেও যে কিছু কিছু আছে তা স্বীকার করতেই হয়।

১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের সাথে সাথেই প্রকৃতপক্ষে কবির কাব্যসাধনার প্রথম পর্বের অবসান সূচিত হয়। কর্মক্ষেত্র ও পেশার পরিবর্তনের সাথে সাথে কবির সাহিত্য-সাধনায়ও লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা দেয়। কবি এক নতুন পরিমণ্ডলে, পূর্বেকার অভ্যস্ত মনীষী-সাহচর্য থেকে বঞ্চিত অবস্থায়, পুরাতন ধারার প্রতি আনুগত্য রেখেই কাব্যসাধনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু এ পর্বে তাঁর সৃষ্টিকর্ম ক্রমশই মন্থর হয়ে এসেছে। নানা পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও জীবনের কর্মধারার বৈচিত্র্য তাঁর সাহিত্যকর্মকে এই পর্বে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, আগষ্ট আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গমা প্রভৃতি নানা সমস্যা কন্টকিত এই যুগের কবি ও সাহিত্যিকদের মানসিক স্থৈর্য ও সাহিত্যনিষ্ঠা বজায় রাখা খুবই কঠিন ছিল। তাছাড়া জীবন-সংগ্রামের তীব্রতায় এ যুগে কবির জীবন অনেক বেশী আলোড়িত হয়েছিল। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তাঁর কর্মজীবন বড়ই ঘটনাবহুল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে তিনি সরকারী প্রচার বিভাগের কর্মচারী হিসেবে ১৯৪৪ সালে কলকাতা চলে যান, আবার দেশবিভাগের পর ১৯৪৭ সালে ঢাকায় আসেন। তারপর দীর্ঘ চৌদ্দ বছরেরও বেশী প্রচার বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে নানা উপলক্ষ্যে বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন, আন্তর্জাতিক লোকসাহিত্য সম্মেলনে নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। মোট কথা ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান থেকে ১৯৬১ সালে সরকারী প্রচার বিভাগের কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত দীর্ঘ চব্বিশ বছর কবির জীবন যেমনি কর্মবহুল ও ঘটনাময়, তাঁর পারিপার্শ্বিক দেশ ও কাল যেমন সমস্যা সংক্ষুব্ধ, কবির সৃষ্টিকর্মও সেই পরিমাণে অনেকটা দীপ্তিহীন।

অবশ্য এই পর্বে জীবনাভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য তাঁকে সাহিত্যকর্ম প্রকাশে কিছুটা বৈচিত্র্যাশ্রয়ী করে তুলছে তা ঠিক। পল্লীজীবন ও পল্লীসাহিত্যের প্রভাব তাঁর এ পর্বের রচনায় স্ব স্ব আধিপত্য বজায় রেখে চললেও কবি এ যুগে সম্পূর্ণ পল্লীনিষ্ঠ থাকতে পারেন নি। তিনি কোথাও আধুনিক কালের রোমান্টিক কবিদের ন্যায় কৃত্রিম ভাববিলাসিতার পরিচয় দিয়ে সৌন্দর্য ও প্রেমানুভূতির প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। আর তা করতে গিয়ে কাব্যের ভাষাকেও অনেকটা কৃত্রিম ও প্রসাধনকলাশ্রয়ী করে তুলেছেন। এ সব ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রানুসারী রোমান্টিক কবিদের সগোত্র এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অক্ষম

অনুকারীই বটে। তাঁর 'রূপবতী' (১৯৪৬) কাব্যটিতে তিনি নানাদেহের আঁধারে রূপের আরতী করতে চেয়েছেন—এবং চূড়ান্ত ভাব-বিলাসিতার পরিচয় দিয়েছেন। অথচ তেমন কোন সার্থক সৃষ্টি কলাকৌশলের পরিচয় রেখে যেতে পারেন নি। এ কাব্যের কিছু কিছু কবিতায় পল্লী পটভূমির উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও তা তেমন প্রাণবন্ত নয়। এ পর্বের আর একটি ব্যতিক্রমধর্মী কাব্য 'মাটির কান্না', (১৯৪৬)-এর অধিকাংশ কবিতার পটভূমি পল্লী নিঃসন্দেহে। বিশুদ্ধ নাগরিক পটভূমিতে রচিত কয়েকটি কবিতাও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই কবি আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসাবশে যুগ-মানবের যন্ত্রণা, বেদনা ও ভাবনার কিছুটা প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছেন। আমাদের আধুনিক জীবনের কিছু কিছু সমস্যার কথাও তিনি এ কাব্যে ব্যক্ত করেছেন। মাঝে মাঝে তাঁর স্বাভাবিক কবি-ক্ষমতার প্রকাশে কবিতায় কিছুটা মাধুর্যের সঞ্চার হলেও এ কাব্যে কবির নুতন ভাবনা সমূহ উপযুক্ত কলাসম্মত প্রকাশে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নি। পল্লীকাব্যের আঙ্গিকে আধুনিক যুগোচিত নুতন ভাবনার প্রকাশ কাব্যের দেহে একটা জোব্‌ড়া রঙের প্রলেপের মতই কেমন যেন বেমানান। বক্তব্যের নুতনত্বে যে প্রকাশকলার নতুনত্ব দাবি করে এ শৈল্পিক উপলব্ধি তাঁর ঘটে নি। যুগজীবনের জটিলতা ও কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার প্রভাবে তিনি কেমন যেন এক মানসিক সংকট অনুভব করেছেন। তিনি যেন শুধু পল্লীকাব্যের মধ্যেই নিজের সমস্ত প্রকাশকে সীমাবদ্ধ রাখা অসম্ভব বলে বুঝতে পেরেছিলেন। অথচ সে গণ্ডী অতিক্রমণের উপযুক্ত ক্ষমতা তাঁর আয়ত্ত হয় নি। এই জন্য লক্ষ্য করি তিনি একদিকে কাব্য ছাড়াও নাটক, রূপকথা, স্মৃতিকথা, উপন্যাস ইত্যাদি রচনায় উৎসাহী হয়েছেন, অথচ বিষয় নির্বাচনে, ভাষাভঙ্গিতে পল্লীজীবন ও পল্লীসাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রায় সর্বত্রই —যদিও বিষয় নির্বাচনে তিনি মাঝে মাঝে পল্লীর গণ্ডী অতিক্রমও করেছেন।

এ পর্বে কাব্য রচনায় জসীমউদ্‌দীন নতুন সুরে নতুন কথা বলার চেষ্টা করেও বিশেষ সফলকাম হন নি। তাই তো দেখি 'মাটির কান্না'র বহু পরে তিনি 'সকিনা', (১৯৫৯) ও অতি আধুনিক কালে অপ্রকাশিত 'মা যে জননী কান্দে', (১৯৬৪) কাব্যে পুরাতন কাহিনী কাব্যের অনুবর্তন করে স্বভাবের খাতেই ফিরে যাওয়ার চেষ্টা পেয়েছেন। 'সকিনা'তে যদি বা কিছুটা পেরেছেন, 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যে সে প্রয়াস মূলতঃ ব্যর্থ হয়েছে। কবির মনোধর্মে এমন একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যে, কবি ইচ্ছে করলেও আর সেই পুরাতন কাব্যের মাধুর্যের রাজ্যে ফিরে যেতে পারেন না, পথও খুঁজে পান নি। সে পথের অন্বেষায়ই বুঝি কবি শেষ পর্যন্ত আধুনিক উপন্যাসের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাই দেখি ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত 'বোবা কাহিনী', (১৯৬৪) নামক গ্রন্থ তিনি পল্লী-মানুষের দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনীকেই উপন্যাসের আধারে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। তাতে তিনি কতটা সার্থক হয়েছেন তা অবশ্য বিচার সাপেক্ষ, কিন্তু এ নতুন রচনাতেও এমন প্রমাণের অভাব নেই যে, জসীমউদ্‌দীন এখনও মূলতঃ গীতি-গাথার রাজ্যেই মানস-ভ্রমণে লিপ্ত আছেন, তাঁর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা সে রাজ্যের সীমান্ত পেরিয়ে আধুনিক জীবন ও চিন্তার রাজ্যে এখনও প্রবেশের অপেক্ষায় আছে। তারা এখন পুরাতন ও নতুনের সীমান্তেই ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তবু এ পর্বে জীবন-বৈচিত্র্যের প্রয়োজনেই জসীমউদ্‌দীন গদ্যে-পদ্যে বিচিত্র ধরনের রচনার আশ্রয় নিয়ে কিছুটা যুগ-সচেতন মনের পরিচয় দিয়েছেন, তা স্বীকার্য। আর তাতে কিছুটা সার্থকতার পরিচয়ও তিনি রাখতে পেরেছেন। বিশেষতঃ ১৯৫০ সালে রচিত 'পদ্মাপার' নামক গীতিনাট্য ও তার পরবর্তীকালে 'বেদের মেয়ে', (১৯৫১) 'মধুমালা', পল্লীবধূ', (১৯৫৬) প্রভৃতি লোকনাট্য রচনার মধ্য দিয়ে

জসীমউদ্‌দীন লোকসাহিত্য ভিত্তিক সাহিত্য-সাধনার যে নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেন, তা এই পর্বে শিল্পী হিসেবেই তাঁকে নতুন মর্যাদার অধিকারী করেছে। এ সব রচনার মাধ্যমে তিনি পল্লীর অশিক্ষিত মানুষের সাথে শহরবাসী শিক্ষিত ভদ্র সমাজের একটি হৃদয়ের যোগ স্থাপনে অনেকটা সার্থক হয়েছেন। যাঁরা জসীমউদ্‌দীনের কাব্য পাঠে তৃপ্তি পান না, তাঁরাও এ লোকনাট্যগুলোতে বর্ণিত জীবনদৃশ্যের সজীবতায় মুগ্ধ হন।

এ পর্বে কবির আর এক আত্মপ্রকাশ ঘটেছে শিশু কবিতা ও রূপকথা রচয়িতা হিসেবে। ইতিপূর্বে 'হাসু' নামক কাব্যগ্রন্থে শিশুমনোরঞ্জনের যে প্রয়াস দেখা গিয়েছিল, 'এক পয়সার বাঁশী'তে সে আগ্রহ আরও পরিস্ফুট হয়েছে। তাছাড়া 'ডালিম কুমার', 'বাঙালীর হাসির গল্প', ইত্যাদি বইয়ের গল্পগুলো শিশুমনোরঞ্জনে যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করেছে। এ সব রচনায় তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন ঢঙের গল্পকেই অবলম্বন করেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে নিজ কল্পনার প্রয়োগে গল্পকে কিছুটা নতুন রূপ দিয়েছেন, কোথাও বা প্রচলিত গল্পকে মার্জিত ভাষারূপ মাত্র দান করেছেন। এ সব রচনায় গল্প বলার সহজ ও অনায়াস ভঙিটিকে এমন আয়ত্ত করেছেন, যা অনায়াসেই শিশু-মনোহরণে সমর্থ হয়েছে। অনেক পরবর্তীকালে 'বাঙালীর হাসির গল্প' বইয়ের কিছু গল্প Folk Tales of Bangladesh" নামে অনূদিত হয়ে এদের জনপ্রিয়তা প্রতিপন্ন করেছে। অবশ্য এ সব রচনা মৌলিক সৃষ্টি নয়, তাই সৃষ্টিকর্ম হিসেবে এদের মহত্ত্বের কোন দাবি নেই। তবে জসীমউদ্‌দীনের লোকসাহিত্য প্রীতির নিদর্শন হিসেবে এগুলোরও কিছু মূল্য আছে। অন্ততঃ লোকসাহিত্যের উপকরণ কাজে লাগিয়ে এক্ষেত্রেও তিনি লোকরঞ্জনে কিছুটা সার্থক হয়েছেন স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই।

জসীমউদ্‌দীনের সাহিত্য-সাধনায় আরও কিছুটা নতুনত্ব এই পর্বে দেখা দিয়েছে জীবন-স্মৃতিচারণ ও ভ্রমণাভিজ্ঞতা বর্ণনার প্রচেষ্টা থেকে। তাঁর 'যাঁদের দেখেছি', (১৯৫২) 'চলে মুসাফির', (১৯৫৭) 'ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়', (১৯৬৮) ইত্যাদি রচনা এই জাতীয় প্রচেষ্টার ফল। সব গ্রন্থে জসীমউদ্‌দীন যথেষ্ট আবেগের সাথে সাদামাটা ভাষায় অন্তরের কথা বলেছেন। কোন নতুন গদ্যরীতি তিনি প্রবর্তন করেন নি হয়তো ; কিন্তু তাঁর যেমন খুশী তেমন করে বলে যাওয়া এ গদ্য আমাদের হৃদয়কে বেশ নাড়া দেয়। এ গদ্যে আমরা জসীমউদ্‌দীনের আত্মভোলা কবি-প্রকৃতির হৃদস্পন্দন স্পষ্ট শুনতে পাই। জসীমউদ্‌দীদের মানস প্রকৃতি যথার্থভাবে অনুধাবন করতে হলে এ গ্রন্থগুলোর সাথে পরিচয় অপরিহার্য। একটি অনুভূতিশীল হৃদয়ের স্পর্শে সঞ্জীবিত এ গদ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে দিয়ে সাদামাটা গ্রামের ছেলে জসীমউদ্‌দীনের আত্মভোলা প্রকৃতি ও দরদী মনের যে পরিচয়টি ফুটে উঠেছে তা অন্যত্র দুর্লভ। এমন করে নিজের হৃদয়কে আর কোথাও অনাবৃত করে দেন নি কবি। অন্যত্র তিনি লোকজীবন ও লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যের একনিষ্ঠ সাধক, এখানে তিনি অনন্য নির্ভর। একটি সংবেদনশীল মনেরই নানা ভাবনা ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে এসব রচনায়। এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আপন সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে, লোকসাহিত্য সম্পর্কে তিনি মাঝে মাঝে যে সব প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন, তাতে জসীমউদ্‌দীনের ব্যক্তিগত রুচি ও চিন্তাভাবনার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

জসীমউদ্‌দীনের জীবন তথা সাহিত্য-সাধনার অন্তিম পর্ব বলে চিহ্নিত করা যায় ১৯৬১ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর থেকে ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত সময়-সীমাকে। নানা ঘটনায় ও সমস্যায় সংক্ষুব্ধ এই কালেও কবির কাব্যসাধনা অব্যাহত ছিল সন্দেহ নেই। তবে স্বাভাবিক কারণেই এ পর্বের সাহিত্য-সাধনায় ক্লান্তির

ছাপ বড় স্পষ্ট। কাব্যে কোন নতুন খাত রচনার প্রায়স নেই, আছে পুরাতনের প্রায় অর্থহীন অনুভূতির ঝোঁক। এ পর্বে প্রকাশিত একমাত্র কাহিনী-কাব্য 'মা যে জননী কান্দে', (১৯৬৪) তে যেমন পুরাতন কাহিনী-কাব্যের অনুবর্তন চলেছে, তেমনি 'হলুদ বরণী', (১৯৬৬) 'জলের লেখন', (১৯৬৯) 'মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো', (১৯৭৬) ইত্যাদি খণ্ড কাব্যেও মুখ্যত পুরাতনের পুনরাবর্তন ঘটেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম, ভাষা ও রচনারীতির গতানুগতিকতা সত্ত্বেও, 'ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে', (১৯৭২) নামক খণ্ড কবিতার বইটি। এতে মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী দিনগুলোর বেশ কিছু বাস্তব আলেখ্য ধরা পড়েছে। এই পর্বে রচিত একমাত্র নাটক জাতীয় রচনা 'ওগো পুষ্পধনু', (১৯৬৮) নীরক্ত সৃষ্টি। যা কিছু সাফল্য এ পর্বে ঘটেছে উপন্যাস, স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনী জাতীয় গদ্য রচনায়। এগুলো 'বোবা কাহিনী',(১৯৬৪) 'জীবনকথা', (১৯৬৪) 'স্মৃতির পট', (১৯৭৮) 'হলদে পরীর দেশে', (১৯৫৪) 'যে দেশে মানুষ বড়', (১৯৬৮) ও 'জার্মানীর শহরে বন্দরে', (১৯৭৫)। এ গদ্য রচনাগুলো অন্তরঙ্গতার উত্তাপে আশ্চর্যরকম হৃদয়স্পর্শী। এই পর্বে জসীমউদ্‌দীনের আর দুটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল 'জারী গান', (১৯৬৮) এবং 'মুর্শীদা গান', (১৯৭৭) নামে দুই সুসম্পাদিত লোকগীতির সংকলনগ্রন্থ। সর্বশেষ এই পর্বের রচনার সংখ্যা থেকে এই সত্যই পরিস্ফুট হয় যে জসীমউদ্‌দীনের সাহিত্যিক সজীবতা তখনও অক্ষুন্ন ছিল। তিনি কাব্য সৃষ্টিতে নতুন কোন সার্থকতার পরিচয় না দিতে পারলেও, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কাব্যে ধারণ করার চেষ্টা করেছিলেন। এটা তাঁর মানসিক সজাগতার পরিচয়বাহী। তবে গদ্যরচনায় এ পর্বেও তাঁর বেশ কয়েকটি সাহিত্যকার্য নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর পরিচিতিকে অনেকটা বিস্তৃতি দান করেছে। এ প্রসঙ্গে আই. লাভলক ও বি. পেইন্টার অনূদিত 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ 'Gypsy wharf". (১৯৬৯) বি. পেইন্টার অনূদিত 'বাঙালীর হাসির গল্পে'র অনুবাদ "Folk Tales of Bangladesh"(১৯৭৪) এবং জনৈক লেখকের বাংলা ভাষায় অনূদিত 'মাটির কান্না' কাব্যের কথা উল্লেখ করা যায়। বস্তুতঃ জসীমউদ্‌দীন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সৃষ্টিকর্মে নিবেদিত থেকে আপন সাহিত্যিক সার্থকতার পথ অনুসন্ধান করেছেন। আমাদের ধারণা লোকজীবন ভিত্তিক কাব্যসাধনায়, লোকনাট্যে ও গদ্যরচনায় সে সার্থকতা তা তিনি অনেকখানিই খুঁজে পেয়েছিলেন।

জসীমউদ্‌দীনের সাহিত্যকর্ম ঃ রূপবৈচিত্র্য

জসীমউদ্‌দীনের সাহিত্য-সাধনার পথরেখা অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইতিপূর্বেই আমরা তাঁর বৈচিত্র্যান্বেষী মনের পরিচয় লাভ করেছি। মূলতঃ কবিকর্মী হয়েও তিনি নাটক, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী ও স্মৃতিকথা জাতীয় নানাবিধ গদ্যরচনায় যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। আবার কাব্য ক্ষেত্রে পল্লীপথিক হয়ে লোকগীতি-গাথার ঐতিহ্যকে পূর্ণমূল্য দিয়েও তিনি যুগোচিত জীবন-ভাবনার স্বীকৃতি দানে কুণ্ঠিত বোধ করেন নি। পল্লীজীবন ও প্রকৃতিকে কাব্যের উপজীব্য করেও তিনি পল্লীকবিদের আধুনিক অনুসারী মাত্র নন।

পল্লীজীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর চেতনা অনেকটাই আধুনিক রোমান্টিক কবির। তারপর গদ্য ও পদ্যে নানা আঙ্গিকের প্রয়োগ-নিরীক্ষায় এবং ভাষা ও ছন্দের পরিমার্জনায় তাঁর সদাজাগ্রত কৌতূহলেও আধুনিক মনের প্রক্ষেপ স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। পল্লী-পথচারী হয়েও তাঁর কাব্য তাই অনেকটাই বিচিত্রভঙ্গিম ; কালেভদ্রে শহরের রাজপথে গিয়ে উপস্থিত হলেও তা সম্পূর্ণ অপ্রতিভ হয় না, যদিচ যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করে।

জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে আধুনিক জটিল নাগরিক জীবনের তরঙ্গ দোলা মোটেই সঞ্চারিত হয় নি। তার গদ্য রচনায়ও আধুনিক জীবনচিন্তার জটিলতা অনুপস্থিত; অথচ বিস্ময়ের কথা এই যে, আধুনিক সাহিত্যের পাঠকদের একটা বড় অংশ আজও তাঁর কাব্য পাঠে তৃপ্তি লাভ করে। তাঁর গদ্যেও সহজ কথাকে সহজ নৈপুণ্যে প্রকাশ করার ক্ষমতা দেখে তাঁরা সাধুবাদ দিয়েছেন। মনে হয় পল্লী নিয়ে লিখেছেন বলে নয়, তাকে এক মহৎ শিল্পীর ন্যায় রসলোকের সামগ্রী করে তুলতে পেরেছিলেন বলেই জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের সমাদর ঘটেছে। বিষয় ও ভাবানুগ অপূর্ব ভাষাশৈলী এবং সংবেদনশীল কবি-হৃদয়ের স্পর্শে সঞ্জীবিত বলেই যে তাঁর কাব্য পাঠকচিত্তে ঢেউ তুলতে সমর্থ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া যে লোকজীবনের ঐতিহ্য জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় অনেকটা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে, বাংলাদেশের লোকসাহিত্যে যার ব্যাপক সমর্থন মিলে এবং আজও পল্লী-মানুষের জীবনে যার রূপকর্ম প্রত্যক্ষ করা যায়, একালের সংস্কৃতিমনা মানুষের কাছে তাঁর মূল্য কিছুতেই কম হতে পারে না। মনে রাখতে হবে যে জসীমউদ্‌দীন নানা আধারে সেই ঐতিহ্যের রসধারা আমাদের পরিবেশন করেছেন। তারপরও কথা থেকে যায়। জটিল বাস্তব জীবন -সমস্যায় বিব্রত, চিন্তা ক্লিষ্ট আধুনিক মানুষের কাছে যদি জসীমউদ্‌দীনের সহজ, অনাড়ম্বর অথচ হৃদয়স্পর্শী ভাষায় রচিত আশ্চর্যরূপে জটিলতা মুক্ত লোকজীবন ভাষ্যমূলক কাব্য-কাহিনী প্রীতিপ্রদ মনে হয়, তাতেও বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই।

মোট কথা, জসীমউদ্‌দীনের কাব্য শিল্পের দাবি ও কালের দাবি উভয়ই মেটাতে সমর্থ হয়েছিল বলেই আদরণীয় হয়েছে এরূপ সিদ্ধান্ত করলে অন্যায় হবে না। তবে একথা সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, জসীমউদ্‌দীনের শিল্পী হিসেবে যা কিছু সার্থকতা, তা এক সীমিত পরিমণ্ডলেই সম্ভব হয়েছে। তার বাইরে তিনি নিষ্প্রভ, প্রায়শঃই অসার্থক। আমাদের জীবনের পল্লীবৃত্তেই তিনি স্বচ্ছন্দ-বিহারী, নাগরিক পরিমণ্ডলে তিনি একেবারেই ম্রিয়মান। তাই লক্ষ্য করি, পল্লীবৃত্তে অবস্থান করে পল্লীরূপের অনুধ্যানেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন পরম তৃপ্তি, পরম আশ্বাস! যুগধর্মের প্রভাবে মাঝে মাঝে কক্ষচ্যুত হয়ে যখনই তিনি নাগরিক পরিমণ্ডলে উপস্থিত হয়েছেন, তখনই দেখি তিনি কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছেন। তাঁর ভিতরকার শিল্পীসত্তা কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের রচনার গভীরে দৃষ্টিপাত করলে এ সত্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সে যাই হোক, জসীমউদ্‌দীনের সাহিত্যকর্ম আপন সীমিত পরিমণ্ডলেও যে যথেষ্ট বৈচিত্র্যধর্মী, আর ঐ কারণেই যে তাঁর শিল্পসত্তা অনেকটা বিশিষ্ট তা স্বীকার করতে হয়। ভাবনার বৃত্তের সম্প্রসারণ না ঘটিয়েও প্রকাশকলায় বৈচিত্র্যাশ্রয়ী হয়ে তিনি আপন শিল্পীসত্তার সজীবতাই বার বার প্রতিপন্ন করেছেন। জসীমউদ্‌দীনের একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনা ও তাঁর সাহিত্যকর্মের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে তাই তাঁর বিচিত্র সৃষ্টিকর্মের সাথে আমাদের নিবিড় পরিচয়-সাধন প্রয়োজন। আর তার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মকে নিম্নরূপ কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে তার

রূপ-বৈচিত্র্য নির্দেশ করা যেতে পারে।

ক. **কাব্যঃ** [১] **খণ্ড কবিতা-গুচ্ছ ঃ** রাখালী, বালুচর, ধান খেত, রূপবতী, মাটির কান্না, হলুদ বরণী, জলের লিখন, ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে, মাগো জ্বালায়ে রাখিস্ আলো।

[২] **কাহিনী-কাব্য বা কাব্যোপন্যাসঃ** নক্সী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, সকিনা, মা যে জননী কান্দে।

[৩] **শিশু কবিতাঃ** হাসু, এক পয়সার বাঁশী।

[৪] **গীতি মঞ্জুষাঃ** রঙিলা নায়ের মাঝি, পদ্মাপার, (উত্তরাংশ) ও গাঙের পার।

[৫] **কাব্যানুবাদঃ** পদ্মা নদীর দেশে

খ. **নাটকঃ** বেদের মেয়ে, মধুমালা, পল্লীবধূ, পদ্মাপার (১ম অংশ), গ্রামের মায়া, ওগো পুষ্পধনু।

গ. **লোকগল্পের কথাকতা ঃ** ডালিম কুমার, বাঙালীর হাসির গল্প (১ম ও ২য় খণ্ড)।

ঘ. **স্মৃতিকথাঃ** যাঁদের দেখেছি, ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়, জীবনকথা, (১ম খণ্ড) স্মৃতির পট, স্মরণের সরণী বাহি।

ঙ. **ভ্রমণ কাহিনীঃ** চলে মুসাফির, হলদে পরীর দেশে, যে দেশে মানুষ বড়, জার্মানীর শহরে বন্দরে।

চ. **উপন্যাসঃ** বোবা কাহিনী।

ছ. **লোকগীতি সংগ্রহ ও সম্পাদনাঃ** জারীগান ও মুর্শীদাগান।

রচনার এ শ্রেণীবিন্যাস সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত হয়েছে এমন কথা অবশ্যই বলা যায় না। আর সে রূপ সূক্ষ্ম বিভাগের অসুবিধাও যথেষ্ট। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। যেমন ধরুন, আমরা 'রাখালী'কে খণ্ড-কবিতার সংকলন বলেছি, 'রঙিলা নায়ের মাঝি'কে গানের বই বলেছি, 'পদ্মাপার' বইটিকে একবার নাটক, আর একবার গানের বই বলে চিহ্নিত করেছি। সত্য বটে 'রাখালী'র অধিকাংশই খণ্ড-কবিতা; কিন্তু তাতে যে দু'চারটি পল্লীগীতিরও স্থান আছে তাতো অস্বীকার করতে পারি না। আবার 'রঙিলা নায়ের মাঝি' গানের বই বটে —তাতে কবির স্বরচিত গান যেমন আছে, তাঁর সংগৃহীত গানও তেমনি আছে। কেউ কেউ যদি একে 'পল্লীগীতি সংগ্রহ' বলে চিহ্নিত করেন, তবে তাঁকে দোষ দেওয়া চলে না। অথচ কবির স্বরচিত গানও যে আছে, তাও তো সত্য কথা। 'পদ্মাপার' বইটিতে একই সাথে পল্লীগীতিভিত্তিক একটি লোকনাট্য, কতগুলো স্বরচিত ও সংগৃহীত গানের সমাবেশ ঘটেছে। এ অবস্থায় একে শুধু 'নাটক' হিসেবে চিহ্নিত করলেও ঠিক হয় না, আবার গানের বই বললেও যথার্থ হয় না। সুখের বিষয়, এ ধরনের বিভ্রান্তির অবকাশ জসীমউদ্‌দীনের সাহিত্যকর্মে খুব বেশী নেই। জসীমউদ্‌দীনের সাহিত্যকর্মের উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ হলেও তার যৌক্তিকতা এবং উপযোগিতা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। এর থেকে আমরা তাঁর সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও প্রকাশ-বৈচিত্র্য সম্পর্কে অনেকটা জ্ঞান লাভে সমর্থ হই। এর গুণগত দিক সম্পর্কে না হোক, এর পরিমাণের দিকটা, বৈচিত্র্যের দিকটা সম্পর্কেও আমাদের একটা সুষ্ঠু ধারণা হয়। এটা কম লাভ নয়।

রচনার এ শ্রেণীবিন্যাস থেকে আর একটি জিনিস পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে জসীমউদ্‌দীন পল্লীকবিদের ন্যায় বাঁধাধরা পথের পথিক নন। পল্লীজীবন ও পল্লীপ্রকৃতি

তাঁর রচনার অবলম্বন হলেও সৃষ্টির প্রয়োজনে বারবার পল্লীগীতি -গাথার দ্বারস্থ হলেও জসীমউদদীন নিতান্ত পল্লীনির্ভর ছিলেন না—কাব্যের বিষয়েও নয়, প্রকাশকলায়ও নয়। যদিচ পল্লী তাঁর জীবন ও কাব্যের এক নিয়ামক শক্তি, তিনি ক্ষেত্রবিশেষে পরিবেশ—নিরপেক্ষভাবে আধুনিক রোমান্টিক কবির ন্যায় নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রেম-সৌন্দর্যমূলক ভাবানুভূতি প্রকাশ করেছেন, কোথাও বা যুগমানবের সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতাও দেখিয়েছেন। তাঁর 'বালুচর', 'রূপবতী', 'মাটির কান্না', কাব্যের অনেক কবিতায় তার প্রমাণ মিলবে। প্রকাশ-কৌশলেও তিনি পল্লীকবিদের ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছেন। পল্লীকবিরা গান রচনা করে অথবা গাথার আকারে নিজেদের ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। জসীমউদদীন আধুনিক কবির ন্যায় খণ্ড-কবিতায় এক একটি চিত্র এঁকেছেন, ভাবনার প্রকাশ করেছেন, আবার গাথার অনুসরণে কাহিনী-কাব্য রচনা করে তাঁর মধ্যে উপন্যাসের ধর্ম সঞ্চার করেছেন। শুধু কি তাই, তিনি লোকজীবন থেকে উপাদান নিয়ে 'লোকনাট্য' লিখিছেন; উপন্যাসও লিখেছেন গদ্যরীতির আশ্রয়ে। আবার স্মৃতিকথা লিখে আধুনিক মানুষের ন্যায় নিতান্ত ব্যক্তিক কামনা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতারই প্রকাশ ঘটালেন রচনায়। তিনিই আবার কোথাও পল্লী-প্রচলিত গল্প আমাদের সরল গদ্যে কথার মতো সহজ করে বলেছেন; শিশুদের জন্যে ছড়া কেটেছেন। তদুপরি লোকসংস্কৃতির একজন আধুনিক গবেষকের ন্যায় তিনি পল্লী থেকে সংগৃহীত লোকসাহিত্যের সম্পদকে নিজস্ব বক্তব্যসহ সভ্য সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। পল্লীকবির চিন্তার এ বিচিত্র পথ কোনোদিনই ধরা দেয় নি। তাছাড়া পল্লীকবিদের কাছে ঋণ সত্ত্বেও জসীমউদদীনের কাব্যের ভাব, ভাষা , ছন্দ বিশিষ্ট শিল্পরসনিষিক্ত বলে সম্পূর্ণ অভিনব। ভাষার এমন পরিমার্জন ও স্বভাবের রাজ্য থেকে সতেজ উপমা সৃষ্টির ক্ষমতা পল্লীকবিদের কাছে আশাই করা যায় না।

মোট কথা এ শ্রেণীবিভাগ জসীমউদদীনের সত্যিকার শিল্প পরিচয়টিকেই আমাদের সামনে তুলে ধরতে যথেষ্ট সাহায্য করে। তিনি সাহিত্যে পল্লীজীবন ও প্রকৃতির কারবারী হয়ে, পল্লীগীতি-গাথার পুরাতন অথচ সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে মূলধন হিসেবে খাটিয়েও আপন বিশিষ্ট সৃষ্টি-ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখে যেতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি পল্লীকবিদের অঙ্কিত চিত্রেই নতুন রং সংযোগ করে ক্ষান্ত হয় নি, অথবা তাঁদের কণ্ঠে সুর মিলিয়েই থেমে যান নি। তিনি পল্লীকবিদের থেকে সৃষ্টির সংকেত গ্রহণ করেছেন বটে; কিন্তু আপন উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগে প্রায় সম্পূর্ণ নতুন জিনিস সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় দীক্ষিত খাঁটি কবিত্বশক্তির অধিকারী শিল্পীর হাতে পড়লে পল্লীজীবন -ভিত্তিক সাহিত্যকর্মও যে বিচিত্র ঐশ্বর্যময় হতে পারে, জসীমউদদীন আমাদের যেন তাই দেখিয়েছেন। মৃতপ্রায় পল্লীসাহিত্যের পুনরুজ্জীন শুধু নয়, তার নতুন মহিমান্বিত প্রকাশ ঘটেছে জসীমউদদীনের রচনায়; অথচ তা করতে গিয়ে তিনি কালধর্ম বিস্মৃত হয়েছেন, এমন কথা বলা যায় না। পল্লীজীবন ও প্রকৃতিকে তিনি তাঁর প্রায় সকল শিল্পকর্মের উপজীব্য করেছেন; অথচ তা আশ্চর্যরূপে গ্রাম্যতামুক্ত। বাংলা কাব্যে পল্লী আর কোনোকালেই এমন শিল্পমহিমা লাভ করে নি। পল্লীকে শিল্পমহিমা দান করতে গিয়ে জসীমউদদীন তাঁর রচনার ভাষায়, ভাববিন্যাসে, ঘটনার উপস্থাপনায় আধুনিক রুচির মর্যাদা অনেকটাই রক্ষা করে চলেছেন। তাঁর আধুনিক মনকেই ক্রিয়াশীল দেখি কবিতায়, ব্যক্তিগত প্রেম-ভাবনা ও সৌন্দর্য-তৃষ্ণা প্রকাশে, অথবা কবিতায়, লোকনাট্যে ও উপন্যাসে সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনার রূপায়ণ প্রচেষ্টায় অথবা জীবন-স্মৃতি রোমন্থনে।

জসীমউদদীনের বিচিত্র সাহিত্যিক প্রয়াসের গুরুত্ব যথাযথ অনুধাবন করতে হলে তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মের বিচার ও বিশ্লেষণ তাই অনেকটা অপরিহার্য। পল্লীপথিক যে বিশ্বপথিকও হতে পারেন জসীমউদদীনের সমগ্র সাহিত্যকর্ম তারই আভাসে সমৃদ্ধ। তাই তো দেখি পল্লী নিয়ে কাব্য লিখেও তিনি নাগরিক মানুষের প্রাণে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছেন, বাংলাদেশের পল্লীর দিকে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে পেরেছেন।

জসীমউদ্‌দীনের কাব্য-পরিক্রমা

জসীমউদ্‌দীনের প্রধান পরিচয়, তিনি কবি। আর সেই কবি-পরিচয়ও তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষণে বিশেষিত। আধুনিক যুগে জীবনের ন্যায় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নাগরিকতার সর্বাত্মক প্রভাবের দিনে, তিনি মুখ্যতঃ পল্লীনিষ্ঠ কাব্য রচনা করে, বাঙলা সাহিত্যে 'পল্লীকবি' হিসেবে অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। তিনি তাঁর কাব্যে পূর্ব বাংলার প্রাণকেন্দ্র পল্লীগুলোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীবনধারার আশ্চর্য সুন্দর আলেখ্য অঙ্কন করে অসাধারণ কবিখ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। তাঁর কাব্যে পল্লী-মানুষের প্রাত্যহিক জীবনচর্চার বাস্তব চিত্র যেমন অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি তাঁদের ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনার কথাও সুর লাভ করেছে। তরলে-শ্যামলে ঢেউ খেলানো বঙ্গ-প্রকৃতির রূপ মাধুরীকে তিনি কোনোদিনই ভুলতে পারেন নি। মুগ্ধ-হৃদয় ভক্তের মতো সে রূপের আরতি করেছেন সারা জীবন। পূর্ববাংলার মূক পল্লী-প্রকৃতি ও তার ক্রোড়ের সন্তান পল্লী-নরনারী যুগ-যুগান্তের সঙ্কোচ কাটিয়ে যেন মুখর হয়ে উঠেছে জসীমউদদীনের কাব্যে। পূর্ববঙ্গ গীতিকা,মৈমনসিংহ গীতিকা ইত্যাদিতে আমরা পল্লীপ্রকৃতির অনাবিল রূপকে কতকটা প্রত্যক্ষ করেছি সত্য, পল্লী-নরনারীর হৃদয়াবেগের আশ্চর্য অকুণ্ঠ প্রকাশও লক্ষ্য করেছি। পল্লী-স্বভাবের ভাষায় সৃষ্ট সে সব কাব্যে হৃদয়ের ঐশ্বর্যের অভাব না ঘটলেও সব সময় উপযুক্ত শিল্প-সুষমা সঞ্চারিত হয় নি। অশিক্ষিত পল্লীকবিদের কাছ থেকে তা আশা করিই বা কি প্রকারে? আর শিক্ষিত সমাজ তো প্রায় সকল যুগেই পল্লীকে অনেকটা করুণার চোখে দেখে এসেছেন। পল্লীর দৈন্যের ছবি তাঁদের মনে করুণার উদ্রেক করলেও, তেমন রেখাপাত করে নি কোন কালেই। কাজেই পল্লীজীবন ও প্রকৃতি নিয়ে শিল্পসৃষ্টির তেমন কোন প্রয়াস শিক্ষিত সমাজে দেখা যায় না। অথচ পল্লীর অন্তরে ঐশ্বর্যের অভাব তো কোন কালে ঘটে নি। শুধু তাকে জানবার ও বুঝবার মনেরই অভাব ঘটেছে চিরটা কাল।

জসীমউদ্‌দীন এসেছিলেন সেই মন নিয়ে। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় পুষ্ট সে মন! নুতন কালের নাগরিক মানুষের সামনে তিনি উপস্থিত করলেন পল্লীকে নতুন সাজে সাজিয়ে। অসামান্য মাধুর্যের সন্ধান পেল নতুন কালের মানুষ তাঁর অঙ্কিত পল্লীচিত্রে— কত সাধারণ সে দৃশ্য, অথচ কত সজীব, কত সুন্দর! অমার্জিত স্বভাব পল্লীর নরনারীর জীবনে স্নেহ-প্রেমের যে মৃত্যুঞ্জয় রূপ কবি অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমাদের দেখিয়ে দিলেন, সে শুধু সবাইকে বিস্মিত করে নি, আকর্ষণও করেছে। আমাদের আশেপাশে উপেক্ষার অন্ধকারে এরা লুকিয়ে ছিল। একটু সহানুভূতির পরশ পেতেই সকল হৃদয় -ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়ে

আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। এ একটা রীতিমত নতুন অভিজ্ঞতা। বাঙলাদেশের শিক্ষিত সমাজ তথা নাগরিক মানসকে একটা বড় রকমের নাড়া দিয়েছিলেন জসীমউদ্‌দীন এ অবহেলিত জীবননাট্যের দৃশ্য উন্মোচিত করে।

মানুষের মনের তারে ঘা দিতে পারলে মানুষ যে কত সহজে অপরিচিত আপাত তুচ্ছ, অবজ্ঞাত জিনিসকেও বরণ করে নিতে পারে, জসীমউদ্‌দীনের পল্লীনিষ্ঠ কাব্য-সাধনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর কাব্যের মাধ্যমেই শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি পল্লীপ্রকৃতি ও জীবন-মাধুর্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, এমন এক কালে যখন পল্লীর ভূমিকা আমাদের জীবনে একেবারেই গৌণ হয়ে এসেছিল; শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি যখন শহরের ঐশ্বর্য-বিলাসের দিকে নিবদ্ধ, জীবনে যখন শহরেরই একাধিপত্য। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে জসীমউদ্‌দীনের কাব্যসাধনা তাই একটা ঐতিহাসিক মূল্য বহন করে। জসীমউদ্‌দীনের কাব্য পাঠ ব্যতীত বাংলা কাব্যের ইতিহাসের সাথে আমাদের পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য। অথচ জসীমউদ্‌দীনের কাব্যসাধনা সম্পর্কে তেমন কোন বিশেষ আগ্রহ আজ আর শিক্ষিত সমাজে দেখা যায় না। দুঃখজনক হলেও এটা স্বীকার করতেই হয় জসীমউদ্‌দীনের কবিখ্যাতি ইতিমধ্যেই অনেকটা শ্রুতিনির্ভর হয়ে পড়েছে। আজ আর বড় কেউ আগ্রহ ভরে তাঁর কাব্য পড়েন না— পড়ার গরজ বোধ করেন না। হয়তো কাল বদলেছে, সাথে সাথে বদলেছে মানুষের মর্জি। তবু একজন শক্তিমান শিল্পীর রচনার প্রতি আমাদের এ ঔদাস্য কোনমতেই সমর্থন যোগ্য নয়। এ ঔদাস্য শিল্প-সাহিত্যের কথা জাতীয় মানসের অপমৃত্যুরই ইঙ্গিত বহন করে। এ মানসিক বন্ধ্যাকে কোন রকমেই প্রশ্রয় দেওয়া সাজে না।

এমনিতেই আমাদের সাহিত্যে সার্থক সৃষ্টির পুঁজি অল্প। তা জেনেও যদি আমরা জসীমউদ্‌দীনের মতো একজন খাঁটি কবির কবি-কর্মের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাই, তাহলে আমাদের সাহিত্যিক দৈন্য কোনদিনই ঘুচবে না। আমাদের আগামী দিনের সাহিত্যিক সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করেই সাহিত্যিক অগ্রপথিকদের রচনার সাথে সম্যক পরিচয় সাধন প্রয়োজন। এ পরিচয় আমাদের রসচেতনাকে পুষ্ট করবে, আমাদের সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভরসা দিবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে আধুনিককালে বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যিক দৈন্য ঘোচাতেই নজরুল ইসলামের মতোই জাতির মনে সাহিত্যিক প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলে আবির্ভূত হয়েছিলেন জসীমউদ্‌দীন । তিনি তাঁর পল্লীনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনার মাধ্যমেই বাঙালীকে 'ঘরের ছেলের চোখে বিশ্বভূপের ছায়া' দেখিয়ে আত্মস্থ হতে অনেকটা সাহায্য করেছিলেন সেদিন। দুঃখের বিষয় বাংলা কাব্যে তাঁর কাব্যসাধনার যথার্থ উত্তরণ ঘটে নি। উপযুক্ত উত্তর-সাধকের অভাবে সাহিত্যের এ নূতন দিগন্তে ফসলের প্রাচুর্য আর দেখা দেয় নি। জসীমউদ্‌দীন নিজেও কতদূর অগ্রসর হয়েই থেমে গিয়েছেন, 'আবেগের ক্ষেত্রে নব-নব রাজ্য জয় করে' অগ্রসর হতে পারেন নি। সাহিত্যে নবদিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যসাধনা পুনরাবৃত্তির একঘেয়েমিতেই পর্যবসিত হয়েছে। অথচ বৃহত্তর বঙ্গ-প্রকৃতি ও জন-জীবনের যে বিপুল ঐশ্বর্য বাঙলার সহস্র সহস্র পল্লীতে ছড়িয়ে রয়েছে, তার চাবিকাঠিটি আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের হাতে তুলে দিয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের জীবন -মুক্তির যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা তিনি বয়ে এনে দিয়েছিলেন, তার গুরুত্ব অস্বীকার করবে কে?

জসীমউদ্‌দীনের কবি-কর্মের বিচার ও বিশ্লেষণ আমাদের বাঙলা কাব্যের জীবন-মুক্তির এ অভিনব প্রয়াসকে বুঝতে সাহায্য করবে, একথা স্মরণ করেই আমরা জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা যেতে পারে যে,

জসীমউদ্দীনের পল্লীনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনা শুধু কাব্যের খাতেই প্রবাহিত হয় নি—লোকনাট্য, লোকগল্প, উপন্যাস ইত্যাদির মধ্যেও নিজের প্রকাশ খুঁজেছে। তবে কাব্যসাধনাই যে জসীমউদ্দীনের জীবন-সাধনা তা নিশ্চিত করেই বলা চলে। আমরা প্রথমে তাঁর কাব্যে এবং পরে পর্যায়ক্রমে তাঁর অন্যবিধ রচনার সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করব।

রাখালী

'রাখালী' জসীমউদ্দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। পাঁচটি গ্রাম্যগান (স্বরচিত) সহ মোট আঠারটি কবিতার সংকলন 'রাখালী'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। কবি-বন্ধু আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন ঢাকা থেকে গ্রন্থটি প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছিলেন। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার সংকলন ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে এবং 'কল্লোল' সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাস প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়ে প্রকাশককে সাহায্য করেছিলেন।

'রাখালী' কবির প্রথম কবিতা সংকলন হলেও তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। কবির বহুখ্যাত 'কবর', ও পল্লীজননীর মতো আশ্চর্য জীবন-ঘনিষ্ঠ রসঘন কবিতা এ কাব্যে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া পরবর্তীকালে পল্লীগীতি রচনায় জসীমউদ্দীন যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার সার্থক সূচনা এ কাব্যে সংকলিত কয়েকটি গানেই হয়েছে। শুধু কি তাই? পল্লী-নরনারীর জীবন-মন্থন করে যে আশ্চর্য মহিমময় প্রেমচিত্র অঙ্কনের ক্ষমতা তিনি পরবর্তীকালে 'নকসী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', ইত্যাদিতে দেখিয়েছেন তারও আভাস বহন করে এনেছিল 'রাখালী'র নাম কবিতা রাখালী। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে জসীমউদ্দীন লোকনাট্য রচনায় সে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন রাখালীর মেয়েলি গানের সুরে রচিত "সিঁদুরের বেসাতি" নামে সাঙ্গীতিক প্রেমচিত্রেই তা প্রথম আভাসিত হয়েছিল। মোট কথা জসীমউদ্দীনের পরবর্তী সাহিত্যিক সার্থকতার যথার্থ পূর্ব-সূচনা রাখালীতেই হয়েছিল।

'রাখালী'র সকল কবিতাই জসীমউদ্দীনের ছাত্রাবস্থায় রচিত। তিনি তখন সবে স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছেন। এর কিছু কাল আগে থেকেই তিনি গ্রাম্যগান সংগ্রহ করছিলেন এবং গ্রাম্য-জীবন নিয়ে কিছু কিছু কবিতাও লিখেছিলেন। কিন্তু সে সব কবিতা সাহিত্যিক মহলে তেমন স্বীকৃতি পাচ্ছিল না। এ সম্পর্কে জীবন-স্মৃতিমূলক রচনা 'যাঁদের দেখেছি'-তে তিনি অকপটে সকল কথা ব্যক্ত করেছেন। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে যে সকল কবিতা তিনি লিখেছিলেন, তা অনেক মাসিক পত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল; কিন্তু পল্লীর কথা নিয়ে মেঠো সুরে কথা বলতে গিয়েই তিনি বাধা পেলেন। হতাশাগ্রস্ত কবি আশ্বাসের ভরসায় ছুটে গিয়েছিলেন নজরুল সন্নিধানে। কিন্তু যে কারণেই হোক তাঁর কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে যখন অসহায়ের মতো কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন অপ্রত্যাশিত ভাবেই ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র আনুকূল্যে লোকসাহিত্য-প্রেমিক দীনেশচন্দ্র সেনের সাথে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। এ সাক্ষাৎকার ছিল তাঁর ভাবী সৌভাগ্যেরই যেন বিদ্যুৎচমক। দীনেশচন্দ্র প্রথমে তাঁর কাব্যরচনার প্রতি তেমন কোন আগ্রহ না দেখালেও, কল্লোলের পৃষ্ঠায় 'কবর' কবিতাটি প্রকাশিত হলে, তাঁর রচনার একেবারে মুগ্ধ পাঠক হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তরুণ কবিকে সাধুবাদ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, তাঁকে সুধী সমাজের সামনে দাঁড় করার জন্য করণীয় সব কিছুই করেছিলেন। প্রসঙ্গান্তরে সে সব কথা বলা হয়েছে, তাই তার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন দেখছি না।

'কবর' কবিতা প্রকাশের পর থেকে বছর দুই ধরে কল্লোলের পৃষ্ঠায় জসীমউদদীনের আরও পাঁচটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। কল্লোলে প্রকাশিত ছয়টি এবং 'নওরোজ' 'লাঙল', 'শান্তি', 'প্রবাসী', ইত্যাদি পত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত গুটি কয়েক কবিতা ও গান সংকলিত হয়েই পরে এই 'রাখালী' কাব্য প্রকাশিত হয়।

আমরা লক্ষ্য করেছি 'রাখালী' পুস্তকাকারে প্রকাশের আগেই এর কোন কোন কবিতা দীনেশচন্দ্রের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল। শুধু দীনেশচন্দ্রেরই নয়, আরও কিছু কিছু সুধী ও রসিক ব্যক্তির দৃষ্টিও যে জসীমউদীনের কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, তারও প্রমাণ মেলে। এ প্রসঙ্গে ১৩৩৬ সালের ১ লা পৌষ কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কলিকাতাস্থ বাসভবনে অনুষ্ঠিত 'সম্মেলনী'তে জসীমউদদীন সম্পর্কে কবি-সমালোচক কালিদাস রায় যা বলেছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেনঃ "নবীন কবিদের মধ্যে এই কবির রচনা কিছুকাল হইতে লক্ষ্য করিতেছি। ইহার সম্বন্ধে সুহৃদবর ডক্টর সুনীতিকুমারের সহিত সেদিন আলোচনা হইতেছিল। সুনীতিও আমাকে ইহার রচনাগুলি লক্ষ্য করিতে বলিতেছিল। গত দুই বৎসর কল্লোল পত্রিকায় শ্রীমানের যে কবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি পড়িয়াছিলাম। তাহাতে শ্রীমানের অঙ্কুরিত কবিশক্তির পরিচয় পাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি।"

রাখালী কাব্যাকারে প্রকাশের আগে থেকে যে এর কবিতাগুলো সুধীজনের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল, এর চেয়ে তার আর বড় প্রমাণ কি হতে পারে? ঐ একই প্রসঙ্গে কালিদাস রায় মহাশয় রাঢ়ের কবি কুমুদরঞ্জনের সাথে জসীমউদদীনের তুলনা টেনে জসীমউদদীনের রচনার অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।[১] একজন তরুণ কবির প্রতিভার এমন সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। 'রাখালী'র তরুণ কবির উচ্চাঙ্গের শিল্প-সৃষ্টির সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করে কালিদাস রায় বলেছিলেনঃ 'জসীমউদদীনের কবিতার ভাষা তাহার আখ্যানবস্তু ও তাহার আবহাওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী। বাঙালীর নিজস্ব স্বাভাবিক ভাষাতেই কবিতাগুলি লিখিত। জসীমউদদীন কবিতার মধ্যে এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহা আমাদের সুপরিচিত নয় বলিয়াই ভয়ে ভয়ে শ্রীমান সেগুলিকে ত্যাগ না করিয়া ভালই করিয়াছেন। কবি শব্দগুলিকে জোর করিয়া ভাষার বৈচিত্র -সৃষ্টির জন্যই প্রয়োগ করেন নাই। ঐ শব্দগুলি ব্যবহার না করিলে রচনার স্বাভাবিকতা নষ্ট হইয়া যায়, রস-ব্যাঘাত ঘটে। বেশ তো! উহাতে আমাদের শব্দ সম্পদ বাড়িল—লাভই হইল।" এমনি প্রশংসার শিরোপা মস্তকে ধারণ করে জসীমউদদীনের প্রথম কাব্য 'রাখালীর' আবির্ভাব! এ এক দুর্লভ সৌভাগ্য!

বস্তুরঃ 'রাখালী' জসীমউদদীনের প্রথম কবিতার বই হলেও পরিণত সৃষ্টি-সম্ভারে সমৃদ্ধ। এ প্রথম কাব্যে জসীমউদদীন যে শিল্প-সার্থকতার অধিকারী হয়েছেন, পরবর্তী 'নকসী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ছাড়া আর কোথাও তিনি অতটা সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। এরপর তিনি কতকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছেন। অবশ্য কিছু কিছু সার্থক কাব্যপংক্তি বা কাব্যাংশ সৃষ্টিতে অন্যত্রও তিনি আপন সহজ কবি- ক্ষমতার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। তবু এটা স্পষ্ট যে, রচনার পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে তাতে আনুপাতিক উৎকর্ষ দেখা দেয় নি। তিনি নিয়েছেন প্রচুর— কিন্তু কাব্যের আখ্যানভাগ

---

১. কুমুদরঞ্জন ও জসীমউদদীনের প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনার জন্যে 'জসীমউদদীন ও পল্লীতীর্থের-পথিক কবিবৃন্দ' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

গঠনে, ভাববস্তু চয়নে, ভাষার ও আবহ সৃষ্টিতে প্রথম দিককার রচনার সে যাদু আর দেখা দেয় নি। কবি যেন এক অপূর্ব ভাবাবেশে স্বপ্নলব্ধ সুন্দর কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথা কয়েকটি উজ্জ্বল কবিতা ও কাহিনী-কাব্যের আকারে পরিবেশন করে, হঠাৎ স্বপ্নভঙ্গে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। চেষ্টা করেও যেন তিনি আর সে রাজ্যে ফিরে যেতে পারেন নি। তারপর থেকে সে স্বপ্নের দুরায়ত-স্মৃতিই যেন তাঁকে চালনা করেছে। তাই তাঁর প্রাথমিক রচনার সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য পরবর্তী রচনায় তেমন আর দেখা গেল না, যদিও সৌন্দর্য, সজীবতা ও মাধুর্য ফিরে পাবার জন্যে কবির আগ্রহ সারাজীবনই সমান প্রবল ছিল।

'রাখালী'র কবি ছিলেন তরুণ—চোখে ছিল তাঁর রঙীন স্বপ্নাবেশ, হৃদয়ে ভাবালুতাও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু দৃষ্টিতে তাঁর কোন আবিলতা ছিল না। এ কথা সত্য 'রাখালী'র সকল কবিতায়ই একটি অনুভূতিপ্রবণ, ভাব-বিধুর কিশোর মনের স্পর্শ পাওয়া যায়; তাই বলে সে মনের অধিকারী বাস্তববিমুখ নয়, রীতিমতো বাস্তবনিষ্ঠ। কোন কোন কবিতায় তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার তীক্ষ্ণতা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। রাখালীতে তিনি শুধু ভাববিহ্বল চিত্তে প্রেমের গুঞ্জরণই করেন নি, তিনি আমাদের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছেন পল্লীপথে। পল্লীপ্রকৃতির স্নিগ্ধ শ্যামল রূপের দিকে যেমন আমাদের চোখ ফেরাতে আহ্বান জানিয়েছেন, তেমনি আমাদের শ্বাসরোধকারী জীবন-বাস্তবের সম্মুখীন করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। রাখালিয়া গীতি সুরে পল্লীনর-নারীর হৃদয়াবেগের উৎসার যেমন ঘটিয়েছেন, আবার শিল্পীর নিরাসক্ত দৃষ্টি দিয়ে জীবন-বাস্তবের ছবিও একের পর এক এঁকে গিয়েছেন। সে ছবিগুলো যেমন জীবননিষ্ঠ তেমনি প্রাণবন্ত। রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনায় বিভোর থেকেও, 'তরুণ কবি' জীবনের রূঢ়তাকে বিস্মৃত হন নি। তাই তো 'পুষ্পে কীট সম' জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্যের পাশেই দুঃখ-মৃত্যুর মুখব্যাদান লক্ষ্য করে কবি ব্যথিত এবং মর্মাহত; প্রেমের মিলন-শিয়রে বিরহের ছায়াপাত লক্ষ্য করে সচকিত; স্নেহ-ভালবাসার অকাল মৃত্যুতে কারুণ্যে দ্রবীভূত। এক সর্বাত্মক দুঃখবোধ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। রোমান্টিক স্বপ্নাবেশ তিনি প্রেম ও সৌন্দর্যের অবগ্যায় বিহার করেন; কিন্তু স্বপ্নাবেশ যখন রূঢ় বাস্তবের সংঘাতে মাঝে-মাঝে কেটে যায়, তখন বাস্তবের সম্মুখীন হতেও কুণ্ঠিত হন না। জীবনের আনন্দ-বেদনা দুইয়েরই স্বীকৃতি রয়েছে তাঁর কাব্যে। তবুও জসীমউদ্‌দীন মূলতঃ বেদনারই কবি। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন জীবনে আনন্দের চেয়ে দুঃখই অধিকতর সত্য— দুঃখের অগ্নিদাহেই নিয়ত চলছে সংসার-পথিক নর-নারীর পরীক্ষা। এ দুঃখ সর্বাতিশায়ী। এ দুঃখেরই রূপকার জসীমউদ্‌দীন। রাখালীতে তিনি এ দুঃখেরই হৃদয়স্তম্ভনকারী চিত্র এঁকেছেন অনেক কবিতায়। পরবর্তী 'নকসী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', ও আরও পরে 'সকিনা', এমন কি 'মা যে জননী কান্দে', নামে সর্বশেষ প্রকাশিত কাহিনী-কাব্যেও তিনি দুঃখেরই ছবি এঁকেছেন নিপুণ শিল্পীর ন্যায়। তাই বলে জীবন সম্পর্কে কোনরূপ নৈরাশ্য কোনদিনই তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে নি। সর্বব্যাপী দুঃখকে সত্য ও নিশ্চিত জেনেও তিনি জীবনকে ভালবাসতে শিখেছেন। এ বোধই তো মহৎ শিল্পীর জীবনবোধ। বিস্ময়ের কথা, প্রথম কাব্যেই জসীমউদ্‌দীন এ উন্নত জীবনবোধের পরিচয় রেখে যেতে পেরেছেন। 'রাখালী' তাই কবির প্রথম কাব্য-সৃষ্টি হলেও বিশিষ্ট কবি-কর্ম হিসেবে গণ্য।

'রাখালী'র মোট আঠারটি কবিতার মধ্যে পাঁচটি হচ্ছে রাখালিয়া ভাষাতে রচিত গান। কবি-সমালোচক কালিদাস রায় 'রাখালিয়া ভাষাতে রচিত' এই গানগুলোই বেশী পছন্দ

করেছেন। কিন্তু 'রাখালী'র শ্রেষ্ঠ সম্পদ বোধহয় এর 'রাখালী', 'কবর', 'পল্লীজননী', 'রাখাল ছেলে',—বিশেষতঃ 'কবর' ও 'পল্লীজননী'র মতো আশ্চর্য জীবননিষ্ঠ কবিতা। সে কথায় পরে আসছি। কবি কালিদাস রায় যে গানগুলোকে 'রাখালীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনে করেছেন তাদের কাব্য-মূল্যও অবশ্য যথেষ্ট। গানের দেশ বাঙলাদেশে কত বছর ধরে কত সহস্র ভাবুকপ্রাণই না গানের সুরে আপন প্রাণের বেদনা নিবেদন করে আসছে। এ গানে বাঙলার অন্তরাত্মা যেমন সাড়া দিয়েছে আর কিছুতে এমন নয়। জসীমউদ্‌দীনও সেই সহস্র কণ্ঠে আপন কণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছেন সহজাত নৈপুণ্যে। রাখালিয়া ভাষায় রচিত তাঁর গানগুলোতে পল্লীনর-নারীর প্রেম-ভালবাসা, বিরহ-মিলন, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার বিচিত্র অনুভূতি ভাষা পেয়েছে। এ গানগুলোর ভাষাভঙি পল্লী-নারীদের সামাজিক অবস্থান, পরিবেশ ও চরিত্রধর্মের সাথে বিশেষরূপে সঙ্গতিপূর্ণ। পল্লীগীতির মূল স্বভাবের স্বীকৃতি থাকায় ভাষার কিঞ্চিৎ পরিমার্জন সত্ত্বেও তাঁর গানগুলো পুরাতন পল্লীগীতির সাথে আপন সাধর্ম্য খুঁজে পেয়েছে। শুধু তাই নয়, জসীমউদ্‌দীনের খাঁটি কবি-মনের স্পর্শ পেয়ে গানগুলোর কাব্যমাধুর্য অনেকটা বেড়েছে এবং সেগুলো শিক্ষিত রুচিরও তৃপ্তি বিধানে সমর্থ হয়েছে। স্বভাবের ভাষায় রচিত এ গানগুলোর মধ্যে পল্লীনর-নারীর অকৃত্রিম প্রাণের পরিচয় বিবৃত বলেই বোধহয়, কবি কালিদাস রায় এ গুলোকে বেশী পছন্দ করেছেন। জসীমউদ্‌দীন গ্রাম্যগীতির সুরকে প্রায় অবিকৃত রেখেই এ গানগুলো রচনা করেছেন। গ্রাম্য মেয়েলি গানের সুর, বারমাসির সুর, বন্ধের গানের সুর, ঘাটুগানের সুর, ভাটিয়াল সুর অবলম্বনে যথাক্রমে তিনি 'সিঁদুরে বেসাতি', বৈদেশী বন্ধু', 'সুজন বন্ধুরে' 'মনই যদি নিবি', 'গহীন গাঙের নাইয়া' গান পাঁচটি রচনা করেছেন। এসব গান রচনার সুর, ছন্দ, ভাষা ও বিষয়বস্তু অনেক কিছু ব্যাপারেই জসীমউদ্‌দীন পল্লীগীতির রচয়িতাদের কাছে ঋণী সন্দেহ নেই। তবে তিনি শুধু মূলধন ভাঙ্গিয়ে খান নি; তা যথাযথ কাজে লাগিয়ে অনেকটাই লাভবান হয়েছেন। মোট কথা এসব গান রচনার মাধ্যমে তাঁর পল্লীগীতির মাধুর্যলোকে প্রবেশের প্রয়াস অনেকটা সার্থকতা লাভ করেছে। আমরা প্রথমে 'রাখালী'র গানগুলোর আলোচনা করব এবং পরে অন্যান্য কবিতার বক্তব্য বিশ্লেষণ করব।

মেয়েলি গানের সুরে উত্তর -প্রত্যুত্তরের ভঙিতে রচিত 'সিঁদুরের বেসাতি' মূলতঃ একটি গান নয়। এটি গীতিময় সংলাপে গ্রথিত পল্লী-নরনারীর জীবন-নাট্যেরই যেন একটি অধ্যায়। এই নাট্যে একটি পল্লীকিশোরীর মনে প্রেম সঞ্চারেরই কাহিনী রূপকচ্ছলে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রেমে পূর্বরাগেরই রক্তিমচ্ছটা লক্ষিত হয়েছে। লোককবিরা গানে গানে কথার মালা রচনা করে এমনি করেই তো জন সাধারণের নাট্যরস পিপাসা মিটিয়েছেন। এ গুলোর মধ্যেই জসীমউদ্‌দীন খুঁজে পেয়েছেন তাঁর পরবর্তীকালের লোকনাট্য সৃষ্টির ইঙ্গিত। আলোচ্য 'সিঁদুরের বেসাতি' গীতিনাট্যাংশে সিঁদুর বিক্রেতা বেনে এক সুচতুর প্রেমেরই কারবারী বটে। সিঁদুর বিক্রয়ের ছল করে সে কৌশলে পল্লীবালার মন চুরি করে নিয়ে গিয়েছে, তাই তো অভাগী পল্লীবালিকার আক্ষেপ শুনি—

ওই বিদেশী বাণিয়া মোরে পাগল কইরা গেছে
আমার মন কাড়িয়া নেছে রে সজনি!
শাঁখা না কিনিতে আমি হাতে বান্ধলাম ডোর,
সিঁথির সিন্দুর কিনে চক্ষে দেখি ঘোর।—

সিঁদুর বিক্রয়ের ছল করে বেনে কিভাবে ধীরে ধীরে মিষ্টি কথার অনুরাগ মাখান ভাষায় জাল বিস্তার করে বালিকার মনে প্রবেশের চেষ্টা করেছে, কেমন করে ধীরে ধীরে সরলা

বালিকা সে আকর্ষণে ধরা দিয়ে অকপটে আপনার অনুরাগ ব্যক্ত করল, 'তোমার কথা বাণিয়ার-হৃদে রইল আঁকা', তাই কবি নাটকেরই মতো ধাপে ধাপে গীতিময় সংলাপ ফুটিয়ে তুলেছেন এ গীতি-নাট্যাংশে। প্রেমের ভাষা হৃদয়কে রঙে রঞ্জিত বলেই, তার ভঙি যেমনই হোক তা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। এ গীতিনাট্যাংশেও তাই হয়েছে এর গীতিময় সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার প্রায় সার্বিক প্রভাব সত্ত্বেও কোথাও কাব্যমাধুর্যের অভাব ঘটে নি।

পল্লী অঞ্চলে আগের দিনে দেখা যেত, এখনও হয়ত কালেভদ্রে দেখা যায়, এক শ্রেণীর বেনে শাঁখা-সিঁদুর ইত্যাদি ফেরি করে বেড়ায়। পল্লীর বিবাহিতা নারীদের (বিশেষতঃ হিন্দু নারীদের) দাম্পত্যজীবনের পবিত্র সম্পর্কের সূচক এ শাঁখা-সিঁদুর। এ সিঁদুরের বেসাতি করতে গিয়ে কোন কালে কোন বেনে যদি কোন পল্লীবালার প্রেমে পড়েই থাকে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। কারণ, বাড়ীর অন্দর মহলের সাথেই তো তাদের কারবার। হয়তো সিঁদুর বিক্রয় করতে এসে কোন কালে কোন বেনে কোন পল্লীবালার প্রেমে পড়েছিল—পল্লীবালাও সে প্রেমের আহ্বানে নিজের অজ্ঞাতেই কখন সাড়া দিয়ে ফেলেছিল। তারপর হয়তো নানা কারণে তাঁদের অভিপ্সীত মিলন সম্ভব হয় নি। প্রেমের ব্যর্থতার বেদনা হয়তো তাদের মনে গুমড়ে ফিরেছে। সেই কাহিনীর স্মৃতি নিয়েই কোন পল্লীকবি গান রচনা করে থাকবেন, সে গান ছড়িয়ে পড়ে থাকবে লোকের মুখে মুখে। জসীমউদ্‌দীন নিজেই হয়তো এমনি কোন কাহিনীর গান পল্লীর পথে শুনে থাকবেন। তাকেই তিনি নিজ কল্পনার রং মিশিয়ে নতুন তাৎপর্য মণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন 'সিঁদুরের বেসাতি' নামক গীতিনাট্যাংশে।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, কোন গানেরই আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না,যতক্ষণ পর্যন্ত না সাহিত্যিক বিচার বিশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত হয় তার সাংগীতিক গঠন বৈশিষ্ট্যের আলোচনা। কেন না গানের কথায় কাব্যের প্রকাশ যতটুকুই থাকুক না কেন, সুর সংযোগেই তা শিল্পসম্পূর্ণতা লাভ করে। এই কথা জানতেন বলে কোন আধুনিক সমালোচক 'গীতাঞ্জলি'র আলোচনা থেকে বিরত হয়েছিলেন। তবু 'রাখালী'র গুটিকয়েক গ্রাম্য গানের বিচারে আমরা তেমন কোন বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হই না এই কারণে যে, 'রাখালী' মূলতঃ কবিতার বই। এতে সংকলিত গ্রাম্যগানগুলোর কাব্যমূল্য স্মরণ করেই হয়তো এদের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এদের বক্তব্য বিশ্লেষণে সাংগীতিক গঠন বৈশিষ্ট্যের আলোচনা তাই অপরিহার্য নয়। তবু গান বিচারে বিভিন্ন ধরনের গানের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচয় থাকলে তার মাধুর্য অনুধাবন করা সহজ হয়। জসীমউদ্‌দীনের পল্লীগীতিগুলোর বিচারেও আমরা সে পন্থা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত মনে করেছি। 'সিঁদুরের বেসাতি' মেয়েলি সুরের গান বলে চিহ্নিত হলেও তা আসলে গীতিময় সংলাপে গ্রথিত লোকনাট্যেরই আংশিক রূপ এবং সেদিক থেকেই তা বিচার করেছি। এবার অন্যান্য গানগুলোর আলোচনা করা যাক।[১]

'বৈদেশী বন্ধু' গানটি বারমাসি সুরে রচিত। 'বারমাসি বা বারমাস্যা' জাতীয় পল্লীগীতির বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে নারীর দুঃসহ বিরহের কথা বর্ণিত হয়। এতে নারীর প্রিয়-বিচ্ছেদের বেদনাই শুধু ব্যক্ত হয় না, বিচ্ছেদ আশঙ্কায় কাতর দয়িতার ব্যথাতুর হৃদয়ের পরিচয়ও উদঘাটিত হয়। এ সব গানে সাধাণতঃ নারী হৃদয়ের প্রেমাকুলতারই প্রকাশ ঘটে থাকে। প্রিয় সান্নিধ্যে যে প্রেম সৌভাগ্যের চূড়ান্ত বলে মনে হয়, প্রিয় বিচ্ছেদ মুহূর্তে তাই একটা

১. শ্রী সুরেশ চক্রবর্তী—'বাংলা লোকগীতির সুর বিচার', ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে সংযোজিত প্রবন্ধ, পৃঃ ৪৮৭।

অভিশাপের মতো দগ্ধ করতে থাকে জীবনকে। 'বৈদেশী বন্ধু' গানটিতে আমরা আসন্ন প্রিয় বিচ্ছেদের আশঙ্কায় বেদনাবিধুর একটি পল্লীনারীর হৃদয়ের হাহাকারই যেন মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি। সে এক বিদেশী বেগানা পুরুষকেই প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল। সেবায়, স্নেহে, যত্নে তার হৃদয় ভরে দিয়ে তাকে একান্ত করে পেতে চেয়েছিল। বিদেশী এসেছিল তার দেশে ধান কাটতে, কিন্তু ধান কাটতে এসে সে কখন যে তার মন কেটে নিয়েছিল, তা সে নিজেও জানতে পারে নি। সে নিশ্চিত হয়ে বসেছিল যে তার প্রিয় তাকে ছেড়ে আর চলে যাবে না। কিন্তু ধান কাটার মরসুম শেষ হতেই সে বেগানা পুরুষ যখন ঘরের টানে সকল স্নেহ-বন্ধন উপেক্ষা করে ফিরে যেতে উদ্যত হল, তখন বজ্রাঘাতের আকস্মিকতার মতোই তা তাকে বেজেছিল। আসন্ন বিচ্ছেদ-ভরাতুর নারী কিন্তু মুখ ফুটে তাকে কিছু বলতে পারে নি। সে দয়িতের উদ্দেশ্যে শুধু একটি প্রশ্ন উদ্যত করে তুলে ধরেছে,—"কেমন গোঁয়াইর কাল মোরে যাও কয়া"। নিশ্চিত প্রিয় বিচ্ছেদের সম্মুখীন বেদনাদীর্ণ নারীর এ চিরন্তন প্রশ্নের জবাব দেবে কে?

বারমাসিক সুরে লেখা এ গানটিতে বিরহ ব্যাকুল প্রেমেরই ভাষা গুঞ্জরিত হয়ে ফিরেছে। এ প্রেমের ভাষা আমাদের বৈষ্ণব গীতিকার বিরহিনী রাধার কথা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও মৈমনসিংহ গীতকার নর-নারীদের প্রেমের জন্য দুঃখচর্যার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গানটির বক্তব্য ও ভাষায় গীতি-গাথার সুস্পষ্ট ছাপ সত্ত্বেও প্রেমের সার্বিক মহিমাই এখানে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিরহ ভয়াতুর নারী হৃদয়ের সূক্ষ্ম টানাপোড়নের এমন জীবন্ত আলেক্ষ্য আধুনিক কাব্যেও বিরল। জসীমউদ্‌দীন পল্লীকবিদের ন্যায়ই স্বভাবের ভাষায় অথচ অনেক বেশী কলাসম্মত উপায়ে নারীর এ অপূর্ব প্রেমার্ত চিত্র এঁকেছেন।

'সুজন বন্ধুরে' এ বইয়ে সংকলিত আর একটি গান। এটি পল্লীগীতিরই এক প্রকারভেদ 'বন্ধের গানে'র সুরে রচিত। এ জাতীয় গানেও পল্লীকবির প্রেমব্যাকুল হৃদয়ের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। তবে এ প্রেমকেই যে অতি সহজেই ঈশ্বরমুখী করে তুলতে পারেন বাঙলার লোকসঙ্গীতে তার দৃষ্টান্ত প্রচুর পাওয়া যায়। মানবীয় প্রেমের ভাষাই ভঙ্গির সামান্য একটু পরবির্তনে ঈশ্বরপ্রেমের ভাষায় পরিণত হয়েছে এ গানটিতে। বাঙালীর জীবনসাধনায় আধ্যাত্মিকতার প্রভাব চিরকালই একটু বেশী। পল্লীকবিরা পার্থিব জীবন-ভাবনার ফাঁকগুলোকে প্রায়শই অপার্থিব আধ্যাত্মিক ভাবনা দিয়ে ভরে দিয়েছেন। রাখালী, বাউল, মুর্শিদা, ভাটিয়ালী প্রভৃতি অজস্র লোকসঙ্গীতে বাঙালীর জীবন-ভাবনা আধ্যাত্মিক ভাবনায় উন্নতি হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় পার্থিব-ভাবনার এ আধ্যাত্ম-ভাবনায় রূপান্তরের জন্যে পল্লীকবিকে কোন নতুন পথের আশ্রয় নিতে হয় নি। সাধারণ প্রেমের ভাষাকেই বিশিষ্ট আবেগে নিষিক্ত করে একটু আলাদা ব্যঞ্জনা দিয়ে কাজ সেরে নিয়েছেন। 'সুজন বন্ধুরে' নামীয় গানটিতেও রচনার সেই যাদু কাজ করেছে। আমরা লক্ষ্য করি পল্লীকবিরা এ ধরনের গানে আধ্যাত্মিক আকুতির বশে ঈশ্বরকে 'সুজন বন্ধু' 'পরাণের বন্ধু', ইত্যাদি মানবীয় সম্বোধনসূচক শব্দেই আহ্বান করেছেন। 'বন্ধু' সম্বোধনের পৌনঃ-পুনিকতায় ভক্ত হৃদয়ের আর্তি অতি চমৎকার ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ভাষার মধ্যে যথার্থ আবেগটি পুরে দিতে পেরেছেন বলেই তো তাঁরা সার্থকতা লাভ করেছেন। বস্তুতঃ গানটিতে জসীমউদ্‌দীন সরল চিত্ত, ভক্ত-হৃদয় পল্লী-মানুষের ঈশ্বরমুখী প্রেমাবেগকেই পল্লী-মানুষের স্বভাবের ভাষায় রূপায়িত করার চেষ্টা পেয়েছেন।

ঘাটুগানের সুরে রচিত "মনই যদি নিবি" গানটি লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্যের দিকে তরুণ বয়সেই যে জসীমউদ্‌দীনের মন কেমন ব্যাপক ও গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল তারই

প্রমাণ। ঘাটুগান মূলতঃ প্রেম-সঙ্গীত। এই গান পূর্ব মৈমনসিংহ অর্থাৎ ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও সদর মহকুমা অঞ্চলের আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত। এ অঞ্চল এবং এরই একান্ত সংলগ্ন পশ্চিম শ্রীহট্ট ও উত্তর ত্রিপুরা ছাড়া বাংলাদেশের আর কোথাও এ ধরনের গানের প্রচলন নেই। এ গান শুধু একটা বিশেষ অঞ্চলেই যে সীমাবদ্ধ তা নয়। বছরের বিশেষ একটা সময় ছাড়া এ গান আর শুনতে পাওয়া যায় না। ঘাটুগানের সময় বর্ষা ও শরৎকাল। ঘাটুগানের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, কোন সমসাময়িক বিষয়বস্তু অবলম্বনে এ গান রচিত হয় না, অথবা কোন আধ্যাত্মিক ভাবের বিন্দুমাত্র স্পর্শও এ গানে থাকে না। বাঙলার লোকসঙ্গীতে এই বিশেষ গুণেই ঘাটুগান এক উল্লেখযোগ্য জিনিস। অথচ নৃত্য সহকারে গীত এ ঘাটুগানের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি বিশেষ পড়ে নি। উচ্চতর হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নীতিবোধ ঘাটুকে দুর্নীতিপূর্ণ পল্লীসঙ্গীত বলেই সাব্যস্ত করে বসে আছে—কারণ ঘাটু-বালকের নারীসুলভ অঙ্গভঙি সহকারে নৃত্যটা তাদের পছন্দসই নয়। ফলে ঘাটুর তেমন প্রসার ঘটতে পারে নি। অথচ সাধারণ স্তরের লোক ঘাটু গান খুবই উপভোগ করে। ঘাটুগান প্রেমসঙ্গীত হলেও এর মধ্যে আসলে 'দুর্নীতির পরিচায়ক' কোন উপকরণ নেই। তবে প্রেম বিষয়ক কথা মাত্রকেই যাঁরা দুর্নীতিদুষ্ট মনে করেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

আগেই বলেছি ঘাটুগান মূলতঃ প্রেমসঙ্গীত। এ গান দুরকমের—এক, ঘাটু সম্প্রদায়ের সমবেত সঙ্গীত; দুই, ঘাটু-বালকের একক সঙ্গীত। বলা বাহুল্য, সম্প্রদায়ের সমবেত গানের চেয়ে ঘাটু-বালকের একক সঙ্গীতেরই আবেদন বেশী। এগুলো একান্তই গীতিধর্মী (Lyrical)—এতে ব্যক্তিহৃদয়ের সহজাত অনুভূতির আন্তরিক প্রকাশ ঘটে থাকে। ধর্মীয় আবেগ বা অধ্যাত্মবোধের কোন স্পর্শ এতে থাকে না।

সংসারে মন দেয়া-নেয়ার খেলায় বিড়ম্বিতা নারীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসই যেন প্রিয়ের প্রতি অনুযোগ রূপে ঝরে পড়েছে আলোচ্য গানটিতে। 'পরাণ বন্ধুরে' অদেয় তার কিছুই ছিল না; সে তো দেহমনপ্রাণ সবই সমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার দুঃখ এই যে, প্রিয় তার মন নিয়ে শুধু ছিনিমিনিই খেলেছে। বন্ধুর প্রতি তাই প্রচণ্ড ক্ষোভ জমে উঠেছে তার হৃদয়ে। অথচ প্রাণের গভীরে তার জন্যে সেই প্রেম তেমনি অক্ষুণ্ন রয়েছে। বারবার 'ও বন্ধুরে' সম্বোধনটির মধ্যে প্রেম বিড়ম্বিতা নারীর ব্যথাদীর্ণ হৃদয়েরই অভিব্যক্তি ঘটেছে।

প্রেমের বঞ্চনার বেদনাই ভাষা পেয়েছে এ গানে। এ প্রেমে কোন খাদ নেই বলেই তা আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। জসীমউদ্‌দীন এ গানটি লিখে ঘাটুগানের প্রতি আমাদের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। পল্লীর স্বভাবের ভাষায় পল্লীর মানুষের ভাবানুভূতির সার্থক রূপদানের ক্ষমতা যে জসীমউদ্‌দীন সেই তরুণ বয়সেই আয়ত্ত করেছিলেন, এ গান তার আর এক পরিচয়।

রাখালিতে সংকলিত পঞ্চম ও শেষ গানটি হচ্ছে ভাটিয়ালী সুরে রচিত 'গহীন গাঙ্গের নায়া' শীর্ষক বিখ্যাত গানটি। ভাটিয়ালী গানে নদীমাতৃক পূর্ব বাঙলারই প্রাণের সুর যেন গুঞ্জরিত হয়ে ফিরে। আর এ ধরনের গান রচনায়ই জসীমউদ্‌দীন সবচেয়ে বেশী সার্থক। তাঁর রচিত অনেক ভাটিয়ালী সুরের গান এখন লোকসঙ্গীতের মতোই পূর্ব বাঙলার মানুষের মুখে মুখেই ফিরে।

আলোচ্য গানটি জসীমউদ্‌দীন কলেজের ছাত্রাবস্থায় রচনা করেন। পরবর্তীকালে বিখ্যাত গায়ক মরহুম আব্বাসউদ্‌দীনের কণ্ঠে গীত হয়ে গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ

করে। এ গানটিতে এক বিরহী নারী-চিত্তেরই আর্তি যেন প্রকাশ পেয়েছে।

সে যখন বেদনাদীর্ণ ব্যাকুল কণ্ঠে নায়ের মাঝির উদ্দেশ্যে বলে,—

"কইও খবর তাহার লাইগ্যা
কাইন্দা মরে এক অভাহ্গ্যারে ;
(ও তার) ব্যথার দেয়া থাইক্যা থাইক্যা
ঝরে নয়ান বায়ারে ;
আমার গহীন গাঙের নায়া।"

তখন সুরের পাখায় ভর করে বিরহিনী নারীর এই অন্তর্বেদনা নদীর ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। গানটির ভাষাভঙ্গিতে আঞ্চলিক ভাষার ছাপ সত্ত্বেও এতে কিছুটা কাব্যিক-মাধুর্য সঞ্চারিত হয়েছে। 'ভাটির দেশের কাজল মায়ায়, পড়াণডা মোর কাইন্দা বেড়ায়', 'কলাবনের বাউরি বাতাস দোলায় মাথার ক্যাশ', 'ব্যথার দেওয়া থাইক্যা থাইক্যা ঝরে নয়ান বায়ারে', ইত্যাদি অংশের কাব্যগুণ অস্বীকার করা যায় না। গানটিতে একটি নারীর প্রেমাশ্রুপূর্ণ ছবিই ফুটে উঠেছে। যে ক্ষমতার স্বাক্ষর জসীমউদ্‌দীন এ পল্লীসঙ্গীত রচনায় তাঁর সাহিত্য-সাধনার প্রথম পর্বে রেখে গিয়েছেন, তাই চূড়ান্ত সমুন্নতি লাভ করেছে পরবর্তী 'রঙিলা নায়ের মাঝি' নামক গানের বইতে।

'রাখালী'র এই গানগুলো কোন কোন রসিক সমালোচকের মতে এর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ বলে মনে হলেও 'রাখালী'র শ্রেষ্ঠ সম্পদ বোধহয় এর গুটিকয়েক আশ্চর্যরূপে পল্লীনিষ্ঠ কবিতা। পল্লীজীবন ও প্রকৃতিকে উপজীব্য করে ভাষাভঙ্গিতে পল্লীকাব্যের আমেজটি বজায় রেখে অথচ তাকে উন্নত শিল্পবোধের দ্বারা পরিমার্জিত করে জসীমউদ্‌দীন এমন জীবন-ঘনিষ্ঠ সুন্দর ও নিখুঁত পল্লীচিত্র খুব বেশী অঙ্কন করেন নি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, গ্রাম্য নর-নারীর জীবন নিয়ে আঁকা এ চিত্রে গ্রাম্যতা দোষ কোথাও দেখা দেয় নি। কবির স্বাভাবিক কাব্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে তা অসাধারণ মহিমা লাভ করেছে।

পূর্ব বাংলার শ্যামল প্রকৃতির আবেষ্টনীতে মানুষ সরল পল্লী-সন্তানেরই জীবন-ভাষ্য রাখালী কাব্য। তাদেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বপ্ন-কামনার কথা, প্রেম-স্নেহ-ভালবাসার কথা, বিরহ-বিচ্ছেদজনিত বেদনার কথা, প্রাত্যহিক জীবন-চর্যার নানা বিড়ম্বনার কথা, দারিদ্র্য ও মৃত্যুর দংশনে জর্জরিত জীবনের নিঃশব্দ প্রতিবাদের কথাই যেন ভাষা পেয়েছে 'রাখালী'তে। পল্লী নর-নারীর জীবনের এক মিছিল চলছে 'রাখালী'তে। এ মিছিলে শরীক হয়েছে মাঠের রাখাল, কৃষাণ-দুলালী, পল্লীবধূ, স্নেহাতুরা পল্লীজননী, শোক-জর্জর পল্লীবৃদ্ধ, দুর্ধর্ষ গ্রাম্য-মাতব্বর, বৈরাগী-বোষ্টমী, জেলে-জেলেনী, আরও কত স্তরের নর-নারীই না! জসীমউদ্‌দীন এদের নানা অবস্থার ছবি এঁকেছেন—কোথাও মাঠের রাখালের কৈশোরের চঞ্চল স্নেহময় রূপ, কোথাও প্রেমের অলক্ষ্য ছোঁয়াচে রঙীন কিশোর-কিশোরীর হৃদয়ের ছবি। আবার কোথাও কর্মনিরতা পল্লীবালার স্নিগ্ধ মূর্তি, গ্রাম্য বৈরাগী-বোষ্টমীর প্রাত্যহিক জীবন-চর্যার ছবি, জেলে-জেলেনীর বিচ্ছেদ-আশঙ্কা পীড়িত প্রেম পূর্ণ জীবনের ছবি ভেসে উঠেছে কবির চোখে। শুধু কি তাই, বাস্তবের রূঢ়তার স্পর্শে ম্লান সন্তান-স্নেহাতুরা পল্লীজননীর ছবি, স্নেহাতুর পিতৃহৃদয়ের ছবি, প্রিয়-পরিজনহারা পল্লীবৃদ্ধের দুঃসহ শোকচর্যার মর্মস্পর্শী ছবি আঁকতেও তিনি সমান মনোযোগী। এ ক্ষেত্রে তাঁর সার্থকতা বোধহয় সর্বাধিক। কোন অসাধারণ বক্তব্য নেই এ সব কবিতায়, নেই 'অঘটন ঘটন পটিয়সী' প্রতিভার যাদুস্পর্শ। কিন্তু 'সহজ' কথাকে সহজ করে বলার

হতভাগ্য নৈপুণ্য কবিতাগুলো আকারগত সম্বন্ধ। 'রাখালী'র গানগুলোতেও ঐ একই কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তবে সেখানে কবি পুরোপুরি স্বাধীন নন, অনানিভর। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে উনি স্বাধীন কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন বেশী ; তা ছাড়া বাস্তব জীবন-উক্তির সমর্থন থাকায় কবিতাগুলোতে অঙ্কিত চিত্রও বিশেষ প্রাণবন্ত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র কবি যেখানে মানুষের দুঃখ শোক, দুঃখ-বেদনার কথা বলতে চেয়েছেন, সেখানেই উনি যেন অবশ্য স্বচ্ছন্দ বোধ করেছেন। বড় স্নিগ্ধ, বড় করুণ, বড় মর্মস্পর্শী সে সব ছবি।

এ সব কথা স্মরণে রেখেই এবার আমরা 'রাখালী'র কবিতাগুলোর অন্তর পরিচয় উদ্ঘাটন করব। প্রথমেই নামকরিত 'রাখালী'র প্রসঙ্গে আসা যাক। একটি পল্লীকিশোর ও একটি পল্লীকিশোরীর অস্ফুট বাক্-প্রেমের ব্যথাতর কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে। প্রেম যেখানে পূর্ণতার রক্তিমছটা দেখিয়েই বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে ; স্বভাবের নিয়মে বিকশিত হয়ে পূর্ণতা অর্জনের সুযোগ পায় নি। কবি বড় সুন্দর করে সহানুভূতি দিয়ে কিশোর-কিশোরীর হৃদয়ে প্রেমাঙ্কুরের ধারাটি বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতির অমোঘ ইঙ্গিতেই যেন সদ্য হাস্যোজ্জ্বল কিশোরী বড়ুর 'রূপের গাছে' পরাণ হারিয়ে বসেছিল গাঁয়ের রাখাল। মনের মহা বড়ুর জন্যে সে অনুভব করে এক অপরূপ আকুলতা। তাকে সে মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল হতে দিতে চায় না। তাই তো নানা ছলনায় বাড়ীতে, জলের ঘাটে, মাঠের পথে সে বড়ুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ের চেষ্টা পায়। বড়ুকে নিয়ে মনে সে গড়ে তোলে প্রেম-মোহে বাঁধা জীবনের স্বপ্ন। মাঝে মাঝে সে আত্মহারা হয়ে যায়, বিস্মৃত হয় বাস্তব পরিবেশ। কিশোর প্রেমের এই লুকোচুরি খেলা চলে বহুদিন। অবশেষে 'গেয়ো স্নেহের নমনে ছলে পড়ল বাঁধা দুইটি হিয়া।' কিন্তু হলে কি হবে ; তাদের অস্ফুট বাক্-প্রেম ভাষা সম্পূর্ণতার শক্তি অর্জন করার পূর্বেই হৃদয়হীন, দৃষ্টিহীন, সমাজশক্তি মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করল তার প্রতি। রাখালের হৃদয়কে গুড়িয়ে দিয়ে ভিন্ গাঁয়ের এক ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল একদিন। হতভাগ্য রাখাল সে অনুষ্ঠানের মূক সাক্ষীরূপে সবই দেখল। বেদনা-বিদীর্ণ হৃদয়ে অপরাধীর মত পালিয়ে এল ঘরে। সারাটা রাত দারুণ ব্যথায় অশ্রু করল সে। প্রেমের রামধনু হাতছানি একবার চকিতে দেখা দিয়ে তাকে বিষাদের আঁধারে নিক্ষেপ করে চকিতে মিলিয়ে গেল। এখানেই কবি থেমে যান নি। প্রেমিক রাখালের মানসিক প্রতিক্রিয়াকে শৈল্পিক সহানুভূতি সহকারে আর একটু বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করে এ প্রেমকাহিনীর যথার্থ পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

'রাখালী'তে আমরা যে প্রেমচিত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছি তা সুন্দর কিন্তু অস্ফুট-বাক্। এই প্রেমচিত্র স্বভাবতই অসম্পূর্ণ, কিন্তু তাই বলে মূল্যহীন নয়। পরবর্তী 'নক্সী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র মতো সার্থক প্রেমকাব্যের বীজ রাখালীতেই উপ্ত হয়েছিল। 'রাখালী'র কিশোর রাখালই তো পরবর্তী কাব্য-কাহিনী দুটির নায়ক রূপা ও সোজনের পূর্ব পথিক ; 'রাখালী'র নায়িকা কিশোরী বড়ু তেমনি ঐ কাব্য দুটির নায়িকা সাজু ও দুলীরই অপরিস্ফুট রূপ। লক্ষ্য করার বিষয় 'নায়িকা'র রূপ বর্ণনার যে বৈশিষ্ট্য রাখালী'তে ফুটে উঠেছে পরবর্তী কাব্য দুটিতে সে বৈশিষ্ট্য অনেকটা রক্ষিত হয়েছে। বস্তুতঃ 'রাখালী'র অসম্পূর্ণ প্রেমচিত্রই যেন পরবর্তী 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কাব্যে পরিণত রূপ লাভ করেছে।

'কিশোরী' ও 'তরুণ কিশোর' কবিতা দুটিতে কবির রূপমুগ্ধতাই যেন প্রবল হয়ে উঠেছে। কবি এ ক্ষেত্রে রোমান্টিক ভাব-বিলাসিতারই পরিচয় দিয়েছেন। শব্দ চয়নে, উপমা নির্বাচনে পল্লী-পারিপার্শ্বিকের স্বীকৃতি সত্ত্বেও এ দুটি কবিতার প্রকৃতি পল্লীকাব্য থেকে

সম্পূর্ণ আলাদা। কবি এখানে আধুনিক কালের রোমান্টিক কবিদের ন্যায় বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের তত্ত্ব দাঁড় করানোর প্রয়াসী হয়েছেন। প্রথম কবিতায় কিশোরীর অমলিন রূপের আরতি করেছেন ; দ্বিতীয় কবিতায় কিশোরের নিষ্পাপ, অকলঙ্ক জীবনকেই জীবনের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত সুন্দর রূপ বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এ উপলক্ষ্যে যৌবনের সাথে তুলনায় কৈশোরের রূপ কেন বাঞ্ছনীয় তা বিশেষ বিশেষ যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের তত্ত্বটিকে মানব জীবনের পটভূমিতে দাঁড় করাতে হলে সাংসারিক জীবনের আবিলতাশূন্য কৈশোরের অমলিন রূপের মধ্যেই তাকে পাওয়া সম্ভব। এই দুই কবিতায়ই কবির ভাবুকতা অনেক ক্ষেত্রেই ভাবালুতায় পর্যবসিত হয়েছে।

কবিতায় কবি কিশোরীর রূপের স্তুতি করেছেন এই বলে,—

"চিকন ধানের শিশু-শিষে বসি শিশির যেমন হাসে
তেমনি ও মোর আঁখির পলকে অশ্রু-শিশিরে ভাসে।"

কিশোরীর দেহ তো 'রূপদেবতার গেহ'। এ রূপ কামনা-বাসনার দ্বারা কলঙ্কিত নয় তাই তো অতি পবিত্র—এই রূপের আঙ্গিনায় প্রবেশ করতে হলে পূজারীর নিষ্ঠা ও পবিত্র মন নিয়ে প্রবেশ করতে হবে। বড় দুর্লভ, বড় মধুর কিশোরীর এই রূপের আরতি করেই কবিপ্রাণ আশ্বাস পেতে চায়। কবির কামনা, এ কিশোরী যদি অনন্তকাল কৈশোরের অমলিন রূপে বিরাজ করতে পারত। কিন্তু হায়, তা যে হবার নয়! ধূলামাটির পৃথিবীর মালিন্য একদিন তাকে স্পর্শ করবেই।

কবি সুন্দরের পূজারী—সব সহ্য করতে পারেন কিন্তু সৌন্দর্যের যে ছায়াপাত ঘটেছে কবির প্রার্থনা তা যেন অনন্তকাল রূপের ডালি সাজিয়ে পৃথিবীর দুঃখ-ব্যথা-বিচ্ছেদ ও মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে মানুষকে সৌন্দর্য ও মাধুর্যের বার্তা শুনিয়ে একটু আশ্বস্ত করে। বড় সুন্দর কবির এই কামনাটি। তবে অতিকথন দোষে, ফেনায়িত আবেগের প্রকাশে কবিতার শিল্পমূল্যের কিছুটা হানি ঘটেছে সেটা স্বীকার করাই ভাল।

'তরুণ কিশোর' কবিতাটিতে কৈশোরের অকলঙ্ক, নিষ্পাপ রূপের ভাবনার মধ্যে কবির বিশেষ সৌন্দর্য দর্শনটি আবার আত্মপ্রকাশ করেছে। যে রোমান্টিক মন কিশোরীর রূপে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যাদর্শের সন্ধান পেয়েছিল, তাই এখানে কিশোরের অমলিন জীবনাশ্রয়ে আপন ভাবনার সমর্থন খুঁজছে! কবির আপেক্ষ এমন সোনার কৈশোর, তার অকপট হৃদয়মাধুর্য, তার সরলতা ও পবিত্রতা কিছুই শেষ পর্যন্ত স্থির থাকছে না। প্রভাতের রক্ত-রাগের মতোই কৈশোরের স্বপ্ন-রঙীন-রূপ সুন্দর। কিন্তু দিনের আলো ফুটে উঠলেই যেমন প্রভাতের রক্ত-রাগ মিলিয়ে যায়, কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলে, মানবসন্তানের সকল চারিত্রিক সরলতা, পবিত্রতা ও মাধুর্যই তেমনি সাথে সাথে বিদায় নেয়। সে তার অম্লান কিশোর রূপ হারিয়ে ফেলে। তাই তো কিশোরের অবাঞ্ছিত পরিবর্তন সম্ভাবনায় বিচলিত কবি বলেন,—

"হায়রে তরুণ হায়
এখনি যে সব জাগিয়া উঠিবে প্রভাতের কিনারায়।"

মানুষের জীবনে কৈশোর থেকে যৌবনে প্রবেশের ঘটনা এক মহাঘটনাই বটে। এ যেন সম্পূর্ণ এক নতুন রাজ্যে প্রবেশ। অজানা রাজ্যে নানা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় মানুষকে। মানুষ হারিয়ে ফেলে কৈশোরের অনাবিল হৃদয়মাধুর্য, সবাইকে আপন করে লওয়ার সহজ ক্ষমতা এবং সরল ও পবিত্র অন্তঃকরণ। তৎপরিবর্তে সে জড়িয়ে পড়ে

সংসারের জটিলতার মধ্যে, হারিয়ে ফেলে মানসিক পবিত্রতা, মন হয়ে ওঠে তার বাসনা-মলিন। সে স্বার্থের তল্পীবাহক হয়ে ওঠে। কেবল হিসেব-নিকেশ, দর কষাকষি, জমা-খরচের ধাঁধায় তার দিন কাটে। কৈশোরের তুলনায় যৌবন তাই অসুন্দর।

কবি ভাবছেন, মানুষের কৈশোর যদি চিরস্থায়ী হতো, তবে জীবনটা চিরকাল মাধুর্যময়ই থাকতো। কিন্তু তা যে হচ্ছে না, তা এক রূঢ় সত্য। কালধর্মে কিশোরকে যৌবনে পদার্পণ করতেই হয়। এই পরিবর্তন কোন মতেই প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তাই তো কবির সুন্দর কিশোরের স্বপ্ন টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে ভেঙে যাচ্ছে যৌবনের আবির্ভাবে। সৌন্দর্যকামী কবি-আত্মার কাছে এ পরিবর্তন মোটেই কাম্য নয়, এ পরিবর্তন অনিবার্য। আর এটা রোমান্টিক, স্বাপ্নিক কবির কাছে রীতিমতো পীড়াদায়ক। রোমান্টিক ভাব-বিলাসিতার বশে কবি বৈষ্ণব কাব্যের কৃষ্ণের বৃন্দাবন তথা গোকুল থেকে মথুরা যাত্রার কাহিনীর রূপকে কৈশোর থেকে যৌবনে উন্নীত মানুষের জীবনের পরিবর্তনের তাৎপর্য ব্যাখ্যার প্রয়াস পেয়েছেন। ফলে কবিতাটি অনাবশ্যক রূপে দীর্ঘ হয়েছে। তত্ত্ব ব্যাখ্যার অতি উৎসাহে কবি সংযত হওয়া অনাবশ্যক বিবেচনা করেছেন। তাই অতিরিক্ত ভাব-বিলাসিতা কবিতার কলেবর স্ফীত করেছে। কৈশোর ও যৌবনের তত্ত্বকে বৈষ্ণব কাব্যের গোকুল ও মথুরার রূপকে বর্ণনা করেই তিনি খুশী হলেন না। আবার তার গাঁয়ের নদীটির দুটি তীরের রূপক আধারে বর্ণনা করলেন। 'যৌবন মথুরা' রূপে প্রকাশিত এ কবিতার অংশ বিশেষ কোন কোন পাঠ্য পুস্তকে সঙ্কলিত দেখা যায়। তা অনেকটা রস-সম্পূর্ণতা লাভ করেছে স্বীকার করতেই হয়।

'রাখাল ছেলে' কবিতায় পল্লীপ্রকৃতির শ্যামলতার প্রতিমূর্তি সরল, কর্মচঞ্চল পল্লী রাখালের জীবনমাধুর্যের আশ্চর্য সুন্দর ছবি অঙ্কিত হয়েছে, যার জীবনের বাণী হল,—

"খেলা মোদের গান গাওয়া ভাই, খেলা লাঙল-চষা,
সারাটা দিন খেল্‌তে জানি, জানিই নেক বসা।"

কবিতাটির বক্তব্য প্রকাশে একটু অভিনবত্ব আছে। কবি কথোপকথনের ভঙ্গিতে ছোটখাট প্রশ্নের ও মন্তব্যের অবতারণা করে তারই প্রত্যুত্তররূপে রাখালের মুখ দিয়েই তার জীবনমাধুর্যের সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। মাঠ থেকে গাঁয়ের বাঁকা পথ দিয়ে চলতে থাকা রাখালকে তার গন্তব্যস্থানের কথা জিজ্ঞেস করতেই সে আনন্দে উদ্ভাসিত মুখে দূর গ্রাম-প্রান্তে সবুজ পাতায় ছাওয়া ছোট্ট কুটিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জানিয়ে দেয়—সেখানে তার মায়ের কাছে সে যাচ্ছে। তার গাঁয়ের প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মাধুর্যই কি কম? 'নীল নোয়ান সবুজ ঘেরা গাঁ', সেখানে 'কলার পাতা দোলায় চামর শিশির ধোয়ায় পা।' ঐখানেই রয়েছে তার পাতায় ছাওয়া কুটিরটি। সাঁঝ আকাশের আবীর রঙে নেমে তাকে মনে হচ্ছে 'সোনার পাতায় ছাওয়া।' এমন প্রাকৃতিক আবেষ্টনীতে মায়ের স্নেহে তার জীবন মধুময়। সকাল হলেই ঘর ছেড়ে মাঠের আহ্বানে সে বেরিয়ে পড়ে। রাতভোর সে যে সবুজ মাঠের স্বপ্ন দেখে সকালের মিঠেল রোদে শিশির ঝরা ঘাসে সে স্বপ্নই যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। সকালের হাওয়া সরষে ফুলের পাঁপড়ি নেড়ে রাখাল যেন খেলা করতে আহবান করে, পথ চলতে মটরশুঁটি যেন তার পা দুখানি জড়িয়ে তাকে খেলা করতে অনুরোধ জানায়। কিন্তু তার প্রতি যে সারা মাঠের ডাক এসেছে, সে তো আর মাঠের আহবানকে উপেক্ষা করতে পারে না। চলে যায় দ্রুত মাঠের কাজে। অনেকেই হয়তো রাখালের এ দৌড়াদৌড়ি পছন্দ করেন না। তাদের ধারণা রাখাল ছেলে কাজ ফেলে বুঝি হেলায়-খেলায় ঘুরে বেড়ায়—এটা তো ঠিক নয়। কিন্তু অভিযোগের জবাবে রাখাল যখন বলে,—

"কাজের কথা জানিনে ভাই, লাঙল দিয়ে খেলি
নিড়িয়ে দেই ধানের খেতের সবুজ রঙের চেলী।"

তখন তার জীবনের খেলার রূপটা বোধহয় বুঝতে কষ্ট হয় না। তার এ কাজ-খেলায় আনন্দও আছে যথেষ্ট। যখন সে কাজ করতে করতে দেখতে পায়,—

"শরষে বালা নুইয়ে গলা হল্‌দে হাওয়ার সুখে
মটর বোনের ঘোমটা খুলে চুম দিয়ে যায় মুখে!"

তখন অবশ্যই এই দৃশ্যে সে আনন্দ পায়। পৌষ মাসে ঝাউয়ের ঝাড়ে হিমেল হাওয়ার স্পর্শে যখন সারা জাগে তখন 'আমরা সেথা চষ্‌তে লাঙল মুর্শীদা গান জুড়ি।' কাজ তার প্রধান খেলা ; তা নিয়েই সে সারাদিন ব্যস্ত থাকে। অলসের নিষ্কর্মা জীবন তার নয়।

পল্লীপরিবেশের স্নিগ্ধ স্পর্শে কবিতাটি বেশ মাধুর্যমণ্ডিত হয়েছে বলতে হয়। শিশু-পাঠ্য কবিতা হিসেবে অনেক পাঠ্য পুস্তকে এর স্থান জুটলেও, এ কবিতার কাব্যমাধুর্য কোনরূপেই উপেক্ষণীয় নয়। গ্রাম্য পরিবেশের বর্ণনায় কবির স্বাভাবিক নৈপুণ্য ছাড়াও, এ কবিতায় একটি কিশোর পল্লীরাখালের স্বপ্নাবেশ জড়িত জীবন-ভাবনার সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। এ কবিতায় রোমান্টিক কবি-মনের স্পর্শ পাওয়া যায় প্রায় সর্বত্রই। তাই তো অতি সাধারণ পল্লীপারিপার্শ্বিক এখানে অসাধারণ মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে। ছড়ার ছন্দে গাঁথা কবিতাটি উপভোগ্য হয়েছে।

'বৈরাগী আর বোষ্টমী যায়' ও 'জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়' কবিতা দুটিতে পল্লী নর-নারীর জীবন-বৈচিত্র্য আস্বাদনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এ প্রয়াসের পেছনে বাস্তব অভিজ্ঞতার সমর্থন থাকায় অঙ্কিত চিত্রগুলো জীবন্ত বলে মনে হয়, তাছাড়া অতি সাধারণ স্তরের রূপ বর্ণনায় ও চরিত্রধর্ম প্রকাশে জসীমউদ্‌দীন পারিপার্শ্বিকের যথার্থ মর্যাদা দান করেছেন বলে চিত্রগুলো স্বাভাবিক হয়েছে। 'বৈরাগী আর বোষ্টমী' কবিতায় তিনি যে জীবনদৃশ্য অঙ্কন করছেন তা একান্ত বাস্তবধর্মী।

পল্লীপথে একতারা বাজিয়ে রসের গান গেয়ে সবাইকে মাতাল করে ফিরছে রসের নাগর বৈরাগী ও সহচরী বোষ্টমী—এ তো একান্ত চোখের দেখা ছবি। চোখের দেখা এ ছবিকে মন দিয়ে বুঝতে গিয়ে নতুনতর মাধুর্যের সন্ধান পেয়েছেন কবি।

'জলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়' কবিতায় কবি জেলেদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এবং তাদের জীবনে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার যে টানাপোড়ন চলছে তাও দেখিয়েছেন। এ কবিতায় জসীমউদ্‌দীন সাধারণ মানব-মানবীর প্রেম-ভাবনার রূপায়ন করতে গিয়ে পারিপার্শ্বিককে মোটেই বিস্মৃত হন নি। পদ্মার তীরের জেলের জীবন-যাত্রার যে আভাস তিনি দিয়েছেন কবিতার প্রথমাংশে তা যেমনি বাস্তব তেমনি কাব্যময়। খরস্রোতা নদীর উজান বাঁকে 'ছোট ডিঙ্গি নায়' জেলে প্রতিদিন পাড়ি জমায়। নদীর খরস্রোতের বর্ণনা দিতে গিয়ে পল্লীর-স্বভাবের ভাষায় বলেছেন,—'পদ্মা নদী—কাটাল ভারি, চাক্কুতে যায় কাটা।' ঐ নদীতে উজান-ভাটায় তার নৌকা ছুটাছুটি করে। জলের বুকে 'শ্যাওলা ভাসে, স্রোতের ফুলও ভাসে।' তার উপর দিয়ে পাল তুলে জেলের ডিঙ্গি ভেসে যায়।

কবি কাব্যময় ভাষায় বলেছেন,—'তারির পরে জেলের তরী ফুলের পালে হাসে।' ভাটিয়ালী সুরের গান ধরে জেলে পারি জমায়। বাস্তব পারিপার্শ্বিক থেকে গৃহীত এ ছবিতে গ্রাম্যপ্রকৃতির সরলতার ছাপ সত্ত্বেও কাব্যমাধুর্যের অভাব হয় নি।

'শাকতুলুনী' কবিতায় কর্মনিরতা এক পল্লীবালার ছবি কেন্দ্র করে কবির সৌন্দর্য-পিপাসু

রোমান্টিক মনের ভাবনাই গুঞ্জরিত হয়ে ফিরেছে। মটর ক্ষেতে শাক তোলার কাজে রত পল্লীবালার ছবি এমন কোন অসাধারণ দৃশ্য নয়। সবুজ মাঠের বুকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে বউটিশাক তুলছে, হাতে তার চুড়ি বাজছে, শরীর দুলছে। পায়ের কাছে বাতাসে মটর কুঁড়ি দুলছে, পাতার ফাঁকে ফাঁকে মটরশুঁটি উঁকি মারছে। মাঝে মাঝে তার পায়ের খাড়ুতে মটরশুঁটির পাতা জড়িয়ে পড়ে। ছাড়াতে গিয়ে হয়ত বা সে ক্ষেতের বুকে আছাড় খেয়ে পড়ে। এই তো সামান্য দৃশ্য! কিন্তু তা-ই কবির রোমান্টিক মনের স্পর্শে রঙিন হয়ে উঠে একটা অসামান্যতা লাভ করেছে। দেখবার চোখ থাকলেই সাধারণ দৃশ্যও যে কেমন একটা মহত্তর রূপে দেখা দিতে পারে, এ কবিতায় তাই দেখতে পাই।

'কৃষ্ণ দুলালী' কবিতাটিতে কবি একটি গ্রাম্য-বালিকার সাদামাটা রূপের আরতি করেছেন। এখানে কবির রোমান্টিক মনোভাব ক্রিয়াশীল। তবে কবি গ্রাম্য-বালিকার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তাকে স্বভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন নি। তাকে তার চিরাভ্যস্ত আবেষ্টনীর মধ্যে স্থাপন করেই চিত্রটি এঁকেছেন। এইরূপ বর্ণনায় একটা 'স্থানিকতা' (Local colour) আছে বলেই তা আমাদের মনকে আকর্ষণ করে বেশী।

'বৈশাখ শেষের মাঠ' কবিতায় চৈত্রের শুষ্কতা ও শূন্যতার পটভূমিতে বৈশাখে বালুচরের বুকে সবুজ ধানের প্রস্তুতি দেখে কবিমনে যে আনন্দ, যে আবেগ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে তাই উপযুক্ত কাব্যিক প্রকাশ লাভ করেছে। এ উপলক্ষ্যে কবি চাষীর ফসল ফলানোর মহান সাধনার কথা—তার স্বপ্ন ও আনন্দের কথা বলেছেন এবং মানুষের কল্যাণের জন্যে চাষীর ত্যাগ ও সাধনার জন্যে নিজ অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। কবিতাটিতে মাটির পৃথিবী ও মাটির মানুষের প্রতি মমত্ব ও শ্রদ্ধাবোধেরই অকুণ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে।

'মেলা' শেষ কবিতাটিতেই বোধহয় জসীমউদ্‌দীন সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ চরিত্র-চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন। পল্লীর সন্তান জসীমউদ্‌দীন বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে কার্যোপলক্ষে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বিচিত্র চরিত্রের লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। পল্লীর লোক মূলতঃ অশিক্ষিত, নিরক্ষর, নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। দুঃখ-দারিদ্র তাদের নিত্য সাথী, তারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে মাটির বুকে ফসল ফলায়; নানা ছোটখাট কাজ করে রুজির ব্যবস্থা করার চেষ্টা পায়। মাঝে মাঝে গ্রাম্য দলাদলিতে জড়িয়ে পড়ে, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হয়। আঘাত দেয়, আঘাত পায়—সুখে হাসে, দুখে কাঁদে। এদের চরিত্র বড় একটা সভ্য সমাজের চোখে পড়ে না। তবু মাঝে মাঝে এমন এক-আধটা চরিত্র নিজ বৈশিষ্ট্যেই এদের মধ্যে এমন ভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় যে, তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সে নিজ মহিমা প্রকাশ করে আপন শক্তিতে সমাজের অন্য পাঁচজনের উপর আধিপত্য করে। বল-বিক্রমে সে সবাইর উপরে, তাকে ভয় করে প্রায় সবাই। শুধু গায়ের জোরেই সে সবাইকে দাবিয়ে রাখে তা নয়। তার বুদ্ধিটাও কম থাকে না। রেগে গেলে সে খুন-খারাবিতে পিছ-পা হয় না, দল বেঁধে দাঙ্গা করতেও তার আপত্তি থাকে না। আবার মামলা-মোকদ্দমার লড়াই চালাতেও তার জুড়ি নেই; জাল, জুয়াচুরি সবাইকে বশ করার মন্ত্র জানে সে। তাকে ঘাটাতে গেলে বিপদ আছে, তাই গ্রামের লোক থাকে সন্ত্রস্ত। আবার ঐ লোকই অনেক সময় দেখা যায় তার প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে তার জন্যে সর্বস্বপণ করতেও দ্বিধা করে না। বিপদে-আপদে সবাইর পাশে এসে দাঁড়ায়, আবার তাদের উৎসব-আনন্দেও অংশ গ্রহণ করে। ফলে অনেক লোকের মন জয় করে সে। হাজার লোক তার কথায় উঠবস করে। পুঁথিগত বিদ্যার ধার ধারে না সে, অথচ হাজার হাজার লোকের নেতৃত্ব করার ক্ষমতা আছে তার। অন্যান্যদের দৃষ্টিতে সে দুর্বৃত্ত গ্রাম্য মাতব্বর মাত্র। হয়ত তার কোন গুরুত্ব নেই তাদের

কাছে, কিন্তু গ্রামে সে যে একটা কেউকাটা। তাকে উপেক্ষা করে সাধ্য কার? এমনি অসাধারণ একটি চরিত্র মেনা শেখ।

এ চরিত্র কবিকে আকর্ষণ করেছে এর আশ্চর্য বলিষ্ঠতার জন্যে। এ চরিত্রের দোষ কবির নজর এড়ায় নি, কিন্তু এর মহত্ত্বও কম নয়। শিক্ষিত সমাজ হয়তো তাকে অত্যাচারী, বর্বর বলে তাচ্ছিল্য করবে। অথচ মেনা তো তাদের থেকে কোন দিক দিয়েই হেয় নয়। শিক্ষিত সমাজ কলমের জোরে কতই না অনর্থ ঘটায়, কত ছল-প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়, নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে কত লোকের সর্বনাশ করে। গরীব চাষীর মুখের অন্ন কেড়ে খায়। মেনা শত অন্যায় করলেও শিক্ষিত কলমধারীদের মত হৃদয়হীন নয়, সে ভালমন্দ সকল ব্যাপারেই তার প্রতিবেশীর পক্ষ নিয়ে দাঁড়ায়। প্রাণপণ করে সবাইর সাহায্য করে। মেনা শেখ তাই কবির চোখে তথাকথিত কলম-পেশা শিক্ষিত মানুষের চেয়ে অনেক বেশী মহৎ।

বস্তুতঃ 'মেনা' চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে কবি পল্লীর জীবন-বাস্তবের নিখুঁত ছবিই শুধু আমাদের সামনে তুলে ধরেন নি, দোষে-গুণে, ভাল-মন্দে মেশানো অথচ আশ্চর্যরূপে বলিষ্ঠ একটি পল্লী-মানুষের রক্ত-মাংসের জীবন-ছবিও এঁকেছেন। পরবর্তী 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের নায়েব মশায়ের অনন্য চরিত্রের আভাসটিই যেন বহন করে এনেছে মেনা শেখে'র এই চরিত্র। কাব্য হিসেবে নয়, চরিত্র-চিত্রণ প্রয়াস হিসাবেই আলোচ্য কবিতাটির মূল বিচার করতে হবে—কারণ কবি এখানে কবিত্ব করার চেয়েও বাস্তব বর্ণনে বেশী মনোযোগী। তবু মাঝে মাঝে জসীমউদ্‌দীন যে কিছুটা কবিত্ব-শক্তিরও পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন, তা উপেক্ষা করবার জিনিস নয়।

মৃত্যুর পটভূমিতে সাংসারিক স্নেহ-প্রেমের আশ্চর্য করুণাঘন রূপ ফুটে উঠেছে 'রাখালী'র 'কবর', 'মা', 'পল্লীজননী', ও 'পাহাড়িয়া'র চারটি কবিতায়। এদের মধ্যে 'কবর' ও 'পল্লীজননী'র শিল্প-সার্থকতা বোধহয় শেষ অবধি জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে অনতিক্রম্য রয়ে গিয়েছে। 'মা' ও 'পাহাড়িয়া' কবিতায় শৈল্পিক সার্থকতা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এগুলো পদ্য-ছন্দে গাঁথা সাংসারিক স্নেহ-বিয়োগ ব্যথার আখ্যায়িকা মাত্র। ঐ উপলক্ষে কবির দুঃখ-বিলাসিতাই যেন প্রকাশ পেয়েছে। এ দুটি কবিতায় কবির পদ্য রচনার ক্ষমতার অভাব না থাকলেও, স্বাভাবিক কবিত্বের সেই স্পর্শটি যেন অনুপস্থিত। কিন্তু 'কবর' ও 'পল্লীজননী'তে তাঁর কাব্যিক সিদ্ধি রীতিমতো ঈর্ষার বস্তু।

'কবর' ও 'পল্লীজননী' কবিতায় পল্লী-মানুষের জীবনে স্নেহের অপঘাতজনিত দুঃখের শ্বাসরোধকারী চিত্রই দেখতে পাই। যে দুঃখের ছবি তিনি এঁকেছেন, তা সমালোচকের মতে 'সর্বহারার হয়েও সর্বময়', 'অপজাতের হয়েও উঁচুজাতের।' বর্ণিত চিত্রের বাস্তবতা ও অনুভূতির গাঢ়তাই এ কবিতা দুটিকে প্রাণস্পর্শী করে তুলেছে।

'কবর' জসীমউদ্‌দীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা ; একমাত্র 'পল্লীজননী' কবিতাটিই বোধহয় শিল্প-সার্থকতায় এর সমকক্ষতার দাবী রাখে। এ দুটি কবিতায় জসীমউদ্‌দীন যে দুর্লভ শিল্প-সার্থকতার অধিকারী হয়েছেন, শ্রেষ্ঠ কবির রচনায়ও তা কদাচিৎ দেখা যায়। এ দুটি কবিতা জসীমউদ্‌দীনের কবি-খ্যাতিকে দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরবর্তী কাহিনীকাব্য 'নকসী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' তাঁর কবি-খ্যাতিকে বিস্তৃত করেছে সত্য ; কিন্তু শিল্পস্বার্থকতায় তা এ কবিতা দুটিকে অতিক্রম করতে পারে নি। 'কবর' কবিতায় সকল স্নেহের পরিজনহারা পল্লীবৃদ্ধের দুঃসহ শোকচর্যার যে ছবি অঙ্কিত হয়েছে, তা এ অকালমৃত্যুর দেশে হয়ত এক সাধারণ দৃশ্য ; কিন্তু তার করুণা তাই বলে

কম নয়। বাঙলার পল্লীতে এ শোকচর্যা কত যুগ ধরেই না চলে আসছে। মানুষ অসহায়ের মতো চোখের জলই ফেলেছে ; পরিত্রাণের কোন পথ দেখে নি। মানুষের সুস্থ, সুন্দর জীবন গড়ার কামনা চিরটা দিনই ঐ শিয়রে উপস্থিত অকালমৃত্যুর ছোবলে নীল হয়ে গিয়েছে। মূক পল্লীপ্রকৃতি রয়ে গেছে তার নীরব সাক্ষী।

যুগ যুগ ধরে অবহেলিত পল্লী এ পুঞ্জিভূত শোককে বক্ষে ধারণ করে সুকঠোর তপশ্চর্যা করে চলেছে। প্রকৃতির সেই মূক বেদনাকে মুখর হয়ে উঠতে দেখি 'কবর' কবিতায়। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন হারা বৃদ্ধের দুঃসহ বেদনায় প্রকৃতি যে ভাবে সাড়া দিয়ে উঠেছে এ কবিতায় তা জীবন-বাস্তবের রূঢ়তা সত্ত্বেও কবিতাটিকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিকের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ও হৃদয়ানুভূতির সার্থক সমাবেশে কবিতাটি দুর্লভ শিল্পসার্থকতার অধিকারী হয়েছে। পল্লীবৃদ্ধের দুঃসহ বেদনার এ চিত্র এক হিসেবে সকল পল্লীবাসীর দুঃখ-বেদনারই আন্তরিক ও প্রতিনিধি স্থানীয় চিত্র। বৃদ্ধের মুখে সকল পল্লীবাসীর যুগ যুগান্তের পুঞ্জিভূত শোক-বেদনাই যেন ভাষা পেয়েছে। ব্যক্তিগত সুখ এখানে সার্বিক শোক-চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। বাঙলা কাব্যে সাধারণ মানুষের জীবনের দুঃখ-বেদনার এমন মহিমাময় শিল্পসম্মত প্রকাশ আর দেখা যায় না। জসীমউদ্‌দীন মূক মানুষের বেদনাকে ভাষা দিয়ে বাঙলা কাব্যে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তা প্রায় নজীরবিহীন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কবর' কবিতাকে 'বাংলা কবিতার নতুন দিগদর্শন' বলে চিহ্নিত করে এর অনন্য সৃষ্টি-মহিমারই স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

'কল্লোল' পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এ কবিতাটি সমকালীন শিক্ষিতসমাজে একটা রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ কবিতার তাৎপর্যপূর্ণ আবির্ভাবের কথা বলতে গিয়েই অচিন্ত্যকুমার বলেছিলেন—"একটি কবিতা গোঁয়ো মাঠের সজল-শীতল বাতাসে উড়ে আসে 'কল্লোলে'।[১] মানুষের মনে সংক্রামিত হওয়ার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল এ কবিতাটির, তাই তো প্রকাশের প্রায় সাথে সাথেই তা সকলের মনকে দ্রবীভূত করে দিয়েছিল। কবিতা পাঠ করে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে আবেগপূর্ণ ভাষায় জসীমউদ্‌দীনকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। দীনেশচন্দ্র এ কবিতা পাঠে সাধারণ মানুষের দুঃখের শ্বাস-রোধকারী বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে চোখের জল ফেলেছিলেন। তিনি এ কবিতার মধ্যে এক নতুন কাব্যধারার আগমনী শুনতে পেলেন। বস্তুতঃ এ কবিতা বাঙলা কাব্যের জন্যে একটি যেন নতুন জানালা খুলে দিয়েছিল। তা দিয়ে হুর হুর করে পল্লীর মেঠো হাওয়া প্রবেশ করেছে। শিক্ষিত বাঙালীর মনকে তা আর একবার হাতছানি দিয়েছিল নাগরিকতার নির্মোক থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে। বাঙালী কিছুক্ষণের জন্যে এ দিকে ফিরে তাকিয়েও ছিল। কিন্তু যুগের বিরুদ্ধ হওয়া শেষ পর্যন্ত তাকে সবলে নিজের দিকেই আকর্ষণ করেছে। সে যাই হোক, 'কবর' কবিতা সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার বাংলা পাঠসংগ্রহে স্থান পেয়েছিল। এমন সাদর অভ্যর্থনা বহুদিন কোন বাঙালী কবির কবিতার ভাগ্যে জোটে নি।

'কবর' কবিতার অসামান্যতা এর বর্ণিত বিষয়ে নয়, অসামন্যতা রয়েছে তাকে দেখবার বিশেষ দৃষ্টিতে, তাকে বলিষ্ঠ শিল্পসম্মত রূপদানের ক্ষমতায়। প্রিয় পরিজনহারা এক

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—কল্লোলযুগ, পৃঃ ১৮৭।

পল্লীবৃদ্ধের শোকই তো 'কবর' কবিতার অবলম্বন। সে তার প্রিয় স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, নাতনি সবাইকে হারিয়েছে । একমাত্র নাতির কাছে প্রিয়-স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বৃদ্ধ তার দুঃসহ দুঃখের কথাই বেদনা বিগলিত ভাষায় প্রকাশ করেছে। স্নেহ-ভালবাসায় একদিন জীবন ছিল তার পরিপূর্ণ। কিন্তু একটির পর একটি দুর্দৈবের ন্যায় মৃত্যু এসে কেড়ে নিয়েছে তার সকল প্রিয়জনকে তার কাছ থেকে। জীবিত রয়েছে শুধু একটি নাতনী। তারই হাত ধরে দাদু পরপারের জন্যে আকুল প্রতিক্ষায় আছে। জীবনে তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা মৃত্যু, আর কোন কামনা নেই। এ রকম কত শোকের দৃশ্যই তো আমাদের সামনে প্রতিদিন অভিনীত হচ্ছে। কই, তা তো আমাদের অন্তরকে তেমন নাড়া দেয় না! সংসারের জটিলতার আবর্তে পাক খেয়ে ফিরছি আমরা--স্থিরদৃষ্টিতে কোন জিনিস অবলোকন করার সময় কোথায়? সে অসামান্য হৃদয়বোধ কোথায় যা সন্ধ্যানী আলোর ন্যায় জীবনের আঁধার প্রদেশগুলোকে আলোকিত করে আমাদের জীবন-মহিমা উপলব্ধিতে সাহায্য করবে? জসীমউদ্‌দীনের সে অসামান্য হৃদয়বোধ ছিল; তাই তো অপরের চোখে যা দেখা দিয়েছিল জীবনের সহস্র দুর্দৈবের একটি রূপে, তাই জসীমউদ্‌দীনকে সাহায্য করেছিল সহস্রের মর্মবেদনা উপলব্ধি করতে। 'কবর' কবিতায় পল্লীবৃদ্ধের ব্যক্তিগত শোককে তিনি সামাজিক মানুষেরই দুঃখ রূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই যে ব্যক্তির দুঃখকে সর্ব মানবের দুঃখের ঘনিভূত রূপ হিসেবে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা, এটা জসীমউদ্‌দীনের সুতীব্র জীবনানুভূতির ও অসামান্য হৃদয়বোধেরই ফল।

মৃত্যু সংসারে একটা অতি সাধারণ ঘটনা, কিন্তু তার একটা স্বাভাবিক গতি আছে। ঐ স্বাভাবিক গতির ছন্দে সে যখন দেখা দেয়, তখন তাকে তেমন ভয়াবহ মনে হয় না! তাই তো বৃদ্ধের মৃত্যু আমাদের বিচলিত করলেও, তেমন আকুল করে না। কিন্তু যখন আমরা দেখি বৃদ্ধের চোখের সামনে কুসুমের মত ঝরে পড়ছে তারই প্রাণপুতলী স্নেহের পরিজন, মায়ের স্নেহাকুল দৃষ্টির সামনে মরছে সন্তান, তখন সে ঘটনা আমাদের সমস্ত সত্তাকে ভীষণ ভাবে নাড়া দেয়। আমরা ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়ি, জীবনে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি, সংসার আমাদের কাছে মরুর ভীষণ শূন্যতা নিয়ে দেখা দেয়। স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমই জীবনে এ বিপর্যয় সৃষ্টি করে পদে পদে। তাই তো সাংসারিক স্নেহ-প্রেম সব সময় আশঙ্কায় কম্পমান, অশ্রু টলমল।—সকল স্নেহানুভূতিই কেমন একটা কারুণ্যে মিশ্রিত। 'কবর' কবিতায় স্নেহবিহ্বল মানুষের সেই ট্র্যাজেডি-করুণ রূপটিকে যেন তুলে ধরা হয়েছে। সে ভালবাসে সবাইকে, কিন্তু কাউকে মৃত্যুর কাছ থেকে ধরে রাখতে পারে না। কেবল মার খেয়ে খেয়ে মাঝে মাঝে করুণ আর্তনাদ করে ওঠে। কিন্তু আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও স্নেহের স্মৃতির উৎপীড়ন থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না। মৃত্যু যেন পরিহাসভরে তাকে তার প্রিয়জনের বিদায় দৃশ্যের সাক্ষী দাঁড় করিয়ে রেখে জীবনকে এক নির্মম ব্যঙ্গ হেনে যায়।

'কবর' কবিতার আকর্ষণ এইখানে যে, এ কবিতায় একদিকে আমরা মৃত্যুকে নির্মম জীবন-সত্য রূপে প্রত্যক্ষ করি, সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক স্নেহ-প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমাকেও অবলোকন করি। সবচেয়ে বড়ো কথা, এ প্রকাশ সম্পূর্ণ কলাসম্মত হয়েছে। কবি আপন অভিজ্ঞতা ও ভাবনার রূপায়ণের জন্যে উপযুক্ত শব্দ , চিত্র ও উপমা সন্নিবেশে কোথাও কোন বাধার সম্মুখীন হন নি। সর্বত্রই ভাবানুষঙ্গ হিসেবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে, এর কাব্য-মাধুর্য আরও বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। 'কবর' কবিতাটিকে 'pastoral Elegy'

বা রাখালিয়া শোকগীতি বলা যেতে পারে। এই জাতীয় কবিতায় যে শোকের প্রকাশ ঘটে তা সাধারণত কবিরই ব্যক্তিগত দুঃখবোধ ; তবে তার প্রকাশে কবি নানা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। সাধারণত কোন রাখাল তার বন্ধুর জন্য শোক প্রকাশ করছে, এমনি এক ঢঙের আশ্রয় নিয়ে বা প্রথাগত কোন লৌকিক পন্থা অনুসরণে এই জাতীয় কবিতায় কবি কোন ব্যক্তিগত বিয়োগ-ব্যথা ও দুঃখ প্রকাশ করে থাকেন। তবে অনুভূতির গভীরতায় কবির এ ব্যক্তিগত শোক সার্বিক শোকচেতনায় রূপান্তরিত হলে তার মূল্য অনেক বেড়ে যায়। এ জাতীয় কবিতায় সব সময়েই একটা করুণ্যের সুর লক্ষ্য করা যাবে এবং তাতে জীবনের নশ্বরতা সম্পর্কে সুগভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যাবে। বালাবাহুল্য এ জাতীয় কবিতায় যে ব্যক্তিগত শোক ও দুঃখভাবনার প্রকাশ ঘটে, তার উদ্বোধক কারণগুলো পল্লীজীবন ও পারিপার্শিকেই বর্তমান থাকে। তাই এ জাতীয় রচনার আবহ মূলতঃ পল্লীর; এর প্রকাশভঙ্গিতে লৌকিক বাকভঙ্গির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'কবর' কবিতায় এক স্ত্রী, পুত্র, পরিজনহারা পল্লীবৃদ্ধের অন্তর্বেদনা তারই একমাত্র নাতিকে লক্ষ্য করে ব্যক্ত হয়েছে। কবিতাটির সৃষ্টির পিছনে কবির প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতা যে অনেকটাই কাজ করছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। নতুবা কবির পক্ষে বৃদ্ধের অনুভূতির সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া সম্ভব হত না এবং ফলে কবিতাটিও যে সৃষ্টিমহিমা লাভ করেছে, তা হয়ত সম্ভব হত না। কবিতাটিতে পারিপার্শ্বিক, বিশেষ সামাজিক অবস্থান ও জীবনভঙির স্বীকৃতি রয়েছে। ভাষায় পল্লীআবহ রক্ষিত হলেও তা অবশ্য অনেকটাই মার্জিত। কবিতাটিতে করুণ রসের প্রবাহ লক্ষ্য করা যায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। পল্লীবৃদ্ধের ব্যক্তিগত শোক-চেতনা গ্রামবাসীর সার্বিক শোক-চেতনায় রূপান্তরিত হয়ে কবিতাটির শিল্পমূল্যও অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যান্য শোকগীতির ন্যায় রাখালিয়াগীতির সার্থকতার ভিত্তি হল 'absoiute sincerity of emotion and expression", সামান্যতম কৃত্রিমতা এর সার্থকতার পরিপন্থী হয়ে দেখা দিতে পারে। 'কবর' কবিতার সমালোচক মাত্রেই স্বীকার করবেন এতে কবি ভাবাবেগ প্রকাশে ও কাব্যকলায় সেই নীতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।

কবিতাটির আর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এর বক্তব্য প্রকাশের ভঙিটি 'Dramatic Monologue' বা নাটকীয় একোক্তির মত। বক্তা প্রিয় পরিজনহারা পল্লীবৃদ্ধ যে ভাবে একটির পর একটি শোকের স্মৃতি বর্ণনা করেছেন , তাতে লক্ষ্য করি শোকাবেগ ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে উঠে, পরিশেষে ভাববন্ধন থেকে মুক্তির জন্যে এক চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতায় ফেটে পড়েছে। এমন ভাবে সর্ব স্নেহবন্ধন রিক্ত হয়ে বেঁচে থাকায় লাভ কি? প্রত্যেকটি শোক-স্মৃতির পিছনে বৃদ্ধের আবেগকম্পিত হৃদয়টি যেন একবার করে উঁকি মেরে গিয়েছে। সংসার জীবননাট্যের এ অভিনেতার জীবনে একটির পর একটি মৃত্যুর আঘাত এসেছে, আর একটি একটি করে হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়ে গিয়েছে। অসহ্য ব্যথায় বার বার আর্তনাদ করে উঠেছে সে! নির্মম মৃত্যু তার কাছ থেকে সবাইকে ছিনিয়ে নিয়েছে, রেখে গিয়েছে শুধু এক ক্ষুদ্র বালককে—তার বংশের একমাত্র প্রদীপ নাতিটিকে। ঐ শিশুমুখ তার পক্ষে কোন সান্ত্বনার কারণ হয়ে দেখা দেয় নি ; বরং তাকে আরো বেশী করে স্মৃতির জ্বালায় দগ্ধ করেছে। এ শিশু তাকে হারান প্রিয়-পরিজনের কথাই আরও বেশী করে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে সামান্য বিস্মৃতি-সুখও ভোগ করতে দেয় না। এর চেয়ে নির্মম অভিশাপ মানব জীবনে আর কি হতে পারে? বৃদ্ধ সংসার জীবননাট্যে স্নেহেরই ট্র্যাজেডি-করুণ রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে। নাতির কাছে সকল দুঃখস্মৃতি রোমন্থন করতে করতে সে হৃদয়ভার লাঘব করার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু দুঃখ কি তার

লাঘব হতে পারে? সংসারে সবার আগে এসে সবার বিদায়ের সাক্ষী হয়ে সে যেন আপন স্নেহাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছে ; এ যেন গ্রীক নাটকেরই নায়কের ন্যায় ক্রূর নিয়তির খেলা চলছে তার জীবনে।

'কবর' কবিতায় বৃদ্ধের জীবন-বাস্তবের রূপকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাংসারিক স্নেহ-প্রেমের নিয়তি-নিহত আরক্তিম মূর্তি। তার অপরাধ সংসারে সে স্নেহ-ভালবাসার নীড় বেঁধে সুখী হতে চেয়েছিল। স্নেহনীড় সে বেঁধেছিল, সুখের স্পর্শও সে পেয়েছিল। কিন্তু সে সৌভাগ্যের বিদ্যুৎচমকের পিছনেই চরম দুঃখের বজ্রাঘাত নেমে এসেছিল তার জীবনে। তারই চোখের সামনে একের পর এক মৃত্যুর হাত ধরে বিদায় নিয়েছে তার প্রেমময়ী স্ত্রী, উপযুক্ত পুত্র, লক্ষ্মী পুত্রবধূ, আদরের নাতিনী, স্নেহের পুত্তলী মেয়ে। শুধু তাকে স্নেহস্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যেই বোধহয় বেঁচে রইল বংশের একমাত্র প্রদীপ নাতিটি। তার স্নেহের নীড় ভেঙ্গে গেল; জীবন তার হয়ে উঠল দুঃস্বপ্নময়। চারিদিকে দেখা দিল মরুর উষরতা। এক দুঃসহ বেদনায় অস্তিত্বকে বহন করে সে বেঁচে রইল। ভালবেসে তাকে হারাতে হল পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সুন্দর মানবীয় কামনাটিকে। দিনরাত মৃত্যু-কামনা তাঁর সকল ভাবনার সার হয়ে দাঁড়াল। এমন করে স্নেহের খেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে বেঁচে থাকার কি কোন মানে হয়! এ যে জীবনের প্রতি একটা নির্মম ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়।

বৃদ্ধের জীবনের এ ট্রাজেডি আমাদের স্রষ্টার ন্যায়ের বিধানে সংশয়ায়িত করে তোলে। জীবন সম্পর্কে আমাদের নিরাশ করে তোলে। ভালবেসে সারাজীবন ধরে বৃদ্ধ যে খেসারত দিল, তা এই কারণেই আমাদের সমগ্র অস্তিত্বের মূলকে ভীষণভাবে নাড়া দেয় যে, সেখানে জীবনধারার মূল স্বভাবের ব্যতিক্রমটা বড় বেশী প্রকট। অকালমৃত্যু সংসারে নেই তা নয়, কিন্তু তাই বলে এটাই যদি সংসারের নিয়ম হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সংসারটা মানব-বসতিতে পূর্ণ না হয়ে, অরণ্যই হোত। তা হয় নি বলেই তো এখনও আমরা সংসারকে, জীবনকে সুন্দর দেখি। বৃদ্ধের জীবনে সে ব্যতিক্রমটাই বিশেষ কার্যকরী দেখে আমরা একটা চূড়ান্ত বিভ্রান্তির সম্মুখীন হই। এক অসাধারণ অভিজ্ঞতাই বটে। স্বভাবের নিয়মে বৃদ্ধেরই আগে সংসার থেকে বিদায় নেওয়া উচিত ছিল! কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে তাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে, তারই সকল স্নেহের পাত্রদের মৃত্যু-দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে! মৃত্যু-কামনা করেও এ জ্বালা থেকে সে পরিত্রাণ পায় নি। এ বৃদ্ধের কোন্ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত? আমরা একমাত্র প্রবল স্নেহবোধ ছাড়া বৃদ্ধের চরিত্রে আর তো কিছু দেখতে পাই নে।

আমাদের মনে হয় বৃদ্ধের সকল দুঃখ-বেদনার মূলে রয়েছে তার প্রবল স্নেহানুভূতি। এই স্নেহানুভূতির তাড়নায়ই সে মৃত্যুর অধিকারের রাজ্যেও প্রিয়জনকে অনুসরণ করার প্রয়াস পায়। তাই তো দেখি, নাতির কাছে এক একটি শোকস্মৃতি বর্ণনা করার ফাঁকে ফাঁকে প্রত্যেকটি স্নেহের পাত্রের জন্য মন থেকে প্রার্থনাবাণী বেরিয়ে আসে,—

"আয় খোদা, রহমান,
ভেস্ত নাজেল করিও সকল, মৃত্যু-ব্যথিত প্রাণ।"

এ এক আশ্চর্য প্রাণ! মৃত্যুর বিষাক্ত ছোবলে একটির পর একটি স্নেহের পুত্তলী তার চোখের সামনে ঢলে পড়েছে। অসহ্য-বেদনায় তার বুক ফেটে যাচ্ছে ; তার সমগ্র অস্তিত্ব দুঃসহ বোধ হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে নিজের মৃত্যু-কামনা করেছে। তবু বিশ্ববিধানে অবিশ্বাস তার জাগে নি একবারের জন্যেও । আমার বিশ্বাস, 'কবর' কবিতাটির মূল আকর্ষণ মৃত্যুঞ্জয়ী স্নেহ-প্রেমের অধিকারী বৃদ্ধের এই চরিত্রটি। বৃদ্ধের পরাজয় ঘটেছে মৃত্যুর কাছে নয়, স্নেহের কাছে। তাই তো দেখি নাতির কাছে প্রিয়-বিয়োগ ব্যথার দুঃসহ অভিজ্ঞতার

কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধ বার বার অতীত স্নেহ-স্মৃতির মাধুর্যের জগতে ফিরে যায়। প্রিয়জনের মৃত্যুটা যেন তার কাছে বড় কথা নয়, ঐ মৃত্যুর ফলে তার স্নেহবুভুক্ষু হৃদয় যে স্নেহসুধা থেকে বঞ্চিত হল তার জন্যেই যেন তার আফ্‌শোস বেশী। মৃত্যুর শীতল নিঃশ্বাসে তার চোখের সামনে তার স্নেহের কুসুমগুলি একে একে ঝরে পড়ল, তবু সে বৃদ্ধ জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারায় নি, তার কারণ তার হৃদয়ের গভীরে স্নেহ-প্রেমের এক অনিবার্ণ শিখা জ্বলেই চলছিল। মৃত্যুর ঝাপটায় তা কখনই নিভে যায় নি। স্নেহের অটল বিশ্বাসেই মৃত্যুর ঘাতককে বৃদ্ধ সহ্য করতে পেরেছিল। 'কবর' কবিতা যে দুঃসহ দুঃখের হয়েও সর্বস্তরের পাঠকের মন জয় করতে পেরেছে, তারও রহস্য ঐখানে। নতুবা পর পর কতকগুলো মৃত্যু-বিচ্ছেদের বেদনা বর্ণনা নিশ্চয়ই পাঠক এবং শ্রোতা কারো কাছে প্রীতিপ্রদ মনে হত না। কবি বৃদ্ধের মুখ দিয়ে একটি একটি করে পরপর কয়েকটি মৃত্যুর স্মৃতি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু বর্ণনার ভেতরের ফাঁকগুলোকে কৌশলে স্নেহ-স্মৃতির মাধুর্য দিয়ে এমন করে ভরে দিয়েছেন যে, ব্যথাভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়েও আমরা তৃষিত চিত্তে সেদিকে দৃষ্টি না ফিরিয়া পারি না। দীর্ঘ কবিতাটিতে তিনি পাঠক ও শ্রোতার মনকে ধরে রাখার এ আশ্চর্য কৌশল প্রয়োগে খুবই সার্থক হয়েছেন। এতে অবশ্য বৃদ্ধের নিদারুণ শোকের গুরুত্ব এতটুকুও কমে নি। বরং তার স্নেহশীল মনের পটভূমিতে তার নিদারুণ দুঃখের স্বরূপ উপলব্ধি করে আমাদের মন তার প্রতি সহানুভূতিতেই ভরে ওঠে। ধনৈশ্বর্যের অধিকারীর দীনবেশ আমাদের যেমন ক্ষুব্ধ করে, তেমনি স্নেহৈশ্বর্যের অধিকারী বৃদ্ধের স্নেহাপঘাত জনিত করুণ ব্যথিত মূর্তি আমাদের বিচলিত করে। কারণ এতে স্বভাবে যে ব্যতিক্রম দেখা যায় তা বড়ই পীড়াদায়ক।

জসীমউদ্‌দীন নাটকীয় কৌশলে বৃদ্ধের শোকস্মৃতি বর্ণনার সাথে সাথে তার অমেয় স্নেহৈশ্বর্যের পরিচয় উদঘাটিত করে তার প্রতি আমাদের সহানভূতি বাড়িয়ে তুলেছেন। জলভরাতুর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বুকে হঠাৎ মেঘের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক সূর্যের আলো এসে লাগলে যেমন এক মায়াময় দৃশ্যের অবতারণা হয়, বৃদ্ধের দুঃসহ শোকভরাতুর হৃদয়ে স্নেহপ্রেমের ক্ষণমাধুর্যের স্মৃতিও মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে তাকে অপরূপ এক কারুণ্যে নিষিক্ত করে। আমরা চোখের জল ফেলি অথচ আমাদের ওষ্ঠাধরে স্নেহ-মাধুর্যের ক্ষণ অনুভূতি জনিত তৃপ্তির রেখা ফুটে ওঠে। কিন্তু সেটা স্থায়ী হয় না; পরমুহূর্তেই আমরা জীবনের রূঢ়তা সম্পর্কে সেচেতন হয়ে উঠি। স্নেহের শিয়রে মৃত্যুর ভ্রুকুটি দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি।

জসীমউদ্‌দীনের অসামান্য হৃদয়বোধ ও উচ্চাঙ্গের কলাকৌশলের গুণেই 'কবর' একটি উৎকৃষ্ট কবিতা হতে পেরেছে। অক্ষম কোন কবির হাতে পড়লে 'কবর' একাধিক মৃত্যুশোকের অর্থহীন বিবৃতিতেই হয়তো পর্যবসিত হতো। কারণ, পরপর এতগুলো মৃত্যুর দৃশ্য একযোগে পাঠকের স্নায়ুকে আঘাত করে সকল অনুভূতিকে হয়তো স্তব্ধ করে দিত। সেটা দুঃখের চূড়ান্ত হত; কিন্তু কবিতা হত না কিছুতেই। কারণ, সেখানে পাঠকের ভাববার, অনুভব করার কিছুই থাকত না। জসীমউদ্‌দীন যথার্থ কবিদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন বলেই কাব্যের সে অপঘাত সম্ভাবনাকে সযত্নে দূরে সরিয়ে দিয়ে, সার্থকতার পথ বেছে নিতে পেরেছেন। 'কবর' কবিতার মনোযোগী পাঠক নিশ্চয়ই এ সত্য হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ হবেন।

'কবর' কবিতাটি বিষয়-মহাত্ম্যেই শুধু নয়, প্রকাশকলার অভিনবত্বেও পাঠকের মনে স্থায়ী দাগ কেটে বসেছে। আগেই বলেছি, কবি এ কবিতায় ভাব প্রকাশে অনেকটা নাটকীয় রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। বৃদ্ধ তার বংশের প্রদীপ নাতিটিকে সামনে রেখে একটির পর একটি করে প্রিয়জনের কবর নির্দেশ করছে, আর আবেগ-উত্তপ্ত ভাষায় নিজ স্নেহ-স্মৃতির

কথা বলতে বলতে অসহ্য দুঃখে ফেটে পড়ছে। প্রত্যেকটি শোক-স্মৃতি যেন এক একটি আবেগের ঢেউ রূপে দেখা দিয়েছে। ঢেউগুলো একটার পর একটা এসে বৃদ্ধের বিক্ষুব্ধ শোকাতুর মনের ছবিটিই আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পতিত মানুষ যেমন ঢেউয়ের সাথে সংগ্রামে ক্লান্ত হয়ে শেষে নেতিয়ে পড়ে, বৃদ্ধও শোক-তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত বাঁচবার সাধটি হারিয়ে ফেলেছে। 'কবর' কবিতায় আমরা স্নেহাতুর অথচ শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধের হৃদয়ের তরঙ্গদোলা অনুভব করি। আমাদের চোখের সামনে মৃত্যুর সাথে স্নেহের সংগ্রামে বিপর্যস্ত একটি মানুষের অপরাজয়ের রূপেরই ছবি যেন ভেসে ওঠে। কবিতার শুরুতেই আমরা স্নেহের সেই অপরাজেয় রূপেরই আভাস পাই যখন বৃদ্ধ তার নাতিকে স্ত্রীর কবর নির্দেশ করে বলে,—

"এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।"

'তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে'—বাক্যটির মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ প্রেমের সম্রাট বৃদ্ধের মূর্তিটি। স্ত্রীকে হারিয়েছে সে ত্রিশ বছর আগে, আজও সে তার স্মৃতি তর্পন করে চলেছে চোখের জলে। স্ত্রীর প্রতি তার সুগভীর প্রেমের এ প্রকাশ স্বভাবতই তার স্বল্পকালীন দাম্পত্যজীবনের মাধুর্য সম্পর্কে আমাদের কৌতূহলী করে। বৃদ্ধ নিজেই অবশ্য আমাদের সে কৌতূহল চরিতার্থ করেছে। যে প্রেমস্মৃতি সে ত্রিশ বছর ধরে সঙ্গোপনে বুকে পুষে রেখেছে, আজ প্রথম সুযোগেই তা প্রকাশ-আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তার মুখেই আমরা শুনতে পাই, পুতুল খেলার বয়সও পার হয় নি, এমনি একটি ছোট মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে এনেছিল সে। ঐ অতটুকু ছোট মেয়েই সেদিন তার মনকে কেমন একটা নাড়া দিয়েছিল। তার দিনগুলো সব কেমন যেন রঙীন হয়ে উঠেছিল। স্বাভাবিক নিয়মেই ধীরে ধীরে ভালবাসার অলক্ষিত সঞ্চারে দুটো প্রাণ কখন যে এক হয়ে গেল বৃদ্ধ নিজেও তা বলতে পাবে না,—

"এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে
ছোটখাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।"

নাতির কাছে যৌবনের সে প্রেম-মোহে গাঁথা অপরূপ দিনগুলোর কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ যেন কেমন আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কেমন করে পরস্পর সামান্য অদর্শনেও অধীর হয়ে উঠত তাদের প্রাণ; কেমন করে ক্ষণে অক্ষণে ছল করে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে গোপনে স্ত্রীর সাথে দেখা করে ছোটখাট উপহারে তাকে তুষ্ট করার চেষ্টা পেত, সে স্মৃতিও বর্ণনা করতে সে বড় আনন্দ পায়। স্ত্রীও হেসে কেঁদে কত প্রাণের কথাই না তাকে বলত। কিন্তু বৃদ্ধের কপাল মন্দ, তাই তার তরুণ যৌবনেই প্রেমময়ী স্ত্রী তাকে ছেড়ে গেল। এ ব্যথা তাকে যে নিদারুণ বেজেছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বৃদ্ধের আক্ষেপোক্তিতেঃ

"আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়
কবরের দেশে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝঝুম নিরালায়।"

এ ভাষা প্রেমের ভাষা—যা প্রিয়ার দুঃখ ভাবনায় আত্মবিস্মৃত। স্ত্রীর মৃত্যু বৃদ্ধের জীবনে যে শূন্যতা সৃষ্টি করল, তা আর পূর্ণ হল না। বস্তুতঃ বৃদ্ধ যে রূপ অনুভূতিশীল হৃদয়ের অধিকারী তাতে তার পক্ষে এ শূন্যতা একটা চিরন্তন বেদনার উৎস হয়ে রইল। তবু তার জীবন এতটা দুর্বহ হয়ে উঠত না যদি তা সংসারের অপরাপর স্নেহের পরিজনদের কাছ থেকে স্নেহের একটু শীতল স্পর্শ পেত। কিন্তু দুরদৃষ্ট তার,—

"যখানে যাহারে জড়িয়ে ধরেছি সেই গেছে ছাড়ি।"

তার সব স্নেহের পাত্র একে একে কবরের দেশে চলে গিয়েছে। নিজ হাতেই তো 'কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে' সে মাটির তলে শুইয়ে দিয়েছে। সে সব স্মরণ করে তার হৃদয় বিগলিত হয়। অশ্রু ঝরিয়ে একটু হালকা হতে চায়। স্নেহ তার জীবনে এমন নির্মন অভিশাপ হয়ে দেখা দিবে তা সে ভবাতেও পারে নি। বুক তার ফেটে যাচ্ছে বেদনায়। নাতির কাছে সে করুণ কাহিনী বলতে না পারলে যেন তার শান্তি নেই। তাই সে মৃতা স্ত্রীর স্মৃতি বর্ণনা করেই থেমে যায় নি। পরপর বিবৃত করে গিয়েছে অনেকগুলো স্নেহের মৃত্যু-করুণ কাহিনী।

পাশাপাশি দুইটি কবরে শায়িত রয়েছে বৃদ্ধের পুত্র ও পুত্রবধূ অর্থাৎ নাতিটির বাপ ও মা। সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেই নাতিটির চোখে জল আসে, সে কেঁদে ফেলে। বৃদ্ধও দুঃখ পায়, তবু সে চুপ করে থাকতে পারে না। কারণ, 'পরাণ যে মানে না'। এক বছর ফাল্গুন মাসে সামান্য অসুস্থ হয়ে পুত্র তার শয্যা নেয়, তাই হয় তার শেষশয্যা।—তাকে যখন কবর দিয়ে আসা হল তখন শিশু-নাতির মুখে 'বা-জানরে মোর কোথা যাও দাদু লয়ে' এ মর্মান্তিক প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধ মূক হয়ে গিয়েছিল। তার দুর্গতির আরও বাকী ছিল। পুত্রের মৃত্যুর পর স্বামীহারা পুত্রবধূ এমনি কাতর হয়ে পড়েছিল যে, দিনরাত তার চোখের জল ঝরেছে। স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন লাঙল-জোয়াল দুহাতে জড়িয়ে ধরে কেঁদে সারা হত সে দিনমান। সে শোকের করুণ্য পারিপর্শ্বিকেও ছায়া ফেলেছিল। বৃদ্ধ নিজে প্রেমিক, তাই তরুণী পুত্রবধূর দুঃসহ বেদনার কথা বুঝতে পেরেছিল। বৃদ্ধের মনে হয়েছিল পুত্রবধূর মর্মান্তিক দুঃখে মূক প্রকৃতিও যেন সাড়া দিয়ে উঠেছিল--বৃদ্ধ আপন দুঃসহ অভিজ্ঞতা থেকেই এ সর্বাতিশায়ী দুঃখকে বুঝতে পেরেছিল, তাই সেই দুঃখকে সে পারিপার্শ্বিকে প্রতিবিম্বিত দেখতে পেয়েছিল ঃ

"গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে,
ফাল্গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শূন্যে মাঠখানি ভরে।
পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জল নাহি।"

পল্লীপারিপার্শ্বিক ও জীবন-বাস্তবের অকুণ্ঠ স্বীকৃতির ফলে এ চিত্র বড় সুন্দর, বড় মর্মস্পর্শী হয়েছে। প্রেমার্ত মানুষের শোক অমনি করেই বেদনা রমণীয় হয়ে ওঠে।

স্বামীহারা পুত্রবধূর জন্য বৃদ্ধের বড় দুঃখ। সে ত তারই একান্ত স্নেহের পাত্রী। বৃদ্ধ নিজের একান্ত ব্যক্তিগত দুঃখ বরং সহ্য করে যেতে পারে কিন্তু তার আপন স্নেহের জনের এমন চরম সর্বনাশের কথা ভেবে স্থির থাকতে পারে না। পুত্রকে সে হারিয়েছে। হতভাগিনী পুত্রবধূও 'জীবনের প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাঁঝ—আপনি পড়িল মরণ-বিষের তাজ'। স্বামীহারা নারী বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা খুঁজে পায় নি। ছোট ছেলেটিকে ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হয়েছিল—চোখের জলে ভেসে ছেলেকে আশীর্বাদ করে বিদায় নিয়েছিল। মৃত্যুর আগে শ্বশুরকে একটি করুণ মিনতি শুধু জানিয়ে গিয়েছিল,—

"....আমার কবর গায়
স্বামীর মাথার 'মাথাল' খানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।"

মৃত্যুপথযাত্রিনী দরিদ্রা পল্লীবালার কি সামান্য কামনা। অথচ কামনাটি কতই না মানবিক। দরিদ্র স্বামীর স্মৃতি হিসেবে ঐ 'মাথালটি' ছাড়া কিই বা সে কবরের উপর দিতে

বলতে পারে! স্বামীর মাথার ঐ মাথালটিই এই মুহূর্তে তার কাছে স্বামীর অস্তিত্বকে সত্য করে তুলেছিল।

বৃদ্ধ ভুলতে পারে না সেই বেদনাদায়ক স্মৃতি। পুত্রবধূর কবরের দিকে নজর পড়তেই কেমন একটা স্নেহ-ব্যাকুলতা অনুভব করে বৃদ্ধ। তার মনে হয় তার স্নেহের পুত্র ও পুত্রবধূ হয়ত ঘুমিয়ে আছে ঐখানে। সে কত সুন্দর কথা কল্পনা করেই না সান্ত্বনা খোঁজে,—

"জোড় মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরু ছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটিয়ে পড়েছে গায়।
জোনাকী মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো
ঝিঁঝিরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।"

বড় সুন্দর সন্তানহারা পিতার এ কল্পনা—স্নেহের রসে সিক্ত মাধুর্য অসাধারণ। কিন্তু প্রশ্ন জাগে এ কোন ধরনের পিতৃহৃদয়? আপন দুঃসহ শোকের কথা বলতে গিয়েও যা মনের হিউমার (Humour)-কে হারিয়ে ফেলে নি? বেদনাবোধের এমন রমণীয় প্রকাশ সাধারণ স্ত্রী-পুত্রহারা লোকের পক্ষে কি সম্ভব? ঐখানেই তো আলোচ্য কবিতার সকল ঘটনার সাক্ষী বৃদ্ধের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। দুঃখের অগ্নিদাহে জীবনের খাদ্যটুকু একেবার পুড়ে গিয়ে বৃদ্ধের স্নেহ যেন খাঁটি সোনার ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়েছে; তাই তো দুঃখের অমানিশাকেও সে আপন জ্যোতিতে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। কবরে শায়িত পুত্র-পুত্রবধূর দুঃখজনক স্মৃতি ঐ স্নেহের ঔজ্জ্বল্যেই এমন রমণীয় হতে পেরেছে।

বৃদ্ধের দুঃখচর্যার শেষ এখানেই নয়। পুত্র-পুত্রবধূকে হারানোর পরেই সে হারিয়েছে তার বড় আদরের নাতিনীকে । বনেদী ঘর দেখে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু শ্বশুরগৃহে সে সুখী হতে পারে নি—অনাদরে সে স্নেহকুসুম শুষ্ক ম্লান হয়ে গিয়েছিল। বাপের বাড়ীতে আসার জন্যে সে বড় ব্যাকুল ছিল। একবার শীতে তাকে নিয়ে আসা হল। সোনার মুখ তার মলিন হয়ে গিয়েছিল। বাপ-মার কবরের কাছে বসে সে সারাদিন কাঁদত। মাত্র কয়েকদিনের জ্বরে সেও মারা গেল। তাকেও বাপ-মার পাশেই কবর দেওয়া হল। হতভাগিনী নাতিনীর জন্যে বৃদ্ধের বড় দুঃখ; সে জীবনে একটুও শান্তি পেল না। ঐ ছোট মেয়েটির জীবনের বিড়ম্বনার কথা ভেবে বৃদ্ধের স্নেহাতুর হৃদয় আর্তনাদ করে ওঠে যেন।

স্নেহের পাত্র পুত্র-পুত্রবধূ, নাতিনীকে হারিয়ে স্নেহের জন্যে যে চূড়ান্ত বিড়ম্বনা তাকে ভোগ করতে হয়েছে, তারপরে যে কোন মানুষের পক্ষেই বেঁচে থাকাটা অপরাধ বলে মনে হবে। বৃদ্ধ যেন বেঁচে থেকে প্রবল স্নেহবোধেরই খেসারত দিয়েছে। বাস্তব জীবনে এ স্নেহের বিড়ম্বনার কোন সান্ত্বনাই মিলতে পারে না, তাই স্নেহাতুর কল্পনাপ্রবন বৃদ্ধ বাইরের প্রকৃতিতেই সে সান্ত্বনা খুঁজে ফিরেছে। প্রকৃতির মধ্যে আপন শোকাতুর হৃদয়ের প্রক্ষেপ ঘটিয়ে এক অভিনব উপায়ে মৃত্যু-বিড়ম্বিত স্মৃতি-চর্যায় মেতেছে ঃ

"ব্যথাতুরা সেই হতভাগিনীরে বাসে নাই কেহ ভালো,
কবরে তাহার জড়ায়ে রয়েছে বুনো ঘাসগুলি কালো।
বনের ঘুঘুরা উহু উহু করি কেঁদে মরে রাতদিন,
পাতায় পাতায় কেঁপে উঠে যেন তারি বেদনার বীণ।"

বৃদ্ধের দুঃখের পসরা শেষ হতে তখনও কিছুটা বাকি ছিল। তা পূর্ণ হল তার মাতৃহারা সাত বছরের ছোট মেয়েটির মৃত্যুতে। ফুলের মতন সুন্দর তার মুখখানিতে বৃদ্ধ তার স্ত্রীর মুখের আদল লক্ষ্য করে কেমন এক অদ্ভুত ব্যকুলতা বোধ করত। দারুণ শোক-দাহের মধ্যেও বৃদ্ধ অনেকটা সান্ত্বনা পেতেন ঐ স্নেহের পুত্তলটিকে বুকে জড়িয়ে চোখের জলে

ভেসে। এই ছোট মেয়েটি তার জীবনে 'রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তের দ্বার বেয়ে'। কিন্তু সে স্নেহের পুত্তলীটিও একদিন সাপের কামড়ে মারা গেল। নিজ হাতে তাকেও কবরে রেখে আসল বৃদ্ধ। নাতির কাছে এতক্ষণ ধরে একটির পর একটি শোকস্মৃতি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বর্ণনা করেছে বৃদ্ধ। কিন্তু শিশু কন্যার মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে তার সকল সংযমের বাঁধ যেন ভেঙে গেল। অসহ্য ব্যথার আর্তনাদ করে ওঠে বৃদ্ধ। স্মৃতিচর্যা উপলক্ষে এতক্ষণ তার স্নায়ুর উপর যে পীড়ন চলছিল, তা এখানে এসে যেন বৃদ্ধের সকল মানসিক ধৈর্যকে নষ্ট করে দিয়েছে! একটা দারুণ স্নেহোন্মাদন বশে অবুঝ প্রলাপের ভাষায় নাতিকে আহ্বান করে বলে,—

"এইখানে এই কবরের পাশে, আরও কাছে আয় দাদু,
কথা কস্ নাক, জাগিয়া উঠিবে ঘুম ভোলা মোর যাদু!
আস্তে আস্তে খুড়ে দেখ দেখি কঠিন মাটির তলে,
দীন-দুনিয়ার ভেস্ত আমার ঘুমায় কিসের ছলে!"

যে শোকাবেগ একটির পর একটি স্নেহের পাত্রের অকালমৃত্যুর শোচনীয় স্মৃতির বর্ণনায় স্নেহোদ্বেল বৃদ্ধের হৃদয়ে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল বহুক্ষণ ধরে, তাই যেন অবুঝ স্নেহের কারুণ্য-মিশ্রিত প্রলাপ হয়ে ঝরে পড়েছে এখানে। এত কাল পরে নাতির কাছে শোকস্মৃতি বর্ণনা কবতে গিয়েও সে আবেগে আত্মহারা হয়ে গিয়ে এক অদ্ভুত বিশ্বাসের মধ্যে আশ্বাস খুঁজে ফেরে—তার স্নেহের দুলালরা মাটির তলে ঘুমিয়ে রয়েছে, তারা মরে নি! বৃদ্ধের শোকাবেগ এখানে নাটকীয় সমুন্নতি (climax) লাভ করেছে।

এর পর উপসংহার—climax-এর পরেই যেমন catastrophe, যে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে তার চিত্তকে এতক্ষণ মথিত করছিল, তা এখন প্রশমিত হয়ে এসেছে; অশ্রুর প্লাবনে তার উত্তাপ কমে এসেছে। বৃদ্ধ বুঝতে পেরেছে এ হচ্ছে তার জীবনের নিয়তি, অমোঘ বিধান। তাই প্রশান্ত আত্মসমর্পণের ইচ্ছায় তার সকল মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। দূর দিগন্তে বনানীর বুকে সন্ধ্যার রক্তরশ্মি ঝরে পড়েছে। বৃদ্ধের মনেও 'অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে'। দূরে মস্‌জিদ থেকে আজানের সকরুণ সুর ভেসে আসছে—বৃদ্ধের মনে প্রশ্ন জাগছে—'মোর জীবনের রোজ কেয়ামত....কতদূর'! তারপরই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সকল প্রিয়জনের মঙ্গল কামনা করে একটি প্রার্থনা উচ্চারণ করে নীরব হয়ে যায় বৃদ্ধ।

কবিতাটিতে প্রিয়-পরিজনহারা বৃদ্ধের শোকাবেগের উত্থান-পতনকে লেখক নাটকীয় কৌশলে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন বলেই কবিতাটির আকর্ষণ সকল শ্রেণীর পাঠকচিত্তেই প্রবল হয়েছে। 'কবর' কবিতা যে কতকগুলো শোচনীয় ঘটনার বিবৃতি না হয়ে উচ্চাঙ্গের কাব্যিক সার্থকতার দাবিদার হতে পেরেছে, তা কবির অসাধারণ হৃদয়বোধ, মানব-চরিত্রের অন্তর্দৃষ্টি ও অপ্রতিম শিল্পকৌশল প্রয়োগের ক্ষমতার জন্যেই সম্ভব হয়েছে। মৃত্যুশোকের এমন হৃদয়স্তম্ভনকারী অথচ আশ্চর্যরূপে বাস্তবধর্মী চিত্র বাঙলা কাব্যে পূর্বাপররহিত। কবিতাটিতে স্নেহ যেন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ধরে চলেছে প্রথম থেকেই। দুইয়ের শক্তিপরীক্ষায় আপাততঃ মৃত্যুর জয় হলেও স্নেহ এখানে ট্রাজেডির নায়কের ন্যায়ই যেন আমাদের সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। বিরোধী শক্তির সাথে সংগ্রামে বিপর্যস্ত বলেই তো আর তার মহিমা কমে যেতে পারে না। সকল পরাভবের বেদনা নিয়েই সে আপনার অধিকারকে চিরকাল ঘোষণা করে এসেছে। 'কবর' কবিতায় জীবনের এ মৌল সত্যের স্বীকৃতি আছে বলেই তা অসামান্য সৃষ্টি হতে পেরেছে।

জীবনে স্নেহ, প্রেমের স্থান নিয়ে বিতর্ক নেই কোন কালে। সংসারের শত আবিলতার মধ্যেও এ স্বর্গীয় অনুভূতিই জীবনকে মধুর করে তোলে। কাব্যে-সাহিত্যে যুগ যুগ ধরে স্নেহ-প্রেমের মহিমাই কীর্তিত হয়ে এসেছে। স্নেহের মৃত্যুঞ্জয়ী রূপের আরতি করেছেন কবিরা—সকল প্রতিকূলতা জয় করে প্রেম-স্নেহ আপন প্রতিষ্ঠা খুঁজেছে সর্ব যুগে। এ নিয়ে উৎকৃষ্ট কবিতাও সৃষ্টি হয়েছে। বৈষ্ণব কাব্যে, লৌকিক প্রণয় আখ্যায়িকায়, মঙ্গল কাব্যে আমরা প্রেমের মহিমা ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করি। কিন্তু স্নেহ-প্রেমের অনুভূতি নিয়ে সূক্ষ্ম চিন্তা আধুনিক কালের পূর্বে তেমন দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'যেতে নাহি দিব' যেন স্নেহেরই অন্তরের বাণীরূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে আধুনিক মনের কাছে। মৃত্যু-তাড়িত পৃথিবীতে স্নেহের সে চিরন্তন বাণী 'যেতে নাহি দিব' কথাটির তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ স্নেহের চিরন্তন বাণীটিকে তাৎপর্যময় করে তুলে ধরবার জন্যেই একটা সাংসারিক বিদায় দৃশ্যের এবং ঐ উপলক্ষে পারিপার্শ্বিকে তার প্রতিক্রিয়ার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তাতে মৃত্যুর ছায়াপাত ঘটেছে; কিন্তু মৃত্যু সশরীরে দেখা দেয় নি। কবির স্নেহ-সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা এখানে জটিল দার্শনিক চিন্তার অনুবর্তী হয়েছে। 'কবর' কবিতায় স্নেহের কোন তত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রয়াস নেই। তৎপরিবর্তে মৃত্যুশোকের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্নেহের বেদনাকরুণ রূপটিকেই তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। 'মৃত্যুতেই সব কিছুর শেষ' এ কথা 'কবর' কবিতার স্নেহাতুর বৃদ্ধ কখনই বিশ্বাস করতে পারে নি। মৃত্যুর উপরে স্নেহের জয় ঘোষণা করেই যেন বৃদ্ধের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে একটি সুন্দর প্রার্থনা—যেন তার সকল প্রিয়জনের জন্যে 'ভেস্ত নাজেল হয়'। যাকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব হল না, তাকে বেহেশ্‌তে চিরন্তন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখার কামনাটি কিন্তু সম্পূর্ণ মানবীয়। মোট কথা 'কবর' কবিতায় কবরের (অজ্ঞাত মৃত্যুর) উপর মানবীয় স্নেহেরই জয় স্বীকৃত হয়েছে। কবিতাটির অন্যতম আকর্ষণ এই যে, এতে পল্লীজীবন বাস্তবের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি আছে—তা শুধু বিষয় উপস্থাপনায় নয়, ভাষাভঙ্গিতেও পরিস্ফুট। জীবনের প্রতি পরিপূর্ণ। বিশ্বস্ততা বজার রেখে কবি এ দুঃসহ শোকচিত্র অঙ্কন করেছেন। ফলে তা আমাদের মনে একটা দাগ কেটে যায়। মৃত্যুর ভয়াবহতা সত্ত্বেও, এ কবিতায় স্নেহ কিন্তু আপনার অধিকারকে বার বার প্রতিষ্ঠিত করেছে। সোচ্চার না হলেও স্নেহ আপন আচরণেই ব্যঞ্জিত করেছে তার অমর বাণী—

"আমি ভালোবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে সরে যেতে পারে।"

এ অটুট বিশ্বাসই তো এত শোকের মধ্যেও বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। বস্তুতঃ 'কবর' কবিতা মৃত্যু-দংশনে জর্জরিত স্নেহেরই যেন ভাষ্য। 'কবর' কবিতার মাধুর্য শুধু এর বিষয়ের সার্বজনীন আবেদনে সীমাবদ্ধ নয়; এর ভাষা ও ছন্দ সে মাধুর্যেরই পরিপোষকতা করেছে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতাটি ধীরলয়ে ব্যথাতুর মনের বেদনাভারকেই যেন বহন করে চলেছে। কবিতাটির ভাষা সম্পর্কে বলা চলে যে, জসীমউদ্‌দীন এ ক্ষেত্রে আশ্চর্য পরিমিতিবোধ ও ঔচিত্যবোধ দ্বারা চালিত হয়েছেন। 'কবর' কবিতায় বর্ণিত চিত্র পল্লীর মুসলমান সমাজের থেকেই গৃহীত। সে সমাজের বিশেষ পারিপার্শ্বিকটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি যথার্থ শিল্পীর ন্যায় যথেষ্ট সংখ্যক সুপ্রচলিত আরবী ফার্সী শব্দ প্রয়োগ করেছেন। সে প্রয়োগ স্বাভাবিক হয়েছে বলেই কবিতাটির কাব্যমাধুর্য যথেষ্ট বেড়েছে। সবচেয়ে বড় কথা কবিতার ভাষায় দুঃসহ শোকাবেগকে পুরে দেওয়ার যে দুর্লভ ক্ষমতা তিনি দেখিয়েছেন, তা তাঁর শিল্পীসত্তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে। লক্ষ্য করার বিষয়

পল্লীজীবন ও পারিপার্শ্বিকতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিয়েও জসীমউদ্‌দীন এই কবিতায় পল্লীর বাক্‌ভঙ্গিকে যথাযথ গ্রহণ করেন নি। সৌন্দর্যের অনুরোধে ও উচ্চতর কাব্যিক সার্থকতার খাতিরেই তিনি ভাষার যথেষ্ট পরিমার্জন করেছেন।

কবিতাটি এক পল্লীবৃদ্ধের দুঃসহ শোকচর্যার ছবি হলেও, পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির বর্ণনায় কোথাও সৌন্দর্য দৃষ্টির হানি ঘটে নি। জসীমউদ্‌দীন যথার্থ শিল্পী বলেই জাহান্নামের বুকে বসেও ফুলের হাসি হাসতে পেরেছেন। কবিতায় বর্ণিত শোকাবহ দৃশ্যের বর্ণনা পাঠকের মনকে ভারাক্রান্ত করে তুললেও, কবির সৌন্দর্যদৃষ্টিকে ঝাপসা করে ফেলে নি। তাই বিষয়ের কারুণ্য সত্ত্বেও 'কবর' কবিতা কাব্য-সৌন্দর্যে পাঠকের মনকে জয় করতে পেরেছে।

'পল্লীজননী' 'রাখালীর আর একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। শিল্প সামর্থে এ কবিতার স্থান বিখ্যাত 'কবর' কবিতার পাশেই। মাতৃস্নেহের এমন হৃদয়স্পর্শী অথচ একান্তরূপে বাস্তবধর্মী চিত্র বাঙলা কাব্যে বড় একটা দেখা যায় না। এখানেও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্নেহ আপন বৈভব প্রকাশ করেছে। পল্লীজীবন বাস্তবের পটভূমিতে মাতৃস্নেহের যে করুণাঘন রূপ এ কবিতায় ধরা দিয়েছে, তা বাঙলা কাব্যে প্রায় একক। পরিবেশের অনাত্মীতাকে তুচ্ছ করে মাতৃস্নেহ এখানে আপন হৃদয়-ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়েছে। পল্লীকবি যথার্থই বলেছেন ঃ

"নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ
জগত ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।"

যে আধারে ফেলেই তাকে দেখা যাক না, মাতৃস্নেহের রূপ সর্বত্র এক। রাজরাণী থেকে ভিখারিণী এখানে একই সারিতে দণ্ডায়মান। বাইরে তাদের পার্থক্য যাই থাক না কেন, সন্তান-স্নেহের নিবিড় ঐক্যে তারা একীকৃত। সমাজিক অবস্থান, বিত্তগত সংস্থান ও পরিবেশের বিভিন্নতার জন্য পুরুষের মতো নারী-সমাজেও পরস্পরের মধ্যে অন্তহীন ব্যবধান হয়তো রয়েছে। কিন্তু সন্তানস্নেহ মাতৃত্বের এক অখণ্ড রূপ নিয়েই যেন বিশ্বের ঘরে ঘরে বিরাজ করে। স্নেহকে যখন আমরা সকল পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিযুক্ত করে দেখি, তখন তা এক অদ্বর ভাবমূর্তি ; তা মনকে আকর্ষণ করলেও তেমন দোলা দেয় না। কিন্তু জীবন-বাস্তব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার বিশেষ কোন কোন রূপ আমাদের মনকে মাঝে মাঝে এমন ভীষণভাবে নাড়া দেয় যে, তা আমাদের চেতনার একটা অনন্য-সাধারণ অভিজ্ঞতারূপেই প্রতিভাত হয়। 'পল্লীজননী' মাতৃস্নেহের তেমনি এক রূপের আলেখ্য।

এ কবিতায় কবি দারিদ্র-দুঃখক্লিষ্ট এক পল্লীনারীর সন্তানস্নেহের এক অপরাজেয় রূপের ছবি এঁকে নারীর মাতৃরূপেরই যেন বন্দনা করেছেন। দারিদ্র, ব্যাধি ও অকালমৃত্যুর এক শ্বাসরোধকারী পরিবেশে রুগ্ন সন্তানের শিয়রে অতন্দ্র প্রহরায় রত জননীর 'স্নেহ-বিহ্বল , করুণায় ছলছল' রূপের যে ছবি জসীমউদ্‌দীন অঙ্কন করেছেন, তা সাধারণ জীবন-ছবি হলেও উপযুক্ত শিল্পীর হাতে এক অসাধারণ মহিমা লাভ করেছে। পরিবেশ যেখানে স্নেহের প্রতিবাদী, সেখানে স্নেহের স্বাভাবিক প্রকাশ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতাই বটে। জসীমউদ্‌দীন 'পল্লীজননী'র যে ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন তার মহিমা বেড়েছে প্রতিবেসের অকরুণ রূপের জন্যেই। সন্তানদের জন্যে মায়ের স্নেহ এখানে সূর্য কিরণের মতো, ঝরণাধারার মতো অকৃপণভাবে বর্ষিত হওয়ার সুযোগ পায় না—দারিদ্র , ব্যাধি, অকাল-মৃত্যু তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। তাকে সংগ্রাম করে পথ বের করে নিতে হয় পদে পদে। অন্তর মাধুর্য প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশও জোটে না। সাংসারিক মানুষের স্নেহ তাই সব সময় প্রশান্ত হাস্যে বিচ্ছুরিত নয়; জীবন-বাস্তবের রূঢ়তায় অনেকটা ম্লান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে 'মরণ পীড়িত' এ প্রেম-স্নেহ, বিষণ্ন নয়ন-পরে অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল

আশঙ্কাভরে চিরকম্পমান।' 'পল্লীজননী'র স্নেহ-ছবিটিও ঐরূপ অশ্রুটলমল, বেদনায় কম্পমান। তবে বাস্তব প্রতিবেশের রূঢ়তা সাংসারিক স্নেহ-ছবিকে ম্লান করে দিলেও , তাই অনেক সময় স্নেহের নুতন ঐশ্বর্যের সন্ধান দেয় আমাদের । স্নেহের সে ঐশ্বর্য হচ্ছে সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আপন মহিমাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে ক্লান্তিবিহীন সংগ্রামী মনোভাব। স্নেহের এ ঐশ্বর্য সাধারণ অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে না। বাঙলার পল্লীর ঘরে ঘরে যুগ যুগ ধরে দারিদ্র-ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মাতৃস্নেহ এমনি ভাবে আপন ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়ে এসেছে। কিন্তু দেশের কবি-সাহিত্যিকের দৃষ্টি এদিকে বড় একটা পড়ে নি। জসীমউদ্‌দীনই প্রথম তাকে অবহেলার স্তূপ থেকে উদ্ধার করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাঙলা কাব্যে।

'পল্লীজননী' সাধারণ পল্লী-মানুষের দারিদ্র্য-ব্যাধি কন্টকিত হতাশাচ্ছন্ন স্নেহাশ্রু টলমল জীবনেরই এক অসাধারণ আলেখ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'স্বর্গ হইতে বিদায়'-এ 'দীনহীনা অশ্রু-আঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা'র যে কল্পনা করেছেন, আমাদের 'পল্লীজননী'র চেয়ে তার সত্যতর রূপ আর হতে পারে না। শত দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও পল্লীর কুটিরে কুটিরে এই স্নেহাতুরা জননী স্নেহের দীপশিখা জ্বেলে তাকে একটু রমণীয় ও সহনীয় করে তোলার জন্যে প্রাণপাত করে যাচ্ছে যুগ যুগ ধরে। তবু কি তার স্বস্তি আছে! দারিদ্র্যের কশাঘাতে তার সকল কামনা-কুসুমই ঝরে পড়েছে; শুধু তার সম্বল সন্তানস্নেহ। ঐ সন্তানস্নেহের সুধা ভরে রেখেছে তার অন্তরকে। সেখানেও মৃত্যু তার প্রতিবাদী—কখন শ্যেন পাখীর মতো স্নেহের দুলালকে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যায় সে আশঙ্কায় কম্পমান তার হৃদয়। তাই তো সন্তান-স্নেহাতুরা 'পল্লীজননী'র ছবিটি বড় করুণ, বড় মর্মস্পর্শী। সন্তানকে বক্ষে পেয়ে তার শান্তি নেই—কখন যে তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে কে জানে। তাই তো জননী সন্তান শিয়রে যেন সব সময়ই প্রহরারতা—

সারাক্ষণ জাগি রবে কম্পমান প্রাণে,
শঙ্কিত অন্তরে, ঊর্ধ্বে দেবতার পানে
মেলিয়া করুণ দৃষ্টি, চিন্তিত সদাই—
যাহারে পেয়েছি তারে কখন হারাই[১]

'পল্লীজননী' কবিতায়ও আমরা মহিমান্বিত মাতৃত্বের সেই করুণ মুখচ্ছবিই প্রত্যক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যা ভাবের এক রসমূর্তি রূপে উপস্থিত হয়েছে, জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় তা জীবন-বাস্তব দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। দারিদ্র্য, ব্যাধি, অকাল মৃত্যুর শ্বাসরোধকারী পল্লীপরিবেশে আমাদের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে জসীমউদ্‌দীন মৃত্যু ব্যথা-কন্টকিত মাতৃস্নেহের যে রূপ দেখিয়েছেন, তার মতো হৃদয়স্তম্ভনকারী দৃশ্য বড় কমই আছে। এমনিতেই সর্বব্যাপী দারিদ্র্য-দুঃখ সব কিছুকে সমাচ্ছন্ন করে রয়েছে। তারই মধ্যে ঝড়ের বাতাসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় আঁচলের আড়াল করা প্রদীপটির মতো, মৃত্যুব্যাধির কবল থেকে সন্তানকে বাঁচানোর জন্যে জননীর করুণ প্রচেষ্টার প্রায় নিশ্চিত ব্যর্থতা আমাদের মানবিক সত্তাকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দেয়। একটা দমকা বাতাসের ন্যায় জীবনের আশার মৃৎপ্রদীপটিকে নিবিয়ে দিয়ে, আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে একটা সর্বব্যাপী অন্ধকারে নিক্ষেপ করে।

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'চিত্রা 'স্বর্গ' হইতে বিদায়' কবিতা দ্রষ্টব্য।

'পল্লীজননী' কবিতাটি যেন অবহেলিত পল্লীর জীবন অধ্যায়েরই একটি পাতা—কেমন করে যেন কালের হাওয়ায় ভর করে জসীমউদ্‌দীনের হাত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। দারিদ্র-দুঃখক্লিষ্ট পল্লীজননীর ছবি যে এমন অসাধারণ তাৎপর্য মণ্ডিত হয়ে উঠতে পেরেছে—তার মূলে রয়েছে জসীমউদ্‌দীনের সুউচ্চ মানবতাবোধ, জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও জীবনসত্য অনুধাবনের স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি। সর্বোপরি রয়েছে জসীমউদ্‌দীনের স্বাভাবিক কবিত্ববোধ, বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি ও অনায়াস শিল্পকৌশল। কবিতায় বর্ণিত জীবনদৃশ্য অসাধারণ কিছু নয়—দীন-দরিদ্র পল্লীর সহস্র দৈন্যের মধ্যেও মাতৃস্নেহ কেমন করে যুদ্ধ করে অকালমৃত্যুর হাত থেকে সন্তানকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে, এরই একটি আশ্চর্য নিখুঁত ছবি এঁকেছেন কবি! তাঁর কবিত্ব এইখানে যে তিনি তাকে শ্বাশ্বত স্নেহচ্ছবির মর্যাদা দিতে পেরেছেন, বিশেষের মধ্যেই নির্বিশেষের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। কবিতাটি রচনায় জসীমউদ্‌দীন একাধারে চিত্রশিল্পী, ঔপন্যাসিক ও কবির কৃত উদযাপন করেছেন। পল্লীপারিপার্শ্বিকের মর্যাদা রক্ষা করেও, ভাষার গ্রাম্যতা ও ভাবের গ্রাম্যতা দুইই যথাসম্ভব পরিহার করে চলতে সমর্থ হয়েছেন। এ বর্ণনায় একদিকে পল্লীর জীবনবাস্তব সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধির পরিচয় যেমন মিলে, তেমনি মিলে তাঁর উপযুক্ত চিত্রাঙ্কন ক্ষমতার পরিচয়। শক্তিশালী চিত্রশিল্পীর ন্যায় তিনি অন্ধকার পল্লীর বুকে এক দীন-দরিদ্রের কুটিরে রুগ্ন সন্তানের শিয়রে জাগা পল্লী-নারীর যে স্নেহ করুণ ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন, তা শুধু ছবি নয়; জীবন-বাস্তব দ্বারা রীতিমতো সমর্থিত। এই উপলক্ষে বাংলার পল্লীর দৈন্যের যে ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তা মর্মান্তিক হলেও সত্য। এই দৈন্যের ছবি কুটিরে কুটিরে মাতৃস্নেহের দীপালোকে মাঝে মাঝে একটু শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠলেও তা এতই ক্ষনস্থায়ী যে তাকে সত্য বলে ভাবতেও দ্বিধা হয়। অথচ ঐ ক্ষীণ দীপালোকের মতো উজ্জ্বল সন্তানস্নেহের ছবিটির দৌলতেই পল্লী যা কিছু সামান্য মহিমা লাভ করেছে এ চিত্রে। ঘোর অন্ধকারের বুকে আলোর ন্যায় পল্লীর সর্বাত্মক দৈন্যের মধ্যে মাতৃস্নেহের ঐ দীপ শিখাটি আকর্ষণ করে। তথাপি জসীমউদ্‌দীন বর্ণিত পল্লীও শিল্পগুণের স্পর্শে আশ্চর্যরূপে সঞ্জীবিত। এঁদো ডোবা, বাঁশ বন, সুপারী বন বেষ্টিত মশকের আবাসভূমি পল্লী কবির রঙীন মনের স্পর্শ পেয়ে মাঝে মাঝে যে একটা অনাস্বাদিত মাধুর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন,—

"বাঁশ বনে বসি ডাকে কানাকুয়া, রাতের আঁধার ঠেলি,
বাদুর পাখার বাতাসেতে পড়ে সুপারীর বন হেলি,
চলে বুনো পথে জোনাকী মেয়েরা কুয়াশা কাফন ধরি"

অথবা, "পচা ডোবা হতে বিরহিনী ডাক ডাকিতেছে ঝুরি ঝুরি,
কৃষাণ ছেলেরা কালকে তাহার বাচ্চা করেছে চুরি।
ফেরে ভন্ ভন্ মশা দলে দলে ফুল ফুটে ঝরে বনে,
ফোঁটায় ফোঁটায় পাতা চোঁয়া জল ঝরিছে তাহার সনে।"

ইত্যাদি অংশের মাধুর্য বোধহয় কোন রকমেই অস্বীকার করা যাবে না। এতে পল্লীপ্রকৃতির যথার্থ রূপের আভাস যেমন আছে, তেমনি খাঁটি কাব্যের আমেজও পাওয়া যাচ্ছে তা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। আবার যখন তিনি অন্ধকারপ্রায় কুটিরে ক্ষীণ দীপালোকে সন্তান-শিয়রে বসে থাকা জননীর ছবি আঁকতে গিয়ে রোগক্লিষ্ট ছেলে ও মায়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সাংসারিক স্নেহের শত তুচ্ছ কথা উল্লেখ করে আবেগকম্পিত হয়ে ওঠেন, তখন তাঁর উপন্যাসিকসুলভ বাস্তবদৃষ্টি ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হই। দারিদ্র্য, দুঃখ-পীড়িত সামাজিক মানুষের ব্যথা-বঞ্চনার মর্মান্তিক আভাস বহন করে আনে রুগ্ন পুত্রের শিয়রে জাগা দুঃখিনী জননীর অতি সাধারণ কয়েকটি ভাবনা,--

"কত কথা আজ মনে পড়ে যায়, গরীবের ঘর তার,
ছোটখাট কত বায়না ছেলের পারে নাই মিটাবার।
আড়ঙের দিনে পুতুল কিনিতে পয়সা জোটে নি তাই।
বলেছে আমরা মুসলমানের আড়ঙ দেখতে নাই"।

দরিদ্র মুসলমান ঘরের একটি নারীর এই সামান্য দুঃখের কথা, অনেকেই হয়তো ভেবে দেখা আবশ্যক মনে করে না ; কিন্তু দরিদ্র্য পল্লীজননীর মর্মবেদনার এ ভাষা পল্লীর শোচনীয় দারিদ্র্যের যে আভাস বহন করে আনে, তা কোন মতেই উপেক্ষার ব্যাপার নয়। জননীর এ বেদনার্ত কথায়, সহস্র সহস্র পল্লী-মানুষের মূল বেদনাই যেন ভাষা পেয়েছে। এখানে জসীমউদ্‌দীন উপন্যাসিকের ন্যায় জীবনের দুঃখ-বেদনা কন্টকিত রূপকেই তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই বলে পল্লীজননী কবিতায় কাব্য-মাধুর্য এতটুকু কমেছে মনে করলে ভুল করা হবে। কবিতায় বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার বিবৃতি অনেক অনেক ক্ষেত্রেই গদ্যের কাছ ঘেঁষে গেলেও সমগ্রের সাথে মানিয়ে নিয়ে, তাও অনেকটাই কবিত্বের সামগ্রী হয়ে উঠেছে ; স্নেহভারাতুর জননীর ভাবনা-ব্যাকুল হৃদয়ের যে তরঙ্গদোলা কবিতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রসারিত, তাই অতি তুচ্ছ বাস্তব বর্ণনাকেও কেমন যেন হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় ভাবনার অনুসঙ্গী করে তুলেছে। এক অসাধারণ উচ্চাঙ্গের কবিত্ব-শক্তি থাকলে পরেই অতি সাধারণ অভিজ্ঞতা, ভাবনা, দৃশ্য ইত্যাদিকে কবিত্বের যাদুস্পর্শে অসাধারণ মহিমা দান করা যায়। অর্থাৎ আপাত তুচ্ছ জিনিসও সকলের আদরের সামগ্রী হয়ে ওঠে। পল্লীজননীতে জসীমউদ্‌দীন সেই দুর্লভ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

'পল্লীজননী' কবিতায় সন্তান বিয়োগশঙ্কায় শঙ্কিত পল্লী-নারীর অসহায় রূপটি যেন পারিপার্শ্বিকতার অসহায়তাকেই আরও পরিস্ফুট করে তুলেছে। গভীর রাত্রি, বাইরে ঘোর অন্ধকার, চারিদিক নিস্তব্ধ—'নিশ্বাস ফেলি তাও শোনা যার' এমনি দারুণ সে স্তব্ধতা। কোথাও কাহারও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এমনি পারিপার্শ্বিকে পল্লীর কুটিরে রুগ্ন ছেলেদের শিয়রে জননী জেগে আছেন—রাত জাগার ক্লান্তিতে, দুশ্চিন্তায় করুণ চাহনি 'ঘুম ঘুম যেন ঢুলিছে চোখের পাতা'। ছেলের শিয়রের কাছে নিবু নিবু প্রদীপ বাতাসে ঘুরেঘুরে জ্বলছে। আর 'তারি সাথে সাথে বিরহী মায়ের একেলা পরাণ দোলে', নিবু নিবু প্রদীপ রুগ্ন ছেলের নিবু নিবু জীবনেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে যেন প্রথম থেকেই। এ অবস্থায় মার পরাণে দুশ্চিন্তার দোলা লাগবে তাতো স্বাভাবিক। পারিপার্শ্বিকে উৎসাহজনক কিছুই নেই। বাইরে মশার ভন ভন শব্দ শোনা যাচ্ছে, ডোবা থেকে পচা পাতার গন্ধ ভেসে আসছে। শীতের রাত্রি, ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে শীতের হাড় কাঁপান বাতাস ঢুকছে। ছেলের শিয়রে বসে মা মনে নানা দুর্ভাবনার যন্ত্রণা ভোগ করছে।

এদিকে রোগের জ্বালায় ছেলের ঘুম আসে না। সে কেবল মাকে জিজ্ঞেস করে—কত রাত আছে, কখন ভোর হবে, এই সব প্রশ্ন। শুয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না। মায়ের ঘুম যাওয়ার অনুরোধে ছেলে রেগে জানায় তার ঘুম আসে না। মা তার মুখে চুমো খায়, গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়—হৃদয়ের স্নেহ যেন মরণমুখী ছেলের জন্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। পুত্রের কল্যাণ কামনায় জননী 'মসজিদের মোমবাতি মানে', 'দরগায় মানে দান' আল্লা, রসুল ও পীরের দোয়া মাগে ছেলের জন্যে। ভরসা হয় না, চোখের জলে বুক ভেসে যায় তার। মন তার কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। বাঁশ বনে কানাকুয়া ডাকে, সুপারীর বনে বাদুরের পাখা ঝাপটানির শব্দে চমকে ওঠে সে। শীতের রাত্রি চারিদিকে কাফনের ন্যায় কুয়াশার আস্তরণ বচনা করেছে, জোনাকী পোকারা সে কুয়াশার বুকেই উড়ে বেড়াচ্ছে। মায়ের মনে অলক্ষুণে সব কথা জাগে, তার বুক কেঁপে ওঠে; পরমুহূর্তেই নিজেকে ভরসা দিয়ে বলে—'বালাই, বালাই, ভালো হবে যাদু।'

হঠাৎ আবার তার ভাবনায় ছেদ পড়ে ছেলের কথায়। মাকে সে প্রশ্ন করে, সে যদি ভাল হয়ে যায় তাহলে মা তাকে খেলার সাথী করিমের সাথে খেলতে মানা করবে না তো? আবার সাথে সাথেই যখন মাকে জিজ্ঞেস করে, 'রহিম চাচার ঝাড়ায়' সে অবিলম্বে ভাল হয়ে উঠতে পারে কি না তখন মা বড় আগ্রহ ভরে সে কথাগুলো যেন প্রাণ দিয়ে গেলে—সে তো তাই চায়। কিন্তু তা যে হবার নয়! ঐখানেই মায়ের দুঃখ। ছেলেটি রোগের ঘোরে নানা কথা বলে চলে। কথায় শিশুর আবদারের সুর বেজে ওঠে,—

"শোন মা, আমার লাটাই কিন্তু রাখিও যতন করে,
রাখিও ট্যাপের মোয়া বেঁধে তুমি সাতনরি সিকা ভরে।
খেজুরে গুড়ের নয়া পাটালিতে হুডুমের কোলা ভরে'
ফুলঝুরি সিকা সাজাইয়া রেখো আমার সমুখ পরে।"

গরীব পল্লীসন্তানের এ আবদার বড় সুন্দর—তার ছোট ছোট বাসনাগুলোর প্রকাশ বড় মানবিক। এতে শিশু মনস্তত্ত্বের পূর্ণ স্বীকৃতি রয়েছে।

কথা বলতে বলতে শিশু চুপ করে যায়। হয়তো একটু ঘুমিয়েও পড়ে। মা ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। বাইরে থম থম কাল রাতের বুকে জোনাকী পোকার নৃত্য চলে। এ কাল রাতের ইঙ্গিত বড় সুদূরপ্রসারী। মৃত্যুপথযাত্রী ছেলের শিয়রে বসে মায়ের মনে আজ কত সামান্য তুচ্ছ কথাই ভেসে আসছে। কবে ছেলে মাকে না বলে দূর বনে চলে গিয়েছিল। সন্ধ্যায়ও না ফেরাতে মায়ের মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ ছেলের কণ্ঠের গান শোনা গেল। গাইতে গাইতে কোচরে বেথুল নিয়ে আসছে। রেগে গিয়ে মা তাকে খুবই গাল-মন্দ করেছিল। আজ ছেলে তার বিদায় নিতে বসেছে। ছোটখাট বহু বঞ্চনার স্মৃতি ভেসে আসে মায়ের মনে। দারিদ্র্যের তাড়নায় ছেলের আরও কেনার সাধটিও সে মিটাতে পারে নি—ছেলেকে 'মোসলমানের ছেলের সামান্য পুতুল দেখিতে নাই' বলে বুঝ দিয়েছে। ছেলের অবুঝ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মায়ের মন ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। আজ দারুণ রোগে ছটফট করছে ছেলে। সামান্য ঔষধ পর্যন্তও জোটে নি। ফলে ছেলে তার মৃত্যুর মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে—'ঝড়ে কাঁপে যেন নীড়ের পাখীটি জড়ায়ে মায়ের ডানা।' দরিদ্র্য মায়ের মর্মযাতনা যে কি ভীষণ, তা সেই শুধু জানে। রাত্রি ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে আসে। ঘরের চালে ভুতুম ডেকে ওঠে—অলক্ষুণে শব্দে পুত্রের মৃত্যুর পদধ্বনিই যেন মা শুনতে পান। বুক কেঁপে ওঠে তার—দূর দূর করে ভুতুম তাড়িয়ে মা যেন মৃত্যুকেই দূর করে দেওয়ার প্রয়াস পায়। বাইরে বাচ্চাহারা ডাহুকীর ডাক শোনা যাচ্ছে, বনে ফুল ফুটে

ঝরে যাচ্ছে, পাতা চোয়া শিশির জল ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে। ভীষণ কুয়াশায় দিগন্ত সমাচ্ছন্ন। এমনি পরিবেশে ছেলের শিয়রে মা একা জেগে আছেন 'সম্মুখে তার ঘোর কুঝ্ঝটি মহাকাল রাত পাতা' স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এখানে ভাবী ঘটনার আভাস। তারপরেই যখন কবি বলেন,

"পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল,
আঁধারের সাথে ঝুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল।"

তখন বুঝতে পারি ছেলের জীবন প্রদীপ নিভিবার বেশী বাকী নাই। তেলহীন প্রদীপের ন্যায় রোগের সাথে যুদ্ধে তার প্রাণশক্তিও নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। এখানেই কবিতাটি শেষ হয়েছে। নিবু নিবু দীপের সংকেতে ছেলেটির আসন্ন মৃত্যুর যে আভাস কবিতার প্রথমেই পাওয়া গিয়েছিল, তা স্পষ্ট মৃত্যুর সঙ্কেতরূপে দেখা দিয়েছে কবিতার শেষে। কবিতাটির এ সমাপ্তি বড় ইঙ্গিতপূর্ণ—কবিতা শেষ হয়ে যায়, আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে 'অশ্রু আঁখি, ম্লানমুখী জননীর করুণ মুখচ্ছবি'। তার সকল প্রযত্ন, অন্তরের সকল প্রার্থনাকে ব্যর্থ করে দিয়ে মৃত্যু ব্যঙ্গভরে তারি চোখের সামনে তার ছেলেকে কোন্ অনিদেশ অন্ধকারের রাজ্যে ঠেলে দিল কে জানে? রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায়,—

"শুষ্ক তুচ্ছ ধূলিসম উড়ে চলে যায়
একটি নিশ্বাসে তার আদরের ধন।
অশ্রু জলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথিবী তলে..."

বড় প্রাণস্পর্শী, বড় করুণ সন্তানহারা জননীর এ ছবি। জসীমউদদীন 'পল্লীজননী' কবিতায় এক পল্লীনারীর মধ্যে মাতৃত্বের এ করুণ রূপকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। সংসারের শত অভাব ও দৈন্যের মধ্যেও সন্তানস্নেহের সুধায় নারীর জীবন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অভাগিনী পল্লীবালার সে সামান্য সুখও নির্মম বিধাতার যেন সহ্য হল না। তার বুকের নিধিকে কেড়ে নিয়ে এক নিষ্ঠুর খেলা খেললেন তিনি। তবু মাতৃত্বের বোধহয় পরাভব নেই—দুঃখের পরীক্ষায় তা যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। 'পল্লীজননী'র মাতৃত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল বিষাদ মাখা মুখচ্ছবিটি কেউ কি কখনও ভুলতে পারে? সংসারের ঘরে ঘরে সন্তান শিয়রে চিরকাল জেগে রয়েছে এ মাতৃমূর্তি যুগ যুগ ধরে মৃত্যুকে অতিক্রম করে।

'পল্লীজননী' কবিতাটির ভাষা ও ছন্দ কবিতার বক্তব্যের সুষ্ঠু প্রকাশের উপযোগী। এখানেও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অপেক্ষাকৃত ধীর লয়ে ব্যথা ভারাক্রান্ত মাতৃহৃদয়ের প্রকাশটি স্বাভাবিক হয়েছে। কবিতাটিতে পল্লী পারিপার্শ্বিকের যথার্থ আবহ সৃষ্টির অনুরোধে কবি প্রচুর গ্রাম্য ও দেশজ শব্দ ব্যবহার করেছেন। মুসলিম সমাজের ধ্যান-চিন্তার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে প্রয়োজনীয় আরবী-ফার্সী শব্দও প্রয়োগ করেছেন। অথচ ভাষার পরিমার্জনার দিকেও যে কবির বেশ নজর রয়েছে তাও বুঝতে কষ্ট হয় না। কবিতাটিতে মৃত্যু-বিচ্ছেদের আভাস ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে বাস্তব বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কবি খুব সহজ অথচ অতি সুন্দর এবং ইঙ্গিতময় উপমা ও বাক্য প্রয়োগ করেছেন। এগুলো কবির স্বাভাবিক শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতারই পরিচায়ক। অতি সাধারণ জীবন-বাস্তবকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কবি কাব্যব্রত বিস্মৃত হন নি। তাই অতি সাধারণ শব্দ-দৃশ্যকে ইঙ্গিতময়তা দান করে সব সময় চেষ্টা করেছেন কাব্যমাধুর্য বাড়ানোর। তাতে তিনি যথেষ্ট সফলকামও হয়েছেন। জীবনের প্রতি মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধা দেখাবার উপযুক্ত বোধ আছে বলেই জসীমউদদীন অবলীলাক্রমে অতি সাদামাটা তুচ্ছ জীবনদৃশ্যকেও কাব্যিক মাধুর্য দানে সক্ষম হয়েছেন তার কাব্যে ও কবিতায়।

'পল্লীজননী' তাঁর এই শক্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

'রাখালী'র অবশিষ্ট দুটি কবিতা 'মা' ও 'পাহাড়িয়া'তেও আমরা স্নেহের করুণ মুখচ্ছবিই যেন প্রত্যক্ষ করি। ঐ কবিতা দুটির কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। 'কবর' ও 'পল্লীজননী'র তুলনায় এদের শিল্পসৃষ্টি হিসাবে মূল্য নিশ্চয়ই কম। তবু এসব স্নেহচ্ছবি অঙ্কনের পিছনে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার ছাপ থাকায় চিত্রগুলো কিছুটা সজীব বলেই মনে হয়। সাংসারিক স্নেহের প্রতিমূর্তি 'মা'য়ের অবর্তমানে সংসার তার মাধুর্য কি ভাবে হারিয়ে ফেলে, সে স্নেহ-নির্ঝর শুকিয়ে গেলে তার যে কিরূপ দুরবস্থা হয়, তাই কবি 'মা' কবিতায় বলতে চেয়েছেন। কবিতাটির বক্তব্যভঙি থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কবি এক বাস্তব অভিজ্ঞতারই বিবৃতি দিচ্ছেন এ কবিতায়। সে বিবৃতি রীতিমতো দীর্ঘ। কবিত্বরসের পরিবর্তে তাতে কাহিনী বর্ণনের স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করা যায়। 'মা'র বর্তমানে সংসার ছিল হাসি-খুশীতে ঝলমল, কিন্তু তার বিদায়ে সব জানি কেমন বিষাদ করুণ হয়ে গেল। কবি এ সংসার-দৃশ্যের সাক্ষী। এ করুণ দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে কবি আপন স্নেহাতুর মনের ঐশ্বর্যকে উজার করে দিয়েছেন। দীর্ঘ কবিতাটিতে এক-আধ জায়গায় কাব্যমাধুর্যের সন্ধান পাওয়া গেলেও সামগ্রিকভাবে 'মা' কবিতাটি রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি হতে পারে নি। এর কারণ কবির মন এখানে ভাবকেন্দ্রের দিকে নিবদ্ধ নয়। আপন শত তুচ্ছ অভিজ্ঞতার বিবৃতি দানের উৎসাহে লক্ষ্যভ্রষ্ট।

'পাহাড়িয়া' কবিতায় সাংসারিক স্নেহেরই আর এক করুণ রূপের সাক্ষাৎ পাই। যে পাত্রেই ধারণা করা যাক না, স্নেহের রূপ যে একই তাও এ কবিতায় বর্ণিত করুণ আখ্যায়িকাটি পাঠে হৃদয়ঙ্গম হবে। মৃত্যু এখানেও স্নেহের প্রতিবাদী। তাই স্নেহের রূপ এখানেও করুণ। এ কবিতায়ও কবির বাস্তবাভিজ্ঞতার ছাপ বড় বেশী স্পষ্ট। পাহাড়ী পথে (বোধহয় দার্জিলিংয়ের; অন্ততঃ কবির বর্ণনা থেকে তাই মনে হয়) বেড়াতে বেড়াতে কবি পাহাড়ী ফুলের মতই সুন্দর একটি মেয়েকে দেখতে পেয়েছিলেন।। সঙ্গে তার বুড়ো বাপ। সুন্দর মেয়ে নানা কথা বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। দুই পাশে পশু, পাখী, ফুল, লতাপাতা দেখতে দেখতে আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কবি অনেক দিনই তো পথে তাকে দেখতে পেয়েছেন। কবির বড় ভাল লেগেছিল মেয়েটিকে। তাকে দেখবার জন্য মন তার আকুল হয়ে থাকে। একদিন সন্ধ্যায় পাহাড়ী পথে পাহাড়ী মেয়ের বসন পরে, গলে একরাশ লাল সাদা নীল পাথরের মালা পরে মেয়েটিকে চলে যেতে দেখলেন কবি একা একা—কবির মনে সে দৃশ্য দাগ কেটে বসেছিল। তীব্র আকর্ষণ বোধ করলেন কবি মেয়েটির রূপে। তাকে না দেখতে পেলে কবি কেমন যেন অসহায় বোধ করেন। নানা ছল করে পথ চলার ছলে প্রতিদিন মেয়েটিকে দেখার ইচ্ছা করেন।

এমনি করে কিছু দিন গেল। তারপর ছন্দপতন ঘটল। তিন চার দিন মেয়েটিকে আর দেখা গেল না। একদিন কবি তার পিতার কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, তার এক মাত্র ঐ মেয়েটি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত; বিশেষ করে একা একা তার বড় কষ্ট। এই শুনেই কবি প্রচণ্ড আঘাত পান—চোখে তার জল এসে যায়। কোন রকমে সামলিয়ে নিয়ে চলে আসেন। পথের ধারে বসে বেদনা-হত চিত্তে ভাবেন মানুষের পরিণামের কথা। এতটুকু সোনার মেয়ের বুকে মৃত্যুর কীট বাসা বেঁধেছে! ভাবতেও কবির প্রাণ ফেটে যায়।

এক অপ্রতিরোধ্য স্নেহাকর্ষণে কবি প্রতিদিন ছুটে যান মেয়েটির বাড়ীর দিকে, জানালার পথ দিয়ে দেখেন মৃত্যুপথযাত্রী স্নেহকুসুমটিকে। তারপর একদিন সব শেষ হয়ে যায়। বড় করুণ সে দৃশ্য। সে বিদায় দৃশ্যের কারুণ্য আরও তীব্র হয়ে উঠেছে মেয়েটির ছোট ছোট সাধ

আকাঙ্ক্ষার আশ্চর্য প্রকাশে এবং মৃত কন্যার জন্য বৃদ্ধ পিতার আশ্চর্য করুণাবোধের প্রকাশে। কন্যার মৃত্যুতে বিপর্যস্ত বৃদ্ধের রূপের ইঙ্গিত দিয়েই কবিতাটি শেষ হয়েছে--'মৃণাল দণ্ড জলে ঝাপটায়, ছিন্ন কুসুম কলি।' বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র স্নেহের সন্তানহারা পিতার অবস্থার এর চেয়ে সত্যতর রূপ আর কি হতে পারে?

'কবর' ও 'পল্লীজননী'র মতো এ কবিতায়ও কবি স্নেহের ট্র্যাজেডি করুণ রূপের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তবে পূর্বোক্ত দুইটি কবিতার শৈল্পিক সার্থকতা এখানে অনুপস্থিত। যদিও এখানে সেখানে কবিপ্রতিভার বিদ্যুৎচমক লক্ষ্য করা যায়, তবু সামগ্রিক বিচারে এ কবিতা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হতে পারে নি। 'কবর' ও 'পল্লীজননী'তে জসীমউদ্‌দীন মানুষের বাস্তব জীবনেরই দুঃখ-ব্যথার কথাকার, সেখানে তিনি শিল্পী। নিরাসক্তি রক্ষা করতে পেরেছেন বলেই কবিতা জমজমাট হয়েছে বেশী। পক্ষান্তরে 'মা' ও 'পাহাড়িয়া কবিতায় কবি অনেকটা আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে পড়েছেন। ফলে কবিতা দুটোর গঠনেও অনেকটা শৈথিল্য এসে গিয়েছে—কবিতা দুটি অনাবশ্যক রূপে দীর্ঘ হয়েছে; দুঃখবোধ এখানে অনুভূতি-গাঢ় না হয়ে ফেনায়িত ভাবোচ্ছ্বাস রূপে দেখা দিয়েছে। তা আমাদের মনকে তেমন নাড়া দেয় না। 'কবর' ও 'পল্লীজননী'তে কবি মুখ্যতঃ চিত্র এঁকেছেন—সে চিত্র শিল্পীর নিষ্ঠার পরিচয় বহন করে, তা অনায়াসে আমাদের মনে দাগ কেটে বসে। 'মা' ও 'পাহাড়িয়া' কবিতায় কবি মুখ্যতঃ নিজ অভিজ্ঞতার বিবৃতি দিয়েছেন—চিত্র সেখানে গৌণ। তার অভিজ্ঞতাও এমন কিছু অসামান্য নয়, কবি রোমান্টিক মনের স্পর্শ ঘটিয়ে তাকে একটু আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করেছেন মাত্র। মোট কথা কাহিনীধর্মী অভিজ্ঞতার বিবৃতি-সর্বস্ব 'পাহাড়িয়া' কবিতায় কবি শিল্পীসুলভ সংযত ও তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নি। 'রাখালী'র কবিতাগুলোর আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করছি। এ আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, 'রাখালী' জসীমউদ্‌দীনের প্রথম কাব্য হলেও পরিণত শিল্পীসৃষ্টি হিসেবে গণ্য হবার দাবি রাখে। 'কবর' ও 'পল্লীজননী'র মতো অপূর্ব রসঘন কবিতা এ পুস্তকেই আমরা পেয়েছি। আবার পল্লীগীতিকার জসীমউদ্‌দীন, লোকনাট্য শিল্পী জসীমউদ্‌দীন, পল্লীনর-নারীর প্রেম-স্নেহ ভালবাসার রূপকার কাহিনীকাব্য স্রষ্টা—জসীমউদ্‌দীনকে আমরা এখানেই ভবিষ্যতের জন্যে সার্থক প্রস্তুতি নিতে দেখি। আবার রবীন্দ্র যুগের রোমান্টিক কবিদের মতো সৌন্দর্যের অনুধ্যানে তৃপ্তি ও মুক্তি খুঁজেছেন যে জসীমউদ্‌দীন তাঁকেও প্রত্যক্ষ করি এ কাব্যে। বস্তুতঃ জসীমউদ্‌দীনের প্রতিভার যে ৈ শিষ্ট্যসমূহ তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তার সার্থক সূচনা 'রাখালী' কাব্যেই দেখা দিয়েছিল। মোট কথা 'রাখালী'কে জসীমউদ্‌দীনের সমগ্র সাহিত্য-সাধনার উপযুক্ত ভূমিকা হিসেবেই গ্রহণ করা চলে। এ কাব্যে পরিস্ফুট গুণ ও দোষ মোটামুটি ভাবে তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনারই গুণ ও দোষ হিসেবে ধরে নিলে খুব অসঙ্গত হবে না। 'রাখালী'র বাঁশী বাজিয়েই কবি পল্লীর পথে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর দুই পাশের দৃশ্যসমূহ অবলোকন করেছেন। প্রবেশ করেছেন পল্লীর অভ্যন্তরে। প্রত্যক্ষ করেছেন সাংসারিক, সামাজিক মানুষের জীবনলীলা—স্নেহে, ভালবাসায় সমুজ্জ্বল, দুঃখ-দারিদ্রে, শোকে-ব্যাধিতে বিবর্ণ তার বিচিত্র রূপকে। পল্লীপ্রকৃতির চোখ জুড়ানো শ্যামল রূপ তাঁর কাছে দেখা দিয়েছে একটা মস্ত আশ্চর্যরূপে। পল্লীসন্তান জসীমউদ্‌দীন হৃদয় সূত্রে বাঁধা পড়েছিলেন এ পল্লীর সাথে। তাইতো তাঁর কাব্যে পাওয়া যাবে পল্লীপ্রকৃতিরই স্নিগ্ধতা ও বিস্তার ; আবার তারই সংকীর্ণ শ্বাস-রোধকারী জীবন বাস্তবের রূঢ়তার ছবি। পল্লীর সীমাবদ্ধতাই তাঁর সাহিত্য-সাধনারও সীমাবদ্ধতা রূপে দেখা দিয়েছে শেষ পর্যন্ত।

নক্‌সী কাঁথার মাঠ

'রাখালী'র পরেই প্রকাশিত হয় বহু প্রশংসাধন্য কাহিনী-কাব্য 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ'। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা সম্বলিত এ কব্যটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালে। পল্লীর পটভূমিতে রচিত দুটি গ্রাম্য ছেলে-মেয়ের প্রেমের উন্মেষ, বিকাশ ও বিষাদজনক পরিণতির চিত্র এঁকেছেন কবি এ কাব্যে। ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ সমকালীন সাহিত্যরুচির কথা স্মরণ রেখেই দ্বিধাভরে লিখেছিলেন, "নক্‌সী কাঁথার মাঠ" রচয়িতা শ্রীমান জসীমউদ্‌দীন নতুন লেখক, তাতে আবার গল্পটি নেহাৎই যাকে বলে--ছোট্ট এবং সাধারণ পল্লীজীবনের। সহরবাসীদের কাছে এই বইখানির সুন্দর কাঁথার মতো করে বোনা লেখার কতটা আদর হবে জানি না,—আমি এটিকে আদরের চোখে দেখেছি, কেননা এই লেখার মধ্য দিয়ে বাংলার পল্লী-জীবন আমাদের কাছে চমৎকার একটি মাধুর্যময় ছবির মতো দেখা দিয়েছে।... জানি না, কি ভাবে সাধারণ পাঠক এটিকে গ্রহণ করবেন ; হয়তো গোঁয়ো যোগীর মতো এই লেখার সঙ্গে এর রচয়িতা এবং গল্পের ভূমিকা-লেখক আমিও কতকটা প্রত্যাখ্যান পেয়েই বিদায় হব।" বস্তুতঃ এ আশঙ্কা অমূলক ছিল না। জীবনের ন্যায় সাহিত্যেও সেদিন চলেছিল নাগরিকতারই জয়জয়কার। শিক্ষিত মানুষের ধ্যান, চিন্তা, মনন—সব কিছুতেই জুড়ে বসেছিল নাগরিকজীবন। পল্লীর প্রতি তার দারুণ বিতৃষ্ণা, তার মধ্যে আকর্ষণীয় ও গ্রহণীয় কিছু থাকতে পারে একথাই কেউ ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করতেন না। এ অবস্থায় জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের আদর হতে পারে, এমন ভরসা অবনীন্দ্রনাথও করতে পারেন নি। তবু হৃদয়বান, শিল্পরসিক ও লোকসংস্কৃতিপ্রেমিক অবনীন্দ্রনাথ যুগরুচির বিরোধিতাকে ভয় না করে অকপটে এ পল্লীজীবন-চিত্রের মাধুর্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। না করে পারেন নি, কারণ এই কাব্যটির মধ্য দিয়ে পল্লীজীবন একটি চমৎকার মাধুর্যময় ছবির মতো দেখা দিয়ে তাঁর শিল্পীসত্তাকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছিল।

আনন্দের কথা, অবনীন্দ্রনাথের আশঙ্কা একেবারে সত্য প্রমাণিত হয় নি। দুই এক শতাব্দীর নাগরিক সভ্যতা আমাদের মন থেকে পল্লীকে যে একেবারে নির্বাসিত করতে পারে নি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ জসীমউদ্‌দীনের পল্লীকাব্যের সমাদর। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' সাধারণ জনচিত্তের ন্যায় শিক্ষিত চিত্ত জয়েও সমান সার্থকতা অর্জন করেছে। তাই তো দেখি অবনীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এ কাব্যের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে'র এই সার্থকতার মূলে কাজ করেছে এর লেখকের অকৃত্রিম জীবনবোধ, অকুণ্ঠ পল্লীপ্রীতি ও নর-নারীর চরিত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টি; তদুপরি পল্লীকাব্যের উপযুক্ত ভাষা ও আবহ সৃষ্টির অপ্রতিম কলাকৌশল। প্রথম কাব্য 'রাখালী'তেই তিনি প্রতিভার চমক দেখিয়ে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন। 'রাখালী', 'কবর' ও 'পল্লীজননী'র মতো উৎকৃষ্ট কবিতায় 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে'র উপযুক্ত ভূমিকা তৈরী হয়েছিল। পল্লীজীবন থেকে সুন্দর, তাৎপর্যপূর্ণ দৃশ্যগুলোকে বেছে নিয়ে তিনি কবিতার মালিকা রচনা করার প্রয়াস পেয়ে আসছিলেন বেশ কিছু কাল ধরে। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্যে তাই যেন একটি সুসম্পূর্ণ পল্লীজীবন-ভাষ্য রূপে এক সুডৌল কাহিনীতে পরিণতি লাভ করেছে। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্যের আবেদন এর আশ্চর্য মানবিকতায়। পল্লী নর-নারীর জীবন নিয়ে লেখা এ কাব্যে কবি পল্লীকবিদের ন্যায় আবেগ-সর্বস্ব হয়ে পড়েন

নি। আধুনিক মানুষের সচেতন সংবেদনশীল মন নিয়ে সে জীবনকে যথার্থ অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। ফলে তাঁর পল্লীজীবনাশ্রিত কাব্য অনেকটাই আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। কাব্যের কাহিনীবিন্যাসে, চরিত্রচিত্রনে সমাজবাস্তবের বর্ণনায়, সে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। পল্লীরাখালের জীবনের আনন্দ বেদনাকে কাব্যে রূপদানের আগ্রহ ও তাতে সার্থকতা অর্জনের বাধার কথা বলতে গিয়ে তিনি উপযুক্ত কাব্যিক ভঙ্গিতে যা বলেছেন তা জসীমউদ্‌দীনের সমাজ সচেতন অথচ আশ্চর্চরূপে হৃদয়বান্ শিল্পীসত্তারই পরিচয় বহন করে।

"মাঠের রাখাল, বেদনা তাহার আমরা কি অত বুঝি?
মিছেই মোদের সুখ-দুখ দিয়ে তার সুখ-দুখ খুঁজি।
আমাদের ব্যথা কেতাবেতে লেখা, পড়িলেই বোঝা যায়,
যে লেখে বেদনা বে-বুঝ বাঁশীতে কেমনে দেখাব তায়?
অনন্তকাল যাদের বেদনা রহিয়াছে শুধু বুকে,
এ দেশের কবি রাখে নাই যাহা মুখর ভাষায় টুকে;
সে ব্যথারে আমি কেমনে জানাব? তবুও মাটিতে কান
পেতে রহি যদি কভু শোনা যায় কি কহে মাটির প্রাণ!
মোরা জানি খোঁজ বৃন্দাবনেতে ভগবান করে খেলা,
রাজা-বাদ্‌শার সুখ-দুখ দিয়ে গড়েছি কথার মেলা।
পল্লীর কোলে নির্বাসিত এই ভাই বোনগুলো হায়!
যাহাদের কথা আধ বোঝা যায়, আধ নাহি বোঝা যায়।
তাহাদেরই এক বিরহিয়া বুকে কি ব্যথা দিতেছে দোল
কি করিয়া আমি দেখাইব তাহা, কোথা পাব সেই বোল?
—সে বন-বিহগ কাঁদিতে জানে না, বেদনার ভাষা নাই,
ব্যাধের শায়ক বুকে বিঁধিয়াছে জানে তার বেদনাই।"

এ বিশেষ দৃষ্টিই জসীমউদ্‌দীনের পল্লীজীবন-ভিত্তিক প্রেমকাব্য 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ'কে দিয়েছে এক অনন্যসাধারণ মর্যাদা। শুধু কি তাই? কাব্যের প্রকাশকলায়ও আধুনিক কালের সচেতন শিল্পীর ন্যায় তিনি ঔচিত্যবোধকে পূর্ণ মূল্য দিয়েছেন। গ্রাম্যজীবন নিয়ে লেখা তাঁর কাব্য তাই ভাবে, ভাষায় কোথাও গ্রাম্যতা-দুষ্ট হয় নি। তথাপি 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে'র প্রেমচিত্র পরিকল্পনায় কবি স্বয়ং-নির্ভর নন; স্পষ্টতই তিনি মধ্যযুগের বৈষ্ণব-মহাজন, মঙ্গল কাব্য রচয়িতা, বিশেষতঃ মৈমনসিংহ গীতিকার পল্লীকবিদের কাছে এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ঋণী।

যে হৃদয়-আকুল করা প্রেমচ্ছবি আমরা বৈষ্ণব কাব্যে প্রত্যক্ষ করেছি, মঙ্গল কাব্যে দৈব-নিগৃহীত হয়েও যে প্রেম অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তি দিয়েছে, মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকায় যে প্রেম আপন মহিমা প্রতিষ্ঠায় দুঃসহ ক্লেশ ও ত্যাগ বরণের তপস্যায় রত, জসীমউদ্‌দীনের 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' এসেই প্রেম-ছবিই যেন নতুন রূপে দেখা দিয়েছে। এ প্রেম-ছবি অঙ্কনে পল্লীকবিদের কাছেই যেন কবির ঋণ বেশী। পল্লীগীতিকায় অঙ্কিত প্রেমচিত্রের সম্পূর্ণ মানবিকতা, বাস্তবধর্মিতা এবং তার প্রকাশকলায় অনায়াস সহজতা জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে বিশেষভাবে আপন ছায়া ফেলেছে। গীতিকার নর-নারীদের, বিশেষতঃ নারীদের ন্যায় তাঁর কাব্যের নর-নারীরাও প্রেমের পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রেমের এ দুর্লভ মহিমার ছবি মধ্যযুগের কাব্যে ও পল্লীগীতি-গাথায় অপ্রতুল নয়।

কিন্তু আধুনিক যুগে এসে কাহিনী-কাব্যের এ ধারাটি প্রায় লুপ্ত হতেই বসেছিল। যে প্রতিবেশে এই সব অপূর্ব প্রেমচ্ছবি বিকশিত হতে পেরেছিল, সে প্রতিবেশ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। বিদেশের আমদানি কৃত্রিম নাগরিক সভ্যতার জৌলুষে আমাদের নয়ন বেঁধে গিয়েছে, আমরা স্বভাবের রাজ্য পল্লী থেকে দূরে সরে এসে শহরের ইঁট-কাঠের তৈরি আবেষ্টনীর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছি। সেখানে সব কিছুই চাকচিক্যপূর্ণ অনুকৃত প্রাণহীন খেলনার মতো। মানুষ সেখানে হিসেবের ছকে বাঁধা, বেহিসেবী প্রেম সেখানে হানা দিলেও ভাবনা-চিন্তার জটিল অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলে অচিরেই। জীবন-ঝঞ্ঝায় ক্ষুব্ধ সেখানকার মানুষের হৃদয়বোধের অকৃত্রিম, অবারিত প্রকাশই তো সম্ভব নয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রের কৃত্রিমতার ন্যায় প্রেমের ক্ষেত্রেও কৃত্রিম ভাববিলাসিতা সেখানে দেখা যায়। মনোহারী ভাষা ও উপমায় সংগ্রথিত সে প্রেম-ছবি আমাদের হয়তো মুগ্ধ করে, কিন্তু আকুল করে না। এর কারণ জীবনকে আমরা নগর সীমায় সঙ্কুচিত করে ফেলেছি, বাইরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ইঁট-কাঠের কোঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি। সে সীমাবদ্ধ জীবনকে আমাদের সকল ভাবনা ও চিন্তার সর্বস্ব করে বসে আছি। এ এক বিশেষ ধরনের মূঢ়তা। আমরা তা কাটিয়ে উঠে একটু বাইরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই দেখতে পাই—প্রকৃতির উদার আবেষ্টনীতে জীবন আজও শতছন্দে লীলায়িত হয়ে চলেছে। প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ আজও অফুরান, প্রাকৃতিক আবেষ্টনীতে ঘরে ঘরে তার যাত্রা আজও অব্যাহত গতিতে চলেছে। তার ঐশ্বর্য আজও কম নয়।

আমরা সে সব দেখবার চোখ হারিয়ে ফেলেছিলাম। জসীমউদ্‌দীন আমাদের দৃষ্টি বলিষ্ঠভাবে আর একবার সেই দিকে আকর্ষণ করেছেন। শত দুঃখ, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনার মধ্যে আজও পল্লীর ঘরে ঘরে যে স্নেহ-প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে চলেছে সরল পল্লীর মানুষরা, তাতে না থাকতে পারে প্রসাধনের পারিপাট্য, না থাকতে পারে ঐশ্বর্যের চমক, প্রকাশের উচ্চস্তরের ছলাকলা—কিন্তু তার পরিবর্তে রয়েছে যে অকৃত্রিম হৃদয়বোধের সাড়া, তারই কি মূল্য কম। নাগরিকতার সর্বগ্রাসী মোহাচ্ছন্নতায় আমরা এমনি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম যে, নগর প্রাকারের বাইরে যে একটা পৃথিবী আছে এবং সেটাই যে সত্যতর তা আমরা এক প্রকার ভুলেই গিয়েছিলাম। জসীমউদ্‌দীন আমাদের সে মোহাচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন এবং এক প্রকার অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিয়েছেন—পল্লীর সেই শ্যাম-স্বর্ণশ্রী, তার শ্যামলদূর্বা, তরুছায়া, সেই ঘরকন্না আজও পূর্বেরই ন্যায় মাধুর্যের ডালি নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। এ সবের তুলনায় শহুরে জীবন অনেক কৃত্রিম ও নীরস বলেই মনে হবে। 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাহিনী শুনিয়ে কবি আমাদের সেই শ্যামল পল্লীর আবেষ্টনীর মধ্যেই আহ্বান করেছেন—তার ঐশ্বর্যের দিকে নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আমাদের।

পল্লীর শ্যামল প্রকৃতির সন্তান দুইটি পল্লীবালক-বালিকার প্রেমের উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির কাহিনী বর্ণনা উপলক্ষ্যে কবি পল্লীর প্রাকৃতিক দৃশ্য, সামাজিক আবেষ্টনী, এর কর্মধারা ও প্রতিদিনকার ঘরকন্নার অতি বাস্তব ও জীবন্ত ছবি এঁকেছেন কাব্যটিতে। আপাত নিস্তরঙ্গ পল্লীজীবনের আশ্চর্য দ্বন্দ্বমুখর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন কবি গ্রাম্য উৎসব-অনুষ্ঠান, গ্রাম্য কলহ, জমিজমা নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মামলা-মোকদ্দমার বর্ণনা দিয়ে। তিনি দেখিয়েছেন স্নেহ-প্রেমে, ভালবাসা -বর্বরতার সংমিশ্রিত এক অদ্ভুত জীবন পল্লীর ঘরে ঘরে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে যুগ-যুগান্ত ধরে। সেখানে প্রেমে পড়ে মানুষ ঘর বাঁধে, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়ে সোনার সংসার ছারখার করে। প্রেমের পিছনে সেখানে তাই

সদা উদ্যত হয়ে আছে বিরহের বজ্র। সেই বিরহের বজ্রাঘাত আমাদের কাব্যের নায়ক-নায়িকার জীবনকে চূড়ান্তভাবে বিধ্বস্ত করেছে। এ চিত্র এমনি বাস্তবধর্মী এবং এর প্রকাশ এমনি কলাসম্মত যে, কবিকে সাধুবাদ না দিয়ে পারা যায় না। এমন করে আধুনিক যুগে পল্লীজীবন-গাথা আর কেউ রচনা করতে পারেন নি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নাগরিকতার সর্বাত্মক প্রভাবের দিনে পল্লীর অনাবিল জীবনমাধুর্যের ছবি এঁকে জসীমউদদীন একটা নতুনত্বের আস্বাদ এনে দিয়ে শিক্ষিত মহলে রীতিমতো সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছেন। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' তাঁর সেই সার্থকতার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পরিচয়বাহী কাব্য। এর আগে 'রাখালী'তে তিনি পল্লীজীবন-বাস্তবেরই কিছু কিছু সার্থক ছবি এঁকেছিলেন, সে চিত্র সুন্দর হলেও, পল্লী সেখানে আপন সমগ্রতায় ফুটে ওঠে নি। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে'ই আমরা পল্লীর প্রথম সার্থক ও সামগ্রিক রূপের প্রকাশ লক্ষ্য করি। আর ঐ কারণেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' অসাধারণ সাহিত্যিক গুরুত্বের অধিকারী। সমকালীন বিশ্বের বিভিন্ন সভ্য দেশে লোকসংস্কৃতির প্রতি সে কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল তার সার্থক পোষকতা করে 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়েছিল এবং কবিকেও অসামান্য প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল।

'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতির মূলে বিশেষ অবদান রয়েছে সাগর-পারের বিদেশিনী মহিলা মিসেস্ ই. এম. মিলফোর্ডের। তিনি ১৯৩৯ সালে "The Field of the Embroidered Quilt" নামে অনুবাদ করে বইটিকে বিশ্বের সুধীসমাজের দরবারে হাজির করে জসীমউদ্‌দীনের জন্যে এনে দিলেন খ্যাতির পসরা। আশ্চর্য রূপে জীবন-ঘনিষ্ঠ এ কাব্যে বিশ্বের সুধী সমাজ পেল 'মাটির মানুষের' জীবন-মহিমার পরিচয়। সেই সূত্রে এ দেশের এক পল্লীদুলাল বিশ্বের প্রান্তে পেল অকুণ্ঠ প্রশংসা ও সাধুবাদ। নানা ভাষার বেশ ধরে এ কাব্য আজও হানা দিচ্ছে বিশ্বের মানুষের প্রাণের দ্বারে। এ কাব্যের বিষয় মাধুর্যই শুধু নয়, এর প্রকাশকলার এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা অতি সহজেই অন্য মনকে আকর্ষণ করতে পারে। অনুবাদের ভূমিকায় মিসেস্ মিলফোর্ড বলেছেন : 'The Verse of Jasimuddin varies between the dancing metre of genuine folk poetry, the terse unit of proverbs and prosy passage of story telling and description." অর্থাৎ জসীমউদ্‌দীনের পদ্য কখনও খাঁটি লোককাব্যের নৃত্যে, ছন্দে, কখনও প্রবাদের তীক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্তিতে, কখনও বা গল্পকথন ও দৃশ্যবর্ণনার গদ্যায়িত ভঙ্গির মধ্যে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করেছে। এতে করে তাঁর কাব্যের প্রকাশে একঘেঁয়েমি দেখা দেয় নি এবং শেষ পর্যন্ত তা আমাদের আগ্রহ জাগিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে।

'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্যটির স্বরূপ ও মাধুর্য বিশ্লেষণ করে বিশিষ্ট লোকসাহিত্য-প্রেমিক ডক্টর ভেরিয়ার এলউইন ইংরেজী অনুবাদের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় যা বলেছেন তা এ কাব্যের মূল্যায়নে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এলউইন বলেছেন ঃ— "I do not know whether the 'Field of the Emboidered Quilt" can be classed as folk poetry, but it is obviously poetry about the folk." (আমি জানি না 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্যকে লোককাব্য বলা যাবে কি না, কিন্তু লোকজীবন নিয়েই যে এ কাব্য গড়ে উঠেছে তা অতি সহজেই বোধগম্য হয়।) বইটিতে পল্লীনর-নারীর সামগ্রিক জীবনবৃত্তের খাঁটি ও জীবন্ত ছবি প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ বিস্ময়ে তিনি বলে উঠেছেন ঃ—"Jasimuddin's villagers rejoice and suffer, desire and are desired hate and despair from the very depths of their souls, there is nothing trivial about them, nothing superficial, they are real." (জসীমউদ্‌দীনের পল্লীবাসীরা আনন্দ ও বেদনা সমান

উপভোগ করে, তারা ভালবাসে ও ভালবাসার আকর্ষণ বোধ করে, আত্মার গভীর থেকে বেরিয়ে আছে তাদের ঘৃণা ও হতাশাবোধ। তাদের জীবনে অস্বাভাবিক বলে কিছু নেই, নেই কোন কৃত্রিমতা, তারা একান্তই বাস্তব জগতের অধিবাসী।) লোকসংস্কৃতি-প্রেমিক এলউইন দীর্ঘদীন পল্লীতে বাস করে পল্লীবাসীর জীবনধারাকে লক্ষ্য করেছেন; তাই স্বভাবতই জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে সে অভিজ্ঞতার বাস্তব স্বীকৃতি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি অকুণ্ঠচিত্তে বলেছেন ঃ— "I find every detail of the picture, every turn of the story waking a response in my mind." (চিত্রের প্রতিটি খুঁটিনাটি বর্ণনা, গল্পের প্রতিটি বাঁক আমার মনে কেমন যেন একটা সাড়া জাগায়।) এলউইন আরও বলেছেন ঃ—"It is impossible to read this deeply moving tale and continue to feel superior or indifferent to the villager who is capable of such passioned love and such deep sorrow." (হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ গল্প পড়ার পর যে পল্লীবাসীরা এত সুতীব্র ভালবাসা ও সুগভীর বেদনাবোধের অধিকারী তাদের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠতর মনে করা বা তাদের প্রতি উদাসীন থাকা একেবারে অসম্ভব)। বস্তুতঃ দুঃখ-দারিদ্র-ব্যাধি কন্টকিত পল্লীবাসীর জীবনে মাঝে মাঝে প্রেম, স্নেহ, ভালবাসার যে অপূর্ব প্রকাশ ঘটে তা এক দুর্লভ স্বর্গীয় সম্পদই বটে। এলউইন জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে সে মরণজয়ী স্নেহ প্রেমের মহিমান্বিত বিকাশ লক্ষ্য করেই বলেছিলেন ঃ— "If you measure these people by the quality of their love and if you measure this poem by the its power to portray that love, both poem and people must have a high place in our regard." (যদি ভালবাসার গভীরতাই এই লোকগুলোর জীবন-মাহাত্মের পরিমাপকে হয় এবং সেই ভালবাসার চিত্রাঙ্কনের ক্ষমতাকেই যদি এ কাব্যের উৎকর্ষের পরিমাপক ধরা হয়, তা হলে কবিতা ও কবিতার উপজীব্য মানুষ দু-ই আমাদের বিবেচনায় উচ্চস্থানের দাবীদার।) কাব্যটি এলউইনের মনে এমনিই নাড়া দিয়েছিল যে, তিনি অকপটে এ কাব্যের সৃষ্টি মহিমার স্বীকৃতি জানিয়ে বলেছেন,—"I read the poem with growing excitement, and have returned to it again and again to be delighted by its simplicity, its charm, its deep humanity." (আমি মনের পরিপূর্ণ উত্তেজনা সহকারে এ কাব্য পাঠ করেছি ; এর সরলতা, এর মাধুর্য, এর সুগভীর মানবিকতার সাথে পরিচিত হয়ে আনন্দ পাবার জন্য বার বার এ কাব্যে প্রত্যাবর্তন করেছি।)

এর চেয়ে উচ্চ প্রশংসা একটি কাব্যের পক্ষে আর কি হতে পারে। বইটি এমনিভাবে দেশবিদেশের লোকসাহিত্য-প্রেমিক সুধীদের প্রশংসা কুড়িয়ে পেয়েছে এর কাহিনীর আশ্চর্য সজীবতা ও জীবননিষ্ঠ রূপের জন্যে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে আমেরিকা প্রবাসী স্বর্গত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রশংসাবাণী। এই গ্রন্থে বর্ণিত চিত্রগুলোর সজীবতা, বাস্তবতা এবং তাদের প্রকাশে যে আশ্চর্য সৃজনী শক্তির স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায় তাই নির্দেশ করে নিউইয়র্ক থেকে পত্রযোগে জসীমউদ্‌দীকে লিখেছিলেন,— "Your power to continue a creative impulse is immense. Instead of a small canvas the pictures you draw are large and incisive. In short you are a poet of the first rank." (আপনার সৃজনী চেতনাকে অব্যাহত রাখার ক্ষমতা অসাধারণ। আপনার ছবিগুলো ক্ষুদ্র ক্যানভাসে নিবদ্ধ নয়, সেগুলো বেশ বড় এবং মনে দাগ কাটার মতো। সংক্ষেপে বলতে গেলে আপনি একজন প্রথম শ্রেণীর কবি।) দূর প্রবাসী ধনগোপালের কাছে পল্লীবাংলার এ তাজা প্রাণের ঘ্রাণ বড় মাদকতাময় বলে মনে হয়েছিল। তাঁর বক্তব্যে কিছুটা অতিশয়োক্তি থাকলেও, তা সত্যের নিকটবর্তী। 'নকসী কাঁথার মাঠে'র এই সার্বিক আবেদন যে শুধু এর বিষয়ে নিবদ্ধ নয়, এর প্রকাশ

কৌশলের জন্যেও বটে, তার স্বীকৃতি রয়েছে ধনগোপালের উক্তিতে। অতি সাধারণ গ্রাম্য মানুষের জীবনাশ্রয়ী এই কাব্যখানির বৈশিষ্ট সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন যা বলেছিলেন তাতে একদিকে দীনেশচন্দ্রের রসিক প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়, অপর দিকে তাঁর শিল্পসৃষ্টি মহিমা অনুধাবনে অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। দীনেশচন্দ্র বলেছিলেন,-- "জসীমউদ্‌দীনের এই বইখানি ছোট হইলেও ইহা একখানি কাব্য; ইহার উপাদান বাঙ্গালীর চির অভ্যস্ত গীতি-কবিতার সুর ও ছন্দ; কিন্তু নানা সুর একত্র করিয়া একটা বড় রাগিণী সৃষ্টি করার শিল্পশক্তি ইহার আছে। নানা কুসুমের মালার মত খন্ড কবিতাগুলিকে একটা অখন্ড রূপ দেওয়ার বিলক্ষণ শক্তি ইনি দেখাইয়াছেন ঃ ইহাতে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও প্রচুর সৌন্দর্য-সমাবেশ দেখা যায়।" 'নকসী কাঁথার মাঠে'র ইংরেজী অনুবাদিকা মিসেস মিলফোর্ড যখন অনুবাদকের ভূমিকায় বলেন, "জসীমউদ্‌দীনের পদ্যে পল্লীকবিতার নৃত্যচপল রূপের সাথে তিনি লক্ষ্য করেছেন প্রবাদবাক্যে প্রকট লোকবুদ্ধির দীপ্তি এবং তার সাথে গল্প বলা ও দৃশ্য বর্ণনার গদ্যায়িত ভঙ্গির সমন্বয়"—তখন নানা সুরের মিলিত রাগিণী সৃষ্টির ক্ষমতার তাৎপর্য বুঝতে আমাদের আর কষ্ট হয় না। এর সাথে আধুনিক মানসের অধিকারী শিল্পীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও প্রবল সৌন্দর্যানুরাগ যুক্ত হয়ে এ পল্লীকাব্যকে অনন্য সৃষ্টির মর্যাদা দিয়েছে। পল্লীগীতিকার সাথে আধুনিক উপন্যাসের কলাকৌশলের মেল বন্ধনে 'নকসী কাঁথার মাঠ' সাধারণ পল্লী-গাঁথা থেকে স্বতন্ত্র এক বিশিষ্ট সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে রাখা উচিৎ 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্য লিখেছেন আমাদের কালেরই এক কবি—এবং তিনি রীতিমতো আধুনিক শিক্ষায় কবি। পল্লীর সন্তান তিনি, ঐতিহ্যসূত্রে পল্লীসাহিত্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, পরিবেশ ও কর্মসূত্রেও জীবনের কোন বড় একটা অংশ পল্লীতেই কাটিয়েছেন। কিন্তু শিক্ষাসূত্রে তিনি বেশ কিছুটা নাগরিক মনন ও চিন্তার অধিকারী, সেটাও অস্বীকার করা যায় না। পল্লী নিয়ে কাব্য লিখেছেন তিনি নিতান্ত সচেতন ভাবেই। গীতি-গাঁথার রাজ্য থেকে ভাববস্তু আহরণ করেছেন অনেক ক্ষেত্রে তাও ঠিক এবং পল্লীকাব্যের আমেজটি বজায় রাখার জন্যে সচেতন ভাবে গ্রাম্য-কবির কাব্যপংক্তি, বহু গ্রাম্য শব্দ, উপমা ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর কাব্যকে পল্লীকবিদের রচনার সামিল মনে করলে মহা ভুল করা হবে। জসীমউদ্‌দীন সচেতনভাবে কাহিনী, চরিত্র ইত্যাদি সৃজনে পল্লীর দ্বারস্থ হয়েছেন, বক্তব্যের প্রকাশেও সেই সরলতা অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিক্ষিত মন সেখানে আপন স্বাধীন কল্পনার ক্রীড়াশীল রূপেরও ছাপ রেখে গেছে। কাব্যবস্তুর বিন্যাসে, চরিত্র বিশ্লেষণে, প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায়, ভাষার পরিমার্জন প্রচেষ্টায় তা প্রস্ফুট। একটু ভালভাবে লক্ষ্য করলেই, সাধারণ পল্লীকবির রচনা থেকে তাঁর রচনার মূলগত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পল্লীকবি হৃদয়াবেগে চালিত, প্রকাশকলা সম্পর্কে তেমন সচেতন নয়; তাঁর কাহিনীতে বিশ্লেষণের প্রয়াস থাকে না, থাকে অল্প কথায় হৃদয়স্পর্শ করার একটি আকুলতা। একটি অনায়াস সহজতা সে রচনায় দেখা যায়, কোন জটিলতা তাতে থাকে না। জসীমউদ্‌দীনের পল্লীজীবন-ভিত্তিক কাব্যে হৃদয়াবেগের উত্তাপ থাকলেও সে আবেগ অনেকটাই বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত। তিনি সচেতন প্রকাশকুশলী শিল্পী। জীবন-জটিলতার উত্থাপনে তিনি সংকোচ বোধ করেন না। সুতীক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণী ক্ষমতা তাঁর চরিত্র চিত্রণে অনুপস্থিত নয়। কাব্য যে একটা শিল্প এবং কবির সচেতন প্রয়াস ব্যতীত তা যে তেমন সার্থক হতে পারে না, এটা জসীমউদ্‌দীন জানতেন। জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের ভাষায় তাঁর আধুনিক সচেতন মন বোধহয় সবচেয়ে ক্রিয়াশীল—ভাষা-ভঙ্গিতে তাঁর কাব্যে পল্লীর আমেজ বজায় রাখতে

গিয়ে তিনি কোথাও গ্রাম্যতার প্রশ্রয় দেন নি। বিষয়ের অনুরোধে শব্দ-উপমা চয়নে পল্লীকাব্যে বা পল্লীতে ব্যবহৃত ভাষার আশ্রয় তিনি নিয়েছেন ; কিন্তু তাঁর হাতে পরিমার্জিত হয়ে সে ভাষা প্রায় এক নতুন সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' শুধু কাহিনী নয়, এ যেন ভাষারও নক্‌সী কাঁথা। নানা রঙের সুতোর মতো নানা ধরনের শব্দ-সম্পদের সুষ্ঠু ও কাব্যিক প্রয়োগে তাঁর কাব্য সত্যিই যেন ভাষার নক্‌সী কাঁথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ এক অসাধারণ কৃতিত্ব সন্দেহ নেই।

জসীমউদ্‌দীনের কৃতিত্ব এই যে, তাঁর কাব্য পল্লী পরিবেশকে ধ্যানে, চিন্তায় ও প্রকাশে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েও আধুনিক রুচিকে তৃপ্তি দিতে পেরেছে। তাঁর কাব্যে অসাধারণ কোন বক্তব্য নেই, কলাকৌশলেও খুব একটি অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচয় মিলে না। তবু তাঁর রচনা চিন্তাশীল মনেও দাগ কেটে রাখতে সমর্থ। ভাষা-ভঙ্গিতে পরিমার্জনের ছাপ সত্ত্বেও তাঁর কাব্যে স্বভাবের পূর্ণ স্বীকৃতি রয়েছে। তাঁর কাব্যের বাণী ঃ—

"The moving accident is not my trade
To freeze the blood, I have not ready art
It is my delight alone in summer shade
To pipe a simple song for thinking heart."[১]

(হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা নিয়ে আমার কারবার নয় ; রক্ত হিম করে দেওয়ার মতো কোন সহজ কৌশল আমার আয়ত্ত নয়। গ্রীষ্মের খররোদে গাছের ছায়ায় বসে একাকী ভাবুক হৃদয়ের জন্যে দু'একটি সহজ সুন্দর গান ফুটিয়ে তুলতে পারাতেই আমার আনন্দ।) সত্যই তাই। কিন্তু ঐ যে কবি সহজ সুরের কথা বলেছেন, তা ফুটিয়ে তোলাটা কিন্তু আদপেই অত সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তো বলেছেন, 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে'। সহজ প্রকাশেরও একটা আর্ট আছে। সে আর্ট জসীমউদদীন প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতার ন্যায় যেন অনেকটা আয়ত্ত করতে পেয়েছিলেন। খাঁটি কবির মন তাঁর ছিল ; আর ঐ সঙ্গে প্রথম থেকেই সহজভাবে কাব্যে কথা বলার সজ্ঞান প্রয়াসও ছিল। জনজীবনের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও সমবেদনাবোধ তাঁকে দিয়েছিল লোকচরিত্রে দুর্লভ অন্তর্দৃষ্ট ; আর ঐ সূত্রেই স্বভাবের পথে লেখনী চালনা করে সুবিশাল ভাণ্ডারের সাথে নিবিড় পরিচয় তাঁকে সহজ কথা সহজে বলার শক্তির রহস্যটি কোথায় তাই যেন বলে দিয়েছিল। অথচ তিনি পল্লীকবিদের ন্যায় Unsophisticated নন ; Sophistication তাঁর যথেষ্টই রয়েছে : কিন্তু তা কখনও সীমাতিক্রম করে তাকে বেশী কৃত্রিম হয়ে উঠতে দেয় নি। পল্লীকবিদের ন্যায় তিনিও পল্লী নর-নারীর প্রেম-ভালাবাসা, স্নেহের টানাপোড়েনে দোলায়িত মানবজীবনের ছবি এঁকেছেন কিন্তু আধুনিক সচেতন মন সেখানে সক্রিয়ভাবে কাহিনীর দিক নির্দেশ করে, রচনার ভঙ্গির মধ্যে কিছুটা কৌলীন্য এনে তাকে নতুন মহিমা দান করেছে।

'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্য রচনায় কবির সচেতন মন পুরোমাত্রায় ক্রিয়াশীল। কোন বিশেষ আবেগের বশবর্তী হয়ে নয়, পল্লীজীবন-মাধুর্যের আকর্ষণেই তিনি কাব্যে পল্লীপথের পথিক হয়েছেন। চলতে গিয়ে তিনি হিসেবী মনের পরিচয়ই রেখে গেছেন প্রায় সর্বত্র। পল্লী নর-নারীর জীবন-গাধা রচনা করতে গিয়ে সে হিসেবী মন যে কতটা ক্রিয়াশীল ছিল তা বুঝতে পারি বইয়ের নিজের লেখা ভূমিকায় : "এই গ্রন্থের চিরত্রগুলি সবই গ্রাম্য। আমরা যেভাবে ভাবি, তাহারা সেভাবে ভাবে না। আমাদের হইতে তাহাদের জীবন একেবারে ভিন্ন

১. Wordsworth

রকমের। তাই চরিত্রগুলির ভিতরে কথোকপথন জুড়িতে আমি যতদূর পারিয়াছি, তাহা গ্রাম্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই জন্য আমি প্রাচীন পল্লীকবিদের অনেক পদ কোন কোন চরিত্রের কথোপকথনে জুড়িয়া দিয়াছি।" এখানে যে মন কাজ করেছে তা সাধারণ আবেগপ্রবণ পল্লীকবির নয়, আধুনিক কালের সচেতন শিল্পীর। তিনি জানেন তাঁর চিন্তাধারার সাথে তাঁর কাব্যের গ্রাম্য নর-নারীর জীবন ও চিন্তাধারায় গড়মিল প্রচুর। এ অবস্থায় তাদের জীবনের সত্যশীল রূপটিকে তুলে ধরতে হলে বক্তব্য প্রকাশে এমন একটা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, যাতে করে গ্রাম্য আবহ ও চরিত্রগুলো কথোপকথনের গ্রাম্য ঢঙটি রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। আর ঐ প্রচেষ্টার সার্থকতার কথা স্মরণ রেখেই 'পল্লীকবিদের' দ্বারস্থ হয়েছেন শব্দ, উপমা ইত্যাদির জন্যে। এখানেই তাঁর আধুনিক শিল্পীমন বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল লক্ষ্য করি ; বড় হিসেব করে তা অগ্রসর হয়েছে। কোন পল্লীকবির পক্ষে এ ধরনের চিন্তাই আসতে পারে না। তিনি লিখবেন স্বভাবের আবেগে, এত হিসেব করে তিনি চলতে জানেন না। ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গিতে 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' তাই খাঁটি সুরময় পল্লীকাব্য না হয়ে, অনেকটাই আধুনিক উপন্যাসধর্মী কাহিনী-কাব্য হয়েছে। আধুনিক শিল্পীর সমাজ সচেতন মন ক্রিয়াশীল থাকায় এখানে কাব্যের রাজ্য উপন্যাসের সীমান্তে এসে আপন একক মহিমা হারিয়ে ফেলেছে। অবশ্য বিস্তৃত জীবনদৃশ্যের গদ্যায়িত বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কবিতা কাজ চালিয়ে গেছে চরিত্র, পারিপার্শ্বিক ও মূলগত ভাবের সমন্বয় বিধানের। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' সত্যিই সামান্য পল্লীকাব্য মাত্র নয়, এ হচ্ছে আধুনিক কালের এক সংবেদনশীল কবির পল্লীজীবন মাধুর্য আস্বাদন করার অপরূপ প্রয়াস। বলা বাহুল্য সে প্রয়াস বহুলাংশেই সার্থক হয়েছে।

আধুনিক যুগে নাগরিকতার সর্বাত্মক প্রভাবের দিনে পল্লীর প্রতি আধুনিক শিল্পী-সাহিত্যকদের এ আকর্ষণ কিছুটা বিস্ময়কর হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সভ্য মানুষের সচেতন প্রতিক্রিয়ার যুগে এবং বিশ্বব্যাপী লোক-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের প্রভাবে এবং পরিবর্তিত জীবন-দৃষ্টির প্রভাবে রচিত জসীমউদ্‌দীনের এ ধরনের পল্লীজীবন-ভিত্তিক কাব্য-প্রচেষ্টা আমাদের আঠারো উনিশ শতকের সন্ধিক্ষণে ইংরেজী সাহিত্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং কোলরিজ কর্তৃক 'Lyrical Ballad-গুলো সৃষ্টির সচেতন প্রয়াসকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁরা সমকালীন শিক্ষিত-সমাজ লোকসাহিত্য-চেতন দ্বারা যেমন প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, তেমনি লোকসাহিত্যের অন্তর মাধুর্যের পরিচয় পেয়েও কম আকর্ষণ বোধ করেন নি। 'Lyrical Ballads'-এর preface-এ লোকজীবন-ভিত্তিক কাব্য প্রচেষ্টার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আধুনিক সূক্ষ্ম শিল্পচেনতার পরিচয় দিয়ে যা বলেছেন, জসীমউদ্‌দীনের 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্যের ভূমিকার বক্তব্যেও কতটা যেমন তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মনীষার ছাপ জসীমউদ্‌দীনের বক্তব্যে নেই, কিন্তু অনুভূতির গাঢ়তা আছে। প্রতিভার প্রকৃতি ও ক্ষমতাগত তারতম্য অবশ্যই এ পার্থক্যের মূলে কাজ করেছে। তথাপি তাঁদের পল্লীজীবন ভিত্তিক কাব্য-প্রচেষ্টার মূলগত চেতনার সাধর্ম অস্বীকার করা যায় না। আমরা পূর্বেই জসীমউদ্‌দীনের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি, এবার 'Lyrical Ballads'-এর preface থেকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছি ঃ

"The principal object proposed in these poems was to choose incidents and situations from common life and to relate or describe them, throughout, as far as possible in a selection of language really used by man, and at the same time, to throw over them a certain colouring of imagination whereby ordinary things should be presented to the mind in an unusual aspect, and further, and above

all to make these incidents and situations interesting by tracing in them, truly though not ostentatiously the primary laws of our nature, chiefly as far as regards the manner in which we associate ideas in a state of excitement. Humble and rustic life was generally chosen, because, in that condition, the essential passions of the heart find a better soil in which they can attain their maturity, are less under restraint, and speak a plainer language, because in that condition of the life our elementary feelings exist in a state of greater simplicity, and consequently, may be more accurately contemplated, and more forcibly communicated because the manners of real life permeate from these elementary feelings, and form the necessary character of rural occupation, are more easily comprehended and are more durable, and lastly because in that condition the passions of men are incorporated in the beautiful and permanent form of nature." এর তর্জমা করলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে : (এই কবিতাগুলো রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ জীবন থেকে ঘটনা ও অবস্থা বেছে নিয়ে তাদের আগাগোড়া যত দূর সম্ভব লোকের যথার্থ মুখের ভাষায় বিবৃত করা অথবা বর্ণনা করা এবং এ সঙ্গে তাদের উপর কিছুটা কল্পনার রঙ নিক্ষেপ করা, যাতে করে সাধারণ জিনিসকেও একটা অসামান্য রূপে মনের কাছে উপস্থাপিত করা যায়। তারপর, মুখ্যতঃ যে রীতিতে আবেগ কম্পিত অবস্থায় আমরা নানা ভাবানুসঙ্গ সৃষ্টি করি সে রীতিমাফিক সত্যকার ভাবে ভাব, কোন কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে নয়, ঐ সকল ঘটনা ও অবস্থার মধ্যে প্রকৃতির মৌল স্বভাবটিকে খুঁজে বের করে, তাদের আকর্ষণীয় করে তোলাই ছিল এ রচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। সাধারণ ভাবে সরল গ্রাম্য জীবনকেই এ জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছিল ; কারণ ঐ পারিপার্শ্বিক অবস্থায়ই হৃদয়ের মৌল আবেগগুলো পরিপক্কতা লাভের উপযুক্ত একটি ভূমি পেয়ে যায় ; তাদের উপর বাধ নিষেধের অনুশাসন থাকে কম এবং তারা প্রকাশের সহজ ভাষা পায়। কারণ জীবনের এ অবস্থায় আমাদের মৌল অনুভূতিগুলো আরও বেশী সরল অবস্থায় সহাবস্থান করে ; ফলে ঐগুলোর সূক্ষ্মতর অনুধাবনা সম্ভব হয়ে ওঠে এবং তাদের প্রকাশও জোরালো হয়। যেহেতু গ্রাম্য জীবনভঙ্গিমা গড়ে ওঠে এই সকল মৌল অনুভূতি ও গ্রাম্য কর্মধারার চারিত্র ধর্ম থেকে, তাই তার স্বরূপ অনেক সহজেই অনুধাবন করা যায় এবং তা বেশী স্থিতিশীল হয়। শেষ কারণ হচ্ছে এই যে, ঐ পারিপার্শ্বিকেই মানুষের ভাবপ্রবৃত্তিগুলো প্রকৃতির সুন্দর স্থায়ী রূপের মধ্যে স্বীকৃত হয়)।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর কাব্যের পরিকল্পনায় যে সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি, মননশীলতা ও উচ্চাঙ্গের শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন, জসীমউদদীনের কাব্যের ভূমিকার বক্তব্যে তা অনুপস্থিত থাকলেও, জসীমউদদীন ওয়ার্ডসওয়ার্থ বর্ণিত নীতিসমূহ তাঁর 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্য-রচনায় পুরোপুরিই প্রয়োগ করেছেন এবং তাতে সার্থকও হয়েছেন। তিনি তাঁর কাব্যের ঘটনা ও পরিবেশ সাধারণ জীবন থেকেই নিয়েছেন এবং যত দূর সম্ভব সাধারণের বোধগম্য ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন। আবার তাকে সুন্দর করে তুলতে কবি-কল্পনার রঙ ফলাতেও কার্পণ্য করেন নি। তিনি গ্রাম্য নর-নারীর সরল-সহজ জীবনকে উপজীব্য করেছেন এবং তাদের মৌল বোধগুলোকে স্বাভাবিক পরিবেশে বিকশিত হয়ে উঠতে দিয়েছেন। ফলে তাঁর কাব্যের নর-নারীদের চরিত্রে কোন আতিশয্য ঘটে নি, কৃত্রিমতা দেখা দেয় নি। তারা সর্বত্রই স্বাভাবিক এবং পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সাথে একীকৃত হয়ে গিয়েছে। স্বভাবের যোগে বিধৃত বলেই এদের ভাব, অনুভূতির প্রকাশ অকুণ্ঠ হয়েছে এবং অঙ্কিত চিত্রগুলোর সৌন্দর্য সকলের মনোহরণ করতে সমর্থ হয়েছে।

'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যটির ভাববস্তু বিশ্লেষণ করলেও এ সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

প্রসঙ্গত বলে রাখছি, এ বিশ্লেষণকাজে আমাদের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে [illegible] সালের বৈশাখ সংখ্যা বিচিত্রায় প্রকাশিত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বিখ্যাত 'নকসী কাঁথার মাঠ' শীর্ষক আলোচনাটি। প্রবন্ধটির সূচনায় আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে কিছুটা অবাস্তব বিরূপ মন্তব্য এবং পল্লীজীবন সম্পর্কে কিছুটা মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের কথা বাদ দিলে, এমন চমৎকার রসপূর্ণ পুস্তক সমালোচনা খুব অল্পই দেখা যায়। আমাদের বিবেচনায় আজ পর্যন্ত জসীমউদদীনের কোন কাব্যের এমন সুন্দর বিশ্লেষণ কেউই করেন নি। কৌতূহলী পাঠক গোটা প্রবন্ধ পড়ে দেখতে পারেন। আমরা এখানে প্রয়োজন অনুসারে তা থেকে উপাদান গ্রহণ করছি।

দুটি গ্রাম্য ছেলে মেয়ের কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত এ কাব্য চিত্র ১৫টি ছোট ছোট দৃশ্যপটে সম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি দৃশ্যে বাঙলার পল্লী কুটিরগুলোর এক একটি দৃশ্য উদঘাটিত হয়েছে। সে দৃশ্য বর্ণনা যেমনি বাস্তবধর্মী, তেমনি আশ্চর্য রূপে কবিত্বময়। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আধুনিক কালের ইংরেজী শিক্ষিত এক কবি এ কাব্য রচনা কালে একবারও ইংরেজী বা অন্য ভাষার দ্বারস্থ হন নি। পল্লীর সন্তান, ঋণ শোধ করার জন্যে নতুন শিক্ষার তাগিদেও অন্য কোথাও দানের জন্য হাত বাড়ান নি। এখানেই আধুনিক সাহিত্যিকদের থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য। অথচ তাই বলে তিনি কোথাও গ্রাম্যতার প্রশ্রয় দিয়েছেন এমন অভিযোগ করতে কেউ সাহসী হবেন না। স্বাভাবিক শিল্পচেতনাবশেই পল্লীপ্রকৃতির বর্ণনায়, এর নর নারীর প্রেম ভালবাসার বর্ণনে, প্রাত্যহিক জীবনের কর্মধারায় প্রকাশের জন্যে তিনি বিষয়বস্তু, ভাব, ভাষা অনেকটাই পল্লী থেকে নিয়েছেন। ঋণ তাঁর যা কিছু তা এ পল্লীকবিদের গীতি, গাঁথার জগতেই রয়েছে। সেখান থেকে ঋণ নিয়ে তিনি আপনার স্বাভাবিক কবিত্বের রঙ ফলিয়ে এ আশ্চর্য কাব্য-প্রতিমা গড়ে তুলেছেন। সমকালীন নাগরিক সাহিত্যের পাশে এ সাহিত্য তাই রূপে, রসে একটু অভিনবই ঠেকেছিল। নাটকীয় দৃশ্যপরম্পরায় সজ্জিত চৌদ্দটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ কাব্যটি ধীরে ধীরে যে জীবন চিত্রটি তুলে ধরেছে আমাদের সামনে, তাতে রামধনুর বর্ণালীর সমারোহ হয়তো নেই, কিন্তু মানবিক হৃদয়ঐশ্বর্যে তা তুলনাহীন। দৃশ্যের পর দৃশ্যে সে ঐশ্বর্য ভাণ্ডারই যেন উন্মোচিত হয়েছে।

প্রথমাঙ্কের বর্ণনীয় বিষয়—একটি মাঠ দিয়ে বিভক্ত করা পাশাপাশি দুটি গ্রাম ; এই মাঠটিই কালে 'নকসী কাঁথার মাঠ' নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। পাশাপাশি দুটি গ্রাম যেন দুই ভাইয়ের মতো জড়িয়ে আছে পরস্পরকে ; এদের মধ্যে ভাব ও অসদ্ভাব কিছুরই অভাব নেই—কখনো এরা পরস্পরের জন্যে সহানুভূতিতে বিগলিত হয়, মিলনে আকুলতা বোধ করে ; আবার কখনও সব আকর্ষণ বিস্মৃত হয়ে আত্মঘাতী হানাহানিতে প্রবৃত্ত হয়। কবি অতি সুন্দর ভাবে দুই গ্রামের এ অম্লমধুর সম্পর্কের ছবিটি এঁকেছেন :

"ও-গাঁর বধূ ঘট ভরিতে যে ঢেউ জলে জাগে,
কখন্ কখন্ দোলা তাহার এ-গাঁয় এসেও লাগে।
এ-গাঁর চাষী নিঝুম রাতে বাঁশের বাঁশীর সুরে,
ওই না গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় ঝুরে।
এ-গাঁও হতে ভাটীর সুরে কাঁদে যখন গান,
ও-গাঁর মেয়ে বেড়ার ফাঁকে রয় সে পেতে কান।
এ-গাঁও ও-গাঁও মেশামেশি কেবল সুরে সুরে,—
অনেক কাজে এরা ওরা অনেক খানি দূরে।"

এ-গাঁয় ও গাঁয় এ ভাবের বিনিময় সত্ত্বেও সময় সময় সুরটা বড় বেসুরো বাজে। তাই তো দেখা যায়,—

"এ-গাঁয় লোকে করতে পরখ ও-গাঁর লোকের বল
অনেক বারই লাল করেছে জলীর বিলের জল।"

দ্বিতীয় অঙ্কে আমরা পাচ্ছি কাব্যের নায়ক পল্লী-কিশোর রূপার একটি সজীব চিত্র। রূপা চাষীর ছেলে। গায়ের বরণটি তার কালো। কিন্তু ঐ কালো রূপেই সে সমস্ত গ্রামটি যেন আলো করে রেখেছে। এ কালো রঙের মহিমা বর্ণনে জসীমউদ্‌দীন যেন বৈষ্ণব-কবিদেরই পথ ধরেছেন,—

"কালোয় যে জন আলো বানায় ভুলায় সবার মন
তারি পদরজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।"

রূপা শুধু কালো রঙ আর কিশোর মূর্তি নিয়েই গ্রামটিকে বশ করে নি। তার গুণও আছে যথেষ্ট,

"আখরাতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
জারীর গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে
লাল সুন্দী বেত যেন ও, সকল কাজে লাগে।"

তৃতীয় অঙ্কে কবি নায়িকা সাজুকে উপস্থাপিত করেছেন সবাইর সামনে। রূপসী কিশোরী এই নায়িকার রূপের আভাস দিতে গিয়ে কবি বলেছেন, 'তুলসী তলায় প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঁঝের বেলা'। সে যেন 'দেব দেউলের ধূপ', কিন্তু 'তুলসী তলা', 'মন্দির' ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েও তিনি মুসলমানের ঘরের আঙিনার কথা বিস্মৃত হন নি। সাজুর শাড়ী পরা রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি যখন বলেন,—'লাল মোরগের পাখার মত ওড়ে তাহার শাড়ী', তখন কবির বাস্তববোধের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছে হয়। সাজুকে রূপার উপযুক্ত নায়িকা রূপেই কবি গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তাই রূপার ন্যায় তারও গুণের শেষ নেই। হাঁড়ির উপর সে নানা সুন্দর চিত্র আঁকতে জানে, সিকায় ফুল তুলতে তার জুরি নেই, আবার,—

"বিয়ের গানে ওরই সুরে সবারই সুর কাঁদে,
সাজু গাঁয়ের লক্ষ্মী মেয়ে বলে কি লোক সাধে?"

এর পর কয়েক অঙ্কে শ্যামল কিশোর নায়ক রূপা ও কিশোরী গৌরী নায়িকা সাজুর প্রেমের লুকোচুরি খেলার কথা বর্ণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য কিশোর-কিশোরীর এ প্রেমে 'যৌবনের উদ্দাম স্ফূর্তি, করস্পর্শে অঙ্গে বিদ্যুৎ বয়ে যাওয়া', 'রূপের ফাঁদে প্রেমিককে পেড়ে ফেলে তার জীবন-মরণ সমস্যার সৃষ্টি করা'—এ সকল দুরন্ত অভিনয়ের কিছুই নেই। এরা আদতেই প্রেমের খেলোয়াড় নয়, এরা শুধুই ভালোবাসার পাঠ নতুন শিখছে। দারুণ চৈত্রের খড়ার দিনে বৃষ্টির জন্যে গাঁয়ের ঘরে ঘরে 'নৈলা' গানের ঝঙ্কার উঠছে, এমনি দিনে বৃষ্টি-কামনায় সাজু গাঁয়ের বাড়ী বাড়ী ফিরছে মেঘের পূজার মাঙন, 'বদনা বিয়ের গান' গাইতে গাইতে। সঙ্গে তার চারজন খেলার সাথী। আগে পিছে পাঁচটি মেয়ে—'পাঁচটি রঙের ফুল'। এ উপলক্ষ্যে জসীমউদ্‌দীন গ্রামের মেয়েদের মুখ দিয়ে মেঘের যে বিচিত্র রূপের আভাস দিয়েছেন তাও উপভোগ্য। পল্লীবাঙলার চাষীর মতো মেঘের এত খবর আর কে রাখে। এই মেঘ যে কত রূপে, কত লীলায় আকাশে ভেসে বেড়ায়—এদেশের কৃষক লাঙল কাঁধে ফেলে ঊর্ধ্বমুখে তা লক্ষ্য করে তাদের বিচিত্র নামকরণ করে দিয়েছে কোন

প্রাচীন কালে। পল্লীবালিকারা তাই গানের সুরে আবৃত্তি করে করে মেঘকে আহ্বান জানায় দারুণ খরা দিনে। শিক্ষিত পাঠক কালিদাসের কৃপায় পুষ্কর, আবর্ত প্রভৃতি মেঘের ভুবন বিদিত নাম অবশ্য জানেন ; কিন্তু বাঙলার চাষী মেঘকে আদর করে যে কত নাম দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই ; অথচ তার খবর রাখার গরজ কেউ বোধ করেন না। জসীমউদদীন পল্লীবালিকাদের কণ্ঠে বিচিত্রনামা মেঘের বিচিত্র রূপের বন্দনা আমাদের শুনিয়েছেন ; বাস্তব পল্লীপারিপার্শ্বিক ও মানবিক আশা আকাঙ্ক্ষার যোগে সে বর্ণনা বড় মধুর, বড় সুন্দর। বালিকা কণ্ঠে মেঘের একটি স্তুতি :—

"কালো মেঘা নামো নামো, ফুল তোলা মেঘ নামো,
ধুলট মেঘা, তুলট মেঘা, তোমরা সবে থামো।
কানা মেঘা টলমল বারো মেঘার ভাই,
আরও ফুটিক ডকল দিলে চীনার ভাত খাই।
কাজল মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া,
তোমার ভালে টিপ আঁকিব মোদের হলে বিয়া।
আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতি
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি।
কৌটা ভরা সিঁদুর দিব, সিঁদুর মেঘের গায়,
আজকে যেন দেওয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়।"

এই ধরনের ছড়ার গান আজও বোধহয় পল্লীবালিকাদের কণ্ঠে শোনা যায়। যা বলছিলাম, খেলার সাথীদের নিয়ে মেঘের প্রশস্তি গাইতে গাইতে সাজু রূপার কুটির প্রাঙ্গনে এসে হাজির হয়েছে। রূপার মা তাদেরকে এক সের ধান দিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে সাজুকে দেখে রূপা পরম উদ্যমে এসে মাকে বলে,—'এই দিলে মা থাকবে না আর মান' এবং মায়ের অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই আরও পাঁচ সের চাউল দিয়ে সাজুর প্রতি তরুণ হৃদয়ের অনুরাগের উৎসাহ ও আবেগ কত বেশি তা জানিয়ে দিল। এমনি ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রেম আপন পথ ধীরে ধীরে রচনা করে চলেছে। রূপা বাঁশ কাটতে গিয়েছে ভিনগাঁয়ে, সেখানে আবার সাজু'কে দেখতে পেল, প্রাণের পুলক সে ঢেকে রাখতে পারছে না, সাজু'কে দেখবার ইচ্ছা তার প্রবল; কিন্তু লজ্জায় সাহস করে চোখ মেলে তার দিকে তাকাতে পারছে না। কিশোর বয়সের এই সপ্রতিভ লাজুকতার ছবি কবি এমন নিপুণ ভাবে এঁকেছেন, যার সমালোচনা করা দুঃসাধ্য; শুধু বলতে ইচ্ছে হয় 'কি সুন্দর'। সাজুর মা রূপা'কে আদর করে খাওয়াচ্ছেন—রূপা যা খায় তারই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠছেন। প্রশংসা শুনে সাজুর মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠছে, ভিতরে ভিতরে সে পুলকও বোধ করছে, কারণ সেই ত রান্না করেছে। অবশ্য এখানেও লক্ষ্য করবার বিষয় লেখক প্রেমচিত্র বিকশিত করতে গিয়ে বাস্তব পারিপার্শ্বিককে কোন মতেই বিস্মৃত হন নি। রূপাই তার ঘর মেরামত করার জন্যে ভিনগাঁয়ে এসেছে বাঁশ কিনতে—'মাজায় গোঁজা রাম কাটারী চক্‌চকাচক্ ধার। কাঁধে রঙিন গামছাখানি দুলছে যেন হার'। এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বাঁশ পছন্দ করে অবশেষে বাঁশ কাটতে শুরু করে। ঐ সময়ই হঠাৎ সাজুকে দেখতে পেয়ে মন তার স্বপ্নরঙীন হয়ে উঠেছিল—মনের মধ্যে নানা সুর গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল। কত রকম বাঁশই না রূপা কাটল।—এই উপলক্ষে বাংলাদেশে যত প্রকার বাঁশের শ্রেণী আছে সবগুলোর একটা মোটামুটি তালিকা কবি দিয়ে ফেলেছেন—অবশ্য একে তালিকা বলা ঠিক হবে না; কারণ

কবির হাতে ঐ নীরস কথাগুলোও বেশ কাব্যময় ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। রূপার মনে ভালভাবেই রঙ ধরেছে ঃ—

"ঘরেতে রূপার মন টেকে না যে, তরলা বাঁশীর পারা
কোন বাতাসেতে ভেসে যেতে চায় হইয়া আপন-হারা"

সে নানা ছল-ছুতোয় কত শতবার সাজুদের বাড়ী যাচ্ছে। সে সকল ছলনা প্রায়ই ধরা পড়ে যায়। একদিন সে অসময়ে সাজুদের ওখানে হঠাৎ উপস্থিত হওয়াতে সাজুর মা জিজ্ঞেস করেন, সে অমন অসময়ে এসেছে কেন? রূপাই থতমত খেয়ে যায়, ধরা পড়ে যায় আর কি? কৈফিয়ৎ দেয়ার হাস্যকর চেষ্টায় সে সুস্থ মানুষ সাজুর মাকে বলে, যে তার জ্বরের কথা শুনে সে দেখা করতে এসেছে এবং অমনি তার খাবার 'আধ সের খানি গজা' কিনে এনেছে। সাজুর মা যখন হাসিমুখে জবাবে বলেন, 'কই আমার তো জ্বর হয় নি, আর জ্বর হলে কি কেউ গজা খায়', তখন এ উক্তিতে কিশোরের অসর্তক চাতুরী ধরা পড়ে যায়, সে লজ্জায় মাথা হেঁট করে বসে থাকে। এমন প্রেমের লুকোচুরি খেলা অনেক আছে। তারই মধ্য দিয়ে প্রেম আপন আধিপত্য কায়েম করে অগ্রসর হয়েছে। কবির ভাষায় ঃ

"এমনি করিয়া দিনে দিন যেতে দুইটি তরুণ হিয়া
এ উহারে নিল বরণ করিয়া বিনি-সূতি মালা দিয়া।
এর প্রাণ হতে ওর প্রাণে যেয়ে লাগিল কিসের ঢেউ
বিভোল কুমার, বিভোল কুমারী, তারা বুঝিল না কেউ।"

দুটি কিশোর-কিশোরীর প্রাণে প্রেমের অলক্ষ্য আবির্ভাবের এ ইঙ্গিতটি বড় সুন্দর—কিন্তু এবার দুজনেই কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে; তখন যা ছিল সরল ও অনাবিল, তাই এখন জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। তাদের কৈশোরের উচ্ছল লীলাখেলা অবশ্য সংযমের বাঁধ মেনেই চলেছে। তবু ফুলের ন্যায় নির্মল দুইটি প্রাণের কথা নিয়ে দুষ্ট প্রতিবেশীরা নির্মমভাবে টানা-হেঁচড়া করতে ছাড়ল না; তারা কলঙ্ক রটাতে শুরু করল। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো যাদের অভ্যাস, সেই অকর্মা সংবাদবাহী বুড়ীদের গ্রাম্য-অবসর পূরণের বেশ একটা সুযোগ জুটে গেল। রূপা ও সাজু'কে নিয়ে নানা কুৎসা রটনা করতে লাগল তারা। রূপা বিড়ম্বিত হয় পদে পদে, দুঃখ পায়, বুঝতে পারে না, অপরাধটা তার কোথায়? শুভাকাঙ্ক্ষীর বেশ ধরে তাদের ঘন ঘন যাতায়াত শুরু হল রূপার মার কাছে। রূপার কল্যাণ কামনায় যেন তাদের চোখের ঘুম গিয়েছে। গায়ে পড়ে রূপার মাকে নানা উপদেশ দিয়ে ঘরে ফিরে। রূপার নামে নিন্দার কথাটাও বলে যেতে ভুল করে না। অবশ্য সেটা তারা অন্যের কাছ থেকে শুনেছে বলেই না জানিয়ে পারে না । 'খেদির মা, 'টুনীর ফুপুদের', এই অযাচিত নিন্দা ও উপদেশে সন্ত্রস্ত হয়ে রূপার মা তার ছেলের সঙ্গে সাজুর বিয়ে স্থির করে পাড়াপড়শীদের শানিত জিহ্বা ভোতা করে দিলেন। এই বিষয়ে ঘটকালী থেকে বাসর-রজনীর শেষ পর্যন্ত (৭ম ও ৮ম অঙ্ক) কবি যে দৃশ্যপট এঁকেছেন, তা বাংলাদেশের চাষীঘরের একখানি নিখুঁত সামাজিক চিত্র। এ চিত্র কবির সমৃদ্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতার ছাপ যেমন বহন করে, তেমন বহন করে মানব চরিত্রে তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়। দুবাই ঘটক বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে সাজুর মায়ের কাছে যাচ্ছে ; পদক্ষেপে তার প্রত্যয়ের দৃঢ়তা। কবি তার গতিভঙ্গির বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

"দুখাই ঘটক নেচে চলে, নাচে তাহার দাড়ি
বুড়ো বটের শিকড় যেন চলছে নাড়ি নাড়ি।
ধানের জমি বাঁয় ফেলিয়া—ডাইনে ঘন পাট
জলীর-বিলে নাও বাহিয়া ধরল গাঁয়ের বাট।"

তারপর কবি স্বল্পকথায় দুখাইর ঘটকালী সংক্রান্ত কার্যের বর্ণনা দিয়ে তার অসাধারণ বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। দুখাই এক সংকট মুহূর্তে আবির্ভূত হয়ে দুই পরিবারের মিলন ঘটিয়ে মহা-হিতৈষী রূপে দেখা দিয়েছে, অথচ ঐ উপলক্ষে নিজের আখের গুছিয়ে নিতেও কসুর করে নি। এমন জীবন্ত চরিত্র কবির অন্যান্য কাব্যেও বিরল। দুখাইর ঘটকালীর ফলে সাজু ও রূপার বিয়ে স্থির হল। কবি বিয়ের আসরের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা একটু জমকালো রকমেরই বটে; তবে তাতে বাস্তবের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি আছে স্বীকার করতেই হয়। পল্লীর মুসলমান গৃহে বিয়ের হৈ-চৈ আনন্দ উল্লাসের এ চিত্রটি মনোজ্ঞ ঃ—

"বিয়ের কুটুম এসেছে আজ সাজুর মায়ের বাড়ী,
কাছারী ঘর গুমগুমাগুম—লোক হয়েছে ভারি।
গোয়াল-ঘরে ঝেড়ে পুছে বিছান দিল পাতি;
বসল গাঁয়ের মোল্লা মোড়ল গল্প-গানে মাতি।"

....

"পড়ে কেতাব গাঁয়ের মোড়ল নাচিয়ে ঘন দাড়ি,
পড়ে কেতাব গাঁয়ের মোল্লা মাঠ ফাটা ডাক ছাড়ি।"

তারপর মিঞারা কত কেচ্ছা শুনিয়ে সমবেত লোকদের মন হরণ করেছেন—হানিফার কথা, গাজীকালু-চম্পাবতীর কথা শুনে লোক মেতে উঠেছে। বিশেষতঃ হানিফার যুদ্ধ বর্ণনায় খুব বাহাদুরী আছে ঃ—

"কাতার কাতার সৈন্য কাটে যেন কলার বাগ,
মেষের পালে পড়েছে যেন সুন্দরবনি বাঘ।"

এদিকে কেচ্ছা শুনে মেতে উঠেছে লোকজন, অন্যদিকে,—

"উঠান পরে হল্লা করে পাড়ার ছেলেমেয়ে,
রঙীন বসন উড়ছে তাদের নধর তনু ছেয়ে।"

বিয়ে বাড়ীর এ বর্ণনা কবির বাস্তব দৃষ্টির ও সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। এর পরে সংসারের নিয়মে রূপাই ও সাজুর নতুন জীবন গড়ার স্বপ্ন বাস্তবের রূঢ়তায় হল কিছুটা ম্লান। রূপাইর স্নেহময়ী মায়ের মৃত্যুতে ঘরে নেমে এল দুঃখ ও শোকের ছায়া। তবু ধীরে ধীরে তারা সব বেদনা ভুলে গেল। 'আবার তারা সুখেরই ঘর বাঁধল মনের মত'।

দশম অঙ্কে আমরা পাচ্ছি রূপা ও সাজুর গৃহস্থালীর কথা। এখানে চাষী-জীবনের সুখ-দুঃখ ও জীবনের মূল সূত্রটি অতি স্পষ্ট রেখায় আঁকা হয়েছে। ধানের মরসুম এসে গেছে। রূপা অবিশ্রান্ত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে মাঠে, আর স্বামীসোহাগিনী সাজু হাসিমুখে আহ্লাদে গৃহের কাজ করে চলছে ; অর্ধরাত্রি পর্যন্ত ধানের মলন চলছে—'নবীনা কৃষাণী ঢেঁকির পাড়েতে মুখর করিছে একেলা সারাটি বাড়ী'। কোন কোন দিন হেমন্তের জ্যোৎস্নায় সাজু 'ঘুমায়ে পড়িছে ঝাড়িতে ঝাড়িতে ধান'। ধানের কাব্য শেষ হয়ে আসে, গানের কাব্য শুরু হয়—দীর্ঘ রাত জেগে তারা সুখস্বপ্নে বিভোর হয়। সারাদিনের শ্রান্তির পর দম্পতির সুখ-শয়ন। প্রেমমুগ্ধ রূপা প্রতিদিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে ছড়িয়ে দেয়

হৃদয়-মাধুর্য চারিদিকে। সাজুকে নিয়ে স্বপ্ন কল্পনার জাল বুনে চলে সে প্রতিদিন রাত্রিতে। ওদের এক রাত্রির কথা এ রূপ ঃ

"সে দিন রাত্রে বাঁশি শুনে শুনে বউটি ঘুমায়ে পড়ে
তারি রাঙা মুখে বাঁশি -সুরে রূপা বাঁকা চাঁদ এনে ধরে।
তারপর খুলে চুলের বেণীটি বার বার করে দেখে,
বাহুখানি দেখে নাড়িয়া চাড়িয়া বুকের কাছেতে রেখে।
কুসুম ফুলেতে রাঙা পাও দুটি দেখে আরো রাঙা করি,
মৃদু তালে তালে নিশ্বাস বায়, শুনে মুখে মুখ ধরি।
ভাবে রূপা ও যে দেহ ভরি' যেন এনেছে ভোরের ফুল,
রোদ উঠিলেই শুকাইয়া যাবে, শুধু নিমেষের ভুল।"

অপূর্ব এ প্রেম-চ্ছবি !

একাদশ অঙ্কে জমি নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিত্র। রূপা ও সাজুর জীবনে মহাদুর্দৈবের ন্যায় দেখা দিয়েছে এই ঘটনা। একটা ঝড়ো হাওয়ার ন্যায় এসে তাদের সুখের নীড়কে বিধ্বস্ত করেছে। ইতিপূর্বে রূপার প্রেম-কোমল রূপেরই পরিচয় পেয়েছি। সে পরিচয় তো অসম্পূর্ণ। বাঙালী চাষী ঘরের ছেলে সে। তার হাতে বাঁশের বাঁশী আর বাঁশের লাঠি দু-ই অনিবার্য। দুইয়ের ব্যবহারে রূপা অতুলনীয়। একদিকে সে ফুলের মতো কোমল, মৃদু মৃদু হিল্লোলে প্রেমের গান ফুটে ওঠে তার কণ্ঠে, অপর দিকে সংগ্রামস্থলে হিংস্র দুর্দান্ত পশুর মতো গর্জনে ফেটে পড়ে।

চরের জমির অধিকার নিয়ে দুই দলে বিবাদ বেধে উঠেছে—তরুণ রূপা আপন শৌর্যবীর্যে একদলের নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংগ্রামের আহ্বান আসতেই রূপা এক মুহূর্তেই সাজুর কোমল আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নির্মম উৎসাহে অকুস্থলে ছুটে চলেছে। গায়ে তার যেন মত্তহস্তীর বল, কোন বাঁধাই তাকে আটকে রাখতে পারে না রূপার যুদ্ধযাত্রার বর্ণনাটি কবির মুখেই শুনুন ঃ

"আলী আলী আলী আলী রূপার যেন কণ্ঠে ফাটি
ইস্রাফিলের শিঙ্গা বাজে, কাঁপছে আকাশ, কাঁপছে মাটি।
তারি সুরে সব লেঠেলে লাঠির পরে হানল লাঠি,
আলী আলী শব্দে তাদের আকাশ যেন ভাঙবে ফাটি।
আগে আগে ছুটলো রূপা, বোঁ বোঁ বোঁ সড়কি ঘোরে,
কাল সাপের ফণার মত বাবরী-মাথার চুল যে ওড়ে।
চল্‌ল পাছে হাজার লেঠেল আলী আলী শব্দ করি,
পায়ের ঘায়ে মাঠের ধূলো আকাশ বুঝি ফেল্‌বে ভরি।
চল্ল তারা মাঠ পেরিয়ে চল্ল তারা বিল ডিঙিয়ে,
কখন ছুটে, কখন হেঁটে, বুকে বুকে তাল ঠুকিয়ে।
চল্ল যারা ঝড়ের দাপে ঘোলাট মেঘের দল ছুটে যায়,
বাও কুড়ানীর মতন তারা উড়িয়ে-ধূলি পথ ভরি হায়।"

এই বর্ণনা এতই জীবন্ত, মনে হয় আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি এবং দুই পক্ষেরই উন্মত্ত বীরমূর্তি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কবি এখানে যুদ্ধ বর্ণনায় পুঁথিকারদেরই যেন অনুসারী। কিন্তু পুঁথিকারদের সাধ্য কি তাকে এমন জীবন্ত করে তোলে। তাদের হাতে রচনার সে যাদু কই?

দ্বাদশ অঙ্কে দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবাঞ্ছিত পরিণাম হিসেবে কেমন করে রূপা তথা সাজুর জীবনে দুঃখের কালছায়া নেমে এল তাই কবি অতি দরদ দিয়ে এঁকেছেন। প্রসঙ্গতঃ কবি রূপার জন্য বিরহিনী সাজুর অধীর প্রতীক্ষা, রূপার প্রত্যাবর্তন ও সাজুর কাছ থেকে করুণ বিদায়ের দৃশ্যটি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। এ দৃশ্য আমাদের মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। এই অংশের কাব্যমূল্যও যথেষ্ট। রূপা দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর খুনের দায়ে পড়ে পুলিশের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে পালিয়েছে। এদিকে সাজু তার পথ চেয়ে আছে। দিন গেল, সন্ধ্যা এল তবু রূপা ফিরল না। আশঙ্কায় তার বুক দুরু দুরু করে কেঁপে ওঠে। সে ত আর জানে না তার স্বামী পুলিশের ভয়ে ফেরার হয়েছে। মনের মধ্যে তার শত চিন্তা পাক দিয়ে ফেরে! রাত গড়িয়ে চলে, সাজুর ঘুম আসে না ঃ—

"ঘরের মেঝেতে সপটি ফেলায়ে বিছায়ে নক্‌সী কাঁথা,
সিলাই করিতে বসিল সে সাজু একটু নোয়ায় মাথা।
পাতায় পাতায় খস্ খস্ খস্, শুনে কান খাড়া করে,
যারে চায় সেত আসে নাক শুধু ভুল করে করে মরে।
তবু যদি পাতা খানিক না পড়ে ভাল লাগে নাক তার,
আলো হাতে ল'য়ে দূর পানে চায়, বার বার খুলে দ্বার।"

দীনেশচন্দ্র কাব্যের এ অংশে "গ্রাম্য ভাষায় জয়দেবের 'পততি পতত্রে বিগলিত গাত্রে'র অনুবাদই" যেন সংযোজিত দেখতে পেয়েছেন। প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় রাত প্রায় শেষ হয়ে আসে, আকাশের গায়ে শুকতারা প্রায় ডুবু ডুবু। শেষ রজনীর চাপা নিশ্বাসের ন্যায় ধীরে ধীরে পল্লীর কুটিরে বায়ু বয়ে যাচ্ছে। চোখে পলকহীন ভাবে সাজু বসে আছে। এমন সময় রূপা চোরের মতো এল। কিন্তু তাকে যে তখনই চলে যেতে হবে পুলিশের হাত এড়ানোর জন্যে। সে একবার তার প্রাণ-পুত্তলী সাজুকে দেখে যেতে এসেছে। অবস্থার ফেরে সুন্দরী স্ত্রীকে নিঃসহায় ভাবে একলা ঘরে ফেলে তাকে চলে যেতে হবে, একি একটা মর্মান্তিক ব্যাপার তা রূপা অতি অল্প কথায় ব্যক্ত করেছে সাজুর কাছ থেকে বিদায় কালে। রূপার মা আজ আর জীবিত নেই, সাজু তার সে শূন্য ঘর যে কেমন করে একলা আগলিয়ে থাকবে, রূপা তা ভেবে পায় না। সাজুর সাথে তার এ দেখাই হয়তো শেষ দেখা হবে, এ আলিঙ্গনই শেষ আলিঙ্গন হবে। তারপর রূপা অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াবে, হয়তো অকূলে ঝাঁপ দিবে। আর হয়তো ফিরবে না। বিদায়ের পূর্বে সাজুর কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে অশ্রু সজল চোখে বলল ঃ—

"মাকড়ের আঁশে হস্তী যে বাঁধে পাথর ভাসায় জলে,
তোমারে আজিকে সঁপিয়া দিলাম তাঁহার চরণ তলে।'
'মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি, যদি কোন ব্যথা লাগে
দুটি কালো চোখ সাজাইয়া নিও কাল কাজলের রাগে।
সিন্দুরখানি পরিও ললাটে—মোরে যদি পড়ে মনে,
রাঙা শাড়ীখানি পরিয়া সজলি চাহিও আরশি কোণে।
মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি যতনে বাঁধিও চুল,
আলসে হেলিয়া খোঁপায় বাঁধিও মাঠের কলমী ফুল।
আর যদি সখি মোরে ভালবাস, মোর তরে লাগে মায়া,
মোর তরে কেঁদে ক্ষয় করিও না অমন সোনার কায়া।"

বিদায়ের রক্তরাগে প্রেম আপন মহিমার ছটা বিকীর্ণ করে গেল।

ত্রয়োদশ অঙ্কে এ কাহিনীর প্রকৃতপক্ষে যবনিকাপাত হয়েছে। রূপাই চলে যাওয়ার পর একটি বছর সাজু একাকী স্বামীর ভিটেয় পাহারা দিয়েছে। এদিকে গাঁয়ের অনেক লোকই মামলায় খালাস পেয়েছে। শুধু ফিরল না রূপা। একা তো আর থাকা যায় না। সাজুকে সকলে তার মায়ের নিকট এনে রাখল। দিনরাত দুঃখজ্বালা বুকে নিয়ে কেঁদেকেটে সাজুর দিন কাটে। কিন্তু রূপার ফিরার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। শোকে দুঃখে জীর্ণ কঙ্কালসার হয়ে পড়ে সাজুর দেহ। সাজুর বুড়ী মা মেয়ের দুঃখে পাগলের প্রায় সবাইকে রূপার কথা জিজ্ঞেস করে, একটু আশার কথা শুনলেই উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। মেয়েকে সান্ত্বনা দেয়। সাজু স্বামীর প্রেম-ভালবাসার কথা স্মরণ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বছর কেটে যায়। এমনি কত বছরই তো কাটল! সাজু আবার নক্‌সী কাঁথাটি নিয়ে বসে। এই কাঁথাটিতেই তো সে বহু বছর ধরে ঘরের কাছের মাঠটির ছবি নক্‌সী সুতোয় বুনট করছিল। সে যেদিন এই নক্‌সী কাঁথা সেলাই করতে শুরু করেছে তখন ঃ—

"স্বামী বসে তার বাঁশী বাজায়েছে সেলাই করেছে সে যে,
গুন্ গুন্ করে গান কভু রাঙা ঠোঁটেতে উঠেছে বেজে।"

এই কাঁথা তৈরি করার সাথে সাজুর কত মধুর স্মৃতিই না জড়িত! সে সকল দিন গিয়েছে। এবার সে কোমল হাতে সে নক্‌সায় শেষ রেখাটি টেনে দিল ঃ—

"খুব ধরে ধরে আঁকিল যে সাজু রূপার বিদায়-ছবি,
খানিক যাইয়া ফিরে ফিরে আসা, আঁকিল সে তার সবি।"

দুর্বল রোগ-পান্ডুর সাজু পৃথিবী থেকে বিদায়ের আয়োজন করে ধীরে ধীরে। পান্ডুর হাতে সূঁচ লয়ে কাঁথার উপরে নিজের কবর আঁকে। তারই পাশে টেনে দেয় এক গেঁয়ো রাখালের ছবি। মনের মত ছবিটি এঁকে বারবার দেখে আর চোখের জলে ভাসে। কাঁথা আঁকার পালা শেষ—সাজু ধীরে ধীরে কাঁথাখানা ছড়িয়ে দেয় নিজ শয্যার উপর। এ শয্যাই হল তার শেষশয্যা; মৃত্যুর তুহিন স্পর্শে তার সকল চেতনা অসার হওয়ার আগে সে পাশে উপবিষ্ট বুড়ী মাকে ডেকে তার অন্তিম কামনার কথা বলে ঃ

'সোনার-মা আমার, সত্যিই যদি তোরে দিয়ে যাই ফাঁকি'

তবে—

"এই কাঁথাখানি বিছাইয়া দিও আমার কবর পরে
ভোরের শিশির কাঁদিয়া কাঁদিয়া এরি বুকে যাবে ঝ'রে।
সে যদি আবার ফিরে আসে কভু, তার নয়নের জল,
জানি জানি মোর কবরের মাটি, ভিজাইবে অবিরল।
হয়ত আমার কবরের ঘুম ভেঙ্গে যাবে মাগো তাতে,
হয়ত তাহারে কাঁদাইয়া আমি জাগিব অনেক রাতে।
এ কথা সে মাগো কেমনে সহিবে? বলো তারে ভাল করে,
তার আঁখিজল ফেলে যেন এই 'নক্‌সী কাঁথার পরে।"

অভাগিনী সাজু প্রেমেরই পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে প্রিয়ের দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে বিদায় নিল। তার ইচ্ছা অনুসারেই তার কবরের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তারই হাতের বোনা নক্‌সী কাঁথাখানি। এখানেই বস্তুতঃ কাব্যের শেষ। তবু রূপার স্মৃতি কেমন যেন কাঁটার খোঁচার মতো আমাদের বিঁধতে থাকে। হতভাগ্য রূপা কি একেবারেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল! কবি উপসংহারে সে কাহিনীই সংক্ষেপে বলেছেন। সাজুর মৃত্যুর পর বহুদিন

চলে গেছে, রূপার কথাও গ্রামের সকলে ভুলে গিয়েছে; তারপর একদিন সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে ঃ—

"বহুদিন পরে গাঁয়ের লোকেরা গভীর রাতের কালে,
শুনিল কে যেন বাজাইছে বাঁশী বেদনার তালে তালে।
প্রভাতে সকলে আসিয়া দেখিল সেই কবরের গায়,
রোগ পান্ডুর একটি বিদেশী মরিয়া রয়েছে হায়।
সারা গায়ে তার জড়ায়ে রয়েছে সেই নক্‌সী কাঁথা,
আজও গাঁর লোকে বাঁশী বাজাইয়া গায় এ করুণ গাথা।"

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অভিশপ্ত দুটি প্রাণ প্রেমেরই জন্যে যেন প্রায়শ্চিত্ত করেছে। নক্‌সী কাঁথার ফোঁড়ে সে বেদনার কাহিনীই বিধৃত হয়েছে। এ প্রেমস্মৃতি বিজড়িত হয়েই গাঁয়ের মাঠটি 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' নামে আখ্যাত হয়েছে।

রূপা ও সাজুর কাহিনীকে কবি নিজেই বলেছেন 'করুণ গাথা।' বস্তুতঃ এ কাব্যগাথা জাতীয় রচনাই—তবে আধুনিক যুগের শিল্পীর হাতে পড়ে প্রায় সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরাতন লোকগাথা এক ধরনের পদ্যে বর্ণিত আখ্যায়িকা বিশেষ। সেগুলোর রচয়িতা পল্লীর মানুষ, তাদের শ্রোতাও ছিল পল্লীর মানুষ। সাধারণতঃ এগুলো গীত হত। লোকজীবনের প্রেম, ভালবাসা,বিরহ, কলহ, ঘৃণা ও বীরত্বের কোন কাহিনী অবলম্বনে এ গাথাগুলো লোকমুখেই গড়ে উঠত। গাথাগুলোর রচনারীতিতে কোন জটিলতা দেখা যায় না। সরল ভাষায় স্পষ্ট করে দ্রুতগতিতে গল্প বলে যাওয়া হত ; সে ভাষায় থাকত শিশুসুলভ একটা সাদামাটা রূপকাহিনীর গাঁথুনি, নর-নারীর মনোভাব, ভাবানুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের জন্যে তাদের মাথা ব্যথা ছিল না ; অথচ সামান্য কাহিনীকে নানা কথার ফোঁড়ন দিয়ে দীর্ঘ করে তোলার দিকে তাদের বেশ আগ্রহ ছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে কোন স্বভাব-কবির হাতে পড়ে গাথাগুলো আশ্চর্য নাটকীয় গুণে ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠত। তখন তা লোকজীবনের গণ্ডী ছেড়ে দেশের সর্বস্তরের মানুষের আদরের জিনিস হয়ে উঠত। আমাদের বাংলা সাহিত্যে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'গোপীচাঁদের গীতি' এই জাতীয় গাথার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিশেষতঃ মৈমনসিংহ গীতিকা "আখ্যান বস্তু গ্রন্থন চাতুর্যে জীবনের বাস্তব অনুভূতির রূপায়ণে এবং সহজ ও সরস ভাষার গৌরবে বাংলা সাহিত্যে অমর" হয়ে থাকবে। পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্যেই গাথা প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগে। তবে আধুনিক কালে জীবনের জটিলতা বেড়ে যাওয়ায় আমরা চারিত্রিক সরলতা হারিয়ে ফেলছি, আমাদের সকল ভাবনা, চিন্তা রুচিবোধে কেমন জট পাকিয়ে গিয়েছে। জীবনের সরল, উদার অকৃত্রিম রূপের মাধুর্য অনুভব করার ক্ষমতাও আমরা দিন দিন হারিয়ে ফেলছি। তাই প্রাচীন গীতি-গাথায় আমাদের মন আর ভরে না। তবু গীতি-গাথার কাহিনীর মানবীয় আবেদন, এর আশ্চর্য নিরাভরণ ভাষা, এর নর-নারীর জীবনের সহজ-সরল রূপের আকর্ষণ কোনদিনই একেবারে বিলুপ্ত হওয়ার নয়। আধুনিক কালেও তাই দেখি বিভিন্ন দেশে 'গাথা' জাতীয় কাব্য রচিত হচ্ছে। এ 'গাথা' কাব্যকে পুরাতন গাথা কাব্যের বিবর্তিত সাহিত্যরূপ বলা যেতে পারে। এ কাব্যের ভাষায় পরিমার্জন সত্ত্বেও পুরাতন গাথার গঠনরীতির অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। তবে তাতে আধুনিক যুগোচিত কাহিনীর বিস্তৃতি সাধন, মনোবিশ্লেষণ, চরিত্রাঙ্কন ও বিস্তৃত বর্ণনার প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। এই ধরনের রচনা প্রকৃত পক্ষে পুরাতন ধারার রচনার বিবর্তিত মার্জিত রূপ, পুরাতনের হীন অনুকৃতি মাত্র নয়। জসীমউদ্‌দীনের 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' গাথার বিবর্তিত সাহিত্যিক

রূপ। তিনি ভাষার ভঙ্গিতে গ্রাম্য গাথার আদল কিছুটা রক্ষা করেও বিস্তৃত সামাজিক পটভূমিতে স্থাপন করে কাব্যের আখ্যানভাগের প্রয়োজনীয় বিস্তৃতিসাধন করেছেন, গল্পাংশ বর্ণনার নাটকীয় সংস্থান সৃষ্টিতে মনোযোগ দিয়েছেন, চরিত্রগুলোকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার প্রয়াস পেয়েছেন এবং নর-নারীর হৃদয়াবেগের বিস্তৃত বিশ্লেষণও করেছেন। পরিমার্জন সত্ত্বেও তাঁর কাব্যের ভাষা সরল ও অনাড়ম্বর এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। মোট কথা 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক গাথা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

জসীমউদদীন এ কাব্যে পল্লীকিশোর রূপা ও পল্লীকিশোরী সাজুর প্রেমের বিকাশ ও করুণ পরিণতি শুধু একটি চমৎকার ছোট্ট কাহিনী রূপেই পরিবেশন করেন নি। এই উপলক্ষে তিনি পল্লীগ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সজীব বর্ণনা দিয়েছেন, সমাজ বাস্তবের বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করেছেন, নানা স্তরের নর-নারীর চরিত্র চিত্রণে বাস্তববুদ্ধি ও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজ বাস্তবের বর্ণনায়, চরিত্র-চিত্রণে, মনোভাব বিশ্লেষণে তিনি ঔপন্যাসিকের বাস্তব দৃষ্টি, সমৃদ্ধ জীবনাভিজ্ঞতা ও মানবচরিত্রে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রেখে গেছেন। রূপা ও সাজুর প্রেমাকর্ষণ ও তার পরিণতি তিনি একটির পর একটি দৃশ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এতে কবির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নৈপুণ্যের সাথে হৃদয়-মাধুর্য আস্বাদনের সহজাত কবি-ক্ষমতার পরিচয় মিলে। স্বরাক্ষরে চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতার পরিচয় এ কাব্যে প্রচুর রয়েছে। রূপা সাজুর চরিত্র মোটামুটি পরিপূর্ণ বিকশিত চরিত্র। রূপা বলিষ্ঠ প্রেমিকার রূপা-সাজুর কোমল প্রেমময়ী রূপ দুইই আমাদের আকর্ষণ করে। প্রেমের রাজ্যে এরা শুধু স্বপ্নচারী নয়, এরা বাস্তব পৃথিবীর রূঢ়তার সম্মুখীন হয়েছে বারবার। আর তাতেই তাদের চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে বেশি।

পল্লীসমাজের অগণিত নর-নারী এ কাব্যে ভীড় করেছে। চলমান দৃশ্যে এরা যতটুকু স্থান জুড়ে বসতে পারে, কবি তাদের ততটুকুই স্থান দিয়েছেন। 'দুখাই ঘটকের' চরিত্রাঙ্কনে কবির মানবচরিত্রে অর্ন্তদৃষ্টির সুন্দর পরিচয় মিলে। সাজুর মা রূপার মার চরিত্র পল্লী-নারীর স্নেহময়ী মাতৃমূর্তির সার্থক উদাহরণ। তা ছাড়া গ্রাম্য মাতব্বর, মোল্লা, বিয়ের কুটুম, লেঠেল ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের মানুষের ছবি কবি এঁকেছেন এ কাব্যে। পাড়া কুঁদলী ক্ষেদির মা, টুনীর ফুপুও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। পল্লীর ঘরকন্না, উৎসব-অনুষ্ঠান, কলহের দৃশ্য কিছুই বাদ পড়ে নি তাঁর বর্ণনা থেকে। সমাজ-বাস্তবের স্বীকৃতিতে এ কাহিনী উপন্যাসের গরিমা লাভ করেছে অনেকটাই তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বস্তুতঃ 'নকসী কাঁথার মাঠ' সাধারণ পল্লী গাথায় ন্যায় নর-নারীর প্রেম-বিরহ-ভাবনাকে উপজীব্য করে কবির ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাসের প্রকাশ মাত্র নয়—এ কাব্যে কবির সমাজচেতনা বেশ প্রবল। তিনি যে নর-নারীর ভালবাসার ছবি এখানে এঁকেছেন তারা বৈষ্ণব কাব্যের নর-নারীদের ন্যায় শুধু হৃদয়রাজ্যের অধিবাসী নয়। তারা বাস্তব সামাজিক পারিপার্শ্বিকে পরিবর্ধিত আর পাঁচজন মানুষের ন্যায়ই রক্তমাংসের মানুষ। তারা সুখে হাসে, দুঃখে কাঁদে, বিপদে বিচলিত বোধ করে। আবার প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে, নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টাও করে। তাদের অন্তরাবেগ প্রকাশের ভাষা শহুরে শিক্ষিত মানুষের থেকে অনেকটা আলাদা। কোন কৃত্রিমতার ধার ধারে না এরা ; এরা যখন ভালবাসে প্রাণ ঢেলেই ভালবাসে, আবার-ঘৃণা-বিদ্বেষ-হিংসায় জর্জরিত হয়ে উঠে হিংস্র পশুর মতই উন্মত্ত হয়। স্নেহে-করুণার প্রেমে, হিংস্র বর্বরতায় তারা সমান প্রবল। এই সরলপ্রাণ পল্লী মানুষের কথাই জসীমউদদীন বলতে চেয়েছেন তাঁর কাব্যে। তিনি তাদের ভালবেসেছেন, তাদের দুঃখ-বেদনাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন, তাদের মধ্যে বহুদিন কাটিয়েছেন, তাদের

সাথে সুখ-দুঃখের কথা আলাপন করেছেন। নিজে তিনি তাদের জন্য অন্তরের সকল অনুভূতি উজাড় করে দিয়েছেন ; তারাও তাই নিজেদের অন্তর অনাবৃত করে দিয়েছে তাঁর কাছে। তাই তো জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে নর-নারীরা এতটা জীবন্ত। জসীমউদ্‌দীন সত্যিকার শিল্পীর নিষ্ঠা নিয়ে তাদের হৃদয়ভাবনার প্রকাশ যেমন ঘটিয়েছেন, তেমনি তাদের কর্মচঞ্চল জীবনের ছবি এঁকেছেন। এ সৃষ্টির উপকরণের জন্যে তিনি বারবার পল্লীগীতি, গাথা, প্রবাদ, ছড়া, কিংবদন্তীর দ্বারস্থ হয়েছেন ; সেখান থেকে তাৎপর্যপূর্ণ কাব্যপংক্তি, শব্দ, উপমা অবলীলাক্রমে গ্রহণ করে বাস্তব-জীবনের রঙে তুলি ডুবিয়ে তিনি একটির পর একটি ছবি এঁকেছেন। ছবিগুলোর স্বতন্ত্র মহিমা আছে। আবার যখন সব মিলেমিশে এক অখণ্ড জীবন-ছবি সৃষ্টি করে তখন তার মূল্য আরোও বেড়ে যায়। এ যুগে পল্লীজীবন নিয়ে এমন সার্থক সুন্দর কাব্য আর কেউ লিখতে পারেন নি।

'নকসী কাঁথার মাঠ' আধুনিক কাব্যের সৌধে এক নতুন বাতায়নস্বরূপ। এ বাতায়নে কেউ বড় একটা আসেন না, কারণ এ দিকের পথটা প্রায় জনশূন্য ও পরিত্যক্ত। কিন্তু একবার এ বাতায়ন পথে দৃষ্টি ফেরালে পল্লী-বাংলার অবহেলিত ঐশ্বর্য ভাণ্ডার কৌতূহলী দর্শকের চোখ ঝলসে দেবে তাতে সন্দেহ নেই।

বালুচর

'নকসী কাঁথার মাঠে'র পরই প্রকাশিত হয় 'বালুচর' কাব্যটি। মোট সতেরটি কবিতার সংকলন 'বালুচর' কাব্যের প্রকাশকাল ১৩৩৭ সাল। কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছিল 'রঙ ও রেখার' কারিগর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। কাব্যের উৎসর্গপত্রে কবি কাব্যটি সম্পর্কে ইঙ্গিতে যা বলেছেন তা প্রনিধানযোগ্য ঃ—

> ".....আমার গান —
> তুচ্ছ এ তবু পূর্ণ প্রাণের পূজার দান।"

বস্তুতঃ 'রাখালী' ও 'নকসী কাঁথার মাঠে'র কবি এখানে আনেকটাই আত্মগত হয়ে পড়েছেন। পল্লীজীবন ও প্রকৃতির রূপকার জসীমউদ্‌দীন এবার পল্লীপ্রকৃতির গৌণ পটভূমিতেই যেন আপন প্রেমভাবনা ও স্বপ্ন-কামনা প্রকাশের জন্যে কেমন ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। চিত্রকর যেন হাতের তুলি পাশে সরিয়ে রেখে এবার বাঁশীর সুরে প্রাণের বেদন নিবেদন করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। প্রাণের গভীর থেকে সাড়া পেয়েছেন বলেই তো কবি তাঁর এ নতুন গানকে 'পূর্ণ প্রাণের পূজার দান' রূপে সবাইর হাতে তুলে দিতে ভরসা পেয়েছেন। কবি তখন যৌবন-স্বপ্নে দোল খেয়ে ফিরছেন—মনে তাঁর তখন নানা ভাবনার রং খেলা শুরু হয়েছে। একদিকে সুতীব্র হৃদয়াবেগ, সৌন্দর্যানুরাগ ও প্রেমাকুলতা, অন্যদিকে ব্যর্থতাবোধ, নৈরাশ্য ও বিরক্ততার হাহাকার তাঁর মনকে দ্বন্দ্বায়িত করে তুলছে, সৌন্দর্যের মাদকতাও তিনি বোধ করেছেন; আবার সাথে সাথেই অনুভব করেছেন কেমন একটা সর্বব্যাপী শূন্যতা, তাঁর অন্তরাত্মা কিসের অভাবে যেন হু হু করে কেঁদে উঠেছে। মনের কথা না বলতে পারলে শান্তি নেই কবির—কেমন একটা অস্থিরতা অনুভব করেন তিনি। এই অনুভূতির পীড়নের কথা বলতে গিয়েই তিনি বলেছেন ঃ—"এই পুস্তক রচনার

সময়ে রাতের পর রাত আমি ঘুমাইতে পারিতাম না, আহার করিতে পারিতাম না। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করিতাম, খোদা, তুমি আমার কবিত্বশক্তি লইয়া যাও।" আপন অন্তরানুভূতির এমন অকপট প্রকাশ একমাত্র জসমিউদ্‌দীনেরই সম্ভব। 'বালুচর' কাব্যে সেই অকপট অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে এবং রোমান্টিক মনের স্পর্শ ও আদর্শের অনুরঞ্জন থাকায় সে প্রকাশ মাঝে মাঝে সুন্দর হয়েছে।

'বালুচরে' এই নতুন সুরের আলাপন শুনে অনেকেরই কিন্তু একটু চমক লেগেছিল। 'রাখালী' ও 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে' প্রায় নিরবচ্ছিন্ন পল্লীজীবন ও প্রকৃতির মাধুর্যের চিত্র ও গাথা রচনার সাধনার পরেই 'বালুচরে' কবির আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের প্রকাশ দেখে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। পল্লী নিয়ে ছবি এঁকে, গল্প বলে যিনি আসর জমিয়ে বসেছিলেন তিনি হঠাৎ গায়কের ভূমিকা নিতে গেলে একটু বেসুরো তো ঠেকবেই। 'বালুচরে' ঠিক যেন তাই হয়েছে। যে পল্লীদৃশ্য ও জীবনচিত্র জসীমউদ্‌দীন পূর্ববর্তী কাব্যে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তা এবার কেমন করে যেন কবির নতুন ভাবনার আড়ালে চলে গেল। মাঝে মাঝে সে দৃশ্য, সে চিত্র উঠলেও, তা নতুন ভাবনার গৌণ পটভূমি হিসেবেই দেখা দিয়েছে। 'বালুচর' কাব্যের নামকরণে কিন্তু নতুন ভাবনার ইঙ্গিত তেমন পাওয়া যায় না। আর ঐখানেই মনে হয়, এ কাব্য সম্পর্কে অনেক রসিক পাঠকের বিভ্রান্তির কারণ নিহিত রয়েছে। রসিক পাঠক 'রাখালী' ও 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্যে পল্লীদৃশ্যের রূপকার ও জীবনের ভাষ্যকার কবির যে পরিচয় পেয়েছিলেন, 'বালুচর' নামটি ঐ প্রত্যাশাকে পুষ্ট করতে সাহায্য করেছে যথেষ্ট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, 'বালুচরে' যখন তার ব্যতিক্রম দেখা গেল, তখন কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য। কাব্যটি প্রকাশের পর জসীমউদ্‌দীন কবিকে এর এক কপি উপহার দেন। কবি চিরদিনই পল্লীপ্রেমিক, পল্লীপ্রকৃতির রূপে মুগ্ধ। বাঙলার পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, মধুমতি, গড়াই ইত্যাদি নদীর কূলে কূলে তিনি বহুদিন বোটে করে বেড়িয়েছেন, দেখেছেন নদীর বুকে চরের ওঠা-নামা বালুচর, কাশবন, ধান-খেতের সৌন্দর্য তাঁকে আকর্ষণ করেছে গভীরভাবে। স্বাভাবতই 'বালুচর' কাব্যটি হাতে পেয়ে তিনি নদী-বাঙলার চর অঞ্চলের মনোজ্ঞ চিত্র দেখতে পাবেন ভেবে উৎফুল্ল হয়েছিলেন। 'রাখালী', 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে'র কবির কাছ থেকে তা প্রত্যাশা করা অসঙ্গত ছিল না। কিন্তু কার্যত 'বালুচর' কাব্যে তা হয় নি দেখে কবি একটু ক্ষুন্নই হয়েছিলেন এবং জসীমউদ্‌দীনকে হতাশার সুরেই বলেছিলেন ঃ—"তোমার 'বালুচর' পড়তে গিয়ে বড়ই ঠকেছি হে। 'বালুচর' বলতে তোমাদের দেশের সুদূর পদ্মা তীরের চরগুলির সুন্দর কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা আশা করেছিলাম। কেমন চখাচখি উড়ে বেড়ায়, কাশফুলের গুচ্ছগুলি বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু কতগুলি প্রেমের কবিতা দিয়ে তুমি বইখানাকে ভরে তুলেছে।"[১]

প্রেমের কবিতার ছড়াছড়ি সত্ত্বেও 'বালুচর' কাব্যে জসীমউদ্‌দীনের বিশিষ্ট কবি-চরিত্রের ছাপ একেবারে অনুপস্থিত নয় কিন্তু। পল্লীলক্ষ্মীর চরণস্পর্শ এখানেও ঘটেছে 'নদী', 'বালুচর', 'ধান-খেত', 'আমবনের মায়া', 'লাউয়ের পাতার জাঙলা', 'ঢাকাই সীমের আঁচলে' পল্লীলক্ষ্মীর উপস্থিতি স্পষ্ট। এ সবের উল্লেখ এ কাব্যের অনেক কবিতায় রয়েছে; অবশ্য এরা পল্লীর গৌণ পটভূমির ইঙ্গিত দিয়েই প্রায়াশঃ ক্ষান্ত। একমাত্র 'উড়ানীর চর' কবিতাটি এ কাব্যের নামের কিছু মর্যাদা রক্ষা করেছে। রবীন্দ্রনাথ এ কবিতাটিতে তাঁর প্রত্যাশিত

১. জসীমউদ্‌দীন—'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়', পৃঃ ১

চর-অঞ্চলের সুন্দর বর্ণনা পেয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে বাংলা কবিতার কোন কোন সংকলনে এ কবিতাটি অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। মোট কথা 'বালুচর' কাব্যে জসীমউদদীন রোমান্টিক কবির ন্যায় নিজ হৃদয়ের অনুরাগ, প্রেম, সৌন্দর্যবোধ, হতাশা, নৈরাশ্য সবকিছুই প্রকাশ করেছেন। এ ভাবনাসমূহ অকপট ও সরল। তাদের প্রকাশেও তিনি সহজ ছন্দ ও ভাষাকেই আশ্রয় করেছেন। মাঝে মাঝে অনুভূতির তীব্রতা কোন কোন কবিতাকে আস্বাদ্য করে তুললেও, অধিকাংশ কবিতাই কিন্তু বৈশিষ্ট্য-বর্জিত। বক্তব্যের অতি সরলীকরণ প্রচেষ্টা ও মাঝে মাঝে অনাবশ্যক বিস্তৃতি কবিতার রস নষ্ট করে দিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। ভাবশিল্পসম্মত উপায়ে দানা বেঁধে ওঠে নি অনেক কবিতায়। ভাবালুতা ও শৈল্পিক প্রযত্নের অভাব কবিতাগুলোর শৈল্পিক উৎকর্ষের পরিপন্থী হয়েছে। তথাপি একথা স্বীকার করতে বাধা নেই, 'বাঁশরী আমার', 'উড়ানীর চর', 'একখানি হাসি', 'প্রতিদান', 'মুসাফির' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে। এ সকল কবিতায় স্বাভাবিক কবিত্বের স্পন্দন অনুভব করা যায়।

'বালুচর' কাব্যে কবি তাঁর বহির্মুখী দৃষ্টিকে কিছুটা অন্তর্মুখীন করেছেন সত্য; কিন্তু তিনি প্রেম-সৌন্দর্য ভাবনার ক্ষেত্রে আসলে কোন নতুন বক্তব্য পেশ করেন নি। ইতিপূর্ব 'রাখালী', ও 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে' তিনি পল্লীদৃশ্য ও জীবনচিত্র বর্ণনের ফাঁকে ফাঁকে প্রেম-ভাবনার কথা কিছু কিছু বলেছেন। তাতে হৃদয়াবেগের স্পর্শ আছে, কিন্তু আধুনিক মনোভাবের জটিলতার কোন প্রতিফলন ঘটে নি। 'বালুচর' কাব্যেও তাই দেখি। প্রেম-ভাবনার ক্ষেত্রে তিনি বাঙালীর ধর্মভিত্তিক প্রেম-সাধনার ঐতিহ্যকেই বরণ করে নিয়েছেন প্রথম থেকে। বাউল-বৈরাগী, সুফীদের ধর্ম-সাধনায় যে প্রেমের মহিমা কীর্তিত হয়েছে, সেই প্রেমেরই তত্ত্ব বারবার যেন উঁকি দিয়েছে তাঁর প্রেম-ভাবনার ক্ষেত্রে। প্রেমের জন্য দুঃসহ তপশ্চর্যা, দুঃখ বরণ, দুঃসহ জ্বালা ভোগ করার কাহিনীতে পরিপূর্ণ বৈষ্ণব সুফী ও বাউলদের ধর্ম-সাধনার ইতিহাস। এ দেশের নাড়ীতে সে সাধনার ধারা এখনও প্রবাহিত। পল্লীতে পল্লীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মসাধকরা সে ধারাকে এখনও জীইয়ে রাখছেন। বাংলার গীতিকা-গাথায়, লোকসঙ্গীতে তা চিরকালের জন্য স্থান করে নিয়েছে। জসীমউদ্‌দীন ঐতিহ্যসূত্রে সে প্রভাবকে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা এ ক্ষেত্রে তাঁর মনোভঙ্গিকে তেমন বদলাতে পারে নি। কালধর্মে ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে কবির বক্তব্য প্রকাশে কিছুটা পরিমার্জন দেখা গেলেও, ভাবের রাজ্যে তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যেরই অনুসারী। 'বালুচরে'র কবির সঙ্গে 'রাখালী' ও 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে'র কবির মূলগত পার্থক্য তাই খুব বেশী নয়। ঐতিহ্যের যোগে তাঁরা একই লোকের অধিবাসীই বটেন। 'রাখালী' ও 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে' কবি ঐতিহ্যবাদী হয়েও আধুনিক যে মনোধর্মের তাগিদে বাস্তব জীবনের দিকে দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন, 'বালুচরে' সেই একই মনোধর্ম তাকে আত্মগত ভাবনায় প্রবৃত্তি দিয়েছে। মূলের দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে দুই-ই আপন উৎস খুঁজে পেয়েছে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যিক ঐতিহ্যে। 'বালুচর' কাব্যে যারা 'রাখালী' ও 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে'র ব্যাতিক্রম লক্ষ্য করে বিস্মিত হন, তারা এ সব ভেবে দেখলে বিস্ময়ের কোন কারণ খুঁজে পাবেন না বলেই আমার বিশ্বাস।

'বালুচর' পূর্ববর্তী কাব্যের মত ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। তাই বলে সুধী সমাজের প্রশংসা থেকে একেবারে বঞ্চিত নয় এ কাব্য। রবীন্দ্রনাথ সাধারণ ভাবে এ কাব্যের প্রতি তেমন অনুরাগ না দেখালেও এর কোন কোন কবিতার প্রশংসা করেছেন। 'উড়ানীর চর' কবিতাটি তার দৃষ্টান্ত। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁর সংকলিত কাব্যগ্রন্থ

'কাব্য মঞ্জুষা'তে 'প্রতিদান', 'মুসাফির' কবিতা দুটিকে স্থান দিয়ে কবিতা দুটির যথেষ্ট প্রশংসাও করেছেন। আবু সায়ীদ আইয়ুব "পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা" নামে কবিতা সংকলনে 'একখানি হাসি' কবিতাটির স্থান নির্দেশ করে এর মূল্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। বলাবাহুল্য 'প্রতিদান' কবিতাটিও আরও সংকলনে স্থান পেয়েছে। এমনি সম্মানজনক উল্লেখের দাবি আরও দু'একটি কবিতার ক্ষেত্রেও স্বীকৃত হতে বাধ্য। তবু গোটা 'বালুচর' কাব্য নিয়ে এক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ছাড়া আর কেউ বিশেষ আলোচনা করেন নি। আমরা কৌতূহলী পাঠকদের পরিতৃপ্তির জন্যে বারীন্দ্রকুমারের বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি ঃ "বিজলীতে আমরা জসীমের 'নকসী কাঁথার মাঠে'র অন্তরের সৌন্দর্য—তাঁর আঁকা পদ্মা পারের গ্রামের সুষমার ছবি খুলে দেখিয়েছিলাম। 'বালুচরে'র কবি সেই সুরে, সেই ছবি, সেই রূপরেখা আবার জাগিয়েছেন।

"বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়েছে বালুর চরে
কেমনে ফিরিব গোধন লইয়া গাঁয়ের ঘরে?

* * *

কোথায় খেলার সাথীরা আমার কোথায় ধেনু
সাঁঝের হিয়ায় রাঙিয়া উঠিছে গোখুর রেণু

* * *

সাঁঝের শিশির দুটি পাও ধরে কাঁদিয়া ঝরে,
বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে বালুর চরে।"

জিতা রহো ভাই, বাঙলার কবি! কে বলে তুমি মুসলমান, কে বলে তুমি হিন্দু, তুমি ত অত ছোট নও যে ধর্মের ময়ূরপঙ্খী দাঁড়কাক সাজবে। বাঁশী তোমার চিরদিনই হারিয়ে যাক ঐ পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের বালুর চরে, বালুর চর জুড়ে উঠুক তোমার রূপের রেখা, ধ্যানের গীত, প্রাণের দরদ, আমবনের মায়া, ঢাকাই সীমের আঁচল, চিরদিনই সেই হারান বাঁশীর সুরে।

"উড়ানীর চর ধূলায় ধূসর যোজন জুড়ি
জলের উপরে ভাসিছে ধবল বালুর পুরী।"

তোমায় অভিশাপ দেব, এই হারানো বাঁশী ইহ জন্মে আর যেন তুমি খুঁজে না পাও, তবেই না পল্লীলক্ষ্মীর ছবিখানি আমাদের চোখ ভরে মর্ম জুড়ে তোমার সুরে ফুলে উঠবে।"

* * * *

"কবির এ চিন্তামণির নাচ-দুয়ার থেকে কত রত্ন আর কুড়িয়ে দেখাব। সারা বালুচরখানি তার দেশলক্ষ্মীর রাঙা পা দুখানির ছোঁয়ায় মণিময় হয়ে গিয়েছে।"

বারীন্দ্রকুমারের আলোচনায় কনিষ্ঠের সামান্য কৃতিত্বে গুরুজনের আবেগাপ্লুত সপ্রশংস মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি জসীমউদ্‌দীনের কাব্য পড়ে আনন্দ পেয়েছেন এবং সে আনন্দকেই আবেগকম্পিত ভাষায় প্রকাশ করেছেনঃ প্রকৃত সমালোচকের মন নিয়ে কবি-কর্মের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও বিচারে প্রবৃত্ত হন নি। ফলে কাব্যটি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আমাদের এর মূল্যায়নে খুব বেশী সাহায্য করে না। তবু বারীন্দ্রকুমার দু'চারটি কাজের কথা বলেছেন। এ কাব্যে পল্লীপ্রকৃতির স্বীকৃতি রয়েছে এটা তিনি দেখিয়েছেন। তাছাড়া এ কাব্যের প্রেম-ভাবনার প্রকাশেও বাঙালী মনের বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়েছে তাও তিনি ইঙ্গিতে বলেছেন। 'বালুচর' কাব্যের কবিতাগুলোর অধিকাংশই প্রথমে মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। কবিতাগুলো ত্রিপদী ছন্দেই প্রায়শঃ লিখিত হয়েছিল। তাতে কবিতায় ভঙ্গির যে একঘেঁয়েমি দেখা দিয়েছিল, তাও সমালোচকদের দৃষ্টি এড়ায় নি। জসীমউদ্‌দীন এ সম্পর্কে

নিজেই তাঁর জীবনস্মৃতিমূলক রচনা 'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়' গ্রন্থে সমালোচকদের প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। জসীমউদ্‌দীন লিখেছেন ঃ--"সমালোচকরা বলিতে লাগিলেন, তোমার কবিতা একঘেঁয়ে হইয়া যাইতেছে। ছন্দ পরিবর্তন কর।"[১] জসীমউদ্‌দীন অবশ্য সমালোচকদের কথায় কর্ণপাত করেন নি। কারণ রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ ও উপদেশ নাকি ছিল এরূপ ঃ—"ওসব বাজে লোকের কথা শুনো না। যে ছন্দ সহজে এসে তোমার লেখায় ধরা দেয়, তাই ব্যবহার কর। ইচ্ছে করে নানা ছন্দ ব্যবহার করলে তোমার লেখা হবে তোতাপাখীর বোলের মত। তাতে কোন প্রাণের স্পর্শ থাকবে না।"[২] বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের কথিত এ উক্তি 'বালুচর' কাব্যে ছন্দভঙ্গির একঘেঁয়েমির অভিযোগ খণ্ডন করে না। রবীন্দ্রনাথ জসীমউদ্‌দীনকে আপন সামর্থ্যে আস্থাবান হতে উপদেশ দিয়েছিলেন মাত্র। স্বীয় সামর্থ্যের বাইরে কিছু করতে গেলে জসীমউদ্‌দীন কবিত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারেন, এ আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ ঐ কথা বলেছিলেন। বস্তুতঃ জসীমউদ্‌দীনেরর কাব্যবস্তুর ন্যায় তার প্রকাশ ক্ষমতাও সীমিত। বিশেষ পরিমণ্ডলের বাইরে তিনি কেমন যেন বিব্রত বোধ করেন। কাব্যের বক্তব্য ও তার প্রকাশে তিনি পুরাতন ঐতিহ্য লঙ্ঘনে সাহসী হন নি কোন দিনই। এক আধ জায়গায় বক্তব্যের নতুনত্বের প্রয়াসভঙ্গির পুরাতনত্বে বাঁধা পড়ে তাঁর সীমাবদ্ধতাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে।

এবার 'বালুচর' কাব্যের কবিতাগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। এ কাব্যের প্রথম কবিতা 'বাঁশরী আমার' মূলতঃ একটি গান। এটি পরবর্তীকালে 'রঙিলা নায়ের মাঝি' নামক গীতি-সংকলনের অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। 'বালুচর' কাব্যের নামের সংকেত বোধহয় এ কবিতা থেকেই পাওয়া গিয়েছিল। পদ্মার তীরে কবির বাল্য, কৈশোর এমন কি যৌবনের অনেক দিন কেটেছে। পল্লীর মাঠ-ঘাটের ন্যায় নদীর চরেও পল্লীকিশোরের পদচিহ্ন পড়েছিল। নদীর বুকে, বালুচরে--যেখানে স্থলে-জলে মেশামিশি, উদার আকাশের বিস্তার, তারই উদার বক্ষে শ্যামশস্পাস্তীর্ণ ভূমির মায়ায় পড়ে কৃষক ঘর বাঁধে, জীবন লীলায়িত হয়ে ওঠে নানা ছন্দে। 'পল্লীরাখাল' কবি সে বালুচরের আকর্ষণে বাঁধা পড়েছেন। এ আকর্ষণ কাটিয়ে উঠে আর যেন তার পক্ষে গাঁয়ের ঘরে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, এই চরের বুকেই তিনি তাঁর হৃদয়-বাঁশীকে হারিয়ে বসেছেনঃ—

"বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে বালুর চরে
কেমনে পশিব গোধন লইয়া গাঁয়ের ঘরে।"

শুধু কি তাই ; ঐ চর কবিকে তার শ্যাম-সুষমায় এমনি ভাবে আবিষ্ট করে ফেলেছে যে, কবি এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেও বেদনাবোধ করেন। দিনশেষে রাখালের ন্যায় ঘরে ফেরার জন্যে, খেলার সাথীদের জন্যে কবির মন ব্যাকুল হয়ে উঠলেও কবির পা যেন আর উঠতে চায় না ঃ

"কোমল তৃণের পরশ লাগিয়া
চরণে নূপুর পড়িছে খসিয়া
চলিতে চরণ উঠে না বাজিয়ে
তেমন করে"

* * *

১. জসীমউদ্‌দীন—'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়', পৃঃ ৮।
২. জসীমউদ্‌দীন—'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়', পৃঃ ৯।

"ফোটা সরিষার পাঁপড়ির ভরে,
চোরো মাঠখানি কাঁপে থরে থরে,
সাঁঝের শিশির দুটি পাও ধরে
কাঁদিয়া ঝরে—"

এমন অবস্থায় 'বালুচরে বাঁশরী হারিয়ে বসাটা ' কি স্বাভাবিক নয়? এ কবিতায় পল্লীপ্রকৃতির রূপমুগ্ধ কবিচিত্তের একটি সুন্দর প্রকাশ লক্ষ্য করি আমরা। কবির হৃদয়ানুভূতির তীব্রতায় 'বালুচর' যেন তাঁর প্রিয়ার বিকল্প হয়ে দেখা দিয়েছে। তাকে ফেলে আর কি তাঁর কৈশোরের খেলার সাথীদের গাঁয়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব? বড় সুন্দর কবি-ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে কবিতাটিতে । পল্লীর মেঠো সুরের আমেজটি এ কবিতায় উপস্থিত রয়েছে।

'উড়ানীর চর' কবিতায় কবি চরের মায়াময় রূপের একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। বাস্তব দৃষ্টির সাথে স্বাভাবিক কবিত্ববোধের সমন্বয়ে এ বর্ণনা হৃদয়হারী হয়েছে। নদ-নদী বিধৌত বাঙলার চর অঞ্চলের এমন কবিত্বপূর্ণ ছবি বাঙলা কাব্যে দুর্লভ। ভাষার-ভঙ্গিতে স্বভাবের পূর্ণ স্বীকৃতি থাকায় এ কবিতা অতি সাধারণ বিষয়কে আশ্রয় করে গড়ে উঠে অসাধারণ মহিমা লাভ করেছে।

সকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রির পটভূমিতে নদী-মেঘলা, তৃণ-শাষ্পাস্তীর্ণা বাংলাদেশের বালুচরের এক মায়াময় রূপলোক নির্মিত হয়েছে এ কবিতায়। মানুষের দুঃখ-বেদনার ছোঁয়া পেয়ে চর যেন এক জীবন্ত অনুভূতিময় সত্তা রূপে দেখা দিয়েছে কবিতার শেষদিকে এসে। 'বালুচর' এখানে আর সামান্য বালুচর নয়—মানুষের জীবন লীলার অঙ্গীভূত হয়ে সে অসামান্য মহিমা লাভ করেছে। এমন 'বালুচরে' বাঁশরী হারিয়েছে কবির। তার মায়া-বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেছেন তিনি।

'বালুচর' কাব্যের প্রথম দিকে এ দুটো কবিতা পড়ে সত্যিই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় কবি 'বালুচরে'ও পল্লীলক্ষ্মীরই রাঙা পায়ের চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন। আর সে চিহ্ন লক্ষ্য করেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার অনুসরণ করেছেন। ভাবালু মন ও স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে তার রূপের অনুধ্যান করতে করতে কবি কখন যে নিজের মধ্যে ডুবে গেলেন নিজেই হয়তো খেয়াল করেন নি। পারিপার্শ্বিক জগৎ ও প্রকৃতি তাঁর কাছে গৌণ হয়ে গেল। সৌন্দর্য ও প্রেমাবেগের মধুস্রোত ভেসে উঠল তাঁর দৃষ্টিতে। 'বালুচর' আর বালুচর রইল না। তাঁর দৃষ্টিতে হয়ে উঠল তাঁর হৃদয়াভিসারী গোপন প্রিয়ারই বিকল্প। ফলে পারিপার্শ্বিক যৌবন ভাবনার আড়ালে আশ্রয় নিল রোমান্টিকের স্বপ্নকামনা, আশা-আনন্দ, ভয়-ব্যাকুলতা, বিরহ-বেদনা ও অবশ আত্মদানের কথাই প্রবল হয়ে উঠল। একটা অতৃপ্ত রূপের তৃষ্ণা, প্রেমের অক্ষয় সাধ, একটা নতুন ভাব ছন্দের আকুতি প্রকাশ পেল সকল কবিতায়।

কবির দৃষ্টি ও ভাবনার এ রূপান্তর প্রক্রিয়াটি তাঁর 'সন্ধ্যা' নামক কবিতায় সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। 'সন্ধ্যা' এখানে একটা বাহ্যিক প্রাকৃতিক দৃশ্য মাত্র নয়, কবি-মনের রঙে রঙীন এক প্রেয়সী মানসী মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন। জসীমউদ্‌দীন এখানে রোমান্টিক কবির প্রেমাকুলতা, সৌন্দর্যানুরাগ ও স্বপ্নচ্ছন্নতা নিয়েই প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছেন। তাই প্রকৃতিও সেই ভাবনার প্রতিরূপ হয়েই কবির চোখে দেখা দিয়েছে।

বস্তুতঃ 'বালুচরে' শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক কবির প্রেম-সৌন্দর্য-ব্যাকুল মনের গীতিমুখর রূপই প্রবল হয়ে উঠেছে। পারিপার্শ্বিক ক্রমেই গৌণ হয়ে পড়ে এক সময়ে নীরবে যেন চোখের আড়ালে সরে গিয়েছে। কবির মন ক্ষণে ক্ষণে প্রেম-সৌন্দর্যের ছোঁয়ায় প্রসন্ন হাস্যে বিচ্ছুরিত

হচ্ছে, যেমন, 'সে বসে পড়িছে বই', 'একখানি হাসি', 'সফল সন্ধ্যা' কবিতা-ত্রয়ীতে। আবার প্রেম-ভাবনায় উদ্বেল কবিচিত্তের উত্থান-পতন, আশা-নৈরাশ্য- সংশয়ে আন্দোলিত রূপের পরিচয় ফুটে উঠেছে 'কাল সে আসিবে', 'কাল সে আসিয়াছিল', 'আর একদিন আসিও বন্ধু' ইত্যাদি কবিতায়। কোথাও বা প্রেমানুভূতির ব্যর্থতাবোধজনিত হা-হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রু-ভরাক্রান্ত হৃদয়ের বেদনাক্লিষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে। 'কবির সমাধি', 'তোমারে ভুলেছি আজ', 'দুরাশা', ও 'বিদায়' কবিতা চতুষ্টয় সে বেদনাক্লিষ্ট হৃদয়-ছবিতে সমৃদ্ধ। অনুভূতির উচ্চ গ্রামে পৌঁছে এ প্রেমই যখন দুঃখদহন ও ক্লেশবরণের মধ্য দিয়ে জীবনের নতুন সার্থকতা খোঁজে, নতুন ধর্ম-দর্শনের জন্ম দেয়, তখন তা হয়ে দাঁড়ায় এক দুর্লভ সম্পদ। আমাদের দেশের বাউল, বৈষ্ণব ও সুফীদের সাধনায় প্রেমের সে দুর্লভ রূপকে খুঁজে পাই।

জসীমউদ্‌দীনও 'বালুচরে' কিছু কিছু কবিতায় সে প্রেমসাধনার উত্তর-সাধক রূপেই যেন দেখা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত আমরা তাঁর 'প্রতিদান', 'পরাজয়', 'কারে অভিমান', ও 'মুসাফির' কবিতা চারটির উল্লেখ করতে পারি। কবির অতৃপ্ত প্রেম-তৃষা ও অক্ষয় সৌন্দর্য-পিপাসা এমনি ভাবে নানা ছন্দে প্রকাশ পেয়েছে 'বালুচরে'র কবিতাগুলোতে। সে প্রকাশ সর্বত্র সমান সার্থক না হলেও, তাঁর আন্তরিকতায় সন্দেহ করা চলে না।

ইতিপূর্বেই আমরা এ কাব্যের 'বাঁশরী আমার', 'উড়ানীর চর', 'সন্ধ্যা', কবিতা তিনটি আলোচনা করেছি। এবার আমরা পর্যায়ক্রমে বাকি কবিতাগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।—'সে বসে পড়িছে বই' কবিতটি বই পাঠরতা সুন্দরীর রূপেরই যেন এক 'ষ্টাডি'। রোমান্টিক কবির সৌন্দর্যানুভূতি বিলাস লক্ষ্য করা যায় কবিতাটিতে। কিন্তু হৃদয়ানুভূতির উৎসমুখে এ কবিতার জন্ম হয় নি বলে, এ কবিতা পাংশু বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। 'একখানি হাসি' কবিতায় কবির সৌন্দর্যানুরাগী প্রেমিক মন মুখর হয়ে উঠেছে দয়িতার মুখের হাসির মহিমা বর্ণনে। সে মিষ্টি হাসিটি বড় দুর্লভ বলেই তো তার এত মহিমা! সংসারের শতকর্মে রত দয়িতা প্রিয়ের সাথে কথা বলার সুযোগ ও সময় বড় একটা পায় না। তাতে বাদ সাধে সংসারের জটিলা 'কুটিলা' রূপী নিন্দাবাদীদের দল। এ অবস্থায় দয়িতায় মুখের হাসিটি দুর্লভই হয়ে পড়ে বটে। কবির সোভাগ্য হয়েছিল এরি মাঝে দয়িতের 'গোলাপের মত দুটি রাঙা ঠোঁটে 'একখানা হাসি' দেখার। প্রেমমুগ্ধ কবির চিত্তে সে হাসি দেখা দিল বিশ্বের বাণী নিয়ে। এ হাসি তো হাসি নয়, যেন 'পূর্ণ চাঁদের জোছনার জল', উড়ন্ত পাখীর পাখায় ঝরে পড়া 'প্রভাতের সোনালী আলোক', এ যেন প্রিয়মঙ্গল স্মরণ করে গাঙ্গের জলে প্রদীপ ভাসিয়ে দিয়ে কলসী কাঁখে কাঁকন বাজিয়ে কল্যাণী বধূর ঘরে ফেরার তৃপ্তির হাসি।

কবি অপূর্ব কাব্যময় ভাষায় এ হাসির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন ঃ—

"ও যেন কথার গীতগোবিন্দ! হাফেজের বুল্‌বুলি,
—ওরি মাঝে বসি পাখায় মাখায় তারা গুঁড়ো করা-ধূলি।
একখানি হাসির! বাঁকা তরী বেয়ে এসেছে ঈদের চান্‌,
যেন তারি গায় লেখা রহিয়াছে ভেস্তের ফরমান।"

কবি 'একখানি হাসি'র মধ্যে বিশ্বের সকল প্রেমের শ্রেষ্ঠ ভাষাটিকেই যেন আবিষ্কার করেছেন। এভাবে প্রকাশে তিনি পুরাতন কাব্য-ঐতিহ্যেরও সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। কবিতাটির ভাববস্তু ও প্রকাশকলার মাধুর্য স্বীকার করতেই হয়।

'সফল সন্ধ্যা' কবিতায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রিয়-সন্দর্শনের আনন্দই যেন ব্যক্ত হয়েছে। ঐ উপলক্ষে কবির প্রেমাকুল হৃদয়ের আর্তিও প্রকাশিত হয়েছে।

'কাল সে আসিবে', 'কাল সে আসিয়াছিল', 'আর একদিন আসিও বন্ধু' কবিতা তিনটিতে ভাবের একটা পরাম্পর্য লক্ষ্য করা যায়। 'কাল সে আসিবে' কবিতায় দয়িতের আগমন প্রত্যাশায় অপেক্ষারত কবির প্রেমার্ত হৃদয়ের আশা আনন্দ, ভয় ব্যাকুলতা ও অবশ আত্মদানের মনোভাব ফুটে উঠেছে। প্রিয় সান্নিধ্য লাভের ব্যাকুল কামনা ও অবশ আত্মদানের সুরে কবিতাটি হৃদয়-স্পর্শী। এ প্রেম-ভাবনার মাধুর্য আমাদের বৈষ্ণব কাব্যের প্রেমলোকে নিয়ে যায় যেন।

'কাল সে আসিয়াছিল', নামীয় দীর্ঘ কবিতাটিতে পূর্ব কবিতারই যেন জের টানা হয়েছে। বহু প্রতীক্ষার পরে প্রিয়ের ক্ষণিক দর্শনের স্মৃতি উপলক্ষ করে কবির হৃদয়ে যে আবেগের প্রস্রবণ খুলে গিয়েছে, সেই প্রস্রবণ মুখেই প্রেমার্ত হৃদয়ের আনন্দ, ব্যথা বঞ্চনাবোধ, অভিমান ও আক্ষেপ, সুতীব্র বিরহ-জ্বালা ও অবশ আত্মদানের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। শুধু কি তাই, এই উপলক্ষে কবি পার্থিব-প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন এবং আমাদের বাউল-বৈষ্ণব সুফী সাধকের ন্যায়ই প্রেমের তত্ত্ব ভাবনায় মগ্ন রয়েছেন। প্রেমের গূঢ় তাৎপর্য অনুধাবনের প্রয়াস রয়েছে কবিতাটিতে। জসীমউদদীন প্রেম ভাবনার ক্ষেত্রে যে ঐতিহ্যবাদী, তা এ কবিতায় স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়েছে। লোকায়ত প্রেম দর্শনের নানা মণিরত্নের সমাবেশে সমৃদ্ধ কবিতাটিতে মাত্রাতিরিক্ত ভাবালুতার প্রকাশ ঘটায়, কবিতাটি অনাবশ্যক রূপে দীর্ঘ হয়েছে এবং এর শৈল্পিক সার্থকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

'আর একদিন আসিও বন্ধু', কবিতায় ব্যথাহত প্রেমার্ত হৃদয়ের জ্বালা ব্যক্ত হয়েছে। এ জ্বালার প্রকাশে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। যে প্রিয়ার কাছ থেকে কবি দুঃখ পেয়েছেন তার প্রতি দুর্জয়-অভিমানের আড়ালেই বয়ে চলেছে প্রেমানুভূতির ফল্গুধারা। কবিতার শেষ দিকে যেখানে প্রেমের অভিশাপ উচ্চারিত হয়েছে, সেখানেও 'আর একদিন আসিও সজনি' এ অনুরোধের মধ্যে প্রেমাকুলতা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। মাত্রাতিরিক্ত রোমান্টিক স্বপ্নাচ্ছন্নতা ও ভাবালুতা কবিতার রসকে তরল করে দিয়েছে। কবিচিত্তের আবেগ সংহত হয়ে দানা বেঁধে ওঠার অবসর পায় নি। ব্যথাহত প্রেম এখানে বড় চড়া সুরে বেজে উঠেছে; তাই আমাদের কানকে পীড়া দেয়। তথাপি এ কবিতায় জসীমউদদীনের আবেগ-উত্তপ্ত প্রেম ভাবনার পরিচয়টি পরিস্ফুট। এ আবেগ সমর্থন পেয়েছে বৈষ্ণব-কবিতায়, বাউলদের প্রেম-গীতিতে ও প্রেমসাধকদের দুঃখ-দহনের কাহিনীতে।

'কবির সমাধি', 'তোমারে ভুলেছি আজ', 'দুরাশা', 'বিদায়' কবিতা চতুষ্টয় প্রেমের ব্যর্থতাবোধজনিত দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুপাত ও হাহাকারেই যেন পূর্ণ। 'কবির সমাধি' কবিতাটি একটু কাহিনীধর্মী। কবিতার সূচনায় গদ্যে ভাব পরিচয়-জ্ঞাপক সূত্রটি কবি নিজেই আমাদের হাতে তুলে দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। বনের ধারে নদীর তীরে কবির কুটির। একদিন মালিনীর মেয়ে মালতী-লতিকার সঙ্গে তাঁর ভাব হয়ে গেল। প্রেমের প্রথম উন্মেষণে একে অপরকে ভালবাসল। শেষে মালিনীর মেয়ের আর কবিকে ভাল লাগে না; কবির দুঃখ সে বুঝতে পারে না। প্রেমের এ অকালমৃত্যু কবির কবিসত্তারও যেন সমাধি রচনা করেছে। তাই কবিতার নাম ঐরূপ হয়েছে। কবি মালিনীর মেয়ের রূপের গাঙে ডুবে রয়েছেন। তাকে নিয়েই তাঁর সকল স্বপ্নকামনা, তারই পথ চেয়ে দিন কাটান তিনি। মালিনীর মেয়ের মন এখন অন্যদিকে; কবির মনের বেদনার অর্থ সে বোঝে না। শত তুচ্ছ প্রশ্ন করে কবিকে, কবির জবাবে খুশী হয় না। মনে হয় সব হেঁয়ালী। সে কবির জন্য সহানুভূতি বোধ করলেও তাঁর অন্তরের বেদনাকে বোঝে না। সে রাজার ছেলের জন্যে মালা গড়াতে ব্যস্ত। কিন্তু কবি যে তারই রূপ ধ্যান করে 'আঁখি যমুনার কাল জলে ধুয়ে' মালা গাঁথছেন, সে মালার মূল্য

দেবে কে? মালিনীর মেয়ের কাছে তার কোন মূল্য নেই। কবি কথার মালা গেঁথে তার রূপের প্রশস্তি মহিমা গেয়ে সব কথা বোঝাতে চেষ্টা করেও বোঝাতে পারেন না। কবি দুঃখ পান। কিন্তু মালিনীর মেয়ে তার অর্থ বোঝে না— সে যে কবির ভাবজগৎ থেকে অনেক দূরে সরে আছে। কবির চোখে জল ঝরে, বেদনায় টনটন করে ওঠে তার মন। মালিনীর মেয়ে ভাবভোলা কবির কথা শুনে কৌতুক বোধ করে। সে আছে আপন সহজ সুখের হাসির রাজ্যে। কবির করুণাপূর্ণ মিনতি 'মাঝে মাঝে শুধু দেখে যেয়ো মোরে' এর জবাবে মালিনীর মেয়ে যখন বলে,—

"সময় কোথায়?.....চলিছে ভাটির বেলা—
এরি মাঝে সখা! সেরে নিতে হবে জীবন নাটের খেলা।"

তখন বুঝতে পারে সে কবির জগৎ থেকে কত দূরে সরে গিয়েছে! জগতে যারা শুধু হৃদয় নিয়ে জন্মেছে তাদের এ দুঃখ যে অনিবার্য। প্রেমের ব্যর্থতাজনিত দীর্ঘশ্বাসে পরিপূর্ণ এ কবি-কাহিনী বড় মর্মস্পর্শী।

'তোমারে ভুলেছি আজ', কবিতাটিতে প্রেমের স্বপ্ন-ভঙ্গের সুতীব্র বেদনাই প্রকাশ পেয়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস যেন বেরিয়ে আসে কবিতাটির মধ্য থেকে; এ কবিতায় প্রেমের বেদনা প্রকাশের পদ্ধতিটির বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে। নায়ক এখানে সকল প্রেমস্মৃতি অস্বীকারের নামে প্রেমেরই সুদীর্ঘ স্মৃতি রোমন্থনে প্রবৃত্ত হয়ে প্রকারান্তরে প্রেমের স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকেই অপরূপ কৌশলে প্রকাশ করেছেন।

দীর্ঘ কবিতাটিতে প্রেমের বেদনাই ধাপে ধাপে তীব্র হয়ে উঠে, চরম রিক্ততার হাহাকারে ফেটে পড়েছে। সুতীব্র প্রেমানুভূতির জ্বালা ভুলে যাওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস ও তজ্জনিত প্রিয়ের কথাবার্তার অসংগতির মধ্য দিয়ে কবিতাটিতে যে হিউমার সৃষ্টি হয়েছে তার মাধুর্য অস্বীকার করা যায় না।

'দুরাশা', একটি ক্ষুদ্র কবিতা। এখানেও রোমান্টিক কবিচিত্তের কামনা-বাসনার অতৃপ্তি ও স্বপ্নভঙ্গজনিত দুঃখবোধেরই প্রকাশ ঘটেছে। জীবন যেন কবির কাছে উসর বালুচরের প্রতিরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে এ কবিতায়। তার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কবির হৃদয়ের বেদনার নদী—কবি-কামনা যদি ঐ চর 'সবুজের বন্ধন' মেনে নিত। সে সবুজের 'কোমল বাহুর বাঁধন তাহার আজো কেউ পরিল না' এটাই কবির আক্ষেপ। কবির সবুজের স্নিগ্ধতায় মণ্ডিত জীবন প্রত্যক্ষ করার আশা তবে কি শুধুই দুরাশা; হয়তো তাই কবির এ দুঃখবোধ, হতাশার প্রকাশটি সর্পক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর। এখানেও প্রেমের স্নিগ্ধ সজল রূপটিই প্রত্যক্ষ করি।

'বিদায়', কবিতায় অনুরাগ মথিত পল্লীকিশোর ও কিশোরীর পরস্পরের জীবন থেকে বিদায়ের কারুণ্যই ফুটে উঠেছে। বিদায়লগ্ন উপস্থিত। কিশোর কিশোরীকে আহ্বান করছে তাদের সেই গেঁয়ো নদিটির তীরে। তার পারিপার্শ্বিক মাধুর্যের কথা উল্লেখ করতেও ভোলে নি। আজ বিদায় মুহূর্তে কোন কথাই তাদের মনোভাব প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। তাই তো কিশোর কিশোরীকে বলে,—

"আমি চেয়ে রব তব মুখপানে তুমি মোর মুখপানে
মাঝে অনন্ত কথায় সাগর কথা কবে কানে কানে;"

তারা আজ শেষবারের মতো একান্ত করে পরস্পরকে অনুভব করেছে। তাদের মাথার উপরে নীলাকাশের নীচে সবুজ তৃণ ঘেরা বালুভূমি। আর কেউ কোথাও নেই। এই পরিবেশে আজ অতীতের নানা তুচ্ছ স্মৃতি মনে পড়ছে—ভালবাসার সে শত তুচ্ছ স্মৃতি রোমন্থন করছে কিশোর।

এ প্রেম-ভাবনার প্রকাশে যৌবনের উচ্ছ্বাস নেই, ভাবলুতা নেই--আছে নিষ্পাপ কৈশোরের সরল অকপট মনোভাব। কৈশোর-প্রেমের মাধুর্য বর্ণনার সাথে কবি কাল ও সংসারের পটভূমিতে তার মূল্য ও তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন।

'বালুচর' কাব্যে কবির প্রেমচিন্তা কোন কোন ক্ষেত্রে ভাবের উচ্চগ্রামে উন্নীত হয়ে আমাদের দেশীয় ধর্ম-সাধনার ঐতিহ্যের যোগে এক চরম আনুভূতিক সত্যের মহিমা লাভ করেছে। বাউল, বৈষ্ণব, সুফীদের ধর্ম-সাধনায় প্রেমের জন্য যে দুঃসহ দুঃখচর্যা লক্ষ্য করি, জসীমউদ্‌দীনের এ শ্রেণীর প্রেমের কবিতায়ও তারই মহিমার স্বীকৃতি লক্ষ্য করি। 'বালুচর' কাব্যের 'প্রতিদান', 'পরাজয়', 'কারে অভিমান, 'মুসাফির' কবিতায় প্রেমের এ মহিমার প্রকাশ দেখা যায়। ভালবাসা এক দুর্লভ সম্পদ, এ ভালবাসার গুণে পর আপন হয়, জগৎ সুন্দর হয়। কিন্তু সে ভালবাসার অধিকারীকে জগতের যত লাঞ্ছনা, জ্বালা, বঞ্চনাকে সহ্য করে প্রেমের পথে অগ্রসর হবার সাধনা করতে হয়। কেবল অসামান্য হৃদয়বোধের অধিকারী লোকই এ ভালবাসার মহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারে। কবিরা অসামান্য হৃদয়বান বলেই তো ভালবাসার মহিমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রেরণা বোধ করেন। জসীমউদ্‌দীনের যথার্থ ভালবাসার ক্ষমতা ছিল বলেই তিনি এমন অসাধরণ প্রেমানুভূতিমূলক কবিতা লিখতে পেরেছেন।

'প্রতিদান' কবিতা প্রেমের একটি সুন্দর কবিগীতি। এ কবিতায় কবি বলেছেন, তাঁর কোন শত্রু নেই; এবং সকল শত্রুতা ও হিংসা দ্বেষের মধ্যেও তিনি অনুভব করেন যেন এক মহাপ্রেমিক তাঁর প্রেমের পরীক্ষার ছল করে নানা প্রকার কষ্ট-দুঃখ,লাঞ্ছনা দিচ্ছেন—সে প্রেমিক মানুষের মাঝেই আছেন, কোন ব্যক্তি-বিশেষের মাঝে নয়, সকলের মাঝে। তাকে পাবার জন্যেই কবি পথে পথে সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন; শত বিমুখতা, শত আঘাতকে সহ্য করে লাঞ্ছনার প্রতিদানে নিজের প্রাণের সকল ভালবাসা উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। ভালবাসার জন্য এ চরম আত্মত্যাগের ভাবটির মধ্যে আমাদের দেশের বাউল, বৈরাগীদের ধর্ম-সাধনার তত্ত্বটি যেন উঁকি মারছে। 'প্রতিদান' কবিতায় বর্ণিত প্রেম-সাধনার প্রতিদানটি সত্যিই অপূর্ব, অনবদ্য, অনুপম। এই কবিতা পাঠান্তে রসিক সমালোচক যখন বলেন 'এ প্রতিদানের তুলনা বুঝি বাঙলার স্নিগ্ধ দুধালী লতার রূপেই মেলে', তখন তার কথায় সায় দিতে ইচ্ছে হয়। আঘাত পেয়েও দুধালী লতা যেমন জীবনদায়িনী রস-স্মরণ করে মানবের কল্যাণ করে, এ কবিতায় কবিও তেমনি বলেছেন—

"কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।"

শুধু কি তাই,—

"দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর ;
আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যে আমি বাঁধি তার ঘর।"

কবিকে যে দিয়েছে "বিষভরা বাণ', কবি তাকে দিয়েছেন 'বুকভরা গান।' প্রেমের সাধনায় অনুভূতির কোন সুউচ্চ স্তরে পৌছুতে পারলে এমনি আপ্ত-বাক্যের উৎসার ঘটে কাব্যে, তা আমরা বৈষ্ণব কাব্যে, বাউল গানে, পল্লীগীতিতে দেখেছি। জসীমউদ্‌দীন এ কবিতায় প্রেমের সে মহান উত্তরাধিকারকেই যেন মর্যাদা দিয়েছেন।

'মুসাফির', কবিতাটি 'প্রতিদান' কবিতাটির পটভূমিতে আলোচনা করলে দুই কবিতারই মাধুর্য অনুধাবন সহজ হয়, তাই 'পরাজয়' ও 'কারে অভিমান' কবিতা দুটিকে আপাতত সরিয়ে রেখে 'মুসাফির' কবিতাটির আলোচনা করছি। মোহিতলাল মজুমদার 'মুসাফির'

কবিতাটির মাধুর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'প্রতিদান' কবিতার কথা স্মরণ রেখেই বলেছিলেন, 'এই কবিতাটিতে কবি ঐ পূর্ব কবিতাটির ভাব আরও গভীর, আরও মর্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছেন।' বস্তুতঃ 'প্রতিদান' কবিতার প্রেমিকের ন্যায় এ 'মুসাফির'ও সেই 'পথের বিরাগী'। এখানে তার সেই প্রেম নৈরাশ্য গভীর হয়ে উঠেছে। "সমস্ত জগৎ তাহার নিকটে শূন্য, অতিশয় যন্ত্রণাময়—নির্জন, নিষ্ঠুর, অন্ধকারময় ; তার কারণ, বহু তপস্যা করিয়াও সেই প্রেমময়কে এখন পাওয়া যায় নাই—সে বিচ্ছেদ দুঃসহ হইয়াছে, তাই জগৎ আর সুন্দর নহে।"

মোহিতলাল এ কবিতাটির মধ্যে বিদ্যাপতির বিখ্যাত পদ 'সখি হে হমর দুখক নাহি ওর', এর ভাবসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বলেন যে দুই কবিতার ভাব একই—'কেবল একজন ঘরেই আছে, আর একজন ঘর ছাড়িয়াছে, মুসাফির হইয়া পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।' বস্তুতঃ দুটি কবিতাই ভগবৎপ্রেমের কবিতা ঃ বাউল বৈষ্ণবদের সাধনার, এমন কি সুফীদের সাধনাও, ভগবানকে ঠিক মানুষের মতই ভালবাসতে হয়। আর সে ভালবাসার দুঃখজ্বালা পোহাতে হয়। 'মুসাফির' কবিতায় ভালবাসার জন্য যে তপস্যা, সে দুঃখবরণের তীব্রতার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। প্রেমের পথিক মুসাফিরের এ দুঃখ-ব্যথার দোসর নেই,—

"নয়ন ভরিয়া আছে আঁখিজল, কেহ নাই মুছাবার।
হৃদয় ভরিয়া কথার কাকলি, কেহ নাই শুনিবার।"

নির্জনতাই তার দোসর—ছন্নছাড়া বিরাগী সে অস্তিত্বের দুঃসহ ব্যথা বহন করে শুধু প্রাণবন্ধুর দেখা পাওয়ার ভরসায় অনির্দেশের পথে হেঁটে চলেছে। সে 'যেন ধরার সকল সুখের জীবন্ত প্রতিবাদ'। সাংসারিক স্নেহাকর্ষণ সব উপেক্ষা করে সে তার নিষ্ঠুর প্রাণবন্ধুর সন্ধানে ছুটে ফিরছে। চারিদিকে তার নিদারুণ আঁধার—'স্তব্ধতা যেন জমাট বেঁধেছে ক্রন্দন শুনি তার'। পথিক ভ্রূক্ষেপহীন ছুটে চলেছে, যন্ত্রণার অস্তিত্ব বহন করে। ভগবানকে পেতে হলে তো এরকম দুঃসহ তপশ্চর্যাই প্রয়োজন। এত দুঃখবরণের মধ্যেও সার্থকতা অনিশ্চিত—তবু ভগবৎ-সাধক পিছু পা হয় না। 'মুসাফির' সেই ভগবৎ-সাধকই বটে। কবি জসীমউদ্‌দীন বাউল-বৈষ্ণব-সুফীর প্রেম-সাধনার দুঃসহ দুঃখচর্যার কথাই এ কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

'পরাজয়', কবিতায় সর্বজয়ী প্রেমেরই মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়েছে ; ঐ সাথে প্রেম যে এক প্রকার সুদুঃসহ তপস্যা, দুঃখচর্যা তাও কবি উল্লেখ করতে ভোলেন নি। প্রেম ফুলের মতোই কোমল, কিন্তু তাকে পেতে হলে কাঁটার খোঁচা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। বাইরে থেকে প্রেম বড় সুলভ মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে প্রেমের সাধনা বড় কঠিন। অথচ প্রেমতৃষ্ণা সার্বজনীন। প্রেমতৃষ্ণা জীবনের শান্তি, সুখ দূর করে। জীবনকে দগ্ধ করে বিরহের অগ্নিজ্বালায়, অস্তিত্ব করে তোলে দুর্ভর। শক্তির অহমিকা, আস্ফালন সেখানে শুধু করুণার উদ্রেক করে। প্রেমের জন্য এত কষ্ট, এত ত্যাগবরণের প্রয়োজন জেনেও কিন্তু মানুষ প্রেম সাধনে পিছপা হয় না। সমর্পিত চিত্তে সকল জ্বালাকে, দুঃখকে বরণ করে নেয়। বিজয়ীর বেশে প্রেমকে পাওয়া যায় না—তাকে পরাজয় ও দুঃখের মধ্য দিয়েই লাভ করতে হয়। বৈষ্ণব কাব্যে রাধিকার চরম দুঃখচর্যা প্রেমকে একটা বিজয়ীর মহিমাই দিয়েছে। প্রেমভিখারিণী রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ ব্যাকুলতাই বৈষ্ণব কাব্যেকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। প্রেমের সাধনা তার জীবনের সকল সুখশান্তি-আয়াসকে একেবারে নির্বাসন দিয়েছিল। তাই তো রাধিকা শীতল বলে চন্দন সেবন করতে গিয়ে অনুভব করেছিলেন অগ্নিজ্বালা, মেঘের কাছে পিপাসার বারি মাগতে গিয়ে পেয়েছেন বজ্রাঘাত, এই তো নির্মম জীবনসত্য।

আমাদের কবি যখন অন্তর্জালা অনুভব করে প্রশ্ন করেন নিজেকেই,—

"ফুল তুলেছিনু মালা গাঁথিবারে, ফুল শর চাহি নাই,
ধূপ জ্বেলেছিনু গন্ধ শুঁকিতে অগ্নিরে কেন পাই?
কেন বারি মাগি তড়িৎ পাইনু, হায় পিপাসিত পাখি!
তোর তৃষ্ণার জলেতে আজিকে কে গেছে অনল রাখি।"

তখন সে একই জীবনাভিজ্ঞতার উৎসরণ লক্ষ্য করি! প্রেমের এ শক্তিতে কবি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। প্রেম তো হৃদয়ের একটি সুকোমল অনুভূতি বই কিছু নয়। অথচ তার মহিমার কাছে মানুষের সকল জারিজুরি ব্যর্থ। একেই লক্ষ্য করে কবি বলেছেন—'মাকড়ের আঁশে হাতীরে বাঁধিলে এই বড় বিস্ময়'। এ প্রেমবোধ যে ভগবানেরই লীলা এমনি একটা বিশ্বাসও ব্যক্ত হয়েছে কবিতাটিতে।

'কারে অভিমান' কবিতায় কবি সাংসারিক প্রেমাভিনয়ের অসারতা প্রদর্শন করেছেন। কবি বলছেন সেখানে সত্যিকার প্রেম নেই—প্রেম সেখানে দোকানের পণ্যের মত—একটু শুষ্ক হাসির বিনিময়েই পাওয়া যায় এমনি ধারণা সেখানে। সামান্য 'আমি ভালবাসি' কথার মোহে সেখানে সহস্র প্রাণ ভেসে যায়। প্রেমের অভিনয়ে সামান্য একটু করুণা, একটু আদর, একটু শুষ্ক হাসি, একটু চাহনিতেই সব যেন কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কবি বিদ্রূপের ভরে একে 'বাঁদরনাচ' বলেছেন। প্রেমের নামে এই পরাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কবির মনঃপুত নয়। তবু সরলপ্রাণ কোন সত্য প্রেমিক হয়ত এদের ছলনা বুঝতে না পেরে ফাঁদে পা দেয়; তারপর যখন প্রাণের তৃষ্ণা মেটে না, তখন হয়তো অভিমান করে। কবি এই অভিমান যে নিরর্থক তাই স্পষ্ট করে বলেছেন। কারণ যেখানে যথার্থ হৃদয়বোধ নেই, অনুভূতি নেই, সেখানে সবই মিথ্যার অভিনয়, সেখানে এর মূল্য দেবে কে? কবির এ প্রেমচিন্তা আমাদের প্রেম-সাধকদের ভূয়োদর্শনের ফল।

'বালুচর', কাব্য পাঠের পর আমরা এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছি—বালুচরে নদী-বাঙলার চর অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা থাকলেও একমাত্র 'উড়ানীর চর' কবিতা ব্যতীত কোথাও তা মুখ্য হয়ে ওঠে নি। অন্যত্র চর অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সৌন্দর্য প্রেমভাবনার পটভূমি হিসেবেই স্থান পেয়েছে। 'ধূসর বালুচরে'র সৌন্দর্য বর্ণনায় বৈচিত্র্যের অবকাশও বেশী থাকে না। এ কাব্যের কবিতারও নেই। সেই কাশবন, সেই ধানখেত, সেই পায়েচলা আঁকাবাঁকা পথ, সেই পাখীর কলকাকলি, কলাবাগান ঘেরা কুটির, লাউয়ের জাঙ্‌লা প্রায় সর্বত্রই চরের দৃশ্যে উঁকি মেরেছে। এ পারিপার্শ্বিকেই দুটি কচি প্রাণের বেদনা বরাবর প্রকাশিত হয়েছে। পল্লীপারিপার্শ্বিক বর্ণনায় স্বভাব-পটুত্ব এ কাব্যের অনেক কবিতায় উপস্থিত। তবে প্রেম-ভাবনায় বিভোর কবি এখানে বাইরের জগত থেকে নর-নারীর অন্তর্জগতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন বিশেষভাবে। সহজাত হৃদয়াবেগের স্পর্শ রয়েছে এ সব কবিতায়। এ আবেগ অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই ভাবালুতার নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন কবিতায় যথার্থ হৃদয়বোধের স্পর্শ ঘটেছে সন্দেহ নেই। কোথাও কোথাও প্রেমকে তিনি উচ্চ আদর্শের জগতে পৌঁছে দিয়েছেন। সে সব ক্ষেত্রে তিনি বাউল-বৈষ্ণবধর্ম সাধনারই দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রেমের বিরহ-বেদনা প্রকাশে তিনি বৈষ্ণব কবিদেরই যেন ভাবশিষ্য, এর তত্ত্ব ব্যাখ্যায় বাউল-সুফীদেরই পদাঙ্ক অনুসারী।

ভাবনার ক্ষেত্রে যেমনই হোক, প্রকাশের ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি প্রায় গতানুগতিক পথের পথিক। একই ধরনের ছন্দ, শব্দ, উপমা ও চিত্র ব্যবহারে তার যেন ক্লান্তি নেই। ভাব ও ভাবনার পুনরাবৃত্তি অনেক সময় পীড়াদায়ক হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রায় সকল কবিতায়ই

একই বালুচরের পটভূমি বর্ণনায় একই ধরনের দৃশ্যের অবতারণা নিঃসন্দেহে পরিবেশের সংকীর্ণতা সূচনা করে। অনেক কবিতায় অনাবশ্যক তত্ত্ব ব্যাখ্যার আগ্রহ কাব্যের রসগাঢ়তা ক্ষুণ্ন করেছে। তবু 'বালুচর' কাব্যে সার্থক কাব্যপংক্তি বিরল নয়। স্বল্প কথায় সুন্দর ছবি আঁকার ক্ষমতাও কবির আছে। 'মাথার' পরে 'ঢাকাই সীমের আঁচল ঘেরা' পল্লী কুটির 'বাঁকা তরী বেয়ে আসা ঈদের চানের' ন্যায় 'প্রিয়মুখের একখানি হাসি', 'পালে চাঁদের টিপ-পরা সন্ধ্যা', ইত্যাদি কল্পনা তাঁর চিত্রাঙ্কন ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। শব্দের ব্যবহারেও কিছুটা বৈচিত্র্য রেখে যেতে পেরেছেন তিনি এ কাব্যে। পল্লীর প্রচলিত শব্দ, আরবী শব্দ, তৎসম, তদ্ভব শব্দের সংমিশ্রণ তাঁর অনেক কবিতায় হয়েছে। মোট কথা, কাব্য ভাবনার বৈশিষ্ট্যে ও প্রকাশকলায় এ কাব্যেও তিনি পল্লীঐতিহ্য থেকে বড় বেশি দূরে সরে আসেন নি। তাঁর প্রেমভাবনায় যেমন বৈষ্ণব, সুফী, বাউল ইত্যাদি লোকায়ত ধর্মদর্শনের ছাপ আছে, তেমনি আছে গীতিকার, নর-নারী, আবেগ, বিহ্বলতার ছাপ। আবার প্রকাশকলায় যুগোচিত পরিমার্জনের ছাপ সত্ত্বেও মধ্যযুগের কাব্য ও লোকগাথার ব্যবহৃত শব্দ, উপমা, চিত্রকল্পের উপস্থিতি একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। তবে পূর্ব কাব্যের চেয়ে এ কাব্যে কবি কিছুটা বেশী অন্তর্মুখীন এ সত্যও স্বীকার করতে হয়।

ধান খেত

'বালুচর', কাব্যের অল্পকাল পরেই ১৯৩২ প্রকাশিত হয় 'ধান-খেত' কাব্যটি। কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছিল বিশিষ্ট বাঙালী মনীষী উদারপ্রাণ স্যার হাসান সুহরাওয়ার্দি সাহেবকে। উৎসর্গ-পত্রের কবিতাটিতে মনীষী হাসান সুহরাওয়ার্দির প্রশস্তি ছাড়াও কবি এ কাব্যের মূল সুরের আলাপন করেছেন। কবির নিজেরই কথায়, "এ মোর 'ধানের খেত' সুদূর গাঁয়ের আশা নিরাশার বেদনার সঙ্কেত।" ইতিপূর্বেও তিনি পল্লী নর-নারীর প্রেম-ভালবাসা, বিরহ-ব্যাকুলতা, দারিদ্র্য-দুঃখ, বেদনা-কন্টকিত জীবনের কথা বলেছেন, চিত্র এঁকেছেন ; কিন্তু কোথাও এমন স্পষ্ট করে 'পল্লী-মানুষের আশা-নিরাশার বেদনার' ছবি আঁকার অভিপ্রায়টি ব্যক্ত করেন নি। 'বালুচরে'র জীবনাভিজ্ঞতার পরেপরেই ঘোষিত বলে এ অভিপ্রায়টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ কি 'বালুচরে'র আত্মভাবনার অবসাদ থেকে মানুষের হাসিকান্নার জগতে মুক্তিলাভের প্রয়াস? না, কবির স্বভাবে প্রত্যাবর্তন? অথবা দুই-ই? বস্তুতঃ জসীমউদ্‌দীনের রোমান্টিক কবিমন সারাজীবন পল্লীপথেই আপন ক্ষুধার তৃপ্তি খুঁজলেও, মাঝে মাঝে প্রেম-সৌন্দর্যের অনুভূতিজনিত আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের তোড়ে পল্লীপথ থেকে সরে এসেছে।

প্রথম থেকেই জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে কবিমনের এই দ্বৈত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 'রাখালী'তে পল্লীজীবন ও প্রকৃতির মাধুর্যের ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে কবি যে সৌন্দর্য ও প্রেম সম্পর্কে আত্মভাবনা ব্যক্ত করেছেন তার প্রমাণ 'কিশোরী', ও 'তরুণ কিশোর' কবিতা দুটি। অন্যত্রও নর-নারীর প্রেমাবেগ বর্ণনায় এ স্বভাবের অনতিলক্ষ্য প্রভাব ক্রিয়াশীল। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে'ও তা অনতিলক্ষ্যভাবে কাজ করে গেছে। 'বালুচরে' তাই যেন একবারের জন্যে প্রবল হয়ে উঠে সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। কবি সৌন্দর্য ও প্রেমাবেগের তীব্রতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে আপন ব্যক্তিগত মানসিক প্রতিক্রিয়াই প্রকাশ করেছেন প্রায় সব কবিতায়। যৌবনধর্মে আবেগের সাময়িক একটা তীব্রতাই 'বালুচরে'র প্রকৃতিকে

অতীত পালটিয়ে ফেলেছিল 'ধান-খেত' কাব্যে সে আবেগ অনেকটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। কবি আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠে আবার পল্লী-মানুষের আসা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনার জগতে পরিক্রমা শুরু করেছেন।

'বালুচর' থেকে 'ধান-ক্ষেতে' জসীমউদ্‌দীনের কাব্য যে মোড় নিল তা 'রাখালী', 'নক্‌সী কাঁথার' পথে হলেও, ঠিক সেই পথ নয়। 'ধান-খেতে'র বিস্তারে 'বালুচরে'র ধূসরতা অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এলেও, তার চিহ্ন এখানে সেখানে রয়ে গিয়েছে। 'রাখালী', 'নক্‌সী কাঁথার' সে মোহাঞ্জন মাখানো দৃষ্টিটিও কবি হারিয়ে ফেলেছেন। পল্লীর প্রতি কবির অনুরাগ এখনও তীব্র, তিনি আশ্বাস খুঁজে পান তার শ্যামচ্ছায়ায় ; তবু পল্লীর দৈন্যদশা, তার রিক্ততার ছবি তাঁকে পীড়া দেয়। পল্লীর পুরাতন স্মৃতি তাঁকে দোলা দেয়, কিন্তু বর্তমান পারিপার্শ্বিকের দৈন্য কেমন যেন তাঁকে নিরুৎসাহ করে। তিনি অবশ্য দরদ দিয়েই সব ছবি আঁকতে যান, কিন্তু তা যেন তেমন সুন্দর হয় না। পল্লীবাসীদের জীবনের নৈরাশ্যজনক রূপ তাঁর মনকে বেদনাভারাক্রান্ত করে তোলে। তিনি তাই পল্লীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সভ্য মানুষের। আহবান জানাচ্ছেন সবাইকে পল্লীমায়ের রূপ অন্বেষণ করার জন্য। 'ধান-খেতে'র আর একটি বিশেষত্ব, এ কাব্যের কোন কবিতায় পল্লীসীমা অতিক্রম করে কবির দৃষ্টি জীবনের অন্যত্রও প্রসারিত হয়েছে। তা ছাড়া 'ধান-খেত' কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় কবি 'বালুচরে'র আত্মভাবনার জের টেনেছেন। এসব 'ধানখেত'কে নিছক পল্লীজীবন-ভিত্তিক কাব্যের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেছে—কবির মনোগত ইচ্ছা যাই থাক না কেন।

এবার 'ধান-খেতে'র অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাক। ক্রোড়পত্রের নামহীন কবিতাটি (গান?) ছাড়া মোট পঁচিশটি কবিতার সমাবেশ ঘটেছে এ কাব্যে। ক্রোড়পত্রের 'ও আমার সোনার খেতের ধান'[১] পক্তি চিহ্নিত গানটিতে এ কাব্যের মূল আবেগটিই যেন ধরা পড়েছে। সোনার ধানের খেত চাষীজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক আর তাইতো তা কবির মনকেও নিগূঢ় আনন্দ দেয়, নীল আকাশের নীচে বাতাসের দোলায় খুশী ঝলমল ধানখেত দুলছে, শীতের কাঁচা রোদের রঙ মেখে তা আরও অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। কবির সব দেখে মনে হয় যেন 'ঝলমল বসন টানি দোলে মাটির স্বরগ খানি'। কবির কাছে এ এক গরবের সামগ্রী—তাঁর সাধনার সার্থকতার প্রতীক। তাই তো কবি বলেন,—

"সাধ করে কি মাটির সাথে বানাই মাটির ঘর
ধানের পাতার বাতাস যে পাই শুয়ে মাটির পর।"

মাটির বুকে এ ধানের খেত চাষীর সকল আনন্দ, সকল গর্বের বস্তু, তাই তো মাটির সঙ্গে তার প্রাণের সম্পর্ক। বস্তুতঃ কবিতাটিতে চাষীজীবনের আনন্দ ও গরব 'ধান-খেতে'র সৌন্দর্য ও মহিমা বর্ণনে পল্লীপ্রকৃতির রূপমুগ্ধ, পল্লীপ্রেমিক কবিচিত্তের আনন্দঘন রূপের অভিব্যক্তি ঘটেছে। এ কবিতাটি কাব্যের নাম কবিতা 'ধান-খেতে'রই যেন Prologue। একে পল্লীদৃশ্যের বর্ণনাসমৃদ্ধ পল্লীর 'ধানখেত' কাব্যের উপযুক্ত স্তম্ভলিপি বলা চলে। গোটা 'ধান-খেত' কাব্যে পল্লীর ধান-খেত, বালুচর ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক দৃশ্য—এর পুকুর মাঠ ঘাট, এর নর-নারীর জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্য, এর দুঃখ-বেদনার কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। অবশ্য 'ধান-খেত' কাব্যের এ মূল সুরের ব্যতিক্রম অনেক কবিতায় আছে। এ ব্যতিক্রমগুলো নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়।

---

১. এ গানটি পরে 'রঙিলা নায়ের মাঝি' গীতি সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'রঙিলা নায়ের মাঝি' দ্রষ্টব্য।

'ধান-খেত' কাব্যের কবিতাগুলোকে মোটামুটি তিনটি ধারায় বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

[এক] পল্লীপ্রকৃতির নানা দৃশ্য, পল্লীজীবনের বিচিত্র চিত্র, স্মৃতিকথা ও পল্লীজীবন সম্পর্কে নানা ভাবনার কথা প্রকাশ পেয়েছে অনেক কবিতায়। 'ধান-খেত' কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই এ পর্যায়ে পড়ে। রোমান্টিক কবিসুলভ সৌন্দর্যপ্রীতি, ভাবালুতার প্রকাশ এ সব কবিতায়ও দেখা যায়। তবে কবি এখানে মূলতঃ পল্লীজীবন ও প্রকৃতি নির্ভর।

[দুই] কবি 'বালুচর' কাব্যের সৌন্দর্য, প্রেম-ভাবনার জের টেনেছেন কতকগুলো কবিতায়। 'স্বপনপ্রিয়া', 'ফুলের পূজারী', 'অবেলায়', 'একা, কারে আমি চাই', আজি পুষ্পের জনমের তিথি, ইত্যাদি এ ধরনের কবিতা।

[তিন] স্মৃতি-তর্পণ ও মহাপুরুষ প্রশস্তিমূলক দুটি কবিতা এ কাব্যে পাওয়া যায়—কবিতা দুটি হচ্ছে যথাক্রমে, 'দিদারুল আলম স্মরণে' ও 'তুমি আমাদের কবি'।

আমরা প্রথমে 'ধান-খেত' কাব্যের যে সব কবিতায় 'সুদূর গাঁয়ের আশা-নিরাশার বেদনার সংকেতটি' পরিস্ফুট হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করব। কাব্য রচনার পিছনের ঐ সচেতন অভিপ্রায়টি এ কাব্যের প্রকৃতিকে বিশেষ ভাবেই নিয়ন্ত্রিত করেছে। অন্য সুরের আলাপনও তিনি করেছেন, হয়তো ভেতরকার তাগিদেই, কিন্তু তা এ কাব্যে গৌণই বটে। 'রাখালী', 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে'র পর 'বালুচরে'র অনতি-মধুর অভিজ্ঞতার পর 'ধান-খেতে'র সবুজ বিস্তারে তিনি যেন নতুন করে পল্লীর জন্যে মমত্ববোধ করেছেন। এ দৃষ্টিতে পূর্বের মোহাচ্ছন্নতা ততটা নেই, আছে একটা সচেতন সহানুভূতিপূর্ণ মনের স্পর্শ। তবে কবিস্বভাবের রোমান্টিকতা এখানেও বাস্তবের উপর রঙ ফলিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নাম-কবিতা 'ধান- খেতে'ও এর যথেষ্ট পরিচয় মিলবে। কবি প্রথমে 'ধান-খেতে'র একটি কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। এ বর্ণনায় বাস্তব দৃষ্টির সাথে স্বাভাবিক কবিত্বের সমন্বয় ঘটেছে। একটা মমত্বময় প্রাণ উঁকি মারছে ঐ ধান-খেতের 'সবুজ হলদে ঘেরা' রূপের আড়ালে। পথের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ 'ধান-খেত' কবির ভাষায় 'আমার বুকের আশা নিরাশার বেদনার সঙ্কেত'। ছোট্ট ধান-খেতটি বস্তুতঃ চাষীর জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, আনন্দ-বেদনা ও সকল গৌরবের প্রতীক। এখানে সে নির্বোধ, স্বাধীন, উচ্চ শির। তার সকল কর্মের, সকল কামনার সার্থকতা বা ব্যর্থতা এ ধান-খেতের সাথেই জড়িত—তার শত দুঃখ-বেদনার স্মৃতি যেমন, তেমনই প্রেম-ভালবাসা, আনন্দের স্মৃতি এ ধান-খেতের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়ে ফিরেছে যুগযুগান্ত ধরে। তাই চাষীর মুখে যখন শুনি,—

"হেথায় নাহিক সমাজ-শাসন, নাহি প্রজা আর সাজা
মোর খেত ভরি ফসলেরা নাচে, আমি তাহাদের রাজা।"

তখন তাঁর অকপট প্রাণেরই পরিচয় পাই। 'ধান-খেতে'র স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে চাষীর হৃদয়। চৈত্রের খর রোদে, আষাঢ়ের বরষণে, শরতের সোনালী আলোয়, হেমন্তের সোনা ছড়ান হাসিতে ও শিশিরের স্নিগ্ধতায় ধান-খেত কত রূপেই না দেখা দেয় তাঁর কাছে। এ ধান-খেত কিষাণ দুলালীর মায়াময় শ্যামল স্নিগ্ধ রূপ নিয়েই যেন দেখা দেয় কবির চোখে। হেমন্তে সবুজ ধানে হলুদ রঙের ছোপ পড়ে, কাঁচাপাকা ধানের সে রূপ দেখে কবির মনে হচ্ছে, কৃষাণকুমারীর 'সবুজ শাড়ীর অঞ্চলে যেন ছোপ লাগিয়াছে তাই'। হেমন্তের রোদ যেন 'কচি রোদ-রেখা নাড়ি' প্রতিদিন সে শাড়ী হলুদে ছোপাচ্ছে। কৃষাণ কনের বিয়েরই যেন আয়োজন চলছে চারিদিকে। হলদি কোটার শাড়ী পরা, কলমী-লতার গহনায় সজ্জিত তার রূপে মুগ্ধ সকাল সন্ধ্যা যেন ভিনদেশী বরের মত লাজরক্তিম মুখে প্রতিদিন তাকে উঁকি মেরে দেখে যাচ্ছে। বড় সুন্দর এ কল্পনাটি। রোমান্টিকের সৌন্দর্যকল্পনা সামান্যকে

কিভাবে অসামান্য করে তোলে তা আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে যখন কবি পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,—

"বকের মেয়েরা গাঁথিয়া যতনে শ্বেতপালকের মালা
চারিধারে এর ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাজায় সোনার ডালা।"

মনে হয় যেন, বধূবরণের দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে। আবার রাতের শিশির স্নাত, জোনাকীর আলোতে ক্ষুদ্র মাঠকে দেখে কবি যখন বলেন,—

"শিশির তাহারে মতির মালায় সাজায় সারাটি রাতি,
জোনাকীরা তার পাতায় পাতায় দোলায় তারার বাতি।"

তখন তাতো অপরূপ। অতি সাধারণ পরিপার্শ্বিক জসীমউদ্‌দীনের কল্পনার যাদুতে অসাধারণ মাধুর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে কবিতাটিতে। অথচ কোথাও কবি বাস্তবকে উপেক্ষা করেছেন এমন কথা কেউ বলবেন না। ছড়ায় ছড়ায় জড়ান নুইয়ে পড়া সবুজ ধান দেখে যখন তিনি বলেন, "ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়ে পাখিগুলি শুয়েছে মাঠের পরে', অথবা কাঁচাপাকা ধান দেখে যখন বলেন, 'সবুজ শাড়ীর আঁচলে যেন হলুদের ছোপ লেগেছে' অথবা খেতের উপর সাদা সাদা বক ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে যখন কবি বলেন, 'বকের মেয়েরা শ্বেত পালকের মালা গেঁথে ঘুরে ঘুরে বরণডালা সাজায়' অথবা তালগাছের উঁচু বাসা ছেড়ে বাবুই পাখীর দল চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে তিনি যখন ভাবেন, তারা যেন কিসের মায়ায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তখন কবির কবিত্বের প্রশংসা করেও তাঁর বাস্তব দৃষ্টির তীক্ষ্মতাকে স্বীকার করতে হয়। এত সুন্দর করে আপন পারিপারিশ্বিককে দেখবার ক্ষমতা ছিল বলেই তো 'পল্লী জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে চূড়ান্ত মাধুর্য নিয়ে দেখা দিয়েছিল।

'পল্লীবর্ষা' , কবিতাটিতে পল্লীতে বর্ষার আবির্ভাবের কাব্যময় বর্ণনা এবং ঐ পটভূমিতে পল্লীজীবনের মূল সুরটি চমৎকাভাবে বিধৃত হয়েছে। বর্ষার পটভূমিতে নরনারীর চিরন্তন বিরহ-ব্যাকুলতার সুরটিও এ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাটিতে পল্লীপারিপার্শ্বিকের স্বীকৃতি আছে। 'জলের ঘাটে' কবিতাটিও কাব্যিক গুণে উপভোগ্য। পল্লীপ্রকৃতির রূপমুগ্ধ কবি যেন পল্লীর পথ থেকে মুঠো মুঠো সোনা কুড়িয়ে নিয়ে আমাদের উপহার দিচ্ছেন সুন্দর সুন্দর কবিতার আকারে। সামান্য পল্লীদৃশ্য স্বপ্নময় রূপ নিয়ে উপস্থিত হয় কবির কাছে। আর কবি বুনতে শুরু করেন স্বপ্নের জাল। গঁয়ের পথের শেষে কেয়া ঝাড় সমাচ্ছন্ন নদীর কূল, তার নীচেই ঘাট। সে ঘাটে নানা সাজে পল্লীবধূরা কলসী কাঁখে জল নিতে আসে। ঘাটে এসে তারা জল খেলায় মাতে—কেউ কলসী ভরে, কেউ ডুবগলা জলে দাঁড়ায়। কেউ বা নানা ছন্দে স্নানের আয়োজনে ব্যস্ত থাকে। এ সামান্য পল্লীদৃশ্য নিয়ে কবিতাটি রচিত। অথচ রোমান্টিক কবিমন একেই কেন্দ্র করে একের পর এক রঙিন ছবি এঁকে চলেছেন। সে ছবির চমৎকারিত্ব অস্বীকার করা যায় না। ছোট বড় সাতটি স্তবকে গাঁথা কবিতাটিতে কবি যেন ছবির মালা গেঁথেই চলেছেন। ছবিগুলোর আলাদা আলাদা মূল্য আছে—আবার সব মিলে একটি অখণ্ড তাৎপর্যও লাভ করেছে।

পল্লীনারীর স্নান-লীলার কেন্দ্রস্থল 'জলের ঘাট' কবি-কল্পনার গুণে শেষ পর্যন্ত 'প্রেমের পাট' হয়ে উঠেছে। কবি আমাদের রাখালিয়া বাঁশীর সুরের দোলায় ভাসিয়ে ভাসিয়ে বহুকাল আগের বৈষ্ণবকাব্যের প্রেমের নদী যমুনার তীরেই যেন নিয়ে এসেছেন। যমুনার তীরে কৃষ্ণের বাঁশী শুনে গোপিনীদের যে মানসিক অবস্থা হয়েছিল, এ কবিতায় গাঁয়ে মেয়েদের ভাব-ব্যাকুলতার মধ্যে তারই যেন প্রতিচ্ছায়া লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ আলোচ্য কবিতায় 'রাখালিয়া সুরে' বৈষ্ণব কবির প্রেমাকুলতাই যেন বেজে উঠেছে।

'কৃষাণী দুই মেয়ে' অতি ছোট একটি কবিতা। এর অবলম্বনও অতি সামান্য। গাঁয়ের পথে চলতে চলতে হঠাৎ কবির নজরে এসেছিলো হাসি-খুশীতে ভরা দুইটি কৃষাণী মেয়ে। ভাল করে তাদের লক্ষ্য করার আগেই তারা সরে গিয়েছিলো কবির দৃষ্টি থেকে। সামান্য কয়েকটি মিনিটের দেখা। তাতেই কবি তাদের সহজ মধুর রূপের যে ছবিটি আমাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন, তা প্রশংসারই বস্তু বটে।

সাদামাটা পল্লীদৃশ্য বর্ণনায় বোঝা যায় 'আপেলের মত মুখ', 'তরমুজের ফালির মত রাঙা ওষ্ঠাধরের কল্পনা জসীমউদ্‌দীনের সতেজ-সহজ উপমা সৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

ছবি আঁকতে জসীমউদ্‌দীনের কোন ক্লান্তি নেই যেন! পল্লীপথে ছড়িয়ে রয়েছে সে ছবির অজস্র উপকরণ। সে উপকরণের সদব্যবহার তিনি করেছেন তাঁর কাব্যসমূহে। সেই ছবি আঁকতে গিয়ে তাঁর ছবি শ্যামল পল্লীপ্রকৃতির দিকে নিবদ্ধ থাকে নি, পল্লীর জীবন-বাস্তবের দিকেও প্রসারিত হয়েছে। সে দৃষ্টির তীক্ষ্মতা আমাদের বিস্মিত করে। গ্রাম্য মানুষের চিত্রাঙ্কনে ও জীবন পারিপার্শ্বিকের নিখুঁত বর্ণনে জসীমউদ্‌দীনের সার্থকতা রীতিমতো ঈর্ষার উদ্রেক করে। জীবনের প্রতি যে দরদ ও মমত্ববোধ, যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, যে মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতা, যে অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি ও হিউমারবোধ থাকলে মানব-চরিত্রের ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব, তা জসীমউদ্‌দীনের পূর্ণ মাত্রায়ই আছে। তাই তো জসীমউদ্‌দীন অঙ্কিত মানব-মানবীর চরিত্রগুলো প্রায়শই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'মুন্সী সাহেব' কবিতায় মানব চরিত্রাঙ্কনের সে বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দান ছাড়াও সহজ ও অনাবিল ধর্মবোধের অধিকারী মুসলমান পল্লীবাসীদের জীবনের মূল সুরটিকে আশ্চর্য নিপুণতার সাথে ফুটিয়ে তুলে প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি জীবনের কত বড় রূপকার। 'কাজল ডাঙার বছির মিঞা'র মতো মুন্সী সাহেবরা আমাদের পল্লীসমাজে আজও যে কি রকম প্রতিপত্তির অধিকারী, গ্রাম্য মানুষের জীবনের তারে ঝংকার তুলতে তাদের যে অসাধারণ ক্ষমতা, তা পল্লীজীবন সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারাই জানেন। জসীমউদ্‌দীন তাকে আবিষ্কার করেছিলেন আপন অভিজ্ঞতার রাজ্যে; সংবেদনশীল সমালোচকের মন নিয়ে তিনি তাকে বিচার করেছেন। মুন্সী সাহেবের চেহারাটি বর্ণনায় তিনি যেমন পরিচ্ছন্ন কৌতুকপ্রিয় মনের পরিচয় দিয়েছেন, ধর্মভীরু পল্লীবাসীর চিত্তে তাঁর অসাধারণ প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতায় তেমনি তাঁর চরিত্রমহিমা উপলব্ধি করে প্রচ্ছন্নভাবে তার প্রতি শ্রদ্ধাই নিবেদন করেছেন। মুন্সী সাহেবকে তিনি ফেরেশ্‌তা করে গড়েন নি, তার চরিত্রের ত্রুটির দিকটিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেও ভুল করেন নি। 'দোষেগুণে পয়দা' মানুষ এ জীবনসত্যের স্বীকৃতিই তিনি দিয়েছেন কবিতাটিকে। আমাদের মুন্সী সাহেবও একটি 'দোষেগুণে পয়দা' মানুষ হয়েই দেখা দিয়েছেন আমাদের সামনে। কাবিতাটিতে পল্লীর মুসলমান সমাজের বিশেষ আবহটি ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি অজস্র আরবী-ফার্সী শব্দের যে অপূর্ব সুন্দর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, তা তাঁর উচ্চাঙ্গের শিল্পবোধেরই পরিচয় বহন করে। বাংলা ভাষার দেহে সে সব শব্দ চমৎকার ভাবে মানিয়ে গিয়েছে। কবিতার নিজস্ব ক্ষেত্রে, শব্দ প্রয়োগে তাঁর এ সার্থকতা নজরুল ইসলামের সার্থকতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'গন্ধ তাদের ছড়ায় পবন আতর গোলাপ লোবানেতে, আল্লাহুম্মা ছাল্লে-আলা দরুদ গানের ছন্দে মেতে', মুন্সী সাহেব মিলাদ পড়ে 'পুল-ছেরাতের পুলের সেতু', 'সকল নবী কাঁদবে কাঁদবে সেদিন য়্যা-নফছি য়্যা-নফছি বলে', 'রোজ-হাসরের ময়দানেতে মোরদারা সব জীবন পাবে', য়্যা-উম্মতি য়্যা-উম্মতি, কাঁদবে আমার দীনের রছুল, হতভাগা মোমীনগণে

সে দিন তার পড়বে না ভুল'—এ সব দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন। এ সব ক্ষেত্রে শব্দ প্রয়োগ ঔচিত্যবোধাশ্রয়ী বলেই সার্থক বলে মেনে নিতে বাধা থাকতে পারে না। কবিতায় শব্দপ্রয়োগের এ সার্থকতা প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা যাবে। আমরা বাহুল্য ভয়ে বেশী উদ্ধৃতি দান না করে ক্ষান্ত হলাম।

'বাপের বাড়ীর কথা' কবিতাটি একটি পল্লীবধূর পিতৃগৃহের স্নেহস্মৃতির রোমন্থনের কারুণ্যে বিগলিত। কবিতাটিতে কেমন একটা nostalgic feeling (ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা) এর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বাঙলাদেশের মেয়েরা অতি অল্প বয়সেই বিয়ের পর পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যায় স্বামীগৃহে, সেখানে নতুন পরিবেশে নতুন ভাবে গড়ে ওঠে তাদের জীবন। কিন্তু পিতৃ-মাতৃ স্নেহের প্রবল আকর্ষণের দোলা অনুভব করে সারা জীবন, ব্যাকুলতা অনুভব করে পিতৃগৃহের স্নেহ-স্মৃতির পরিবেশে ফিরে যাওয়ার। তাই তো দেখছি তিরিশ বছর স্বামীর ঘর করার পরও নারী ভুলতে পারে নি পিতা-মাতার কথা, পিতৃগৃহের শত ক্ষুদ্র স্মৃতিকথা। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে সে স্নেহ-স্মৃতি রোমন্থন করে কেমন একটা তৃপ্তি যেন অনুভব করে! হৃদয়ের কারুণ্যে নিষিক্ত স্নেহ-স্মৃতিগুলো বড় মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে কবিতাটিতে। পল্লীর বাস্তব পারিপার্শ্বিকের সমর্থনে পুষ্ট এ কবিতাটির মাধুর্য অস্বীকার করা যায় না। কবিতার কোন কোন অংশ রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতায় বর্ণিত বধূটির বাল্যস্মৃতির ব্যাকুলতার ব্যথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

'বালুচর', কবিতায় এক কৃষাণ ও কৃষাণবধূর সুন্দর সুখের জীবনের একটি চিত্র আঁকা হয়েছে। নদীতীরের বালুচরে ওরা কুটির বেঁধেছে, সে কুটির শ্যামশোভায় ঘেরা। কৃষাণ খেতে কাজ করে, ফসল ফলায়, মনের সুখে বাঁশী বাজায়; আর কৃষাণী ঘরকান্না করে—জল তোলে, আঙিনা লেপে। ভালবাসার আদরে, স্নেহে, মাধুর্যে সে জীবন পরিপূর্ণ। সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে তারা। কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্যের রূঢ়তা ও নানা বিপর্যয়ের ভ্রূকুটিও আসে তাদের জীবনে। বরষায় ওরা নদীর বুকে জীবন নিয়ে ভাসে—জীবনের স্বপ্ন ওদের ছিন্ন হয়ে যায়। 'তবু আরবার বালুচরে ওরা কুটীর বাঁধিতে আসে'—অপরাজেয় তাদের জীবনের মহিমা! দুঃখ-বিপদকে অতিক্রম করে বেঁচে থাকার সাধনায় তা নিযুক্ত। কবিতায় বর্ণিত এ চিত্রে পল্লীপ্রকৃতির সহজ মাধুর্যের ছাপ পাওয়া যায়। চিত্রটি সাধারণ, কিন্তু সুন্দর বলতে বাধা নেই।

'রাখালের রাজগী', 'নিমন্ত্রণ', 'যাব আমি তোমার দেশে',—সমসূত্রে গ্রথিত তিনটি কবিতায় কবি আমাদের হৃতশ্রী, অবহেলিত, নিরানন্দ পল্লীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কবিতাগুলোতে পল্লীর মমত্বময় পরিবেশে ফিরে যাওয়ার জন্যে একটা আকুল আহ্বান জানান হয়েছে। নাগরিকসভ্যতার প্রভাবে আজ আমাদের জাতীয় জীবনে পল্লী একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। একদিন পল্লীই ছিল বাংলার প্রাণকেন্দ্র—সকল ঐশ্বর্য ও গৌরবের স্থল। তখন জীবনের ধাঁধায় মানুষ শহরে ছুটে যায় নি। আজ রূপ পালটিয়েছে, জীবনের ভারকেন্দ্র সরে এসেছে শহরে—আমাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সকল কর্মের ভারকেন্দ্র এখন শহর। গোটা দেশের সম্পদ শহরে কেন্দ্রীভূত। পল্লী কিশোররাও আজ গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি জমাচ্ছে। পল্লীর স্বাধীন, মুক্ত, অবাধ পরিবেশ থেকে তারা গিয়ে শহরের ইটকাঠের প্রাচীরের মধ্যে জীবনের ধাঁধার সমাধান খুঁজছে। ফলে পল্লী এখন রিক্ত, লুপ্তশ্রী। এতে দেশের দুর্দশাই বেড়ে গিয়েছে, জীবনের সহজ আনন্দ মানুষ হারিয়ে ফেলেছে।

কবি নিজে পল্লীসন্তান, পল্লীর সাথে তাঁর যোগ নাড়ীর যোগ। তিনি পেয়েছিলেন এ জীবনের মাধুর্যের সন্ধান। শ্যামশ্রী পল্লীর মধ্যে রয়েছে উদার মুক্ত জীবনের আশ্বাস। সে পল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরের তিক্ত অভিজ্ঞতার স্বাদ কবিকে পেতে হয়েছে। অবশ্য তাঁর এ অভিজ্ঞতা সমকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরই অভিজ্ঞতা। এ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে অর্থনৈতিক মন্দার যুগে মধ্যবিত্ত জীবন যখন দুর্বহ হয়ে উঠেছিল, তখন পল্লীর অনাবিল সুখ-শান্তির কল্পনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন কবি-সাহিত্যিকরা। জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় সমকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক মানসের এ রূপটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কবিতা তিনটিতে কবির পল্লীর প্রতি তাঁর অন্তরের টানই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি সবাইকে পল্লীর শ্যামশ্রীর মধ্যে ফিরে যেতে আহবান জানিয়েছেন ; জানিয়েছেন সাদর নিমন্ত্রণ। তিনি নিজেও ঐ নিমন্ত্রণে শরীক হওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কবিতা তিনটিতে সমকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজের পল্লীচিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে যা 'গ্রামে ফিরে যাও' আহবানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, জসীমউদ্‌দীনের পল্লীনির্ভর সাহিত্য-সাধনায় বোধহয় তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে। কবিতা তিনটির ভাবের পারম্পর্য লক্ষণীয়। 'রাখালের রাজগী' কবিতায় পল্লীর অনাবিল শান্তি ও সুখের অতীত স্মৃতির পটভূমিতে এর বর্তমান নিরানন্দ, শ্রীহীন ও ব্যথা-বেদনাময় রূপের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে এবং তার কারণও নির্দেশ করা হয়েছে। তারপর পল্লীর দুর্দশার একটি প্রতীকার কামনা ব্যক্ত হয়েছে। অবশ্য সে প্রতীকারের পথটি যে শিক্ষিত শহরবাসীদের 'গ্রামে ফিরে যাওয়ার' মধ্যেই নিহিত তার ইঙ্গিতটি সুস্পষ্ট। পরবর্তী 'নিমন্ত্রণ' কবিতায় সবাইকে মায়াময় পল্লীপরিবেশে আহবান করা হয়েছে এবং ঐ উপলক্ষ্যে পল্লীজীবনের একটি অনাবিল মাধুর্যের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষ 'যাব আমি তোমার দেশে' কবিতায় কবি পল্লীসন্তানকে পল্লীতে ফিরে যাওয়ার আহবান জানিয়েই ক্ষান্ত হন নি, পল্লীকে নতুন করে চিনবার ও জানবার জন্য শপথ গ্রহণ করেছেন।

'পলাতক' কবিতায়ও কবির পল্লীচিন্তা আরেকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কবির বাল্য, কৈশোর কটেছে পল্লীতে, পল্লীর রূপ ও মাধুর্যের স্মৃতি রয়েছে তাঁর মন ভরে। পল্লী প্রকৃতির রূপ-মাধুর্যের চিন্তা আজও তাঁকে স্বপ্নাতুর করে তোলে, সে যেন তাঁর স্মৃতিতে এক রূপকথার রাজ্য হয়ে দেখা দেয়। পল্লী থেকে নির্বাসিত ; শহরের পাষাণ-কারায় বন্দী কবিপ্রাণ সে সব স্মরণ করে বেদনায় টন্‌টন্ করে ওঠে। কবির মন ব্যাকলু হয়ে ওঠে কৈশোরের সেই পল্লীর মায়াময় আবেষ্টনীর মধ্যে কাটানো দিনগুলোর জন্যে। কিন্তু সে কৈশোর যে আজ পলাতক,—কবির জীবন রঙ্গমঞ্চ থেকে তাঁর খেলার আসর গুটিয়ে নিয়েছে। ইচ্ছে থাকলেও আর সে জীবনে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। কবির রোমান্টিক মন এখানে অতীত-স্মৃতির অভিসারে বেড়িয়ে কেমন একটা বিষণ্ন আনন্দ উপভোগ করছে যেন। পল্লীপ্রাণ জসীমউদ্‌দীনের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায় কবিতাটিতে। জীবনের ধাঁধায় পড়ে কবি বহুকাল যাবত শহরবাসীই হয়ে পড়েছেন, কিন্তু পল্লী তাঁর মন জুড়ে রয়েছে সারাটি জীবন। শহরে বাস করেও তিনি তাই আজীবন পল্লীপথেই মানসপরিক্রমায় নিযুক্ত আছেন।

'এই গাঁয়ে তুমি রহিও গো মেয়ে' কবিতায়ও কবির পল্লীপ্রীতিই প্রকাশ পেয়েছে, তবে একটু পরোক্ষ ভাবে। 'এই গাঁয়ে রহিও গো মেয়ে' এ অনুরোধের পেছনে পল্লীনারী পল্লীতে থেকেই পল্লীগৃহকোণকে আনন্দময় করে তুলুক, এ কামনাই অনুচ্চারিত রয়ে গেছে।

'বামুন বাড়ীর মেয়ে' কবিতায় কবি একটি পল্লীবালিকার পবিত্র স্নিগ্ধ রূপের আরতি

করেছেন এবং ঐ উপলক্ষ্যে তার পল্লীপারিপার্শ্বিকের ক্লিন্নতার ছবিও ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিবেশের বৈপরীত্যই চিত্রটিকে সমুজ্জ্বল করে তুলেছে। নতুবা এ চিত্র এক সাদামাটা পল্লীবালিকারই অতি সাধারণ ছবি। রোদের গায়ের বরণ সে মেয়েটি 'যে পথ দিয়ে চলে সে পথ রূপে যে যায় নেয়ে।' এ রূপ-প্রশস্তি জসীমউদ্দীনের কাব্যে বারবার নানা উপলক্ষ্যে উচ্চারিত হয়েছে। তবে 'বামুন বাড়ীর মেয়ে'র চিত্রটি একটা বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে এর বিশেষ পারিপার্শ্বিকটির জন্যে।

কবিতাটিতে এঁদো ডোবা, পচা পুকুর, জঙ্গলাকীর্ণ ম্যালেরিয়া মহামারীর আবাসভূমি পল্লীর ক্লিন্নতার সামগ্রিক ছবিটি ফুটে উঠেছে। তাছাড়া হিন্দু-পল্লীর জীবনধারার একটি আভাসও পাওয়া যায়। কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি কবিতাটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রূপ বর্ণনায় রোমান্টিক মনোভাবের পরিচয়টি কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরিস্ফুট।

'পুরাণ পুকুর' কবিতায় কবি বর্তমানে লুপ্তশ্রী, অথচ এককালে শান্তশ্রী পল্লীর জীবন মাধুর্যের স্মৃতিচারণ করেছেন এবং বর্তমানের দুর্দশা লক্ষ্য করে আপন অন্তরের ব্যথা প্রকাশ করেছেন। একটি 'পুরাণ পুকুর' দর্শনে কবির অতীত স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে। পল্লী যে জসীমউদ্দীনের কবিসত্তাকে কেমন করে আচ্ছন্ন করে রয়েছে, তা এ কবিতা পাঠে বেশ বোঝা যায়। পল্লীর সামান্য একটি 'পুরাণ পুকুর'ও কবিকে আবেগে উতলা করে তোলে। এ এক আশ্চর্য অনুভূতিশীল কবি-হৃদয়ই বটে।

'চৌধুরীদের রথ' কবিতায় কবির ঐ পল্লীস্মৃতিচারণই আর এক উপলক্ষ্য করে প্রবল হয়ে উঠেছে। এককালে পল্লীজীবনে দুঃখ-দারিদ্র্য সত্ত্বেও যথেষ্ট আনন্দ ছিল। নানা ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য করে পল্লীবাসীদের জীবনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেত। বড়লোকেরা সেদিন গ্রামেই থাকত, দরিদ্রের সুখ-দুঃখে কিছুটা অংশীদার হত। কামার, কুমার, ছুতোর, পোটো প্রভৃতি শিল্পীরা গ্রামেই বাস করত। ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতা তারা পেত। উৎসব, অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গ্রামের সর্বস্তরের নারী, শিশু, পুরুষেরা যেন মেতে উঠত। 'চৌধুরীদের রথ' সেকালের বার্তা নিয়েই যেন এখনও ভগ্নদশায় পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অতীতের সহস্র প্রীতিকর স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে 'শ্রীহীন পল্লী-বৃন্দাবনের' প্রতীক রূপেই চাকা ভাঙা রথ আজ দাঁড়িয়ে আছে। বনের লতাপাতা যেন তাকে জড়িয়ে ধরে সে স্মৃতিকথা শুনছে। পল্লীজীবনের এমনি শত মাধুর্যের হারান ছবি কবিকে আজও উন্মনা করে তোলে। সে স্মৃতির কথা শোনাতে পারলে কবি যেন স্বস্তি পান।

'ফুপু-মার কবরে' কবিতাটিতে কবির বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। একটি করুণ শোকস্মৃতিই এ কবিতায় ভাষা পেয়েছে। এক হতভাগিনী পল্লী-নারীর মর্মান্তিক দুঃখের কাহিনী এ কবিতায় লিপিবদ্ধ। কবিতায় বর্ণিত দুঃসহ ব্যথার কাহিনীটি আমাদের 'কবর' কবিতার কথাই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়। 'কবর' কবিতার শিল্পসমুন্নতি এ কবিতায় দেখা না গেলেও এর বক্তব্যের এমনি একটা সার্বজনীন আবেদন আছে যে, কবিতাটি অনায়াসে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। দুঃখ-দারিদ্রক্লিষ্ট পল্লীতে প্রতিদিনই তো কত হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছে। কে তার খবর রাখে। জসীমউদ্দীন মানুষের ইতিহাসের উপেক্ষিত নর-নারীদের জীবনের দুঃখ-ব্যথাকেই ভাষা দিয়েছেন তাঁর কাব্যে। বড় দরদ দিয়ে আঁকা সে সব দুঃখ ব্যথার ছবি। আলোচ্য কবিতাটিতে এক পল্লীনারীর জীবনব্যাপী দারিদ্র ও লাঞ্ছনার ছবি ফুটে উঠেছে—একমাত্র মৃত্যুতে এসে তার সমাপ্তি ঘটেছে।

'কাটাধানের বিদায়' কবিতাটি এ কাব্যের শেষ কবিতা। প্রথম কবিতা 'ধান-খেতে'র নামকরণ স্মরণ রাখলে এ নামকরণটি বড় তাৎপর্যপূর্ণ মনে হবে। ধানের খেতের ফসল

ফলানোর কাজ শেষ হয়েছে তাই ধানকাটার পালা তো আসবেই। ধানের এ বিদায় দৃশ্যে কবিচিত্তে যে কারুণ্য সৃষ্টি হয়েছে, তাতে কবিতাটিতে গানের আমেজ এসে গিয়েছে। ধানের বিদায় উপলক্ষ্য করে কবি বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির পট পরিবর্তনের ব্যাপারটি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন এ কবিতায়। চৈত্র মাসের ধূলিধূসর মাঠে সবুজের আস্তরণ ছড়িয়ে ধানের আর্বিভাব সূচিত হয়েছিল। প্রাণ জুড়ান কচিধানের রূপে পথিক মুগ্ধ হয়ে যেত ; তারপর বর্ষার জলে গা এলিয়ে শাপলার ফুল কুড়িয়ে তার দিন কেটেছে, শরতে সোনালী ফুলে ফুলে দেহকে সাজিয়ে ধরেছে সকলের সামনে। তারপরই এল বিদায়ের আহবান। বরষাতে সে কলমীলতার মালা পরেছিল, আজ সে সব ফেলে যেতে তার কষ্ট হচ্ছে। তবু তাকে যেতে হচ্ছে। মটরশুটি আজ তার স্থান নিতে যাচ্ছে ; তাদের পরেই সব ভার দিয়ে ধান বিদায় নিচ্ছে ; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্তে প্রকৃতির পট পরিবর্তনের দৃশ্যটি এখানে একে একে ফুটে উঠেছে ধানের বিদায়ের কথা উপলক্ষ্য করে। কবিতাটিতে পল্লীমাঠের শ্যামল রূপে মুগ্ধ কবিচিত্তের প্রকাশ ঘটেছে।

আমরা এ পর্যন্ত 'ধান-খেত' কাব্যের যে সতেরটি কবিতার আলোচনা করেছি, তাতে নানা উপলক্ষ্য করে কবির পল্লীপ্রীতিই প্রকাশ পেয়েছে। সে ভাবনার প্রকাশে তাঁর সৌন্দর্যপিপাসু রোমান্টিক মনও যে সক্রিয় ছিল তাও দেখেছি। এবার আমরা ধান-খেতের অবশিষ্ট আটটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করব। এর মধ্যে দুটি কবিতা 'দিদারুল আলম স্মরণে' ও 'তুমি আমাদের কবি' কবির কাব্যসাধনায় একেবারেই নতুন ধরনের জিনিস। প্রথম কবিতা 'স্মৃতি তর্পণমূলক' ও দ্বিতীয়টি 'মহাপুরুষ প্রশস্তিমূলক'। আমরা এ দুটি কবিতার আলোচনা সেরে অন্য কবিতাগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

তরুণ সমাজকর্মী ও সাহিত্যিক দিদারুল আমলের অকালমৃত্যুতে ব্যথিত কবিচিত্তের আর্তি বেজে উঠেছে প্রথম কবিতাটিতে। কবিতাটিতে শোক-ব্যথা প্রকাশে আন্তরিকতার অভাব নেই ; কিন্তু এ শোক সার্বজনীন শোকানুভূতির গভীরতা লাভ করতে পারে নি। মাত্রাতিরিক্ত রোমান্টিক ভাবালুতার প্রকাশ ও মৃত্যু নিয়ে দার্শনিকতা করার প্রয়াস কবিতাটির মূলীভূত আবেগকে দানা বেঁধে উঠতে দেয় নি। কবিতাটির প্রকাশকলাও বৈশিষ্ট্য বর্জিত।

দ্বিতীয় কবিতা 'তুমি আমাদের কবি' রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে লেখা। এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবির অন্তরের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও অনুরাগের পরিচয় যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি রবীন্দ্রপ্রতিভার মহত্ত্বেরও উপলব্ধি ঘটেছে। কবির মতে রবীন্দ্রনাথ—'আমাদের কবি, খুব বড় কবি, যতটা বড় ধারণা করিতে পারিনে আমরা সবি।' আকাশে চাঁদ, তারার ন্যায় বহু উর্ধ্বে থেকে তিনি যেন আমাদের আকর্ষণ করছেন, ছড়িয়ে দিচ্ছেন আলো—শত শত প্রদীপের ন্যায়। প্রকৃতির রূপ-মাধুরীকে তিনি মানুষের উপভোগের সামগ্রী করে তুলেছেন, মানুষের জন্যে খুলে দিয়েছেন তাঁর রহস্যরাজ্যের দ্বার। নৈরাশ্য জর্জরিত মানুষের জন্যে এনেছেন তিনি অফুরন্ত আশা-ভরসা ; কুশ্রীতায় ম্লান পৃথিবীতে এনেছেন সৌন্দর্যলোকের বার্তা। গানে গানে তিনি প্রাণে প্রাণে বইয়ে দিয়েছেন অমৃতধারা। এ গান আমাদের প্রাণের তারে ঝংকার তোলে, আমাদের আকুল করে। যুগ-যুগান্ত ধরে তাঁর গানের অমৃতবাণী হয়ে থাকবে আমাদের পাথেয়।' এমন করে তিনি আমাদের প্রাণের তৃষ্ণা মিটিয়েছেন—সেই কবির স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কবির ইচ্ছা 'তব গানগুলি অনাগত যুগে দিয়ে যাব মোরা মোদের বংশধরে।' বড় সুন্দর কবির বাসনাটি। একটি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অবনত চিত্তের প্রকাশ ঘটেছে কবিতাটিতে। দীর্ঘ কবিতাটি মোটামুটি সুখপাঠ্য হয়েছে। ত্রিপদী ছন্দকেই টেনে লম্বা করে তার মধ্যে অমিত্রাক্ষরের প্রবাহমানতা সঞ্চার

ফলানোর কাজ শেষ হয়েছে তাই ধানকাটার পালা তো আসবেই। ধানের এ বিদায় দৃশ্যে কবিচিত্তে যে কারুণ্য সৃষ্টি হয়েছে, তাতে কবিতাটিতে গানের আমেজ এসে গিয়েছে। ধানের বিদায় উপলক্ষ্য করে কবি বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির পট পরিবর্তনের ব্যাপারটি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন এ কবিতায়। চৈত্র মাসের ধূলিধূসর মাঠে সবুজের আস্তরণ ছড়িয়ে ধানের আর্বিভাব সূচিত হয়েছিল। প্রাণ জুড়ান কচিধানের রূপে পথিক মুগ্ধ হয়ে যেত ; তারপর বর্ষার জলে গা এলিয়ে শাপলার ফুল কুড়িয়ে তার দিন কেটেছে, শরতে সোনালী ফুলে ফুলে দেহকে সাজিয়ে ধরেছে সকলের সামনে। তারপরই এল বিদায়ের আহবান। বরষাতে সে কলমীলতার মালা পরেছিল, আজ সে সব ফেলে যেতে তার কষ্ট হচ্ছে। তবু তাকে যেতে হচ্ছে। মটরশুটি আজ তার স্থান নিতে যাচ্ছে ; তাদের পরেই সব ভার দিয়ে ধান বিদায় নিচ্ছে ; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্তে প্রকৃতির পট পরিবর্তনের দৃশ্যটি এখানে একে একে ফুটে উঠেছে ধানের বিদায়ের কথা উপলক্ষ্য করে। কবিতাটিতে পল্লীমাঠের শ্যামল রূপে মুগ্ধ কবিচিত্তের প্রকাশ ঘটেছে।

আমরা এ পর্যন্ত 'ধান-খেত' কাব্যের যে সতেরটি কবিতার আলোচনা করেছি, তাতে নানা উপলক্ষ্য করে কবির পল্লীপ্রীতিই প্রকাশ পেয়েছে। সে ভাবনার প্রকাশে তাঁর সৌন্দর্য-পিপাসু রোমান্টিক মনও যে সক্রিয় ছিল তাও দেখেছি। এবার আমরা ধান-খেতের অবশিষ্ট আটটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করব। এর মধ্যে দুটি কবিতা 'দিদারুল আলম স্মরণে' ও 'তুমি আমাদের কবি' কবির কাব্যসাধনায় একেবারেই নতুন ধরনের জিনিস। প্রথম কবিতা 'স্মৃতি তর্পণমূলক' ও দ্বিতীয়টি 'মহাপুরুষ প্রশস্তিমূলক'। আমরা এ দুটি কবিতার আলোচনা সেরে অন্য কবিতাগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

তরুণ সমাজকর্মী ও সাহিত্যিক দিদারুল আমলের অকালমৃত্যুতে ব্যথিত কবিচিত্তের আর্তি বেজে উঠেছে প্রথম কবিতাটিতে। কবিতাটিতে শোক-ব্যথা প্রকাশে আন্তরিকতার অভাব নেই ; কিন্তু এ শোক সার্বজনীন শোকানুভূতির গভীরতা লাভ করতে পারে নি। মাত্রাতিরিক্ত রোমান্টিক ভাবালুতার প্রকাশ ও মৃত্যু নিয়ে দার্শনিকতা করার প্রয়াস কবিতাটির মূলীভূত আবেগকে দানা বেঁধে উঠতে দেয় নি। কবিতাটির প্রকাশকলাও বৈশিষ্ট্য বর্জিত।

দ্বিতীয় কবিতা 'তুমি আমাদের কবি' রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে লেখা। এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবির অন্তরের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও অনুরাগের পরিচয় যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি রবীন্দ্রপ্রতিভার মহত্ত্বেরও উপলব্ধি ঘটেছে। কবির মতে রবীন্দ্রনাথ—'আমাদের কবি, খুব বড় কবি, যতটা বড় ধারণা করিতে পারিনে আমরা সবি।' আকাশে চাঁদ, তারার ন্যায় বহু উর্ধ্বে থেকে তিনি যেন আমাদের আকর্ষণ করছেন, ছড়িয়ে দিচ্ছেন আলো—শত শত প্রদীপের ন্যায়। প্রকৃতির রূপ-মাধুরীকে তিনি মানুষের উপভোগের সামগ্রী করে তুলেছেন, মানুষের জন্যে খুলে দিয়েছেন তাঁর রহস্যরাজ্যের দ্বার। নৈরাশ্য জর্জরিত মানুষের জন্যে এনেছেন তিনি অফুরন্ত আশা-ভরসা ; কুশ্রীতায় ম্লান পৃথিবীতে এনেছেন সৌন্দর্যলোকের বার্তা। গানে গানে তিনি প্রাণে প্রাণে বইয়ে দিয়েছেন অমৃতধারা। এ গান আমাদের প্রাণের তারে ঝংকার তোলে, আমাদের আকুল করে। যুগ-যুগান্ত ধরে তাঁর গানের অমৃতবাণী হয়ে থাকবে আমাদের পাথেয়।' এমন করে তিনি আমাদের প্রাণের তৃষ্ণা মিটিয়েছেন—সেই কবির স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কবির ইচ্ছা 'তব গানগুলি অনাগত যুগে দিয়ে যাব মোরা মোদের বংশধরে।' বড় সুন্দর কবির বাসনাটি। একটি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অবনত চিত্তের প্রকাশ ঘটেছে কবিতাটিতে। দীর্ঘ কবিতাটি মোটামুটি সুখপাঠ্য হয়েছে। ত্রিপদী ছন্দকেই টেনে লম্বা করে তার মধ্যে অমিত্রাক্ষরের প্রবাহমানতা সঞ্চার

করে কিছুটা বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন কবি।

এবার আমরা 'ধান-খেতে'র বাকি কবিতাগুলোর আলোচনা করে এ কাব্যালোচনার উপসংহার টানব। এ কবিতাগুলোতে তিনি পূর্ববর্তী 'বালুচর' কাব্যেরই প্রেম ও সৌন্দর্য ভাবনার জের টেনেছেন। ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গিতে এ সব কবিতা নিছক পুরাতনের অনুবৃত্তি।

'ধান-খেত' কাব্যে নিছক প্রেম-সৌন্দর্যের ভাবনা নিয়ে রচিত কবিতাগুলো হচ্ছে 'স্বপন প্রিয়া', 'ফুলের পূজারী', 'অবেলায়', 'একা', 'কারে আমি চাই', 'আজি পুষ্পের জনমের তিথি।' প্রথমোক্ত কবিতা দুটি বেশ দীর্ঘ এবং এ দুটিতে কবি তাঁর প্রেম ও সৌন্দর্য ভাবনার স্বপ্নভঙ্গজনিত বিষাদকেই যেন ব্যক্ত করেছেন। একটা সর্বাত্মক নৈরাশ্যবোধ, একটা অতৃপ্তির জ্বালা প্রকাশ পেয়েছে কবিতা দুটিতে। ছন্দ, শব্দ, উপমা প্রয়োগে জসীমউদ্‌দীনের বৈশিষ্ট্য এখানে অনুপস্থিত না হলেও, এসব কবিতায় কবি-প্রতিভার ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। 'স্বপন প্রিয়া' কবিতায় প্রেমের পূজারী কবি আপন স্বপ্নভঙ্গজনিত বেদনাই প্রকাশ করেছেন।

'ফুলের পূজারী' কবিতায় কবির সৌন্দর্যানুভূতির বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে। 'ফুল' সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবেই ব্যবহৃত। কবি মাত্রই সুন্দরের সাধক, তাই তাদের 'ফুলের পূজারী' বলা অসমচীন নয়। আলোচ্য কবিতায় কবি আপন অতৃপ্ত সৌন্দর্যতৃষ্ণার কথাই ব্যক্ত করেছেন। এ সৌন্দর্যতৃষ্ণা অসীমের অভিসারী। কবির নিজের কথায় ঃ—

"আমার সে-ফুল চির শাশ্বত, অনন্ত তার আয়ু,
অঙ্গে মাখিয়া রেণু গৈরিক আমি তার খ্যাপা বায়ু।"

কিন্তু এ শাশ্বত সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি-সাধনা বড় সুকঠিন। কবির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কিন্তু তৃষ্ণা অগাধ—তাই তো কবির মনে একটা চরম অতৃপ্তির ভাব বিরাজ করছে। পার্থিব সৌন্দর্য তো ক্ষণস্থায়ী—সাধারণ ফুলের ন্যায়ই ঝরে পড়ে অকালে, কালের ক্রুর আঘাত সহ্য করে তা টিকে থাকতে পারে না। মানবীর মধ্যে তাই যে সৌন্দর্যের আভাস পাওয়া যায় তা কবিকে আশ্বাস দিতে পারে নি। কারণ পৃথিবীর দুঃখের কীট তাতে প্রবেশ করে তাকে ম্লান করে দিতে পারে যে কোন সময়। একমাত্র অন্তরসৌন্দর্যের রাজ্যে তাকে উত্তীর্ণ করে দিতে পারেন অমরার কবি 'ভগবান'। কবির সে ক্ষমতা নেই। তাই তো সকল দৈন্য নিয়ে তিনি জড়সড় হয়ে পৃথিবীর এক কোণে পড়ে আছেন। তবু কবির মনে ভরসা জাগে যে, দেবতার অনুগ্রহ পেলে তাঁর সাধনা পুষ্পিত হয়ে উঠতে পারে। সে ভরসায়ই তো তিনি সৌন্দর্য পূজার উপচার নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন আপন মানসীপ্রিয়ার দ্বারে—কবির কামনা 'আমি এসেছিনু তোমার মাঝারে অগাধ তৃষ্ণা গড়ি, নিজেরে করি সুন্দরতর কঠোর সাধনা করি।'

কবির ধারণা ছিল সকল সৌন্দর্যের পূজারীর মনই ফুলের মত নির্মল, সুন্দর। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝতে পেরেছেন, এ ক্ষেত্রে অনেক ভ্রষ্টযোগী আছেন, যারা সৌন্দর্যের নির্মল অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছেন। তারা সত্যিকারের সাধকের ব্রতকে ঈর্ষার চোখে দেখেন। কবির নিজের সাধনায়ও সে সীমাবদ্ধতা হয়তো দেখা দিতে পারে। তিনি তা অকপটে স্বীকার করেছেন। তবুও তিনি কোন অভিযোগ না করে অনন্ত সৌন্দর্যের সাধনাই করে যাবেন। সৌন্দর্যের এ তাত্ত্বিক চিন্তায় কবি, রবীন্দ্রনাথের প্রেম-সৌন্দর্যের ভাবনা দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন বলে মনে হয়। তবু এ পথ তাঁর যথার্থ পথ নয় বলেই মনে হয়। তত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রাণান্তকর প্রয়াসে কাব্যদেহ এখানে ভারাক্রান্ত।

প্রেম ও সৌন্দর্যের অনুভূতির প্রকাশে এ কাব্যের অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসর কবিতা

'অবেলায়', 'একা', 'কারে আমি চাই', কবিতাত্রয়ীতে কবি অনেক বেশী সার্থক বলে আমার ধারণা। প্রেমানুভূতির এ ছোট ছোট প্রকাশগুলোতে এমন একটা আন্তরিকতার সুর লক্ষ্য করা যায়, যা অন্যত্র বিরল। আবেগ এখানে অনেকটা সংযত বলেই কাব্য অনেকটা সংহত রূপ পেয়েছে। 'অবেলায়' কবিতাটিতে প্রিয়-প্রতীক্ষারতা নারীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসই যেন ঝরে পড়েছে, এর ধ্রুবপদ 'কেন সন্ধ্যায় তুমি এলে' এ প্রশ্নসূচক বাক্যটিতে। দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে যদি বা প্রিয় এল সন্ধ্যার অস্তরাগের পথে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিষণ্ন বিদায়ের বাঁশী বেজে উঠল। ক্ষণস্থায়ী সন্ধ্যার রক্তরাগের ন্যায় প্রিয়সান্নিধ্য লাভের আনন্দ মুহূর্তেই শেষ হল। বড় সুন্দর প্রেমার্ত নারীর এ হৃদয়ের আকুতি। এ আকুতিটি সুরময় হয়ে উঠেছে কবিতাটিতে। একে প্রেমের গান বললেই বোধহয় ঠিক হবে।

'একা' কবিতাটিতে প্রেমিক কবি জীবনের নৈঃসঙ্গ ও একাকীত্বের বেদনাই যেন প্রকাশ করেছেন। একটা চাপা বেদনার দীর্ঘ নিঃশ্বাস যেন ঝরে পড়ছে কবিতাটির মধ্য দিয়ে।

'কারে আমি চাই' কবিতাটিতে কবির রোমান্টিক মনের প্রেমসৌন্দর্য-ভাবনার স্বরূপটি চমৎকার রূপে ফুটে উঠেছে। রোমান্টিক মাত্রই স্বপ্নবিহারী, মুহূর্তে মুহূর্তে তাদের মনের আক. . ঙ পালটায়। কত সুন্দর সুন্দর কামনা ফুটে ওঠে তাদের হৃদয়-সরোবরে মুহূর্তে মুহূর্তে। আবার মুহূর্তেই বুদবুদের মতো মিলিয়ে যায়। কোন কিছুই স্থির রূপে দানা বেঁধে ওঠে না। রোমান্টিকের মনে সুন্দর দেখা দেয় পলকে ঝলকে, আবার মিলিয়ে যায় চকিতে। প্রেমের পথেও রোমান্টিকের ঐ একই অভিজ্ঞতা। তাই তো রোমান্টিক মন চির অতৃপ্ত, অবসাদগ্রস্ত, স্বপ্ন-ভঙ্গের বেদনায় চিরবিক্ষুব্ধ। সে তার ভাবনার সাথে বাস্তবের মিল বড় একটা খুঁজে পায় না। তাই তাকে আক্ষেপ করে বলতে শোনা যায় 'আমি যাহা চাই ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।' তার এ সংকটের কারণ তারই উচ্চারিত প্রশ্নের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়—'কেন যারে তারে হঠাৎ দেখিয়া এত ভালো লেগে যায়।' আর যদি ভালোই লাগে—'যারে ভালো লাগে, কি হয় তাহার মনের মতন হতে।' এ প্রশ্ন চিরন্তন। এর উত্তর কে দিবে কবিকে? এই যে 'ভালো লেগে যাওয়া' এই যে ঈপ্সিত বস্তুর সাথে মনের গরমিল, এ ধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে মরছে রোমান্টিক মন।

কেন এমন হল? এই অকারণ ভাল লাগা, আবার অকারণ বিরাগ কেন তার মনকে দোলায়িত করছে সারা জীবন? এর উত্তর নেই। কবির নিজের প্রতি কবির প্রশ্ন—'কারে আমি চাই'। আপন মনের ভাবনার অন্তহীন জালে জড়িয়ে পড়া কবির অসহায়তাকেই স্পষ্ট করে তোলে।

'আজ পুষ্পের জনমের তিথি' কবির একটি সৌন্দর্যগীতি। কবিতাটিতে বসন্তকালীন প্রভাতে পুষ্পসমারোহের পটভূমিতে কবি প্রভাত-প্রকৃতির একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন! কবির রোমান্টিক মন উষাকালীন এক অতি সাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যকে কল্পনা-রঙিন করে একটা অসাধারণ মাধুর্য দান করেছে। স্বাভাবিক কবিত্বগুণে মণ্ডিত এ কবিতাটি আমাদের কাছে উপভোগ্য হয়েছে, একথা মেনে নিতে দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

আমরা এখানেই 'ধান-খেত' কাব্যের আলোচনা শেষ করছি। 'ধান-খেত' কাব্যে কবি 'সুদূর গাঁয়ের আশা-নিরাশার বেদনার সঙ্কেত' দিয়েছেন সন্দেহ নেই এবং তাই এ কাব্যের প্রধান বক্তব্য। একথা মেনে নিলেও বলতে হয় এটাই একমাত্র বক্তব্য নয়। কবি 'বালুচরে' প্রকাশিত রোমান্টিক প্রেম ও সৌন্দর্য-ভাবনার জের এখানেও টেনেছেন। সে ভাবনার প্রকাশ সর্বত্র সুন্দর না হলেও সেখানেও মাঝে মাঝে সার্থকতা দেখা দিয়েছে। জসীমউদ্‌দীন শুধু তাঁর পল্লীর প্রতিই যে নিবদ্ধদৃষ্টি একথা সত্যি নয়। তিনি যে আধুনিক

যুগের একজন রোমান্টিক কবি এবং তাঁদের মতই প্রেম ও সৌন্দর্যের ভাবনায় দোল খেয়েছেন, আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তাও সত্যি। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তিনি তেমন বিশিষ্ট নন—তিনি পূর্বসুরীদের পথই অনুসরণ করেছেন। বিশেষতঃ কাব্যসাধনার প্রথম পর্যায়ে তিনি রবীন্দ্র-নজরুলের প্রভাবের কথা নিজ জীবন-স্মৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গেও বলেছেন। তাঁর প্রেম ও সৌন্দর্য-ভাবনামূলক কবিতা 'তুমি আমাদের কবি' ও বন্ধু স্মৃতি-তর্পণ প্রচেষ্টামূলক কবিতা 'দিদারুল আলম স্মরণে' কবিতা দুটি তাঁর নিজস্ব কাল চেতনার স্বাক্ষর বহন করে। তিনি তাঁর কালের দিকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন এ অভিযোগ ধোপে টিকে না। তবে এটা সত্যি, পল্লী সব সময় তাঁর জীবনে কবিত্বশক্তির উদ্দীপনাকারী একটা বড় শক্তিরূপে কাজ করেছে। পল্লীকে তিনি দেখেছেন রোমান্টিক মন দিয়ে। তাই তো দুঃখ-দারিদ্র্য প্রপীড়িত পল্লীজীবনেও তাঁর পক্ষে অশেষ মাধুর্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কবিসুলভ সুগভীর অনুভূতি ও দরদের অধিকারী ছিলেন বলেই অবশ্য জসীমউদদীন অঙ্কিত পল্লীচিত্র এত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। তবে তাঁর অঙ্কিত পল্লীচিত্রগুলো আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার বিশেষ কোন ছাপ বহন করে না। তাঁর কবিতার প্রকাশভঙ্গি প্রায়শঃ বৈচিত্রহীণ, মাধুর্য যা কিছু তা হচ্ছে যথার্থ শিল্পীসুলভ শব্দ চয়ন, উপমা নির্বাচনের ক্ষমতায়। পল্লীর দুঃখ-দুর্দশার প্রতি একটি সচেতন সহানুভূতিসম্পন্ন মনের প্রকাশও লক্ষ্য করা যায় তাঁর পল্লীবিষয়ক অনেক কবিতায়। এক্ষেত্রেও আধুনিক কাল ছায়া ফেলেছে বলতে হবে। তবে 'ধান-খেত' শেষ পর্যন্ত কবি 'পল্লীর গোষ্ঠগৃহে' ফিরে যাওয়ার ব্যাকুলতাটিকেই যেন প্রকাশ করেছেন—'বালুচরে'। পরপর প্রকাশিত বলেই তা আরও বেশী সত্যি বলে মনে হয়।

রঙিলা নায়ের মাঝি

'ধান-খেত' কাব্যের পরেই প্রকাশিত হয় জসীমউদদীনের প্রথম গানের বই 'রঙিলা নায়ের মাঝি'। ইতিপূর্বে তিনি 'রাখালী', 'বালুচর', 'ধান-খেত', কাব্যে কিছু কিছু গান রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। বিশেষতঃ 'রাখালী'তে নানা সুরের গ্রাম্যগান রচনায় তিনি কিছুটা সার্থকতারও পরিচয় দিয়েছিলেন। 'রঙিলা নায়ের মাঝি'তে তাঁর সে সঙ্গীত রচনার ক্ষমতার স্ফূর্তি ঘটেছে। বইটিতে জসীমউদদীনের স্বরচিত ৩৪ টি ও সংগৃহীত ১৪ টি গ্রাম্যগান, মোট ৪৮ টি গান সঙ্কলিত হয়েছে। স্বরচিত গানগুলোর মধ্যে ৪ টি ইতিপূর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত। বাকি ৩০ টি নতুন সৃষ্টি। গুটি কয়েক আধুনিক গান ছাড়া সবগুলো গানই গ্রাম্য ভাষায় গ্রাম্যগানের সুরে লেখা। যে প্রেরণায় জসীমউদদীন গ্রাম্যজীবন ও প্রকৃতি নিয়ে কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, সে একই প্রেরণা কাজ করেছে এ গানগুলো রচনার বেলায়। কাব্যের ন্যায় গানেও জসীমউদদীন বাঙলাদেশের জনসাধারণের মনের ভাষাকেই ধরতে চেয়েছেন একান্ত করে। বইয়ের ভূমিকার বক্তব্যে এ ধারণারই সমর্থন মিলে। তিনি বলেছেনঃ—"বাঙলাদেশের জনসারণের মনের ভাষার সন্ধান করিতে আমি ১৪ বৎসর ধরিয়া বহু গ্রামে ঘুরিয়া নানা প্রকারের গ্রাম্যগান সংগ্রহ করিয়াছি, আমার এই গানগুলির রচনায় তাহার কিছু পরিচয় লইয়া সাধারণ পাঠক-সমাজে উপস্থিত হইলাম।" এ উক্তি থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, গ্রাম্যগানের মধ্যে জসীমউদদীন বাঙলাদেশের জনসাধারণের মনের

পরিচয়টিকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। সংগৃহীত গ্রাম্যগানগুলোই তাঁকে দিয়েছিল পথের সন্ধান। বস্তুতঃ গানের দেশ বাঙলাদেশের মনের পরিচয় রয়েছে এর পল্লীর লোকের মুখে মুখে প্রচলিত অজস্র গীতির মধ্যে। এ গানগুলোর মধ্যে জনসাধারণের প্রেম-ভালবাসা, বিরহ-বিচ্ছেদ,বেদনার কথা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে তাদের আধ্যাত্মিক আকুলতার পরিচয়। এমন করে সঙ্গীতের মধ্যে কোন জাতিই বোধহয় নিজের অন্তরকে মেলে ধরে নি। পল্লীগীতি-সংগ্রাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ পল্লীপ্রাণ জসীমউদদীন এ সত্যকে উপলব্ধী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই নিজেও পল্লীকবিদের সুরে সুর মিলিয়ে গান রচনা করতে কুণ্ঠিত হন নি। তাই বলে তাঁর গানগুলো গ্রাম্যগানের নিছক অনুকৃতি মাত্র নয় ; ভাবে, ভাষায়, সুরে গ্রাম্যগানের মূল বৈশিষ্ট্যটি রক্ষা করেও তা নতুন সৃষ্টির মহিমা লাভ করেছে। জসীমউদদীন একজন সচেতন শিল্পীর ন্যায় গ্রাম্যগান থেকে ভাবসংকেত গ্রহণ করে, ক্ষেত্র বিশেষে গ্রাম্যশব্দ, উপমা গ্রহণ করেও, ভাষার উপযুক্ত পরিমার্জন দ্বারা ঐগুলোকে উপযুক্ত কলাসম্মত রূপ দান করেছেন। তাঁর গ্রাম্যগান ভাষা ও ভাবের গ্রাম্যতা থেকে আশ্চর্য রূপে মুক্ত। সাধারণ গ্রাম্যগানের আঞ্চলিকতা দোষ অতিক্রম করে এ গান সর্বস্তরে মানুষের মনে মনে সংক্রমণ-প্রয়াসী। তথাপি গ্রাম্যগানের বিশেষত্বগুলো যথাসম্ভব বজায় রয়েছে তাঁর গানে এখানেই তাঁর গ্রাম্যগান রচনার সর্থকতা।

জসীমউদদীন পল্লীকাব্যের ন্যায় পল্লীগীতির ঐশ্বর্যের দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এ গানগুলোর মাধ্যমে। বস্তুতঃ বাঙলাদেরশের শিক্ষিত সমাজের বর্তমান লোকসঙ্গীত প্রীতির মূলে জসীমউদদীনের অবদান যথেষ্ট। তিনি অবহেলিত লোকসঙ্গীতের ঐশ্বর্যভাণ্ডার সর্বসমক্ষে তুলে ধরে মস্ত বড় একটা কাজ করেছেন। একদিকে পুরাতন গীতি সংগ্রহ করে, অপরদিকে নিজে ঐ ধরনের গান রচনা করে এক নতুন রসের প্রবাহ সৃষ্টি করলেন তিনি। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী আব্বাসউদদীন, বিনয় কৃষ্ণ ঘোষ ও হিমাংশু দত্ত প্রভৃতি তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এঁদেরই সক্রিয় সহযোগিতার ফলে জসীমউদদীনের গানগুলো আশ্চর্য জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়েছিল। এঁদের উদ্দেশোই তিনি বইটি উৎসর্গ করেছিলেন। জসীমউদদীনের নিজের কথাতেই প্রকাশ, এ ব্যাপারে তিনি শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণচন্দ্র দে, কুমার সচীনদেব বর্মণ প্রভৃতি অনেক সুন্দরপ্রাণ গায়কের নিকট বহুভাবে উৎসাহ পেয়েছেন। সমকালীন সঙ্গীত-শিল্পীদের এ আনুকূল্য জসীমউদদীনের সঙ্গীত রচনা প্রচেষ্টাকে সার্থকতা দানে যথেষ্ট কাজ করেছে।

বলা বাহুল্য গ্রাম্যগান রচনায় পল্লীকবিদের কাছে তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। তথাপি সেখানে তাঁর স্বকীয়তার পরিচয়ও বড় অল্প নয়। আমরা ইতিপূর্বেই তার আভাস দিয়েছি। বইয়ের ভূমিকায় পল্লীকবিদের কাছে তাঁর ঋণের কথা তিনি অকপটেই স্বীকার করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ—"পল্লীকবিদের রচিত কয়েকটি গ্রাম্যগানের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইন দুইটি গ্রহণ করিয়া আমি পরবর্তী পদগুলি নিজে রচনা করিয়াছি। গ্রাম্যকবিদের বাঁধা গানের ভিতর দিয়া আমি নিজের কথা বলিতে চেষ্টা পাইয়াছি। যে যে গানের পদ লইয়া আমি এরূপ করিয়াছি, তাহাদের কতগুলি আমি পুস্তকের শেষাংশে প্রকাশিত গ্রাম্যগান সংগ্রহগুলির মধ্যে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। ইহাতে পাঠক আমার রচনার সহিত পল্লীবাসীদের রচনার পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন।" বস্তুত ঃ জসীমউদদীনের নিজস্ব রচনা এ গ্রন্থের প্রথম গান 'আরে ও রঙিলা নায়ের মাঝি' এবং সংগৃহীত গ্রাম্যগানের সংগ্রহের ৩৫নং গান 'ও রঙিলা নায়ের মাঝি' পাশাপাশি রেখে বিচার করলে পল্লীগীতিকারের কাছে তাঁর ঋণের স্বরূপ এবং তাঁর নিজস্ব

বোঝা দুই-ই পরিষ্কার হয়ে ওঠে। পাঠকের সুবিধার জন্যে আমরা দুটি গানই উদ্ধৃত করছি ঃ প্রথমে জসীমউদ্‌দীনের রচনা, পরে পল্লীকবির রচনা ঃ—

॥ ১॥

"আরে ও রঙিলা নায়ের মাঝি।
তুমি এ ঘাটে লাগায়ারে নাও
লিগুম কথা কইয়া যাও শুনি।
তোমার ভাইটাল সুরের সাথে সাথে কান্দে গাঙের পানি,
ও তার ঢেউ লাগিয়া যায় ভাসিয়া কাজ্বের কলসখানি।
পূবালি বাতাসে তোমার নায়ের বাদাম ওড়ে,
আমার শাড়ির অঞ্চল ধৈরর্য না ধরে।
তোমার নি পরাণরে মাঝি হরিয়াছে কেউ,
কলসী ভাসায়া জলে গণেছ নি ঢেউ !"

॥ ২॥

"ও রঙিলা নায়ের মাঝি।
তুমি এই ঘাটে লাগায়ারে নাও
লিগুম কথা কইয়া যাও শুনি।
মাঝি পাগোল মাল্লা পাগল
পাগল নার ব্যাপারী,
চার পাগলে যুক্তি কইরা
ডুবায় সাধের তরী।
কাওয়া তো কান্ডারী লৌকার
শগুন ভান্ডারী,
বনের শৃগাল বলে
আমি এই লৌকার ব্যাপারী।"

উদ্ধৃত গান দুটোর প্রথম দু-তিন লাইনের মিল ও বাকি অংশের অমিল সাধারণভাবে জসীমউদ্‌দীন ও পল্লীকবিদের রচনার মিল ও পার্থক্যের দ্যোতনা করছে। জসীমউদ্‌দীন তাঁর রচনার সূত্র হিসাবে পল্লীকবির গীতি-পঙ্‌ক্তিকে আশ্রয় করেছেন কিন্তু পরে অনেকটা স্বাধীনভাবেই অগ্রসর হয়েছেন। ফলে প্রারম্ভিক মিল সত্ত্বেও গান দুটির বক্তব্য প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়েছে। পল্লীকবি 'রঙিলা নায়ের মাঝির' কাছে 'লিগুম' কথা শুনতে চেয়ে যে জবাব পেয়েছেন, তা 'লিগুম' কথাই বটে। অনেকটা হেঁয়ালিময় ভাষায় সে 'লিগুম' কথা ব্যক্ত হয়েছে ; তা বুঝতে হলে কিছুটা মগজ খাটাতে হবে বই কি ! এরূপ হেঁয়ালীময় ভাষায় বাউল-মুর্শিদরা নিজেদের আধ্যাত্মভাবনাকে প্রকাশ করে এসেছে। এর উপলব্ধির গভীরতা সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ নেই ! তবু তত্ত্ব-কন্টকিত এসব গানে কাব্য-মাধুর্য খুব বেশী পাওয়া যায় না। জসীমউদ্‌দীনের হাতে সেই একই জিজ্ঞাসা উৎকণ্ঠিত প্রেমের ঘনীভূত আবেগ রূপে প্রকাশিত হয়ে অসাধারণ কাব্য-মাধুর্য মন্ডিত হয়েছে। এ গান সহজেই আমাদের মন স্পর্শ করে। এতে আধ্যাত্মিক সুরের অনুরণন লক্ষ্য করা হয়ত অসম্ভব নয় তবুও তা শুধু তত্ত্বের আরবণে প্রকাশিত হয় নি। তত্ত্ব এখানে জীবনভাবনার সাথে মিশে গিয়েছে যেন। পল্লীকবির ভাষার আমেজ জসীমউদ্‌দীনের গানেও উপস্থিত, তবে

জসীমউদ্‌দীনের গানের ভাষায় সচেতন প্রযত্নের ছাপ আছে। কুশলী শিল্পীর হাতে তা অনেকটা মার্জিত ও সৌষ্ঠব-মন্ডিত হয়েছে। পল্লীকবির রচনায়, শব্দ যোজনায় যথেষ্ট অবিবেচনার পরিচয় রয়েছে; অনেক ক্ষেত্রে তা কিছুটা শালীনতা বর্জিতও বটে। কিন্তু জসীমউদ্‌দীনের ভাষা সর্বত্র সঙ্গতিপূর্ণ শালীন হয়েছে বলা চলে! অবশ্য গ্রাম্যগীতির স্বরূপ অনুধাবন করার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল বলেই জসীমউদ্‌দীন ভাষাভঙ্গির পরিমার্জন সত্ত্বেও তার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়েছেন।

গ্রাম্যগান রচনায় জসীমউদ্‌দীন যে অনেকটা স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার প্রমাণ মিলবে এর ভাষাভঙ্গিতেই। সকল গ্রাম্যগানই ভাষাভঙ্গিতে বিশেষভাবে আঞ্চলিকতা দুষ্ট। বিশেষ বিশেষ কথ্যভঙ্গিটি ঐ ঐ স্থানের গানের ভাষায় অনুসৃত হয়, ফলে বিশেষ অঞ্চলের বাইরে ঐ গানের আবেদন তেমন বেশী হয় না। গ্রাম্যকবিরা ভাষার এ সীমাবদ্ধতাকে মাঝে মাঝে কিছুটা অতিক্রম করতে পেরেছেন সন্দেহ নেই, তবু সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য কথ্যভাষায় গান রচনার আবশ্যকতা আছে—এমন চেতনা তাঁদের ছিল কিনা সন্দেহ। তাঁরা সহজ ভাষায় প্রাণের ভাবনাকে সুর দিতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু তা কতখানি জনমন স্পর্শ করতে পারবে, তার জন্যে হয়তো তেমন ভাবনা ছিল না তাঁদের। জসীমউদ্‌দীন কিন্তু পল্লীকবিদের ভাষা থেকেই সূত্র নিয়ে তাকে পরিমার্জিত করে পল্লীর এক সাধারণ সাহিত্যিক ভাষারূপ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এখানেই তাঁর বিশিষ্টতার পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বইয়ের ভূমিকায় এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ—"আমার রচিত গ্রাম্যগানগুলির বিষয়ে কিছু বলিবার আছে। আমি এই রচনা কার্যে কোন বিশেষ স্থানের কথ্যভাষা অবলম্বন করি নাই। বহুদিন গ্রাম্যগান সংগ্রহ করিয়া আমার একটা ধারণা হইয়াছে যে, গ্রাম্যকবিদের কাব্যরচনা করার একটা সাহিত্যিক-ভাষা আছে। এই ভাষার সহিত তাহাদের কথ্যভাষার যোগ থাকিলেও উহা কোন বিশেষ স্থানের খাঁটি কথ্যভাষা নয়। পান্থ, দীঘল, মনুয়া, মুনা, উঞ্চল, মাঞ্জা, লিলুয়া, মনপবন প্রভৃতি শব্দগুলি পল্লীগ্রামের সাহিত্যিক-ভাষায় ব্যবহৃত হয়। কথ্যভাষায় কেহ এই শব্দগুলি প্রয়োগ করে না। গ্রাম্যগানগুলির রচনায় আমি পল্লীগ্রামের এই সাহিত্যিক-ভাষা অবলম্বন করিয়াছি।" তাঁর ধারণা এর ফলে গানগুলো বাঙলাদেশের সকল জেলার লোকের কাছেই কতকটা বোধগম্য হবে।

বাঙলাদেশের নানা অঞ্চলের গানের ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে জসীমউদ্‌দীন গ্রাম্যগানের জন্য এক সাধারণ ভাষাসূত্র তৈরি করে গানগুলোর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রেখেও তাকে একটা সার্বজনীনতা দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। এর সার্থকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পেরেই বোধহয় তিনি বলেছেন ঃ—"এই গ্রাম্যগান রচনার ধারা আমার কাছে এখনও কতকটা পরীক্ষা-সাপেক্ষ।" তবে তিনি যে একটা মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই এ কাজে হাত দিয়েছিলেন, তাও ভূমিকার বক্তব্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বাঙলাদেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্যে 'একটা সাহিত্যের প্রয়োজন আছে' মনে করেই তিনি তাদের স্বভাবের ভাষায় এ গানগুলো রচনা করতে বসেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা যে যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করেছিল, তাঁর গানগুলোর অসাধারণ জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। তাঁর অনেক গান আজ বাঙলাদেশের লোকের মুখে মুখে প্রচলিত হয়েছে। অনেক সময় আমরা ভুলেই যাই যে, এগুলো জসীমউদ্‌দীনের রচনা, কোন পল্লীকবির রচনা নয়। ভাষাভঙ্গির বিলক্ষণ পার্থক্য সত্ত্বেও পল্লীকবিদের রচনার সাথে তাঁর রচনার এই একাত্মতা, তা-ই জসীমউদ্‌দীনের গানগুলোকে একটা স্থায়ী মূল্য দিয়েছে।

'রাঙলা নায়ের মাঝি' গীত সংকলনের অধিকাংশ গানই গ্রাম্যভাষায় রচিত সন্দেহ নেই। কিন্তু বেশ কিছু গানের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। সন্নিবিষ্ট গানগুলোর মধ্যে এমন কিছু গান আছে যেগুলো নিতান্ত আধুনিক ভাষায় রচিত, শুধু পল্লীগীতির সুরে ঐগুলো গাওয়া হয় বা চলে, এ যুক্তিতে কবি এদের গ্রাম্যগানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার কিছু কিছু গান রয়েছে যা আদপেই পল্লীগীতি নয় ; ভাষায়, সুরে একবারেই আধুনিক গান পদবাচ্য। তবু তা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কবির স্বরচিত ৩৪ টি গান ছাড়াও 'গ্রাম্যগান সংগ্রহ' পর্যায়ে ১৪টি গান এই বইয়ে সংযোজিত হয়েছে। সংগৃহীত গানগুলো সম্পর্কে আমাদের বিশেষ বক্তব্য নেই ; আমাদের যা কিছু বক্তব্য কবির ঐ স্বরচিত গানগুলো সম্পর্কে। সংগৃহীত গানগুলো সম্পর্কে ভূমিকায় কবি বলেছেন ঃ—"বাঙলাদেশের নানা স্থান হইতে গানগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। উহাদের চয়নে সাহিত্যিক নৈপুণ্যের চাইতে সুর-বৈচিত্র্যের দিকই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যাহারা গ্রাম্যগান শিখিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট এগুলি কাজে আসিবে।" এর বেশি আমাদেরও বলার নেই। গ্রাম্যগানের বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে চান যাঁরা অথবা যাঁরা গ্রাম্যগান শিখতে ইচ্ছুক তাঁদের পক্ষে এগুলো যথেষ্ট মূল্যবান সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। কবির স্বরচিত গান সম্পর্কে কবির বক্তব্য এই যে, তিনি দীর্ঘকাল ধরে দেশের জনসাধারণের মনের ভাষার সন্ধান করতে গিয়ে যে গ্রাম্যগান সংগ্রহ করেছেন, তারই পরিচয় গানগুলোর মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করেছেন। অর্থাৎ তিনি পল্লীগীতিগুলোর মধ্যে জনসাধারণের মনের যে সন্ধান পেয়েছেন তাকেই তাদের ভাষায় এই গানগুলোর মধ্যে তুলে ধরেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক ভাষার আশ্রয়ে জীবনের ঐ সুরটিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। সকল রচনাই যে সার্থক এমন দাবি তিনি করেন নি। তিনি আপন রচনার ত্রুটি নির্দেশ করে বলেছেন ঃ—"কোন কোন গানের রচনাকার্যে ভুল রহিয়াছে, শব্দযোজনায় অবিবেচনার পরিচয় আছে। তবু সুরের জন্য সেগুলিকে প্রকাশ করিতে হইল।" নিতান্ত আধুনিক পদবাচ্য কয়েকটি গান নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবেই এ গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। তার যে কারণ কবি নির্দেশ করেছেন সেটা নিতান্তই বৈষয়িক। তথাপি একথা বেশ জোরের সাথেই বলা যেতে পারে, জসীমউদ্‌দীনের স্বরচিত গানগুলোর সাহিত্যিক-মূল্য তাঁর সংগৃহীত গানগুলো থেকে অনেক বেশি। স্বাভাবিক কবিত্বের স্পর্শে তাঁর গানগুলো সাধারণ পল্লীগীতির চেয়ে অনেক বেশি মাধুর্যমণ্ডিত হয়েছে।

'রঙিলা নায়ের মাঝি' গ্রাম্যগানের ভাব-ঐশ্বর্য ও রূপ-বৈচিত্র্যকে তুলে ধরেছে আমাদের সামনে। গ্রাম্য নর-নারীর ঐহিক ও আধ্যাত্মিক সকল ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে এ গানগুলোতে। আর সে গানের সুর-বৈচিত্র্য রীতিমত বিস্ময়কর। মুর্শিদা, ভাটিয়ালী, আধুনিক-ভাটিয়ালী, বাউল, বাউল-ভাটিয়ালী-মিশ্র, বারমাসী, বিয়ের গানের সুর, রাখালী, বিচ্ছেদগান, মুর্শিদা-রাখালী, মিশ্র-রাখালী, ও বিচ্ছেদগানের মিশ্র, মাইজভাণ্ডারী ভাটিয়ালী মিশ্র, গাজীর গানের সুর, সারি-বিচ্ছেদ মিশ্র, ভাওয়াইয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিশুদ্ধ ও মিশ্র সুরের গানের সমাবেশ ঘটেছে বইটিতে। আর তাতে সুর সংযোগ করেছেন আব্বাসউদ্‌দীন আহমদ, গিরীন চক্রবর্তী, শচীনদেব বর্মণ, গোপালী বালা, কুমুদেশ সেন, বিমল মিত্র, কল্যাণী সেন, ভবানী দাস, নমিতা রায়চৌধুরী, উমা বসু (হাসি) প্রমুখ বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীরা। প্রাণমাতান এসব গান গ্রাম্যগানের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে স্বীকার করতেই হয়। আব্বাসউদ্‌দীনের কণ্ঠে গীত—'আরে ও রঙিলা নায়ের মাঝি', 'উজান গাঙের নাইয়া', 'নদীর কূল নাই, কিনারা নাইরে', 'ওরে আমার গহীন গাঙের নাইয়া', 'আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না', গানগুলো কে না শুনেছে? অথচ এসব যে

জসীমউদ্‌দীনের রচনা তার খবর ক'জন রাখেন? অবশ্য মাঝে মাঝে কোন কোন সংগৃহীত গানও জসীমউদ্‌দীনের রচনা বলে গ্রামোফোন কোম্পানী রেকর্ড করেছে—এটা ভুল হয়েছে বলেই ধরতে হবে। এ সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীন নিজে 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের ভূমিকায় আপন অসহায়তার কথা ব্যক্ত করেছেন। তবু জসীমউদ্‌দীনের নিজের রচনার গৌরব কম নয়। গিরীন চক্রবর্তীর কণ্ঠে গীত 'সামাল সামাল ডুবল তরী', কুমার শচীনদেব বর্মণ কর্তৃক গীত 'নিশিতে যাইও ফুল বনে' এবং কুমারী উমা বসুর (হাসি) কণ্ঠে গীত 'আমি কেনে বা পিরীতি রে করলাম' ইত্যাদি গান বহু পরিচিত। এ সকল গান জসীমউদ্‌দীনকে গান রচয়িতা হিসেবে বিশেষ একটা প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

এবার 'রঙিলা নায়ের মাঝি' বইতে সঙ্কলিত গানগুলোর শ্রেণীবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাক। 'এল ঘুম ভাঙানিয়া', 'বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়েছে', 'সোনার বরণী রাণী', 'ওরে আয় আয় আয়', 'অলস আবীর কে দিল ঢালিয়া', 'ওই চরে বাঁধি ঘর' ইত্যাদি গান ভাব ভাষায় আধুনিক পদবাচ্য। এসব গানে বেশ কিছুটা কাব্য-মাধুর্য সঞ্চারিত হয়েছে। গানগুলোতে প্রেম-সৌন্দর্য ব্যাকুল কবিচিত্তেরই যেন প্রকাশ ঘটেছে। কবির রোমান্টিক মনের ছাপটি এসব ক্ষেত্রে স্পষ্ট। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি যেমন পারিপার্শ্বিককে কাব্য-ভাবনার অনুসঙ্গ করে নিয়েছেন, এখানেও তাই লক্ষ্য করি। ভাবব্যাকুল রূপমুগ্ধ উদাস কবিচিত্তের ছাপ পারিপার্শ্বিককে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রসিক পাঠক গানগুলো পড়ে ও শুনে নিশ্চয় এ সত্য উপলব্ধি করবেন।

কবির রচিত অন্যান্য গানের মধ্যে বিশুদ্ধ মুর্শিদা গান রয়েছে ৫ টি ও মুর্শিদা-রাখালী মিশ্রসুরে রচিত গান ১ টি, বিশুদ্ধ বাউলগান রয়েছে ২ টি এবং বাউল-ভাটিয়ালী মিশ্র সুরের কবিতা রয়েছে ১ টি। বাউল গান দুটি নিতান্ত আধুনিক ভাষায় লিখিত, তাতে কবির রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। তবু গ্রাম্যগানের সুরেই এ গান গাওয়া হয়েছে। বাউল-মুর্শিদা গানগুলো মূলতঃ একই প্রকারের গানের স্তরভেদ মাত্র। এসব গানের মধ্যে বাঙালীর আধ্যাত্মিক আকুলতাই বার বার প্রকাশ পেয়েছে। বৈষ্ণব ও সুফী সাধকদের প্রেম সাধনার প্রভাব বাউল-মুর্শিদা গানগুলো মূলতঃ একই প্রকারের গানের স্তরভেদ মাত্র। এসব গানের মধ্যে বাঙালীর আধ্যাত্মিক আকুলতাই বারবার প্রকাশ পেয়েছে। বৈষ্ণব ও সুফী সাধকদের প্রেমসাধনার প্রভাব বাউল-মুর্শিদা গানগুলোতে বেশ লক্ষ্য করা যায়। কৌতূহলী পাঠক বাউলগান সম্পর্কে বিস্তৃত খবর পেতে পারেন ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল' নামক বিশাল গ্রন্থে। বাউল ও মুর্শিদা গানে বাঙলাদেশের হিন্দু-মুসলমান সকল ভেদাভেদ ভুলে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছে—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরাণ-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি।" বাঙলার অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে সমন্বয় সাধক এ বাউলদের বৈশিষ্ট্য স্মরণ করবার মত। বাঙলাদেশের লোকসংগীতের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে এ বাউলগান। বাউলের 'মনের মানুষই' মুর্শিদা গানে গুরু পীর বা মুর্শিদ রূপে আখ্যাত হয়েছে। বাউল-মুর্শিদা গানের ইতিহাস বাঙালীর ধর্মসাধনার একটা ধারার সাথেই যুক্ত। গানগুলোতে ভক্তপ্রাণের প্রেম-ব্যাকুলতা প্রবল ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের স্বরূপ, পরিণাম ইত্যাদি সম্পর্কে দার্শনিক জিজ্ঞাসা ব্যক্ত হয়েছে। এ গানগুলোর প্রাণ আকুল করার ক্ষমতা অসাধারণ। বিশিষ্ট শিল্পীকণ্ঠে গীত জসীমউদ্‌দীনের মুর্শিদা গান 'আরে ও রঙিলা নায়ের মাঝি', 'নদীর কূল নাই, কিনার নাইরে', 'আমি কেনে বা পিরীতিরে করলাম' ইত্যাদি কে না শুনেছে? এদের আবেদন যে কিরূপ ব্যাপক তাতো কারও অজানা নয়। জসীমউদ্‌দীন বিরচিত 'বালুচরের

মেয়ে', 'সন্ধ্যাবতীর দেশে' বাউল গান দুটির ভাষা নিতান্ত আধুনিক বলেই বাউল গানের স্বাভাবিক সৌন্দর্য এতে আবিষ্কার করা যায় না। তবে সুর করে গাওয়া হলে, বাউল গানের মাধুর্য এসবেও অনুভব করা সম্ভব। বাউল-ভাটিয়াল মিশ্র সুরে রচিত তাঁর 'সামাল সামাল ডুবল তরী' গানটি কিন্তু আশ্চর্যরূপে সার্থক। এরপর আসে ভাটিয়াল সুরের গানের কথা—ভাটিয়াল সুরের গানেই বোধহয় নদী-বাঙলার মানুষের প্রাণের সুরটি ধরা পড়েছে সবচেয়ে সার্থকভাবে। ভাটিয়ালী গানে আধ্যাত্মিকতা দেখা দিয়েছে বটে, তবু এতে পল্লী নর-নারীর প্রেমের সুরই যেন প্রধানতঃ বিরহের তারে বেজে ফিরছে অনুক্ষণ। বড় উদাস আকুল করা সুর এ ভাটিয়ালীর। এ সুর যেন নদী-বাঙলার দিক-দিগন্তে, আকাশে-বাতাসে, নদীর স্রোতের সাথে মিশে আছে। ভাটিয়ালী গান রচনায় জসীমউদ্‌দীনের খ্যাতি বোধহয় সর্বাধিক। পল্লীর ভাটিয়ালী গান আজ শহরের মানুষের কাছেও খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে ভাটিয়ালী গানের সহজ সুরটি অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছে—গ্রাম্যভাটিয়াল ভাষা ও সুর পরিমার্জিত হয়ে অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক ভাটিয়াল রূপে দেখা দিয়েছে।

জসীমউদ্‌দীনের রচিত পাঁচটি ভাটিয়াল গান এ সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। 'উজান গাঙের নাইয়া', 'ও আমার গহিন গাঙের নাইয়া', 'গাঙের কূলরে গেল ভাঙিয়া', 'আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না', 'ও বাদীয়া ! সমুখেতে দোলেরে তোর' গানগুলো সমধিক জনপ্রিয়। কোন কোন গানের সুর 'আধুনিক ভাটিয়াল' বলে উল্লেখিত হয়েছে। ভাটিয়াল সুর মাঝে মাঝে অন্য সুরের মিশ্রণে নতুন রূপ লাভ করেছে অনেক ক্ষেত্রে। এ প্রসঙ্গে বাউল-ভাটিয়াল মিশ্র সুরের গান—'সামাল সামাল ডুবল তরী'র কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর একটি উল্লেখযোগ্য মিশ্র সুরের গান হচ্ছে 'নিশিতে যাইও ফুল বনে'। এটি আশ্চর্যরূপে জনপ্রিয় হয়েছে। এটি মাইঝভান্ডারী ও ভাটিয়াল মিশ্র সুরে গাওয়া হয়েছে। এ সব গানের মাধুর্য শুধু 'গান' পড়ে বোঝা যাবে না, শিল্পীকণ্ঠে গীত হলেই এদের মাধুর্য পূর্ণরূপে প্রকটিত হয়।

এ গীত সঙ্কলনের অন্যান্য গানের মধ্যে রয়েছে বারমাসীর সুরে রচিত একটি গান—'ফুল যদি হইতাম বন্ধু'। বারোমাসী বা বারমাস্যা গানে প্রধানতঃ বিরহিনী নারীর বিরহেরই আর্তি প্রকাশ পায়। আলোচ্য গানটিতে সে প্রকাশ হৃদয়স্পর্শী হয়েছে। বন্ধুর বিচ্ছেদ বা বিচ্ছেদগান জাতীয় রচনা রয়েছে ৭ টি ! তাছাড়া রাখালী ও বিচ্ছেদ মিশ্র সুরের একটি গান আছে। গানগুলোর প্রথম কলি হচ্ছে যথাক্রমে 'আমার বন্ধু বিনোদিয়া', 'ও প্রাণ বন্ধুরে', 'ও মোহন বাঁশী', 'পোড়ার মুখী রাধা লো', 'বদল বাঁশী ওরে বন্ধু', 'ও মোরে কান্দালি', 'ও তুই যারে আঘাত হানলি রে মনে', 'আমার প্রাণ কান্দে তার রূপ হেরে'। এ গানগুলোতে প্রিয়-বিচ্ছেদের দুঃখ-জ্বালা ব্যক্ত হয়েছে। এ জাতীয় গানে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার বিচ্ছেদ-বেদনার সুরটির প্রতিধ্বনি প্রায়শঃ শোনা যায়। এ গ্রন্থে রাখালী গান স্থান পেয়েছে একটি—তার প্রথম কলি হচ্ছে 'রজনী হইয়াছে বাসি'। আবার মুর্শিদা-রাখালী মিশ্র সুরের একটি এবং রাখালী ও বিচ্ছেদ মিশ্র সুরের একটি করে গান স্থান পেয়েছে। তাদের প্রথম কলি হচ্ছে যথাক্রমে 'দেখলাম পথ ধারে কে সজনি' ও 'আমার প্রাণ কান্দে তার রূপ হেরে'। 'রাখালী' গানেও প্রেমের বেদনাই যেন দীর্ঘ নিঃশ্বাস হয়ে ঝরে পড়ে।

পল্লীরাখালের বে-বুঝ বাঁশীর সুরে, পল্লীর নির্জন প্রান্তরে, নদীকূলে এ গান যেন যথার্থ মুক্তিলাভ করে। এ জাতীয় গানেও বৃন্দাবন গীতিকার প্রভাব খুবই লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া বিয়ের গানের সুরে রচিত একটি এবং গাজীর গানের সুরে রচিত একটি গান এ সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। বিয়ের গানের সুরে রচিত 'ওলো সোনার বরণী' গানটি রূপক নাটিকা রূপেও চিহ্নিত হয়েছে। এতে এক পল্লীবালার ও সিঁদুরের বেসাতিতে রত বেণে—উভয়ের প্রতি

প্রণয় সঞ্চারের সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছে। এ গানটিই রাখালীতে 'সিঁদূরের বেসাতি' শিরোনামায় স্থান পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা 'রাখালী' প্রসঙ্গে করা হয়েছে। গাজীর গানের সুরে রচিত 'ও তুমি কাইন্দ না' গানটিতেও বিচ্ছেদ-বেদনাই মৃত্যুর কারুণ্যে সিক্ত হয়ে উঠেছে। এ সকল গানের মধ্য দিয়ে বাঙালী 'মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি' সবই খুলে দিয়েছে। এমন করে গানে গানে নিজেকে উজার করে দিতে বাঙালীর দোসর বোধহয় পৃথিবীতে নেই।

আগেই বলেছি, স্বরচিত ৩৪ টি গান ছাড়া গ্রাম্যগান সংগ্রহের নমুনাস্বরূপ বিভিন্ন ধারার ১৪টি গানও এ সঙ্কলনে সংযোজিত হয়েছে। এদের মধ্যে মুর্শিদা ও মুর্শিদা-ভাটিয়াল মিশ্র সুরের গান ৩ টি, বাউল গান ২টি, ভাওয়াইয়া বা রাখালী ৪টি, বিচ্ছেদগান ও বিচ্ছেদ সারি মিশ্র সুরের গান ৩টি, বিয়ের গানের সুরে রচিত গান ২টি। জসীমউদ্‌দীন এসব গ্রাম্যগীতিকেই সামনে আদর্শ রেখে নতুন গ্রাম্যগান রচনা করেছেন। তিনি গ্রাম্যগানের আদল বজায় রেখে আপন উচ্চস্তরের কবিত্ববোধ ও ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে তাকে নতুন মহিমা দানে সক্ষম হয়েছেন। ক্ষেত্র বিশেষ তিনি গ্রাম্যগানের দু'একটি পংক্তিকে ভাবসূত্র হিসেবে গ্রহণ করে গ্রাম্য-ভাষায় নিজ কল্পনা দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণ নতুন গান সৃষ্টি করেছেন। কোথাও বা গ্রাম্য-গানের সুর প্রয়োগে অতি আধুনিক ভাষার গান রচনা করেছেন। কোথাও বা গ্রাম্যগানের বিশেষ স্বভাবটিকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এ সাধনায় সার্থকতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। খাঁটি গ্রাম্যগানের যে নমুনাগুলো তিনি এখানে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, এর পাশাপাশি তাঁর স্বরচিত গানগুলোকে রেখে বিচার করলে তাঁর গানের উৎকর্ষ কোথায় বেশ বোঝা যাবে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, তাঁর গানের বক্তব্য অনেক বেশী সঙ্গতিপূর্ণ, তাঁর ভাষা অনেক বেশী মার্জিত এবং তাঁর গান কাব্যমাধুর্যে অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহী। মোট কথা গ্রাম্যভাষায় লেখা তাঁর গানগুলোতে সচেতন শিল্পীহস্তের স্পর্শ অনুভব করা যায়। গ্রাম্যগান সংগ্রহ করে ও গ্রাম্যভাষায় গান রচনা করে তিনি আমাদের দৃষ্টি বিগতশ্রী পল্লীজীবনের দিকে নতুন করে আকর্ষণ করেছেন। পল্লীজীবন ও প্রকৃতি নিয়ে কাব্যসাধনা করে জসীমউদ্‌দীন আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে যে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, গ্রাম্যগান লিখে তিনি সে সাধনারই পরিপোষকতা করেছেন। এদের ভিতর দিয়ে তিনি দেশের চিত্তের সাথে যোগ স্থাপনে সমর্থ হয়েছেন।

'রঙিলা নায়ের মাঝি', গীতি সঙ্কলনটি সার্থকনামা। প্রথম গানটি ঐ 'রঙিলা মাঝি'কে আহ্বান করেই শুরু হয়েছে। ক্রোড়পত্রে সন্নিবেশিত 'নাও আনরে ভাই' গাটিও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ 'নায়ে'ই কবি আমাদের জন্য গ্রাম্যগানের 'হিরামন-মাণিক্কির বেসাত' বহন করে এনেছেন। শুধু তাই নয়, যেখানে 'কাজেখর কলসীর ঘায় যমুনা উজায়রে' সেই চিরপ্রেমের রাজ্যের বার্তাও এনে দিয়েছেন। নদীর দেশ বাঙলাদেশে 'নায়ের মাঝি' আমাদের জীবনে আশার বার্তাবাহী রূপেই প্রতিভাত হয়েছে যুগে যুগে। তাকে উদ্দেশ্য করে প্রেমিকা নারী দয়িতের উদ্দেশ্যে নিজের বিরহ-ব্যথা নিবেদন করেছে, ঈশ্বরভক্ত তাকে সংসার সাগরের কাণ্ডারীর প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তারই উদ্দেশ্যে হৃদয়-ব্যাকুলতা নিবেদন করেছে! নানা রঙে, নানা রূপে সে দেখা দিয়েছে নর-নারীর মনে। কবি সেই 'রঙিলা নায়ের মাঝি'কে আহ্বান করেই তার নৌকাতেই বুঝিবা আপন গানের পসরা তুলে দিতে চেয়েছেন! তাঁর সে কামনা পূর্ণ হয়েছে বলতে হয়। 'রঙিলা নায়ের মাঝি' তাঁর সে গানকে কাল-নদীর পরপারে পৌঁছে দেবে তা সুনিশ্চিত।

সোজন বাদিয়ার ঘাট

জসীমউদ্‌দীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। 'বালুচর'; 'ধান-খেত' ও 'রঙিলা নায়ের মাঝি'র বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর কবি 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র পথে আবার ফিরে এলেন 'নক্‌সী কাঁথার' কাহিনীকাব্য বা কাব্যোপন্যাসের জগতে। যে পল্লীজীবন তাঁর কাব্যসাধনার শুরু থেকেই নানা খণ্ড ক্ষুদ্র দৃশ্যে, গানে, কাহিনীতে আপন প্রকাশ খুঁজে ফিরছিল, তা প্রথম আপন সমগ্রতায় ধরা দিয়েছিল 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্যে। কি এক যাদুর বলেই যেন অজস্র খণ্ড ক্ষুদ্র জীবনদৃশ্য এক অখণ্ড জীবনপ্রবাহে বিধৃত হয়ে অসামান্য সৌন্দর্য ও মাধুর্য নিয়ে দেখা দিয়েছিল আমাদের চোখে। শত তুচ্ছতা ও দৈন্য নিয়েও পল্লীপ্রকৃতি এবং জীবন যে কত বিচিত্র, প্রাণের ঐশ্বর্যে কত সমৃদ্ধ তা যেন আমরা নতুন করে আবিষ্কার করলাম। সেই প্রথম আমরা লক্ষ্য করলাম জসীমউদ্‌দীনের ঔপন্যাসিকোচিত সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে জীবনচিত্র অঙ্কনের ক্ষমতা। কবির মধ্যে ঔপন্যাসিকের প্রতিভার স্ফুরণ জসীমউদ্‌দীনকে দান করল মহত্তর শিল্পীর মর্যাদা—আমরা আবিষ্কার করলাম, মানব চরিত্রে তাঁর কি সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, নর-নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের কি আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর, কত তীক্ষ্ম তাঁর সমাজ বাস্তবের চেতনা, কত সমৃদ্ধ তাঁর পল্লীপ্রকৃতি ও জীবনের অভিজ্ঞতার পুঁজি, কত সহজে বুনতে পারেন তিনি কাহিনীর জাল এবং কেমন অবলীলাক্রমে তুচ্ছ পল্লীদৃশ্যকে তিনি পারেন আকর্ষণীয় করে তুলতে। পল্লীকিশোর ও কিশোরীর অপরাজেয় প্রেমের আলেখ্য 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' সেদিন কবি ও ঔপন্যাসিকের শিল্পীসত্তাকে নিংড়িয়ে পুষ্টিলাভ করেছিল বলেই, সকল স্তরের পাঠক-পাঠিকার মনে সুতীব্র আলোড়ন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। বস্তুতঃ 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' নাগরিকতার ধূম্রজালে সমাচ্ছন্ন সেদিনকার মানুষের কাছে এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা রূপেই প্রতিভাত হয়েছিল। তাই প্রত্যাশা জেগেছিল রসিক মনে ঐ ধরনের আরও সুন্দর সুন্দর চিত্রের জন্যে। শহরের ইটকাঠের বেষ্টনীর বাইরে প্রকৃতির কোলে যে সবুজ, তাজা প্রাণের খেলা চলছে তার মধ্যে নতুন করে জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে এমনি একটা ভরসাও জেগেছিল পাঠক-মনে। কিন্তু সহসা 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে'র ন্যায় সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি ঘটল না। কবির মন হল নানা ভাবনায় বিক্ষিপ্ত, জীবন-দৃষ্টিতে এল কেমন একটা আচ্ছন্নতা। কখনও তিনি প্রেম ও সৌন্দর্যের আদর্শের অনুধ্যানে ব্যর্থতাজনিত নৈরাশ্য ও হতাশাবোধে জর্জরিত হয়ে জীবনে 'বালুচরে'র ঊষরতা প্রত্যক্ষ করেছেন, আবার কখনও 'ধান-খেতে'র শ্যাম বিস্তারে পল্লীর 'আশা নিরাশার বেদনার সংকেত' পেয়ে তার মায়াময় স্মৃতি রোমন্থনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। পরক্ষণেই কিসের প্রেরণায় যেন গানের 'রঙিলা নায়ের মাঝি' হয়ে নানা ভাবনা অনুভূতির মণি-মাণিক্য নিয়ে জীবনের ঘাটে ঘাটে ফিরেছেন। কিন্তু 'নক্‌সী কাঁথার' প্রাণ-প্রাচুর্য ও হৃদয়-ঐশ্বর্যের আকর্ষণকে তিনি কখনই কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাই তো 'রঙিলা নায়ের মাঝি'র যাত্রা 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে' এসে শেষ হল। কবি আবার আমাদের নতুন করে প্রেম-ভালবাসা, দুঃখ-ব্যথা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ জীবনের আস্বাদন দিতে সংকল্প করলেন ; এক অখণ্ড জীবন-প্রবাহের জটিল আর্বতের ছবি তুলে ধরলেন আমাদের সামনে। এতে করে কবির ভক্ত পাঠকমণ্ডলীই শুধু তৃপ্তি পান নি; কবি নিজেও বোধহয় কম খুশী হন নি।

বস্তুতঃ 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে'র জীবন-চেতনারই সার্থক উত্তরণ ঘটেছে। দুই কাব্যের কাহিনী পরিকল্পনা ও রচনারীতি আশ্চর্য রকমের সৌসাদৃশ্য

এবং লেখকের জীবন দৃষ্টির সঙ্গতি আমাদের ঐ ধারণাকেই সমর্থন করে। উভয় ক্ষেত্রেই জসীমউদ্‌দীন ঔপন্যাসিকের সুতীক্ষ্ণ বাস্তব দৃষ্টির ও সমৃদ্ধ জীবনাভিজ্ঞতা, চিত্রশিল্পীর অপূর্ব রেখাঙ্কন নৈপুণ্য এবং কবির প্রেমসুন্দর হৃদয় ও বলিষ্ঠ কল্পনা-শক্তি নিয়ে দেখা দিয়েছেন। সৃষ্টি মাহাত্ম্যে দুই গ্রন্থই তাই সার্থকতার দাবিদার । তবে এ কথা স্মরণ রাখা ভাল যে, 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' শেষ পর্যন্ত আপন আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র সৃষ্টির মহিমা লাভ করেছে। কাব্যবস্তুর যথেষ্ট মিল সত্ত্বেও দুই কাব্যের ফলশ্রুতি প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন এমন হল, তার উত্তর কাব্য দুটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। দুইয়ের সমাজ পারিপার্শ্বিকের মৌল পার্থক্য, বিশেষতঃ 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র কাব্যে বর্ণিত সাম্প্রদায়িক চেতনায় বিখণ্ডিত সামাজিক জটিলতা থেকে মুক্ত 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্য থেকে পৃথক করে তুলেছে। পরস্পর বিরোধী সমাজশক্তির জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে' প্রেমচিত্রকে অনেকটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে ; পক্ষান্তরে 'নক্‌সী কাঁথরা মাঠে' প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রেমই কথা বলে চলেছে। সমাজ এখানে পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সস্নেহ দৃষ্টিতেই যেন প্রেমকে প্রত্যক্ষ করেছে। 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে' কবির দৃষ্টি প্রেমকে আশ্রয় করেও শেষ পর্যন্ত সমাজের প্রতিই যেন নিবদ্ধ হয়েছে। অপেক্ষাকৃত পরিণতবুদ্ধি কবির জীবনাভিজ্ঞতার স্বাভাবিক উত্তরণই আমরা লক্ষ্য করি 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে। সীমবদ্ধ সামাজিক পরিসরে প্রায় সরলরেখার প্রলম্বিত 'নক্‌সী কাঁথার' প্রেমচিত্রের পরে 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র সাম্প্রদায়িক চেতনা বিখণ্ডিত সমাজের নর-নারীর গণ্ডী অতিক্রম প্রয়াসী প্রেমের জটিল রূপের ছবি আঁকবার চেষ্টা কবির জীবনদৃষ্টির প্রসারকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। ঐ উপলক্ষে কবি হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও তার পেছনে ক্রিয়াশীল অশুভ সমাজশক্তির যে রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন, তাও কবির পরিণত জীবনাভিজ্ঞতা ও বাস্তব দৃষ্টিরই পরিচয় বহন করে।

'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা থেকে দুই কাব্যের মিল ও প্রকৃতিগত পার্থক্য যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি কবির জীবনাভিজ্ঞতার ক্রমোদ্বর্তনের স্বরূপটিও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের যথার্থ মূলায়ন ও মাধুর্য অনুধাবনের জন্যে তাই 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে'র প্রসঙ্গটি স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। দুই কাব্যেই বাস্তব সামাজিক পটভূমিতে গ্রাম্য নর-নারীর হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি প্রেম-ভালবাসার উন্মেষ, ক্রম-পরিণতি ও পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। দুই কাব্যেরই সমাপ্তি ট্র্যাজেডির কারুণ্যে নিষিক্ত। অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা নিয়েই নর-নারীকে অকালে বিদায় নিতে হয়েছে পৃথিবী থেকে। দুই কাব্যেই যেন আমরা বঙ্কিম কথিত 'বাল্য প্রণয়ের' অভিশাপ প্রত্যক্ষ করি। নৈসর্গিক নিয়মেই প্রেম দেখা দিয়েছিল এঁদের জীবনে, এ প্রেম যৌবনে উপনীত নর-নারীর ক্ষণদর্শনের মোহজাত নয়। তার আবির্ভাব এদের জীবনে ঘটেছে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, কেউ জানতে পারে নি কখন তারা পরস্পরের এত নিকট হয়ে গেল। তাদের জীবনে চিরবিচ্ছেদ নিয়ে এল যে শক্তি তাও বাইরের শক্তি, হৃদয়ের দিক থেকে তারা শেষ পর্যন্ত পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্তই ছিল। সেই বাইরের শক্তি এক ক্ষেত্রে গ্রাম্য-দাঙ্গার রন্ধ্রপথে দেখা দিয়েছে, অন্য ক্ষেত্রে প্রতিবাদী সমাজের ক্রূঢ় অসহিষ্ণু হিংস্রতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দুই কাব্যের কলাকৌশলেও লক্ষণীয় ঐক্য দেখা যায়। দুই কাব্যে কবি গ্রাম্যগীতি-গাথা থেকে ভাববীজ সংগ্রহ করে, পল্লীকাব্যে ব্যবহৃত শব্দ, উপমা ও কাব্যপংক্তির সাহায্য নিয়ে, গ্রাম্যকবিতার ছন্দভঙ্গিকে যথাযথ মূল্য দিয়ে গ্রাম্য নর-নারী চরিত্র অবলম্বনে সৃষ্ট কাব্যে পল্লীকাব্যের যথার্থ আমেজটি সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। দুই

কাব্যের প্রতি অধ্যায়ের শীর্ষদেশে তাৎপর্যপূর্ণ কাব্য, ছড়া, প্রবাদ অথবা গীতিপংক্তির উদ্ধৃতি গঠনভঙ্গির সাদৃস্যকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

তথাপি দুই কাব্যের পার্থক্য বড় অল্প নয়। একটু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই এদের ভেতরকার পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুই কাব্যেই সামাজিক পটভূমিতে প্রেমচিত্র অঙ্কিত হলেও, তা সমান মহিমা লাভ করে নি। 'নকসী কাঁথার মাঠে' প্রেমভাবনাই মুখ্য, সমাজচিত্র আনুষঙ্গিক মাত্র ; 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে দুইই পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। আপাততঃ প্রেমচিত্রই কবির লক্ষ্য হলেও সমাজশক্তি মাঝে মাঝে প্রেমকে ছাপিয়ে উঠেছে তার বিচিত্র জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। 'নকসী কাঁথার' সমাজ বিশেষ সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে চিহ্নিত—সেখানে প্রেম আপন প্রকাশের পথে সমাজের অনুকূল্য পেয়ে অনেকটা সহজ সাফল্যের অধিকারী ; 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে' পরস্পর বিরোধী জনগোষ্ঠীর দুটি নর-নারীর প্রেম সমাজের ক্ষমাহীন আক্রোশ ও বিরোধিতায় সদা সন্ত্রস্ত। সমাজ এখানে পাষাণ প্রাচীরের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে দুটি নর-নারীর মাঝখানে। দুঃসাহসিক প্রেম সে বাধাকে অতিক্রম করতে গিয়ে আপন ট্র্যাজেডিকে সেখানে অনিবার্য করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, প্রেমের এ অসামাজিক আচরণ উপলক্ষ্য করে দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যে ঘৃণা ও মনোমালিন্য সঞ্চারিত হয়েছে, কুচক্রী জমিদার, মহাজন প্রভৃতি শোষকশ্রেণীর প্রতিভূ নায়েবের উস্কানিতে তা শেষ পর্যন্ত সর্বনাশা রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্য দিয়ে গোটা পল্লীর সর্বনাশ ডেকে এনেছে। 'নকসী কাঁথার মাঠে' জীবন সরলরেখায় প্রলম্বিত, প্রেমও তাই। 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে' বিরোধী সামাজিক আদর্শের প্রভাবে জীবন জটিলতর, তার গতিভঙ্গিও বঙ্কিম। প্রেম সেখানে স্বভাবতঃই তরঙ্গ সংক্ষুব্ধরূপে দেখা দিয়েছে। প্রেমাকুলা নর-নারীর মানসিক সঙ্কটের যে চিত্র কবি 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে তুলে ধরেছেন তা দুর্লভ মনস্তত্ত্ব জ্ঞানসম্মত। বিশেষতঃ অসামাজিক প্রেমের আকর্ষণে কক্ষচ্যুতা নায়িকাকে সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখার যে প্রয়াস সমাজ করেছে, তাতে নারী-আত্মার সঙ্কটের চিত্রটি আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দুইয়ের টানাপোড়নে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে নারী এখানে আত্মহুতি দিয়ে জীবন-জ্বালা জুড়াতে বাধ্য হয়েছে। 'নকসী কাঁথার মাঠে' নায়ক নায়িকার মনে এ ধরনের জটিলতা সৃষ্টির কোন অবকাশই ঘটে নি। তুলনামূলকভাবে 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' তাই অনেক বেশী জীবনাভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ উপন্যাসধর্মী রচনা।

'নকসী কাঁথার মাঠে' তিনি সুন্দর একটি প্রেমকল্পনাকে জয়যুক্ত করতে চেয়েছেন। আর তাকে সামাজিক পটভূমিতে স্থাপন করে একটা স্বাভাবিক সামাজিক ঘটনা হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সেখানে সামজিকের তীক্ষ্ম দৃষ্টির চেয়ে কবির কল্পনা ও হৃদয়বোধই বেশী সক্রিয়। ঔপন্যাসিক নয়, কবিই এ কাব্যে জয়ী হয়েছেন, যদিও গ্রাম্য-সমাজের রীতি, প্রথা, উৎসব, অনুষ্ঠান, ছোটখাট বাদ-বিসম্বাদের বর্ণনা উপলক্ষ্য করে ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ও বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় এ কাব্যে মিলবে। 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে' মনে হয় ঔপন্যাসিকই জয়ী হয়েছেন, যদিচ নায়ক-নায়িকার অনুরাগ বর্ণনে, তাদের চিত্তের উত্থান-পতনের চিত্র অঙ্কনে কবির কাব্যকল্পনাও সুপ্রযুক্ত হয়েছে। দুই কাব্যের প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য প্রকাশের ক্ষেত্রেও অনেকটা প্রভাব বিস্তার করেছে। 'নকসী কাঁথার মাঠে'র কাহিনী জটিলতা বর্জিত , একমুখী ও এক ভাবনা কেন্দ্রিক, সুতরাং বেশ আটসাট মজবুত বুনোনি তার । মোটামুটি 'নকসী কাঁথার মাঠ' একটি নিটোল প্রেমকাহিনী রূপে দানা বেঁধে উঠতে পেরেছে। 'নকসী কাঁথার' এ শৈল্পিক সার্থকতা তাঁর কাব্যবস্তুর সরলতার জন্যেই যে অনেকটা সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে 'সোজন

বাদিয়ার ঘাটে'র আশ্চর্য জটিল সমাজ পারিপার্শ্বিকে দুই ভিন্ন সমাজের নর-নারীর প্রেম যে জটিল আবর্ত রচনা করে বারবার পথ হারিয়ে মাথা কুটে মরেছে, যে ভাবে তা পারিপার্শ্বিক অশুভ সমাজ বিরোধী শক্তির হাতে পল্লীবাসীর সর্বনাশের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে কবির কল্পনা কখনই কোন ভারকেন্দ্রে এসে স্থির হওয়ার অবকাশ পায় নি। কবি কখনও নর-নারীর প্রেমভাবনায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন, আবার পরক্ষণেই সমাজজীবনের অন্তহীন জটিলতার অরণ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। বিরুদ্ধ শক্তির ঘাত-প্রত্যাঘাতে সমাজদেহে যে তরঙ্গগুলো দেখা দিয়েছে তা যেমন তিনি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছেন ; আবার নর-নারীর অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপটিও অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। প্রেমকাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বারবার দুরন্ত সমাজ-সমস্যার আবর্তে পড়ে গিয়েছেন। এ অবস্থায় এ কাব্যের পরিসর অনিবার্যভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে, তারা নানা ডালপালা বিস্তার করে কাহিনীকে জটিল করে তুলেছে। স্বাভাবিক ভাবেই তা শিল্পীর সহজ শৈল্পিক সার্থকতার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবি নিজেও বোধহয় শেষ পর্যন্ত স্থির করতে পারেন নি—কি তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য ? প্রেমকাহিনী না সাম্প্রদায়িক ঘৃণা বিদ্বেষদুষ্ট সমাজচিত্র। বোধ হয় দুই-ই কবি চেয়েছেন। অথচ দুইয়ের মাত্রা সর্বত্র তিনি বজায় রাখতে পারেন নি। ফলে 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'নক্সী কাঁথার মাঠে'র তুলনায় অনেকটা শিথিলবদ্ধ। প্রেম-ভাবের বর্ণনায় কবিপ্রাণের ভাবালুতা প্রকাশের পাশেই যখন ঔপন্যাসিকের বিপুল অভিজ্ঞতার পুঁজির সমাবেশ লক্ষ্য করি তখন আমরা কবির চেয়ে ঔপন্যাসিকের দিকেই যেন বেশী আকর্ষণ বোধ করি। বস্তুতঃ 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে' আমরা ঔপন্যাসিককেই বেশী সক্রিয় দেখি। কবির সাথে ঔপন্যাসিকের বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করে কাব্যরচনা বস্তুতঃ খুবই কঠিন কাজ। 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র প্রকাশকলায় তাই কিছুটা অসঙ্গতি রয়ে গিয়েছে। তবুও কবির কৃতিত্ব এই বলে কিন্তু বিশেষ খর্ব হয় নি। কবি দুই দিকেই নিজের ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। 'নক্সী কাঁথার মাঠে' কবি মূলতঃ ছড়ার ছন্দ আশ্রয়ী, কাহিনী ও কাব্যবস্তুর সরলতা তাকে এ বিশেষ ছন্দের পথেই ফুটে উঠতে সাহায্য করেছে। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কবি ছড়ার ছন্দ, ত্রিপদী ছন্দের কিছুটা রূপভেদকে যেমন আশ্রয় করেছেন , তেমনি স্থানে স্থানে গ্রাম্যগীতির রচনারীতিকেও আশ্রয় করেছেন। এতে মাঝে মাঝে গদ্যের আমেজ পাওয়া যায় অথচ গীতির সুরটিও ধরা পড়ে। মোটকথা 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে' জীবনবৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রকাশের ক্ষেত্রেও কিছুটা বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে।

'সোজন বাদিয়ার ঘাট' বাঙলাদেশের পল্লী অঞ্চলের নিম্নবিত্ত মানুষের দ্বন্দ্বমুখর জীবনের বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র হিসেবে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিমহিমার অধিকারী। এ কাব্য জসীমউদদীনকে দিয়েছে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা, দিয়েছে লোকজীবন শিল্পীর সম্মান। বাঙলাদেশের পল্লী অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান সমাজের এক নিখুঁত জীবন-দলিল হিসেবে 'সোজন বাদিয়ার ঘাট ' ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন শিল্পসৃষ্টি। ইতিপূর্বে বাঙলার পল্লীজীবনকে এমন সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে কোন শিল্পীই কাব্য-সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলেন নি। বাঙলাদেশের হিন্দু-মুসলমান সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাশাপাশি বাস করেও, পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট শুভেচ্ছা সত্ত্বেও কেমন করে মাঝে মাঝে সামান্য বিষয় নিয়ে আত্মঘাতী কলহে প্রবৃত্ত হয়, জমিদার-মহাজন শ্রেণীর লোক কিভাবে তাদের এই বিভেদের সুযোগ নিয়ে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে তাদের সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেয়, কেমন করে সংকীর্ণ ধর্মবিশ্বাস ও সমাজব্যবস্থার পার্থক্যের প্রভাবে তারা দুই সম্প্রদায়ের নর-নারীর মধ্যেকার প্রেমচেতনার উন্মেষকে সংশয় ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এবং দৈবক্রমে অসামাজিক

প্রেম-সম্পর্ক সঙ্ঘটিত হলে কেমন করে সমাজ নিদারুণ আক্রোশে ফেটে পড়ে, এতৎসত্ত্বেও মাঝে মাঝে শুভবুদ্ধির প্রেরণায় এরা কি ভাবে পরস্পরকে আপন করে নিতে পারে তারও কথা কবি এ কাব্যে বলেছেন। গ্রাম অঞ্চলের গরীব হিন্দু-মুসলমানের প্রাত্যহিক জীবনাচরণ, তাদের আচারপ্রথা সব কিছুর উপরই কবি আলোকপাত করেছেন এ কাব্যে। কবির নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টি এ চিত্রের মূল্য বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্য সৃষ্টির পিছনে কবির বাস্তব-অভিজ্ঞতা যে অনেকটা কাজ করেছে তা এ কাব্যের ভূমিকায় কবির বক্তব্যেই পরিস্ফুট ঃ—"আমাদের ফরিদপুর অঞ্চলে বহু চাষী মুসলমান ও নমঃশূদ্রের বাস। তাহাদের মধ্যে সামান্য ঘটনা লইয়া প্রায়ই বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই সব বিবাদে ধনী হিন্দু-মুসলমানেরা উৎসাহ দিয়া তাহাদিগকে সর্বনাশের পথে আগাইয়া দেয়। মহাজন ও জমিদারদের মধ্যে কোন জাতিভেদ নাই। শোষণকারীরা পৃথিবীতে সকলে একই জাতের। ইহাদের প্ররোচনায় হতভাগা নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের যে অবস্থা হয়, তাহা চোখে দেখিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। এমনই একটি ঘটনা লইয়া এই পুস্তকের সূত্রপাত।"

কবি নিরপেক্ষ মন নিয়ে মানবতার শত্রুদের মুখোস উন্মোচন করে সমাজিক মানুষের প্রতি আপন কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি সমাজ সম্পর্কের ক্লিন্নতা কেমন করে প্রেমকে টুটি চেপে হত্যা করতে পারে তাও যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি সামাজিক বিরোধের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষের অমানুষিক শোষণবৃত্তির ভয়াবহ রূপকেও আবিষ্কার করেছেন। এ কাব্যের হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ছবি অঙ্কনে যেমন কবির বাস্তব-অভিজ্ঞতা কাজ করেছে, তেমনি এর নায়ক ও নায়িকার অসামাজিক প্রেমের কাহিনীর পিছনেও সমকালীন একটি ঘটনা ছায়া ফেলেছে। কবি নিজে আমাদের জানিয়েছেন, বরিশালে শোভনা নামে এক হিন্দু বালিকার সাথে মহীউদ্দীন নামে এক মুসলমান যুবকের প্রণয় নিয়ে দুই সমাজে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সোজন ও দুলীর প্রেমকাহিনীর কল্পনায় এ ঘটনার ছায়াপাত হয়েছিল। আর একটি সংবাদও কবি আমাদের দিয়েছেন যে, তাঁর কাব্যের নায়িকা দুলীর রূপ বর্ণনায় তিনি শান্তিনিকেতনের প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বাসায় দেখা একটি মেয়ের মুখচ্ছবি মনে রেখেছিলেন।[১] এমনি ভাবে নানা অভিজ্ঞতার পুঁজি খাটিয়ে কবি 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যটি রচনা করেছিলেন। কাব্যটিকে তাই গ্রাম-বাঙলার হিন্দু-মুসলমান সমাজের একটি বাস্তব ও জীবন্ত আলেখ্য রূপে মেনে নিতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের ভেতরে প্রবেশ করার আগে এর রচনারীতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে রাখা দরকার। 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যের ন্যায় এ কাব্যেও পল্লীগ্রামের পারিপার্শ্বিক রচনার সুবিধা হবে বিশ্বাসে কবি মাঝে মাঝে পল্লীগীতি ও সাহিত্যের রচনারীতি অবলম্বন করেছেন এবং সচেতন ভাবেই তিনি নিজ রচনার মধ্যে মাঝে মাঝে গ্রাম্যকবিদের রচনা থেকে পদ জুড়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, গ্রাম্য শব্দ, উপমা ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। অনেকেই জসীমউদ্‌দীনের এ রচনারীতিকে সুনজরে দেখেন নি এবং জসীমউদ্‌দীনকে সাহিত্য চুরির অপবাদ পর্যন্ত দিয়েছেন। তাঁদের বিবেচনায় জসীমউদ্‌দীন অপরের লেখায় সামান্য রঙ চড়িয়ে নিজের নামে চালাতে চেষ্টা করেছেন, তিনি অপরের রচনা বেমালুম আত্মস্যাৎ করেছেন। এই ধরনের সঙ্কীর্ণমনা সমালোচকদের অনুদার

১. 'ঠাকুর বাড়ি আঙিনায়'—গ্রন্থের ১৮শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মনোভাবে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেছেন,—"দুঃখের বিষয় আমার এই রচনারীতিকে কেহ কেহ ভুল চোখে দেখিয়াছেন। তাহাদের অনেকের ধারণা, আমি গ্রামের নিরক্ষর পল্লীকবিদের রচনা চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালাইয়া দিতেছি।" কোন কোন পত্রিকা সম্পাদক তাঁকে হেয় করার চেষ্টা করেছেন বলেও জসীমউদদীন ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। তারপর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে রবীন্দ্রনাথ-কৃত কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের অনুবাদমূলক 'মেঘদূত' কবিতার কালিদাসীয় পারিপার্শ্বিক রচনার জন্যে রবীন্দ্রনাথ কেমন করে কালিদাসের মেঘদূত কাব্য থেকে অনেক কবিত্বপূর্ণ লাইন জুড়ে দিয়েছেন তাও উল্লেখ করেছেন। আমাদের মনে হয় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কোন দোহাই পাড়ার প্রয়োজন ছিল না। বিশেষতঃ কবি যখন ভূমিকাতে মুক্তকণ্ঠে পল্লীকবিদের কাছে তাঁর ঋণের কথা স্বীকার করেছেন। আর ঋণ মাত্রই দোষের নয়, সাহিত্যিক মাত্রই এক ভাবে না অন্যভাবে পূর্বসুরীর কাছে ঋণী থাকেন। ঋণ তখনই দোষের হয়, যখন তা নিছক পরাণুকরণে পর্যবসিত হয়। জসীমউদদীন সম্পর্কে নিছক পরানুকরণের অভিযোগ তাঁর কাব্যের কঠোর সমালোচকও করবেন না। তিনি পল্লীকাব্য থেকে ঋণ গ্রহণ করে শুধুই অধমর্ণ সাজেন নি। ঐ ঋণকে আপন কবিকল্পনা দ্বারা সমৃদ্ধ করে নতুন নতুন কাব্যসম্পদ সৃষ্টিতে প্রয়োগ করেছেন এবং উত্তমর্ণের মতো ঐশ্বর্য বিতরণও করেছেন। তবে পল্লীকবিদের রচনার সাথে তাঁর রচনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে লোকে যে তাঁর মৌলিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে, তার কারণ হচ্ছে এই যে—তিনি পল্লীকবিদের সাথে একই উৎস থেকে সৌন্দর্যসুধা আহরণ করেছেন। সে উৎস পল্লীজীবন ও প্রকৃতি। তবে এ ক্ষেত্রেও জসীমউদদীনের স্বাতন্ত্র নানা দিক থেকে এতটাই স্পষ্ট যে, তাঁকে বিশিষ্ট কবি হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় নেই। ইতিপূর্বেই নানা আলোচনায় জসীমউদদীনের বিশেষ শিল্পী স্বভাবটির পরিচয় আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব এখানে সে বিষয়ে নতুন করে কোন কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

এবার আমরা 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যটির অভ্যন্তরে একটু প্রবেশ করে দেখব, কি ঐশ্বর্য সেখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ছোট-বড় বাইশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত কাব্যটিতে কবি পূর্ব বাঙলার পল্লীর ক্ষুদ্র জীবনবৃত্তের মধ্যেই আমাদের এক মহা নাটক প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। দুই ভিন্ন সমাজের দুইটি কিশোর-কিশোরীর প্রণয়কে কেন্দ্র করে পল্লীর জীবনাকাশে যে ঝড়ের কালোমেঘ দেখা দেয়, তাই কেমন করে নানা পারিপার্শ্বিক কারণে প্রচণ্ড ঘূর্ণি ঝড়ের মত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারূপে দেখা দিয়ে পল্লীজীবনকে বিধ্বস্ত করেছে—তারই আশ্চর্য নিখুঁত চিত্র 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'। কবি পক্ষপাতহীন ভাবে সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করেছেন ও আশ্চর্য নির্লিপ্ততা সহকারে সে চিত্র অঙ্কন করেছেন। কাব্যটির স্পষ্টতঃ দুটি অংশ,—যদিও কাব্যের মধ্যে তা নির্দেশ করা হয় নি যথাযথভাবে। প্রথম অংশটিই বড়, তাতে রয়েছে চৌদ্দটি পরিচ্ছেদ; দ্বিতীয় অংশটি বেশ সংক্ষিপ্ত, তাতে সংযোজিত পরিচ্ছেদ সংখ্যা আট। প্রথম অংশটিতে বিষয়ের উপস্থাপনা, দ্বিতীয় অংশে রয়েছে উপসংহার। প্রথম ষোলটি পরিচ্ছেদে কাব্যের নায়ক সোজন ও নায়িকা দুলীর প্রেমের উন্মেষ ও বিকাশ, সমাজের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে তাদের দুঃসাহসিক মিলনপ্রচেষ্টা ও তার ব্যর্থতা, সে ঘটনা উপলক্ষ্য করে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সামাজের মনোমালিন্যের সূচনা, জমিদার প্রতিভূ নায়েবের উস্‌কানিতে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি ইত্যাদির কথা সবিস্তারে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ প্রীতির সম্পর্কের কথা যেমন লেখক বলেছেন, আবার কেমন করে অনেক তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে

তাদের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হয়, তাতে সমাজের একদল কুচক্রী ইন্ধন জোগায়, কেমন করে শুভবুদ্ধির প্রভাবে তারা অনেক সময় সকল সঙ্কীর্ণতা ও হিংসা ভুলে গিয়ে পরস্পরকে ভাই বলে মেনে নিয়ে জীবনের মহিমা প্রকাশ করে তাও বলেছেন।

দ্বিতীয় অংশে লেখক কুচক্রী জমিদার, মহাজন শ্রেণীর চক্রান্তে কেমন করে নমঃশুদ্র ও মুসলমানের মধ্যে সর্বনাশা রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়, তার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন, দাঙ্গার ভয়াবহ পরিণামের চিত্র এঁকেছেন। তারপর কবি সোজন ও দুলীর অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষার দুঃখময় অবসানের চিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই উপলক্ষ্যে দীর্ঘ কারাভোগের পর কারামুক্ত সোজন কর্তৃক দুলীর অনুসন্ধান, দুই, এই নাটকীয় সাক্ষাৎকার, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অবশেষে দুইয়ের করুণ আত্মবিসর্জনের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। দুই অংশ মিলিয়ে কাব্যটিতে আমরা যা পেলাম তার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে,—প্রেম যতই কল্যাণকর মিলনকামী শক্তি হোক না কেন, তার পিছনে সমাজ পারিপার্শ্বিকের সমর্থন না থাকলে তা নর-নারীর জীবনে দুর্গতি টেনে আনবেই, তা বিষিয়ে তুলতে পারে সংস্কারান্ধ মানুষের মনকে, সৃষ্টি করতে পারে মানব-সম্পর্কে জটিলতা, কুচক্রীর হাতে তাই হয়ে উঠতে পারে সর্বনাশা মারণাস্ত্র। অন্ধ সামাজিক সংস্কার কেমন করে সর্ববন্ধন অতিক্রমপ্রয়াসী প্রেমকে টুটি চেপে হত্যা করে 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে কবি তাই আমাদের দেখিয়েছেন। ঐ উপলক্ষ্যেই কবি বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান সমাজের একটি বাস্তব জীবন্ত আলেখ্য অঙ্কন করেছেন।

'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র কাব্যবস্তু আমাদের এই ধারণাকে কতটা সমর্থন করে তাই এখন আমরা কাব্যটি সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখাব। প্রসঙ্গত আমরা কবির ঔপন্যাসিকসুলভ বাস্তব বর্ণন, চরিত্রচিত্রণ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয়টিও যেমন তুলে ধরার চেষ্টা করব, তেমনি তার সহজাত কবিত্ববোধ কেমন একটা মাধুর্যের স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে কাব্যটির সর্বত্র তাও দেখাব।

কাব্যের প্রথম পরিচ্ছেদে কাব্যের নায়িকা দুলী ও নায়ক সোজনের বাল্যলীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের মনে পরস্পরের প্রতি প্রণয়ের উন্মেষের কথা কবি বেশ কবিত্ব করেই বলেছেন। এই উপলক্ষ্যে কবি স্বভাবসুলভ সতেজ উপমা ব্যবহার করে নায়িকার রূপের চমৎকার কবিত্বপূর্ণ একটি বর্ণনাও দিয়েছেন ঃ—

"ধানের আগায় ধানের ছড়া, তাহার পরে টিয়া,
নমুর মেয়ের গায়ের ঝলক, সেই না রঙ নিয়া।
দুর্বাবনে রাখলে তারে দুর্বাতে যায় মিশে,
মেঘের খাটে শুইয়ে দিলে খুঁজে না পাই দিশে।

* * *

যে পথ দিয়ে যায় চলে সে যে পথ দিয়ে আসে,
সে পথ দিয়ে মেঘ চলে যায়, বিজলী বরণ হাসে।"

বাল্যকাল থেকে এ মেয়ের পুতুল খেলা, বেথুল তোলা, ফুল কুড়ানো, ফল কুড়ানো, এ সব কাজে তার সাথী হচ্ছে 'ছমির শেখের ভাজন বেটা, বাবরী মাথায় ঘেরা' সোজন। এই সোজন ঃ—

"বাঁশের পাতায় নথ গড়ায়ে গাবের গাঁথি হার,
অনেক কালই জয় করেছে শিশু মনটি তার।"

স্বভাবের নিয়মেই যেন দুটি হৃদয় বাঁধা পড়ে যায় প্রেমছন্দে। নিজের অজ্ঞাতেই মনের

আনন্দে তারা ছড়া কাটে--সে ছড়া কিসের? না, শিয়ালের বিয়ের ছড়া, চম্পাবতী-কঙ্কাবতী কন্যার ছড়া। তাদের ক্রীড়াচঞ্চল রূপের কথা ইঙ্গিত করেই কবি বলেছেন,—'গেরাম ভরি নাচে তারা গাঙ্ শালিকের প্রায়'। কবির সহজ কবিত্বের প্রশংসা করতেই হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শিমুলতলী গাঁয়ের একটি সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছে। তাতে পূর্ব বাংলার পল্লীকে আমরা যেন জীবন্ত রূপে প্রত্যক্ষ করি। 'নমু-মুসলমানের আবাস' শিমুলতলীতে হিন্দু-মুসলমান আপন আপন জীবনধারা নিয়ে বাস করছে পরম সৌহার্দ্যে। উৎসব, অনুষ্ঠান, ধর্মাচরণে কোন বিঘ্ন ঘটে না সেখানে ; বরং সে সব ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে পরস্পরের সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়--দেখা যায় 'সরস্বতীপূজার লাড়ু মুসলমানের ঠোঁট ছোঁয়া; আবার 'পীরের পড়া জল নমুর পোলার পীড়ার দিনে হয় না বিফল'। পাশাপশি বাস করছে নমু-মুসলমান--একের কুড়েঘরের চাল, অপরের চাল স্পর্শ করে। গরীব মানুষ তারা, ছোটখাট সুখ-দুঃখ লয়ে' শিমুলতলী গ্রামে পরস্পরের দুঃখ-ব্যথার শরীক হয়ে বাস করেছে। এ পাড়ার নমুদের সেরা গদাই মোড়ল। মোটামুটি অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ। লক্ষ্মী গৃহিণী, সাতটি জোয়ান ছেলে ও আদরের মেয়ে দুলালী (ডাক নাম দুলী) তার গৃহকে আলো করে রেখেছে । দুলীর দিন কাটে নানা খেলায় 'পুতুলের অন্নপ্রাশন', 'কুকুর ছানার বিয়ে' আরও কত কি খেলায়। সোজন এ সব ব্যাপারে তার বড় সহায়। দুজনের ভাবটা জমবে না কেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদে কিশোর সোজন ও কিশোরী দুলীর অনুরাগ রঙীন মনের লুকোচুরির সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছে। এখানে কবি কিশোর-প্রেমের অস্ফুট ভাষাকে বোঝবার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। সোজন-দুলী এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে গিয়েছে ; তারা নিজেরাই সে রহস্য বুঝতে পারছেন না—কেন একজনকে ছেড়ে অন্যজন স্বস্তি পায় না। তাদের সম্পর্কের গাঢ়তা বোঝাতে গিয়ে কবি বলেছেন, 'সোজন যেন বা তটিনীর কূল, দুলালী নদীর পানি', দুলালী সে যেন বনের হরিণী সোজন তাহার বন।' সোজন দুলীর অন্তর জুরে বসে আছে—সোজনের শত তুচ্ছ স্মৃতি তাকে উন্মনা করে তোলে।

সোজনের মনেও প্রেমের ছোঁয়াচ লেগে ঐ একই ধরনের ভাব-বিহ্বলতা দেখা দেয়। দুলীকে ঘিরে স্বপ্ন রচনা করে ভবিষ্যতের । তার ভাবনার মধ্যে একজন পল্লীকিশোরের সহজ সুন্দর একটি জীবন কামনাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে! স্বাভাবিক মানবিক কামনার প্রকাশ সমৃদ্ধ সোজনের ভাবনাগুলো কি শুনুন ঃ সে বড়ো হয়ে পাটের নায়ের ভাগী হয়ে দূরদেশে যাবে, অনেক টাকাকড়ি উপার্জন করে ঘরে ফিরবে ; দুলীর জন্যে আনবে মধুমালা শাড়ী, সিঁদুর কৌটা, শঙ্খের চুড়ি আর কত কি ! শুধু কি তাই, সে ভাবে সে যখন কৃষাণ হবে তখন সকল ক্ষেত ভরে কুসুম ফুলের চাষ করবে, কেননা 'কুসুমে কুসুমে চরণ ঘষিয়া কাটিবে দুলীর দিন'। প্রেম যেন তাকেও কবি করে ফেলেছে! দুলীর খুশীর জন্যে সোজনে'র অকরণীয় কিছু নেই। চাষীর ছেলের কল্পনা যেন শস্যক্ষেতের ধারে ধারেই ঘুরে ফিরেছে, সেটা রীতিমত লক্ষ্য করার বিষয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদে কৈশোর প্রান্তে উপনীত সোজন ও দুলীর প্রেম শক্ত মাটির স্পর্শে এসে প্রথমবার হোঁচট খেয়ে কিছুটা যেন সচকিত হল। পারিপার্শ্বিকের অকারণ রূঢ়তায় কিছুটা যেন ক্ষুব্ধ হল। কিন্তু কেন এমন হল তা কেউ বুঝতে পারে না—কেননা এ অভিজ্ঞতা যে একেবারেই নতুন। কবি কিন্তু এ পরিচ্ছেদের সূচনাতেই দুলীর প্রেমের আত্মহারা সোজনের রাত্রিশেষে বিষণ্ন ব্যথা নিয়ে জাগরণের মধ্যে এ ভাবী ঘটনার সংকেত যেন ধরা দিয়েছে—সোজনের এ প্রেম যে কোন জটিলতার দিকে

পথানির্দেশ করেছে তারপর হাজত যেন বাঁধ শেষের আয়োজনের ধ্বনিতে স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছিল। সোজনকে সতর্ক করেই যেন তা বলছিল,

"ওরে ঘুমন্ত ওরে নিদ্রিত ঘুমের বসন খোল,
জাগ্রত আসিয়া দাঁড়িয়াছে তোর বসত বাড়ীর টোল।
শয়ন ঘরেতে বাসা বাঁধিয়াছে যত না সিঁধেল চোরে,
কণ্ঠ হইতে গজমতি হার নিয়ে যাবে চুরি করে।"

সে বাণীর অর্থ অনুধাবনের ক্ষমতা সোজনের হয় নি ; তবে শীঘ্রই যে অভিজ্ঞতা সে লাভ করতে যাচ্ছে, তাতে প্রেম পথের জটিলতা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠবে তার কাছে।

ঘুম থেকে উঠেই প্রতিদিনের নিয়মে দুলীর আকর্ষণে আঁকাবাঁকা পথ ধরে খেজুর গাছে খেজুর, বেতসতলার বেথুল ফল, আম গাছের মগডালে কোথায় আম ঝুলছে তার খবর নিতে নিতে সাতসকালে দুলীদের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। সোজনের সাড়া পেতেই শয্যা ছেড়ে আসে দুলী। অমনি বাধা পায় মার কাছে। তাকে বেশ করে গালমন্দ করে জানিয়ে দেয় এখন তার বয়স হয়েছে, এখন 'বাড়ন্ত ছেলেদের সনে' খেলা করা চলবে না, পাড়ার লোকে ইতিমধ্যেই নিন্দাবাদ শুরু করেছে।

দুলী বুঝতে পারে না তার মায়ের এ রূঢ় আচরণের হেতু। সে অভিমান করে শিশুর মতই মাকে বলে যে, তার মাথার উকুন বেছে দিবে না। হিতে বিপরীত হয় ; মা রেগে তাকে কিছুটা মারধর করে। মায়ের কাছে গালি খেয়ে দমে যায় দুলী। সোজনও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় ব্যাপারটা দেখে। দুঃখ পায়। কিন্তু প্রতিকারের পথ খুঁজে পায় না, পায়ে পায়ে নীরবে সরে যায় সেখান থেকে। তারপর কবি বন জঙ্গল, লতায় পাতায় ঘেরা পরিচিত পল্লী পারিপার্শ্বিকের একটি জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। সে পথে চলতে চলতে সোজন দুলীর ভাবনায় ডুবে যায়, কেমন অস্বস্তি বোধ করে। তার জলে ঢিল ছোড়া, গাছ ধরে ঝাঁকান—বিক্ষিপ্ত মানসিকতারই বাহ্যপ্রকাশ। তারপর এক গাছতলে বসে কোন ভাবনায় হারিয়ে যায় সে। কিন্তু তার মনের আকাশের মেঘ ছিঁড়ে ফিরে হঠাৎ রামধনুকের মত এসে উপস্থিত হয় দুলী। লুকোচুরি কৌতুক খেলায় মেতে ওঠে তারা—উভয়ে উভয়ের মন পরীক্ষা করে। প্রেমের সে কৌতুক খেলা জমেছিল ভাল—কথায় কথায় দুলী সোজনকে তার ভাবনার কথা বলে ফেলে, তার মা যে বলেছে তার বয়স হয়েছে। চুল না পাকলে আবার বয়স হতে পারে এটা বোঝবার ক্ষমতা তখনও দুজনের হয় নি। দুজনেই ভেবে বয়সের কোন রহস্যই ঠিক পেল না। একটু নিশ্চিন্ত হয় বুঝি বা তারা। মেতে ওঠে প্রতিদিনকার মতো ছোটখাট ছেলেমানুষী আনুরাগের খেলায়—তারি মধ্যে তাদের মিলনোন্মুখ মন দু একটি আচরণে নিজেদের অনাবৃত করে দেয়। আর এক অসতর্ক মুহূর্তে ধরা পড়ে যায় তারা। দুলীর খোঁজে দুলীর মা হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় সেখানে ; দুলীকে গালমন্দ করে, প্রহার করতে করতে নিয়ে যায় ঘরে আর সোজনকেও ভাৎর্সনা করে তার আচরণের জন্যে। সোজন বুঝতে পারে না দোষটা তার কোথায়? সে বসে থাকে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে। এখানেই চতুর্থ পরিচ্ছেদের সমাপ্তি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি—যৌবন যেন সোজন-দুলী দুইজনকে ছুঁই ছুঁই করছে। অথচ কৈশোরের অবোধ মন নিয়ে তার অর্থ তারা এখনও বুঝে উঠতে পারে নি। কোথাও যে একটা খটকা বাধছে এটা তারা অনুমান করতে পারছে মাত্র। তাই আকস্মিক আঘাত খেয়ে কেমন একটা অসহায়তা ফুটে ওঠে ওদের চোখেমুখে। এই পরিচ্ছেদে 'দুলীর মার আচরণে উঠতি বয়সের মেয়েদের ভবিষ্যত ভাবনায় সদাসতর্ক মায়েরই রূপটি ফুটে উঠেছে। এই পরিচ্ছেদে কবি একদিকে কাব্যিক দৃষ্টি নিয়ে প্রসন্ন হাস্যে

প্রেমের লুকোচুরি খেলা প্রত্যক্ষ করছেন। অন্যদিকে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি নিয়ে জীবন্ত বাস্তবের সম্মুখীন হয়েছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আমরা লক্ষ্য করি কবির দৃষ্টি প্রেমচিত্র থেকে সরে গিয়ে আপাততঃ সমাজ বাস্তবে নিবদ্ধ হয়েছে। তিনি শিমুলতলীর গায়ে মহরম মাসের মহোৎসবের বর্ণনা উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানের সাধারণ প্রীতি ও সৌহার্দ্যের ছবিটি তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। কেমন করে ভিনগাঁয়ের এক সম্প্রদায়ের লোকের অদূরদর্শিতার ফলে সে সম্পর্কে ফাটল ধরল তারও আভাস দিয়েছেন। কেমন করে সামান্য কারণে সাম্প্রদায়িক বিবাদ উপস্থিত হয় তার একটি বাস্তব ছবি এঁকেছেন। কিন্তু এ পরিচ্ছেদের বাস্তব আকর্ষণ হচ্ছে মহরমের মাসে জারীর গান আর লাঠি খেলার মহোৎসবে মত্ত শিমুলতলীর মানুষগুলোর তাজা প্রাণের আলেখ্যগুলো। কারবালার মর্মবিদারী ঘটনার আবেদন পল্লীর ধর্মপ্রাণ, আবেগপ্রবণ মানুষের জীবনে কিরূপ প্রবল, তা কেমন করে মুসলমানের মনে অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার দুর্জয় সংকল্প সৃষ্টি করে তা কবি অত্যন্ত নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া তিনি এই উপলক্ষে পল্লীবাসী নমু-মুসলমানের বলবীর্যবত্তার একটি উজ্জ্বল ছবিও এঁকেছেন। মহরমের উৎসবে নানা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা যুদ্ধের যে অভিনয় করছে তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের বল-বিক্রমের চিত্রটি। কবি অবশ্য কাব্যের নায়ক সোজনকে একটু মহিমান্বিত রূপে এখানে তুলে ধরেছেন। কবি প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় সব কিছু বর্ণনা করেছেন এ পরিচ্ছেদে। বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে উপযুক্ত রসবোধের সমন্বয়ে এ বর্ণনা বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

এবার এ পরিচ্ছেদে বর্ণিত জীবনদৃশ্যের একটু পরিচয় নেয়া যাক। মহরমের মাস এসেছে শিমুলতলীর গাঁয়ের সবাই ঐ উপলক্ষে জারীগান ও লাঠি খেলার মহোৎসবে যোগ দিয়েছে। টাকার কুমীর মনীর মিঞা, রামনগরের নায়েব মশাইরা দু'চারজন এ অনুষ্ঠানে শরীক না হতে পারে। কিন্তু গরীব-ধনী ভেদ না রেখে গাঁয়ের সবাই আজ এ উৎসবে যোগ দিয়েছে। এমন কি নমঃসুদরা পর্যন্ত সৌভ্রাত্রের পরিচয় দিয়ে মিলেছে এ উৎসবে। মদন কলু, ছদন মিঞার সাথে গদাই নমু, রাম বেহারা, বিন্দু নাপিত এসে যোগ দিয়েছে এখানে। আজ কোন ছোট-বড়র প্রশ্ন নেই—' আজকে গরব গায়ের জোরের, আজকে গরব বুকের পাটার'। ছমি শেখের ভাজন বেটা সোজনের ডাক পড়েছে মহরমের করুণ গাথা গাইবার। শিমুলতলীর কলুর পোলা বৃদ্ধ বদরদ্দির আজকের আসরে সম্মান আছে। তার বীরত্বের কথা কে না জানে—শিমুলতলী গাঁয়ের ছেলেদের বীরত্বে তার বুক ভরে ওঠে। আজ সেই হবে সকল অনুষ্ঠানের কেন্দ্র। তাকে দেওয়া হবে সম্মান। গরীবের ছেলে বীর নিতাই ধোপা ছাড়াও মহরমের নাচ জমবে না। শিমুলতলীর মাঠে আজ জনতার ভীড়। গাঁয়ের বৌ-ঝি, ছেলেমেয়েরাও এক ধারে বসে উৎসব উপভোগ করছে।

সারা গাঁ যখন মহরমের এ উৎসবে মত্ত, নমু-মুসলমান যখন এক কাতারে সামিল, তখন হঠাৎই নমু-মুসলমান দাঙ্গা বেধে যায়। উৎসবমত্ত শিমুলতলীর নমুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সাউদ পাড়ার খাঁরা, ভাজনপুরের শেখরা। মুসলমানের উৎসবে নমুরা সংখ্যায় কম ছিল। তাই কিছুক্ষণ যুঝে শেষে বেদম মার খেয়ে ঘরে ফিরে। এ প্রকাশ্য অত্যাচারে তারা ক্ষুব্ধ হল। ভিতরে ভিতরে আক্রোশ দানা বেঁধে উঠল—'দাদ লইবে, ফনায় লাথি যে মেরেছে গোখরো'। শিমুলতলীর নমু-মুসলমানের সম্পর্কে একটু চির খেল—যদিও নমুদের বাঁচাতে গিয়ে তারাও মার খেয়েছে কম নয়। এ ঘটনা শিমুলতলীর সমাজ-জীবনে যে অনর্থ রূপে দেখা দিল, তা শুধু হিন্দু-মুসলমান প্রীতির সম্পর্কটিকেই দুর্বল করে তুলল না, হিন্দু-মুসলমান ভবিষ্যৎ

আত্মঘাতী সংগ্রামের সূচনা করল। সমাজ গণ্ডী বহির্ভূত সোজন-দুলীর প্রেম তাতে ইন্ধন যুগিয়ে সে সর্বনাশকে চূড়ান্ত করে তুলবে। বস্তুতঃ 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের কাহিনীর জটিলতার মূলে কাজ করছে এই অপ্রীতিকর ঘটনার প্রীতক্রিয়া। শুধু তাই নয়, সমাজ সম্পর্কের এই ফাটল দিয়েই কুচক্রী জমিদার-মহাজন শ্রেণী আপনাদের স্বার্থসিদ্ধি করার প্রয়াস পেয়েছে এবং সামাজিক মানুষের সর্বনাশের বিনিময়ে সার্থকও হয়েছে। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদের গুরুত্ব যথেষ্ট বলেই বিবেচিত হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কবি পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষে উল্লেখিত নমু-মুসলমানের দাঙ্গার সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার আভাস দিয়েছেন। নমু-মুসলমানের বিরোধকে উস্কিয়ে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করে জমিদার মহাজন শ্রেণীর ধনী লোকেরা কেমন জঘন্য উপায়ে আপন আপন স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা করছে, তারই উদঘাটন করতে গিয়ে কবি জমিদারের প্রতিনিধি 'রামনগরের নায়েব মশাইকে 'হাজির করেছেন। আশ্চর্যরূপে বাস্তবধর্মীয় এই নায়েবের চরিত্রটি। চরিত্রটি ঐ শ্রেণীর সকল চরিত্রের প্রতিনিধিত্বের দাবি রাখে। এ চরিত্র অঙ্কনে একদিকে জসীমউদ্‌দীনের জীবনাভিজ্ঞতার সমৃদ্ধির পরিচয় যেমন মিলে অন্য দিকে মিলে মানব চরিত্রের প্রতি তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়। গোটা 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে, শুধু সোজন বাদিয়ার ঘাট কাব্য বলি কেন, জসীমউদ্‌দীনের অন্য কাব্যেও এমন বলিষ্ঠ রক্তমাংসের চরিত্র আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। কবির মুখে সেই 'কীর্তিমান' নায়েব মশাইর চরিত্র মহাত্ম্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে,—

"রামনগরের নায়েব মশায় যম যেন বা স্বয়ং বসে,
ভিটে নিলেম ডিগ্রিজারী করেন বাকী খাজনা কষে।
সেলামী আর নজর-আনা কিস্তি খেলাফ সুদের বোঝায়,
ভুঁড়ীর উপর বাড়ছে ভুঁড়ী, দিনে যতই দিন চলে যায়।
ইহার উপর 'মাথট' আছে 'বাড়তি' আছে 'কমতি' আছে,
যে দিকে চাও হাত বাড়ালে হাত যে ঠেকে টাকার গাছে।
ঘড়ি ঘড়ি বাজছে টাকা, সামনে দিয়ে পিছন দিয়ে
কানে কানে কান-কথাতে চোখ টেপাতে ঝনঝনিয়ে।"

কানে কলম গোঁজা এ নায়েবের কীর্তির শেষ নেই। কত লোক তার কলমের খোঁচায় ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, জেল খেটেছে, কত এয়ো স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর মোছা.. ব্যবস্থা সে করেছে, কত লোকের সর্বনাশ যে সে করেছে তার খবর গাঁয়ের লোকেরা ভালই জানে। সব সময় তার মাথায় ঘুরছে সর্বনাশের চাকা—কোন পথে কখন কার সর্বনাশ করা যায়, এ তার ভাবনা ; দেবতা-ঈশ্বরকে মানুষ জপেতপে খুশী করতে পারে, না করতে পারলেও বড় একটা জবাবদিহি করতে হয় না। কিন্তু নায়েবকে খুশি করে সাধ্য কার? প্রজার দুঃখ বেদনা তার অন্তর স্পর্শ করে না। মিথ্যা বাকীর প্যাঁচ কষে ডিগ্রিজারী, মালক্রোকের অস্ত্র দিয়ে প্রজা পীড়ন চালাচ্ছে সমানে। তার বহুদিনের ইচ্ছা শিমুলতলীতে হাট বসাবে—প্রজাদের ওখান থেকে সরে যেতে বলছে কতবার, হুমকি দিয়েছে ডিগ্রিজারী করে ভিটেমাটি উৎখাত করার ; কিন্তু তিনি জানতেন,—

"নেড়ের সাতে মিলছে চাঁড়াল, বেশী কিছু বল্লে পরে,
ভালমন্দ অনেক কিছুই ঘটতে পারে কপাল জোড়ে।
সান নিয়ে ত খেল্‌ছে খেলা ভালই জানেন নায়েব মশাই
অনেক ছলা, অনেক কলার জাল টেনে তাই ফেরেন সদাই।"

সংঘবদ্ধ শিমুলতলীর নমু-মুসলমানকে ক্ষেপানোটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় বলেই, নায়েব হঠাৎ কিছু করে উঠতে পারেন না। ছিলেন কোন ফিকিরে। এবার সুযোগ তার এসে গেল।

সেদিন রাতে শিমুলতলীর গদাই মোড়ল, বিন্দু নাপিত, নিতাই ধোপা প্রভৃতি জনপঞ্চাশ নমু এসে নায়েবের দরবারে হাজির। মুসলমানের মার খেয়েছে তারা—একথা শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন নায়েব মশাই। দুরন্ধর নায়েব মস্ত সুযোগ পেয়ে যান তার বহুকালের অভিপ্রায়টি সিদ্ধির, আহত নমু-সমাজের মনে প্রতিশোধের বাসনাকে তিনি খুঁচিয়ে তোলেন সুকৌশলে—উদ্দেশ্যে তার নমু-মুসলমানের আত্মঘাতী দাঙ্গায় শিমুলতলী বিধ্বস্ত হবে এবং তারও হাট বসানোর বহুদিনের স্বপ্ন সার্থক হবে। নমু-মুসলমানের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পারলে তার শোষণের পথ হবে অবাধ।

মোড়লের কাছে নায়েব যখন শুনতে পেলেন মহরমের মেলার শেষে মুসলমানেরা তাদের বেদম মার মেরেছে, তখন সহানুভূতি ও দরদের মুখোস এঁটে নায়েব মশায় যে অভিনয়টা করলেন তার নৈপুণ্যের জন্যে তার প্রশংসা না করে পারা যায় না ; প্রত্যক্ষ করুন অভিনেতা নায়েবের মূর্তিটি,—

"কি বললি গদাই মোড়ল" গর্জি উঠেন নায়েব মশায়,
ঝড়ের রাতে বিজলী যেমন, চোখ দুটিতে আগ উগরায়।
নমুর মাথায় লাগায় বাড়ি, এতই সাহস নেড়ের বুকে,
গোখরো সাপের লেঙুর ছিঁড়ে আজো তারা ঘুমায় সুখে?"

এক চরম প্ররোচনাপূর্ণ তীক্ষ্ণ বিষবাণ ছুড়ে দিয়ে নায়েব অপেক্ষা করে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়। গদাই মোড়লের আত্মভিমানে ঘা লাগে—অতর্কিত আক্রমণে তারা মার খেয়েছে, নতুবা এ অপমান সে কিছুতেই সহ্য করতো না, সে কথাই বলে। তারপর নায়েবের পরামর্শ চায় এর প্রতিকারের জন্যে। এই তো নায়েব চেয়েছিলেন। উপকারীর মুখোশ এঁটে মনের দুরভিসন্ধি গোপন রেখে ছুরি চালিয়ে যান নায়েব একের পর এক। ধিক্কার দেন গদাই মোড়ল, বিন্দু নাপিত, গৌর মাঝি, দুখীরাম, কানাই রাম প্রভৃতি বীর নমু সন্তানদের অক্ষমতাকে। আত্মভিমান জাগ্রত হয় ওঠে তাদের, তারা হুকুম চায় নায়েব মশাইয়ের। সুকৌশলী খেলোয়াড় নায়েব মশাই আরও সুতীক্ষ্ণতর অস্ত্র প্রয়োগ করলেন এবার। মানুষের সরল ধর্মবিশ্বাসকে প্রাণঘাতী অস্ত্রে পরিণত করার জন্যে কৌশলী অভিনেতার মত শাক্ত-সাধকের উগ্রবেশে সবাইকে আহ্বান করলেন অপমানের প্রতিশোধ নিতে—রক্ষাকালীর আদেশের দোহাই পাড়লেন, সবাইর কণ্ঠে রক্ষাকালীন পূজোর মালা পরিয়ে দিয়ে আদেশ করলেন,—

"...রাত দুপুরে মুসলমানের ভাঙ্গবি পাড়া
শিমুলতলীর গেরাম হতে আজকে তাদের করবি ছাড়া
সামনে যারে যেথায় পাবি খাঁড়ার ঘায়ে মুণ্ডু নিবি
নেড়ের লাঠি নমুর ঘাড়ে, আজকে তাহার দাদ লইবি।"

সামান্যতম দ্বিধা নেই তার মধ্যে—মানুষের সর্বনাশেই যার আনন্দ, তার মনে দ্বন্দ্ব আসবে কোত্থেকে! নায়েবের এ ভীষণ আদেশ শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় নমঃশূদ্রের দল, এ কি নিদারুণ আদেশ? দ্বন্দ্ব দেখা দেয় কারো কারো মনে। শিমুলতলীর মুসলমানেরা তো তাদের কোন ক্ষতি করে নি এবং তাদের হয়ে মার খেয়েছে। নিতাই প্রকাশ্যেই বলে ফেলে কথাটা। কিন্তু অভিনেতা নায়েব মশাই সূক্ষ্ম অভিনেতার মতো এখানেও কাজ করেন। তিনি গাল দেন ওদের নির্বোধ চাঁড়াল বলে, বুঝিয়ে দেন তাদের যে, মুসলমানে মুসলমানে কোন

তফাত নেই। অতএব সাউদ পাড়ার শোধ শিমুলতলীর উপর দিয়ে নিতে কোন আপত্তিই থাকতে পারে না।

নায়েবের এ যুক্তি যেন তেমন কাজ করে না। নিতাইয়ের মতো গদাই মোড়লও কেমন বিব্রত বোধ করছিল। সে পরিষ্কার ভাবে বলে, শিমুলতলীর সংখ্যালঘু মুসলমানকে শায়েস্তা করা এমন কিছু কাজ নয়। তাছাড়া যাদের সাথে এক আকাশের নীচে সুখে-দুঃখে এত কাল কাটিয়েছে, তাদের উপর হামলা করাটা কি অন্যায় নয়, সে নায়েব মশাইকে আদেশ ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ জানায়।

আপন অভিপ্রায় ব্যর্থ হতে চলেছে দেখে নায়েব মশাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, গালিগালাজ করে তাদের ডিক্রিজারী, মালক্রোক করে তাদের ঘরবাড়ী, বেসাতি লুট করার ভয় দেখায়। ভয়ঙ্কর উগ্রমূর্তি ধারণ করে নায়েব। আশাহত, সরল নমুর দল ভড়কে যায়। নায়েব মশাইর আদেশ মানতে রাজী হয়ে তারা ঘরে ফিরে। কৌশলী অভিনেতা নায়েব মনে মনে এবার উল্লাসিত হয়ে ওঠে। তার চাল এবার সার্থক হতে যাচ্ছে। বাইরে সে ভাব যথাসম্ভব গোপন রেখে তাদের ধর্মবোধের প্রশংসার ভান করে আর একটু উস্কিয়ে দেয়,

"...এই ত সাবাস, মহামায়ার ভক্ত তোরা
রক্তখাকীর আদেশ আজি পালন করে আয়সে ত্বরা।"

বিদায় নেয় নমুর দল। বাইরে তখন গভীর অন্ধকার নেমে এসেছে। এখানেই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছে। চরম নাটকীয় আবেগে পরিপূর্ণ এ পরিচ্ছেদটি 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের আকর্ষণকে বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক পরিমাণে।

সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদে লেখক পূর্ব পরিচ্ছেদের জের টেনেছেন। যে ঝড়ের মেঘের আভাস দেখা দিয়েছিল ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, তাই ধীরে ধীরে পক্ষ বিস্তার করে চরম আক্রোশে ফেটে পড়বার পূর্ব মুহূর্তেই কেমন করে সদ্যজাগ্রত বিবেকের প্রতীপ হওয়ায় দিগন্তে মিলিয়ে গেল তাই কবি বর্ণনা করেছেন এ দুটি পরিচ্ছেদে নির্লিপ্ত চিত্রকরের মন নিয়ে।

রামনগরের নায়েবের সর্বনাশা চক্রান্তের কথা শিমুলতলীর মুসলমানদের অজানা থাকে না। অনেক ভেবেচিন্তে নিরাপত্তার খাতিরে তারা গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করে। সপ্তম পরিচ্ছেদে কবি তাদের সেই বিদায়ের করুণ অথচ মৌন আয়োজনের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। রাতের আঁধারেই মুসলমানরা শিমুলতলীর মসজিদে সমবেত হয়ে গাঁ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

একদিকে শিমুলতলী থেকে মুসলমানরা রাত জেগে বিদায়ের আয়োজনে ব্যস্ত, অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি বাওরের চকে নমঃশূদ্ররা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে রাতব্যাপী, নানা চিন্তা-তর্কে তারা মগ্ন, মনে তাদের দ্বন্দ্ব চলছে ভীষণ। অষ্টম পরিচ্ছেদে কবি সে সব কথাই বলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত শুভবুদ্ধির উদ্বোধনে তারা কেমন করে সর্বনাশা পথচলা থেকে বিরত হল তাও বলেছেন। এ পরিচ্ছেদে কবি গদাই মোড়লের চরিত্রটিতে একটি আশ্চর্য বলিষ্ঠতা দিয়েছেন। গদাই নমুর চরিত্রে কবি পাশবিক শক্তির উন্মত্ততা ও অন্ধ হিংস্রতার বিরুদ্ধে মানুষের বিবেকের, মানুষের শুভবুদ্ধির বলিষ্ঠ প্রতিরোধকেই যেন চিত্রিত করেছেন। শেষ পর্যন্ত মানুষের শুভবুদ্ধিরই জয় হয়েছে। এ পরিচ্ছেদেও কবির চিত্রাঙ্কন ক্ষমতার পরিচয়টি ভালভাবেই মিলে।

নবম পরিচ্ছেদে পট পরিবর্তন হল। দুর্যোগের মেঘ মিলিয়ে গেলে প্রকৃতির হাস্যোজ্জ্বল রূপ যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি প্রশান্তহাস্যে শিমুলতলী জেগে উঠল প্রভাতে। তবে শিমুলতলী আর সে আগের সেই শিমুলতলী রইল না, দুর্যোগের দুরপনেয় রেখা আঁকা রয়ে

গেল শিমুলতলীর বুকে। নমু পাড়া যখন প্রভাত হতে জীবনচ্ছেদে মুখরিত হয়ে উঠল প্রতিদিনকার মত, তখনই সংবাদ ভেসে এল মুসলমানরা সব রাতারাতি শিমুলতলী থেকে চলে গিয়েছে। পাড়ার ছেলেমেয়ে, গাঁয়ের বধূদের কাছে এ সংবাদটা এতই অপ্রত্যাশিত যে, তারা কেমন একটা ব্যাকুলতা বোধ করে। কারো কারো চোখে জল ঝরে। মুসলমান পাড়ায় বাড়ীঘর সব ছাড়া পড়ে রয়েছে, পীরের দরগা শূন্য; ঘরে ঘরে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে আছে ঘরকন্নার সামগ্রী। যাওয়ার সময় সব সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে নি। কেমন একটা বেদনা বোধ করে নমু পাড়ার বিশ্বাস সবাই। তারা তো আর জানে না এ বিচ্ছেদ যাদের সবচেয়ে বেশী করে বেজেছিল তারা হচ্ছে এ কাব্যের নায়িকা নমুর মেয়ে দুলী আর নায়ক মুসলমানের ছেলে সোজনকে। তাদের সদ্য অঙ্কুরিত প্রেম ডালপালা মেলে আকাশের দিকে চাইবার আগেই অবাঞ্ছিত এক সামাজিক উৎপাত তাদের পরস্পর থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে দিল।

কিন্তু বাধা পেয়ে প্রেম তাদের আরও দুর্নিবার হয়ে ওঠে। লোকচক্ষের আড়ালেই শক্তি সঞ্চয় করে চলে। তাই তো একদিন দেখি সংসারের অপরাপর স্নেহ বন্ধন, লোকলজ্জা, সমাজভয় সব বিসর্জন দিয়ে বিয়ের রাতে দুলী পালিয়ে চলে আসে দূর বনের গহন কোণে সোজনের কাছে। আর তাকে নিয়ে সোজন পাড়ি জমায় সংসারের আবর্তসঙ্কুল পথে। দশম পরিচ্ছেদে সে দুঃসাহসিক কাহিনীই বিবৃত হয়েছে। যে প্রেম একদিন প্রায় অলক্ষ্যে পরস্পরের মনে আপন অধিকারকে দৃঢ় করে তুলছিল, তাই এবার স্পর্দ্ধাভরে আপন মহিমা সর্বসমক্ষে প্রচার করল। প্রেমের দুর্জয় প্রাণবেগের যে ছবিটি জসীমউদদীন এ পরিচ্ছেদে তুলে ধরেছেন, তা তাঁর শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাকেই বাড়িয়ে তোলে।

একাদশ পরিচ্ছেদে বিয়ে বাড়ী থেকে অকস্মাৎ দুলীর অন্তর্ধানে যে তড়িৎ প্রতিক্রিয়া জেগেছে শিমুলতলীর নমঃশূদ্রদের মধ্যে, তা বর্ণনা করেছেন। বিয়ের কনে কোথায় উধাও হয়েছে কথাটা জানাজানি হতেই নমু পাড়ায় বিয়ের বাজনা হঠাৎ থেমে যায়। খোঁজ খোঁজ রব পড়ে যায় চারদিকে। ত্রস্তব্যস্ত হয়ে লোকজন ছুটে গেল ঘাটে, পথে, মাঠে, জঙ্গলে। শেওলা দাম ভরা দীঘির জল ঘেটে দেখা হল—ডুবে মরে নি তো। মশাল জ্বেলে হাতে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নমুরা—সন্দেহ জেগেছে তাদের মনে, কেউ তাদের মেয়েকে হরণ করে নি তো? ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে তারা অজানা আততায়ীর প্রতি। গাজনার মাঠ, সরিষার বিল, বেতবন-বারোয়ারীতলা, বাওরের বিল সর্বত্র তারা খুঁজে ফিরছে দুলীকে। বনপথে পদচিহ্ন দেখে তারা ছুটে চলে—সন্দেহ থাকে না মেয়ে পালিয়েছে কারো সঙ্গে। তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে নমুদের মনে—কন্যাহরণ করে তাদের কুলে কালি দিয়েছে যে দুঃসাহসী তাকে তারা শেষ না করে ছাড়বে না। খুঁজতে খুঁজতে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল, পলায়নের কারণে গাছের শাখায় বিয়ের রাঙাচেলি ঝোলান দেখা গেল, অতসী বনের পথে পায়ের বাঁকা খাড়ু পড়ে রয়েছে দেখা গেল। ঐ পথ ধরেই লাঠি, তীর, বল্লম, বর্শা, সড়কি নিয়ে ছুটে চলে তারা—আলতা ছোপানো পায়ের চিহ্ন দেখা যায় পথে—তারা ব্যস্ত হয়ে আরও বেগে ছোটে। কিন্তু কোথাও নাগাল পাওয়া গেল না তার—সারারাত্রি গেল। দিন গেল—বৃথা চেষ্টা।

খবরটা নায়েব মশায়ের কানে গেল। এমন সুযোগ তিনি ছাড়বেন কেন? উপকারীর মুখোশ এঁটে হাজির হলেন তিনি। প্রথম কাজীর গাঁয়ে সোজনের খবর নিতে বলেন; সোজনের সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য থেকে নিশ্চিত হওয়া গেল যে, সোজনই দুলীকে নিয়ে পালিয়েছে। ক্রুদ্ধ-ক্ষিপ্ত নমঃশূদ্রদের তিনি প্ররোচনা দেন কাজীর গাঁয়ের মুসলমানদের আক্রমণ করে নির্মম প্রতিশোধ নিতে—এর জন্যে মামলা-মকদ্দমার যাবতীয় দায়িত্ব তিনি

নিজের ঘাড়ে নেওয়ার সংকল্প জানালেন। যে সংঘাত শুভবুদ্ধির উন্মেষে একবার এড়ানো সম্ভব হয়েছিল, এবার তা অনিবার্য হয়ে উঠল। নমুর দল এবার ভীষণ ক্ষীপ্ত। তাদের কুল-মর্যদাকে ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছে মুসলমানের ছেলে সোজন—এ তারা কিছুতেই সহ্য করবে না। ক্ষিপ্ত নমুবাহিনী প্রস্তুত হয় কাজীর গাঁয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে—কোন দ্বিধা, কোন সংশয় এবার আর দেখা দেয় না তাদের মনে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে শিমুলতলীর নমঃশূদ্রদের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির খবর জানতে পেরে কাজীর গাঁয়ের মুসলমানদের মনে যে তড়িৎ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হয়েছে তাই কবি বলতে চেয়েছেন। কাজীর গাঁয়ের মোল্লাবাড়ীতে সেদিন মৌলুদ শরীফের আয়োজেন হয়েছে। তাতে সাত গেরামের লোক নিমন্ত্রিত হয়েছে। শনিবার রাতের বেলা সৌভ্রাত্রবোধের পরিচয় দিয়ে যথাযথ বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে তারা এসে মোল্লা বাড়ীতে জমায়েত হয়েছে। চারদিকে আতর, খুরমার ছড়াছড়ি—খুশীর ঢেউ। দেখেশুনে বুঝতে পারার সাধ্য নেই যে, এ লোকগুলোই আবার 'কাইজা করে ফ্যাসাদ করে ভর্তি করে জেলের বাড়ী'। সমস্ত পশুত্ব ও বর্বরতার খোলসটাকে বাইরে ফেলে এসে তারা শুদ্ধমনে আজ জমায়েত হয়েছে এ মাহ্‌ফিলে। শিষ্টাচারে সবাই সবাইকে মুগ্ধ করেছে। বৃদ্ধ মুন্সী সাহেব কোরান-কেতাব সামনে নিয়ে মৌলুদ শরীফ পড়ছেন—দীনের নবীর দয়া ও ক্ষমার মধুময় কাহিনী বর্ণনা করছেন। শ্রোতৃমণ্ডলী একেবারে ভাববিষ্ট হয়ে পড়েছেন। বস্তুতঃ মৌলুদের এ বর্ণনাটি অত্যন্ত উপভোগ্য। এ বর্ণন-ক্ষমতার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেও একাধিকবার পেয়েছি।

মৌলুদ শরীফের আসর যখন ধর্মীয় ভাবের প্লাবনে আচ্ছন্ন, এমন সময় কানে দুঃসংবাদ ভেসে আসে বাতাসে—নমুরা ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে আসছে কাজীর গাঁ আক্রমণ করতে। এক কান দু'কান করে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে সবারই মধ্যে। দ্রুত প্রতিক্রিয়া জাগে মুসলমানদের মধ্যে। হাঁকডাক পড়ে যায় চারিদিকে—বলিষ্ঠ প্রতিরোধের সংকল্প জাগে সবাইর মনে। জোয়ানেরা সব লাঠি, সড়কি, ঢাল, বশা হাতে তৈরী হতে থাকে। শান্তিপ্রিয় মানুষ মুন্সী সাহেবও সবাইকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন—কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই থেকে যায়, চৌদ্দ পুরুষের বাপ ভিটা ছেড়ে একদিন তারা শিমুলতলী থেকে চলে এসেছিল কাজীর গাঁয়ে শুধু শান্তির আশায়। সেই কাজীর গাঁ আক্রমণ করতে আসছে নমুর দল, এ অসহ্য!

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কাজীর গাঁর জোয়ান মুসলমানরা। নমুদের তারা রুখে দাঁড়াবেই—তাদের স্পর্ধার সমুচিত জবাব দিবে তারা। শান্তিপ্রিয় বৃদ্ধ মুন্সী সাহেব আজ বিচলিত হয়ে পড়েছেন, তিনিও এ ন্যায়ের সংগ্রামে সমর্থন জানালেন। চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল—একটা উন্মাদনা দেখা দিল মুসলমানদের মধ্যে—

'দলে দলে লোক সাজিল, হাতে হাতে জ্বল্‌ল মশাল
কাল বোশেকীর ঝড় ছুটিল, চৌদিকেতে সামাল সামাল;
মদন কলু ক্ষিপ্ত আজি, দল বেড়িয়া নৃত্য করে,
অট্টহাসি ঠিক্‌রে পড়ে কিড়িমিড়ি মন্ত্র ভরে।"

যুদ্ধ সজ্জার যে বিস্তৃত বর্ণনা কবি দিয়েছেন তা আমাদের জঙ্গনামা পুঁথির যুদ্ধ বর্ণনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যেন। তবে জসীমউদ্‌দীনের হাতে তা অনেকটা মার্জিত রূপ পেয়েছে, এটা অবশ্য স্বীকার্য।

শিমুলতলী থেকে নমুর দল ছুটে আসছে তীব্র আক্রোশে, এদিকে কাজীর গাঁর মুসলমানেরাও মার মার ডাক ছেড়ে কলুর ডিহি পার হয়ে কাজী চকের মধ্য দিয়ে ছুটে এগিয়ে চলল। তাদের 'আলী আলী' হুঙ্কারে রাতের অন্ধকার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

একটা সাংঘাতিক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ঘটিত হতে যাচ্ছে এমনি একটা অবস্থার আভাস দিয়ে নাটকীয় ভাবে কবি পরিচ্ছেদের ছেদ টেনেছেন। দাঙ্গার বর্ণনা দেওয়ার ফাঁকে তিনি আমাদের একবার সোজন-দুলীর খবর দিয়ে নিয়েছেন। বোধ হয় আমাদের স্নায়ুকে একটু রিলিফ দেওয়ার জন্যেই। কারণ ইতিমধ্যেই আমরা দুই পক্ষের ভয়াবহ উত্তেজনাপূর্ণ মনোভাবের যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমাদের স্নায়ুও কম চঞ্চল হয় নি। কবির এ নাটকীয় কলাকৌশল এ কাহিনীর আকর্ষণকে বাড়াতে খুবই সাহায্য করেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে কবি আমাদের শিমুলতলী ও কাজীর গাঁর দ্বন্দ্বমুখর পরিবেশ থেকে নিয়ে এসেছেন গড়াই নদীর তীরের প্রশান্ত প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে। বিরোধী সমাজের ক্রূর ছোবল থেকে বাঁচবার ভরসায় সোজন ও দুলী এসে বাসা বেঁধেছে গড়াই নদীর তীরে আপন পল্লী থেকে অনেক দূরে। ছোট পাতায় ছাওয়া কুটির, মাচানে সীমলতা, লাউ-কুমড়োর ঝাড়, উঠানে নানা রকম শস্য রোদে শুকোচ্ছে। সব মিলিয়ে চোখের সামনে একটি সুন্দর ছোট্ট সুখের ছবি ভেসে ওঠে। কবি আমাদের সোজন ও দুলীর ঘরকন্নার প্রেম-মাধুর্যপূর্ণ একটি ছবি উপহার দিয়েছেন, এ ছবি বেশ বিস্তৃত ক্যানভাসে আঁকা, এর রঙের বৈচিত্র্য আমাদের নয়ন ও মনের তৃপ্তি ঘটায়। ছোট ঘরটির সজ্জা দেখে দুলীর গৃহিণীপনার প্রশংসা না করে উপয়া থাকে না।

সে সারাদিন ঘরকন্নার ছোটখাট অজস্র কাজ করে, অবসর মত বসে বসে মৈফল ভাই ও ভানুর প্রেমকাহিনীর গান করে, হয়ত তার মধ্যে আপনার প্রেমের একটা প্রতিরূপ খুঁজে পেয়ে তৃপ্তিও বোধ করে। সোজন বাইরের কাজ সেবে চুপিসারে ফিরে এসে কতদিন তার চোখ টিপে দিয়েছে সোহাগে বিগলিত হয়ে তাকে বেশী পরিশ্রমের জন্যে। অনুযোগ দিয়েছে। দুলী হাসিমুখে সোজনের সেবা করে—তাকে আদর করে খাওয়ায়, তামাক সেজে দেয়, পাখার বাতাস করে। সোজন প্রেম পরিপূর্ণ হৃদয়ে দুলীকে নিয়ে কত কৌতুকের কথা বলে। দুলী আবার অন্য কাজে মন দেয়, শিকায় ফুল তোলে, সোজন কাজ করার জন্যে বাইরে পা বাড়ায়, আবার বৌটিকে দেখবার জন্য নানা ছলে ফিরে আসে, নানা কথার ছল করে কৃত্রিম ঝগড়া বাঁধিয়ে কিছুটা কৌতুক ভোগ করে দু'জন। প্রতিদিনই প্রায় এ প্রেমাভিনয় চলে। দুলীর মধ্যে গুণপনার শেষ নেই। সে চিত্র আঁকে ভাল। ঘরের বেড়াতে সে একদিকে এঁকেছে দুর্গা, গনেশ, মহাদেব, রাধাকৃষ্ণের ছবি, আর—আর একদিকে আঁকে মক্কার কাবাঘর, কারবালার ময়দান, ফোরাতের কূলে হাসান হোসেনের তাঁবু, শিরী-ফরহাদ, লাইলী-মজনুর কবর। প্রেম তাকে হিন্দু-মুসলমান দুই সংস্কৃতির মোহনায় যেন পৌঁছে দিয়েছে। সোজনকে দেখায় সে সব চিত্র, আর বর্ণনা করতে থাকে তাদের মহিমা ; বলতে বলতে সে কেমন অনমনা হয়ে যায়—আবার সমে ফিরে আসে। স্বামীকে তাড়া দেয় সিনানের, খাওয়া দাওয়ার। ব্যস্ত হয়ে ওঠে ঘরের কাজে।

সিনান, খাওয়া সেরে বিশ্রামের পর সোজন কাঠের বোঝা নিয়ে হাটের পথে পা বাড়ায়। দুলী কিছু জিনিস আনার ফরমাস করে, সোজন উপলক্ষ্য পেয়েই রসিকতায় মেতে ওঠে। সোজনের নানা জিজ্ঞাসা এবং দুলীর উত্তরের মধ্য দিয়ে তাদের প্রেম-স্নিগ্ধ জীবনের মাধুর্যই ফুটে ওঠে বারবার। সোজন দেরী করে ফেলে, দুলী তাড়া দেয় তাকে যাওয়ার । সোজন ছোটখাট দুএকটা ঘরকন্নার কাজের উপদেশ দিয়ে বিদায় নেয়।

এসব দৃশ্য বর্ণনায় জসীমউদ্‌দীন পল্লীজীবন-দৃশ্যের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে চলেছেন বলেই এগুলো বড় স্বাভাবিক মনে হয়। বাড়ীর কাছেরই বন থেকে কাঠ কেটে এনে সোজন প্রতি সকালে এমনি মধুমালতির হাটে যায়। দুলী লাকড়ী কেটে ছোট ছোট আঁটি বেঁধে রাখে

আর মাঝে নানা সেলাইর কাজ করে। এমনি ছন্দে তাদের জীবন চলে যাচ্ছে। নদীর তীরে তাদের বাড়ী—লোকালয় থেকে অনেক দূরে। নির্জনতায় তাদের দিন কাটে প্রেমের গুঞ্জরণ করে। মাঝে মাঝে এ নির্জন ঘরের কোণ থেকে বাঁশির সুর ভেসে গিয়ে নদীর বুকে মাঝিদের মন আকুল করে তোলে। লোকালয় থেকে এমনি দূর নির্জনতায় প্রেম আপনার নীড় রচনা করে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল। কিন্তু নিশ্চিন্ত কি হতে পেরেছিল? পারে নি। ক্ষণ-সৌভাগ্যের বিদ্যুৎচমকের পরেই নেমে এল বজ্রের দুঃসহতা নিয়ে—চরম লাঞ্ছনা, অপমান ও দুঃখ। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে সে আঘাত কেমন করে নেমে এল তাই বর্ণনা করা হয়েছে।

পালিয়ে এসেছিল তারা গ্রাম থেকে সকলের চোখে ধূলো দিয়ে। হুলিয়া তো তাদের পিছনে পিছনে ঘুরছিল। তবু গড়াই নদীর কূলে নির্জন কুটিরে তারা প্রায় নিশ্চিন্তই হয়ে এসেছিল। সোজনের সাহসও তাই বেড়ে গিয়েছিল। এতদিন কাঠের আঁটি বিক্রয় করেই পেটের ভাত জুগিয়েছে, কিন্তু তা দিয়ে তো আর ভবিষ্যতের কোন আসান হবে না। তাই সে কোন ব্যাপারীর নায়ে ভাগী হয়ে দূর সফরে যাওয়ার মনস্থ করে। দুলীকে সব কথা বলতেই সে আপত্তি জানায়—দুলী সোজনকে একথাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, নমুরা তাদের খুঁজেই ফিরছে। এ অবস্থায় সোজনের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করায় বিপদ আছে।

কিন্তু সোজন দুলীর আশঙ্কাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। দুলীকে বলে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। পাটের ব্যাপার করে সে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আনবে, দুলীর জন্য আনবে শাড়ী, গহনা কত কিছু। দুলীকে ভরসা দেয় যে তার কোন বিপদ হবে না, দু'চার দিন বাদেই চলে আসবে। সত্যি সত্যিই দুলীকে গ্রামের বয়স্কা নারী কেদারীর মা তত্ত্বাবধানে রেখে সোজন পরদিনই বেপারীর নায়ে সুদূর সফরে যাত্রা করল।

দিনের পর দিন যায়। সোজনের ফেরার নাম নেই। সোজনের প্রতীক্ষায় অতন্দ্র রজনী কাটে দুলীর। অবশেষে প্রতীক্ষা শেষ হয়—সোজনের প্রতীক্ষায় তপস্যারত দুলী হঠাৎ একদিন দেখতে পায়,—

"...দুয়ারে দাঁড়াল পুলিসের লোকজন
সোজনেরে তারা আনিয়াছে সাথে হাত করি বন্ধন।"

প্রিয় প্রতীক্ষারত নারীর সকল স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায় মুহূর্তে। দুলী যখন সোজনকে নিয়ে রঙীন স্বপ্নে বিভোর, তখন অলক্ষ্যে বসে ক্রূর নিয়তি বোধ হয় একটু ব্যঙ্গের হাসিই হেসেছিল। বজ্রের আকস্মিকতা নিয়েই যেন ক্রূর নিয়তি দুইজনকে নিক্ষেপ করল চূড়ান্ত লাঞ্ছনা অপমান ও দুঃখের মধ্যে। ঘটনার এ আকস্মিক মোড় পরিবর্তনের নাটকীয়তা রীতিমত উপভোগ্য। এখানেই 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের প্রথম অংশ শেষ হল।

সোজন ও দুলী, সংক্ষিপ্ত প্রেমচিত্রের উপর আপাততঃ যবনিকা টেনে দিয়ে কবি আমাদের নিয়ে চললেন শিমুলতলী ও কাজীর গাঁয়ের নমু-মুসলমানদের সর্বনাশা আত্মঘাতী হানাহানির মধ্যে। সে হানাহানির প্রস্তুতিটা আমরা আগেই প্রত্যক্ষ করেছি—এবার কবি আমাদের সর্বনাশা হানাহানির জঘন্য বীভৎস রূপটি প্রত্যক্ষ করাচ্ছেন এবং তার পরিণামটি দেখাচ্ছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে আমরা পাচ্ছি নমু-মুসলমানের দাঙ্গার বিবরণ—এ বিবরণ দিতে গিয়ে কবি গ্রাম্যকবিদের বাচনভঙ্গিটি আশ্রয় করেছেন। সাল তারিখটি পর্যন্ত কবি উল্লেখ করেছেন এবং তাতে রামনগরের নায়েব এবং ঢাকার নবাবের ভূমিকার যে উল্লেখ করেছেন,তা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ দাঙ্গা একটা সত্যিকার সামাজিক দুর্ভোগ রূপেই দেখা দিয়েছিল ফরিদপুরের কোন বিশেষ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানদের জীবনে। কি ভাবে জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর লোকের চক্রান্তে পল্লীর সরলপ্রাণ হিন্দু-মুসলমানরা সামান্য ব্যাপার নিয়ে সর্বনাশা দাঙ্গায় লিপ্ত হয়, এ দাঙ্গা তার বাস্তব উদাহরণ।

কবির বিবৃতি থেকে জানতে পারছি তেরশো উনত্রিশ সালের মাঘ মাসের রাতে এ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। নমঃশূদ্ররা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাত্রির অন্ধকারে মশাল জ্বেলে কাজীর গাঁর মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মৌলুদ শরীফের আসরে সমবেত মুসলমানরাও 'আলী আলী রব করে এগিয়ে এল তাদের প্রতিরোধ করার জন্যে। ভয়াবহ দাঙ্গার সূত্রপাত হল। রামনগরের নায়েব মশায় নমুদের পক্ষ নিয়ে দাঙ্গায় সক্রিয় ভাবে উস্কানি দিতে লাগলেন। তারই প্ররোচনায় তেলিহাটি পরগণার মোহনপুর, কেষ্টপুর, মাধবদিয়া থেকে পঙ্গপালের মতন নমঃশূদ্ররা ছুটে এল, স্থানীয় নমঃশূদ্রদের সাহায্যে। অপর দিকে ঢাকার নবাব যেন এরই প্রত্যুত্তরে পাঠালেন হাজার হাজার মুসলমান পদ্মার অপর পার থেকে।

দুই প্রবল প্রতিপক্ষে দাঙ্গার পরিণাম যে কি ভায়াবহ হতে পারে বিশেষতঃ তাতে ইন্ধন জোগানোর লোক থাকলে, তা যে দুই পক্ষেরই কিরূপ সর্বনাশাকর হতে পারে, এ দাঙ্গায় তার পরিচয় ভালভাবেই পাওয়া গেল। দিনের পর দিন নমু-মুসলমানদের সংগ্রাম চলল। চূড়ান্ত অমানুষিকতার পরিচয় দিল দুই পক্ষ। কবি আহত-বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছেন সে উন্মত্ততা,—

"গ্রাম জ্বলিল, ঘর পুড়িল, দেশ হল ছারখার,
কিবা নমু-মুসলমানের হুঁশ নাহিক আর।

* * *

সকল মানুষ, হদ্দ বেহুঁশ পতঙ্গেরি মত,
আপন হাতে জ্বালাল আগুন আপনি হ'তে হত।
মায়ের বুকের খোকন দুধের, আছড়িয়ে তায় মারি
করছে সবে পথে ঘাটে লাইঠেলি নাম জারি।"

এ উন্মত্ততার ফল—শত শত নমু-মুসলমান প্রাণ হারাল। চারিদিকে হাহাকার উঠল। দুই সমাজেরই বীর সন্তানরা প্রাণ হারাল। দিনরাত্রি শ্মশানে আগুন জ্বলল, কবরস্তানে কবর খোঁড়া হল। সন্তানহারা মা, স্বামীহারা স্ত্রীর আর্তনাদে পূর্ণ হয়ে উঠল গাঁয়ের আকাশ-বাতাস। শিমুলতলীতে নায়েব মশায়ের হাট বসানোর স্বপ্ন এবার সার্থক হল। নমঃশূদ্র ও মুসলমানরা দাঙ্গা করে নিজেদের সর্বনাশ করে নায়েব মশায়ের পথ প্রশস্ত করে দিল নিজেরাই। শিমুলতলীর শ্মশানের বুকে নায়েব মশাইয়ের নতুন হাট যেন নমুদের নির্বোধিতাকেই ব্যঙ্গ করে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াল।

ষোড়শ অধ্যায়ে কবি আমাদের কিছু খবর শুনিয়েছেন। দেশব্যাপী নমু-মুসলমানের দাঙ্গার অস্বাভাবিকতায় অন্য সব খবরই চাপা পড়ে গিয়েছিল। সোজন-দুলীর ব্যাপারটাও আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তাদের নিয়েই তো এত বড় একটা অনাসৃষ্টি ঘটে গেল। এবার কবি তাদের সম্পর্কেই প্রধানতঃ খবর দিচ্ছেন, অবশ্য সাথে সাথে দাঙ্গাবিধ্বস্ত শিমুলতলীর নমু-মুসলমানের অবস্থার খবরটাও দিয়েছেন। কবির পরিবেশিত খবর থেকে আমরা জানতে পাই, পুলিসের হাতে ধরা পড়ার পর নারীহরণের মামলায় অপরাধী প্রমাণিত হওয়ায় সোজনের সাত বছর জেল হয়। নায়েব মশায়ের তদ্বিরেই অবশ্য সেটা সম্ভব হয়েছে। দুলীকে চেষ্টা-চরিত্র করে নতুন ঘরে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাত বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে সোজন যখন শুনল দুলী নতুন বরের সাথে সুখেই ঘর করছে, মনের দুঃখে সে আর গাঁয়ে ফিরে নি—'দেশান্তরী ছুটলো কোথা দূরদেশী এক বেদের নায়ে'। এ খবর সত্য কি মিথ্যা তা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলে, তবুও সে খবর আজ আর কারও কাছে তেমন গুরুত্ব পায় না। হাউইবাজীর মত কত খবর কানে আসে, আবার মিলিয়ে যায়। এদিকে

নমু-মুসলমানের গাঁ শিমুলতলীতে বীর সন্তানদের কণ্ঠ আজ রুদ্ধ। কাসেম খুনী, মদন কলু, নিমাই পাল জমিদারের খাজনার দায়ে সর্বস্ব হারিয়েছে। এক সময় নমু-মুসলমানের নামে জমিদারেরা ভয় পেত—এখন 'সময় কাটে তাদের পদধূলী লওয়ার নামে'। শিমুলতলীর এসব খবর কবি আমাদের শুনিয়েছেন ষোড়শ পরিচ্ছেদে। খবর পরিবেশনের ভঙ্গিটি বড় সুন্দর। যেন পত্রিকার হকার হেঁকে যাচ্ছে দিনের চাঞ্চল্যকর খবরগুলো ক্রেতাকে আকর্ষণের জন্যে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদে কবি আমাদের একটি জবর খবরই কিন্তু শুনিয়েছেন—শিমুলতলীর অপমানিত-আত্মা নায়েব মশাইর উপর চরম প্রতিশোধ নিয়েছে। দাঙ্গায় শিমুলতলীর সর্বনাশ হয়েছে—সর্বস্বান্ত হয়েছে শিমুলতলীর দুধর্ষ নমঃশূদ্রদের নেতা গদাই মোড়ল ; বেঁচে আছে সাতটি ছেলের করুণ মৃত্যুর স্মৃতিজ্বালা বক্ষে ধারণ করে ; মনে মনে ক্ষতিয়ে দেখছে এ সর্বনাশের মূল কারণ কোথায়? কাজীর চরের বিলের ধারে হঠাৎ একদিন দেখা হয় তার শিমুলতলীর সন্তান ছমির লেঠেলের সাথে। এককালের বীর ছমির লেঠেলও আজ দুর্বল শক্তিহীন সর্বস্বান্ত। দুইজনে সাক্ষাৎ হতেই সকল বেদনাদায়ক স্মৃতি কেমন যেন আলোড়ন তোলে পরস্পরের মনে। গদাই মোড়ল নিজের অদূরদর্শিতার জন্যে আক্ষেপ করে। নায়েবের হীন চক্রান্তের কথা স্মরণ করে রক্তে তার হঠাৎ যেন আগুন ধরে যায়। নমু-মুসলমানদের সর্বনাশের মূল নায়েবকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে এর শোধ নেবে বলে কঠোর সংকল্প জানায়। ছমির লেঠেল গদাই মোড়লের কথায় অভিভূত হয়ে যায়। নমু-মুসলমানের সে বিগত দিনের প্রীতির কথা আজ যেন নতুন করে মনে পড়ে। সেও তৈরী হয় গদাই মোড়লের সাথে হাত মিলিয়ে এ সর্বনাশের মূল নায়েব মশাইর উপর প্রতিশোধ নিতে, তারই পরে একদিন চারদিকে সংবাদ রটে গেল 'রামনগরের নায়েব মশার খোঁজ না পাওয়া যায়'। খোঁজ অবশ্য পাওয়া গেল—ক'দিন পরে দেখা গেল কাজীর চরের ধারে 'নায়েব মশার আধেক দেহ ঘুমিয়ে কবর জুড়ে'। আর এক আধেক বিলের অপর পাড়ে চিতাভস্মে বিলীন হয়েছে। শিমুলতলীর জীবননাট্যের শেষ দৃশ্য অভিনীত হল এইভাবে। এরপর কবি 'সোজন ও দুলীর যে প্রেম সমাজ-সমস্যার আবর্তে পড়ে প্রায় তলিয়ে গিয়েছিল, তাকেই আবার জীবনের তটে এনে এর অস্তরাগের শেষ রক্তিম রশ্মির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নির্বাপিত হওয়ার পূর্বে সে প্রেমশিখা আর একবার কেমন করে জ্বলে উঠেছিল এবং শেষে যেন অভিমান করেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিল—'শ অতি আবেগময় ভাষায় কবি বর্ণনা করেছেন এ বইয়ের বাকী পরিচ্ছেদগুলোতে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে কবি আমাদের নিয়ে এসেছেন মধুমতী নদীর তীরে। মধুমতীর বুকের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে বেদে নৌকোর বহর; মাটির মায়া-ছাড়া মানুষগুলো জলের উপর ঘরবাড়ী সংসার নিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে এমনি করে কতকাল ধরে কে জানে? নদীর ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা তাদের 'ডিঙ্গী নায়ের পাড়া' নিয়ে। কবি তাদের জীবনধারার একটি বাস্তব আলেখ্য তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে।

এই বেদের নায়ে সওয়ার হয়েই কালজকুঠির বন্দর উজানী গাঁও, গোদাগাড়ী বউঘাটা লোহাজুড়ি গাঁও, দরমাহাটা প্রভৃতি বহু গাঁ-গঞ্জ ছাড়িয়ে সোজন এসে পৌঁছেছে উজান খালির চরে। এই উজান খালির চরেই দুলীর নতুন স্বামীর ঘর, সোজন অবশ্য তা জানে না। এখানেই বেদেরা নৌকা লাগাল।

তার মনে শুধুই দুলীর চিন্তা। বাঁশীর সুরে সোজন বার্তা পাঠায় দুলীর উদ্দেশ্যে, দুলীর জন্যেই তো সে বেদের বহরে দেশ-দেশান্তরে ফিরছে, তার জন্যেই তো গাঙে গাঙে ভেসে ফিরছে 'বুকের দাগা' নিয়ে। দুলীকে একবার জনমের দেখা না দেখে সে যে মরতে পারে

না; একবার তাকে দেখতে পেলে মরতে তার আর কোন ক্ষোভ থাকবে না। আকাশে, বাতাসে, পাখীর সুরে, নদীর স্রোতে সোজন অন্তরের ব্যথা ছড়িয়ে দেয়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে কবি আমাদের দুঃখিনী দুলীর অন্তরের কথা শুনিয়েছেন। একদিকে সোজন দুলীকে হারিয়ে বেদে সেজে পল্লীর ঘাটে ঘাটে দুঃসহ ব্যথা নিয়ে খুঁজে ফিরছে দুলীকে, অন্যদিকে সমাজবিধানে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য পুরুষের অন্তঃপুরে বন্দিনী দুলী দিন রাত্রি চোখের জল ফেলছে সোজনকে স্মরণ করে। তার সংকট বোধহয় সোজনের চেয়েও বেশী। একদিকে সোজনের প্রেমস্মৃতির সুতীব্র জ্বালা, অপর দিকে তার ভালমানুষ স্বামীটির জন্য স্বাভাবিক নারীচিত একটা মমত্ববোধ, দুইয়ের টানাপোড়নে ক্ষত-বিক্ষত দুলীর দিন রাত্রি বিষময় হয়ে উঠেছে। তবু দুলী সব জ্বালা ভুলে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে। সে, যার গৃহিণী হয়েছে, সে তো কোন অপরাধ করে নি! বড় ভাল মানুষ সে, দুলীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। অবস্থা তাদের স্বচ্ছল—দুলী সে প্রশান্ত জীবনের মধ্যে সেবা-স্নেহের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে আপন দুঃখ-বেদনা ভুলে যাবার চেষ্টা করে। একদিন সে হয়ত কাঁটা ধন্য করে ফুলের মত আবার ফুটে উঠত। কিন্তু কোথা থেকে সোজন আবার এসে দেখা দিয়ে তার মনের আকাশে তুলল ভীষণ ঘূর্ণি, দুলীর সমস্ত সংকল্প চুরমার হয়ে যায়—নদী তীরের ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় সোজনকে নিয়ে সে স্রোতের তোড়ে কোথায় ভেসে গেল এক অজানার রাজ্যে। পরবর্তী দুটি পরিচ্ছেদে লেখক সে বেদনাদায়ক ঘটনার ইতিবৃত্ত রচনা করে 'সোজন-দুলী'র প্রেম কাহিনীর উপসংহার টেনেছেন।

বিংশ পরিচ্ছেদে কবি উজানখালির দুলীর স্বামীগৃহে শাঁখা-সিঁদুর বিক্রেতাবেশী সোজন ও দুলীর নাটকীয় সাক্ষাৎকার ও উভয়ের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

সোজন অতি কষ্টে মাথায় পসরা বহন করে নীরবে চলে যায় 'বাঁকাবন পথে' দুলীর কাছ থেকে প্রত্যাখানের বেদনা নিয়ে। কিন্তু সে কি জানতে পারল, দুলীর হৃদয়কে সে কেমন করে গুড়িয়ে দিয়ে গেল?

একবিংশ পরিচ্ছেদে সোজন ও দুলীর প্রেমকাহিনীর দুঃখজনক পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। সোজন ও দুলীর চিরঅতৃপ্ত প্রেমপিপাসা মৃত্যুর মধ্যেই সকল জ্বালার সমাধান খুঁজেছে। এ পরিচ্ছেদে বর্ণিত জীবনদৃশ্যেও কবি উচ্চাঙ্গের নাটকীয় ক্ষমতা ও মনোবিশ্লেষণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। দুলী তার অতীতকে একেবারে ভুলে গিয়ে নতুন করে সংসারে শিকড় গেড়ে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল, হয়তো সময় পেলে তা সম্ভবও হতো। কিন্তু সোজন এসে আবার তাকে ঘূর্ণির মত ডালেমূলে উপড়িয়ে ফেলল। এ অবস্থায় সে আর কেমন করে বাঁচতে পারে। ঝড় বয়ে গেল তার মনে; বুঝতে পারল বেঁচে থাকতে এ জ্বালা থেকে আর মুক্তি নেই। একদিকে স্বামীর প্রতি মমত্ববোধ, আর একদিকে বাল্যপ্রেমিক সোজনের প্রচণ্ড প্রণয়াবেগের আকর্ষণ—এ দুইয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। সে বুঝেছে, বেঁচে থেকে শুধু দুইয়ের জীবনে অনর্থের হেতু হয়ে থাকবে। তার মৃত্যুই হচ্ছে এ সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান। তাই মনে মনে সে প্রস্তুত হয়, মনের বেদনা মনেই চেপে রেখে বিদায়ের মৌন আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

প্রাকৃতিক নিয়মে দিনের পর রাত আসে। গভীর রাত্রে স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে দুলী সোজনের বাঁশির সুর অনুসরণ করে নদীর ঘাটে উপস্থিত হয়। সোজন তখন দুলীর উপর অভিমান করে বিষ খেয়ে নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে। সোজন বিষ খেয়েছে শুনে দুলী একেবারে ভেঙে পড়ে; সেও আত্মহত্যার পথ বেছে নিল, সকল জ্বালা জুড়ানোর জন্যে।

পরদিন ভোরে গাঁয়ের লোকেরা দেখতে পেল বালুচরে যুবক-যুবতী গলাগলি ধরে

প্রাণশূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে—সোজন-দুলীর প্রেম এমনি করেই নানা আবর্ত সৃষ্টি করতে করতে মৃত্যুর মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদটিকে এ কাহিনীর উপসংহার বলা চলে। সোজন-দুলীর করুণ প্রেমকাহিনী কালক্রমে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়। যে ঘাটে তারা জীবন শেষ করেছিল, সে ঘাটটিই পরে 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' নামে পরিচিত হয়। পল্লীবাসীরা আজও তাদের কথা স্মরণ করে চোখের জল ফেলে। নদীর বুকে মাঝির কণ্ঠেও 'সোজন বাদিয়ার' দুঃখের গান শোনা যায়। সে গান শুনে সবার মন করুণায় ভরে ওঠে।

'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যের মতই বহু প্রশংসাধন্য রচনা। দীনেশচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ, প্রমুখ মনীষী ও রসিক মানুষের চিত্ত জয় করেছিল কাব্যটি। রবীন্দ্রনাথ 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যকে অতীব প্রশংসার জিনিস বলেছিলেন। বস্তুতঃ 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে' প্রশংসনীয় অনেক জিনিসই রয়েছে। কবির উদার অসাম্প্রদায়িক জীবন-দৃষ্টির কথা ছেড়ে দিলেও পল্লীর জীবন-বাস্তবের এমন জীবন্ত ছবি আঁকবার ক্ষমতা স্বল্পশক্তির পরিচায়ক নয়। জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর মানুষের শোষণের যে রূপটি তিনি এ কাব্যে তুলে ধরেছেন, একদিকে তার গভীর সমাজসচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়, অপর দিকে তার নিপীড়িতের প্রতি গভীর দরদ ও সহানুভূতি প্রকাশ পায়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের জীবনধারার বৈশিষ্ট্য, ধর্মবোধ, সামাজিক সংস্কার ও সংকীর্ণতা সম্পর্কে তাঁর সহজ জীবনাভিজ্ঞতারই পরিচয় বহন করে ; তিনি তাদের জীবনের মূল সুরটিকে আবিষ্কার করতে পেরেছেন। তাঁর কল্পনার দুঃসাহস আমাদিগকে বিস্মিত করে। তিনি প্রেমকে এখানে মানবিক পটভূমিকায় ফেলে বিচার করেছেন—হিন্দুর মেয়ে ও মুসলমানের ছেলের প্রেম সমাজের পক্ষে অসঙ্গত হলেও কবির দৃষ্টিতে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে ! এ প্রেমকে তিনি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধার চোখেই দেখেছেন। ধর্মোন্মাদনা ও সংস্কার কন্টকিত মানুষের হৃদয়ে এ ঔদার্য কোথা থেকেও আশা করা যায় না। কবি তাও জানতেন—তাই এই নিয়ে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তাকেও তিনি সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এটি সত্যি, তাঁর কাব্যের নর-নারীরা জটিল সমাজ-ভাবনার চেয়েও হৃদয়বৃত্তির আকর্ষণেই সাড়া দিয়েছে বেশী। প্রেমের যে ছবি বৈষ্ণবকাব্যে, মঙ্গলকাব্যে ও গীতিকাব্যে আমরা দেখি, স্বভাবধর্মে জসীমউদ্‌দীনের প্রেমচিত্রও তাদেরই অনুবর্তী। তবে জসীমউদ্‌দীন তাকে বাস্তব সমাজ পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে তার একটা আলাদা তাৎপর্য দিতে সক্ষম হয়েছেন। এ কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে কবি ঔপন্যাসিকের ন্যায় কাহিনী বয়ন, চরিত্র-চিত্রন ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ক্ষমতার যেমন পরিচয় দিয়েছেন তেমনি নাট্যকারের ন্যায় ঘটনা সংস্থাপনেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। নর-নারীর প্রেম-ভাবনা ও হৃদয়াবেগের প্রকাশে কবি জসীমউদ্‌দীন কাব্যমধ্যে উপস্থিত রয়েছেন সত্যি ; কিন্তু জীবনধারার বর্ণনায়, সামাজিক মানুষের দ্বন্দ্ব-কলহের চিত্রাঙ্কনে, ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি, সুতীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণক্ষমতার পরিচয় সর্বত্রই উপস্থিত। ঐ একই কারণে আমরা লক্ষ্য করি কবিতার নৃত্যচপল রূপ প্রায়শই গদ্যের মন্থর পদক্ষেপে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, পল্লীকাব্যের ঋণ তাঁর এ কাব্যদেহে প্রচুর লক্ষ্য করা যাবে—কোথাও পল্লীগীতি পংক্তির হুবহু উদ্ধৃতিতে, কোথাও তার একটু পরিবর্তিত রূপে, কোথাও পল্লীকাব্যের অনেক ভাবনার তরজমা রূপে। তাছাড়া শব্দ, উপমা ইত্যাদির ব্যবহারে ঋণের কথা তো আছেই। ছন্দের ক্ষেত্রেও এ ঋণ যথেষ্ট। তবু সে ঋণ জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের পক্ষে যে দোষের না হয়ে গুণেরই হয়েছে তার কারণ জসীমউদ্‌দীন সহজাত শিল্পবোধের অধিকারে এসব

জিনিসকেই এমনভাবে তাঁর কাব্যেদেহে প্রযুক্ত করেছেন যে, তা কাব্যদেহে কোন অসংলগ্নতা সৃষ্টি তো করেই নি বরং পল্লীকাব্যের আমেজটি সৃষ্টি করে যথার্থ পল্লীকাব্যের মহিমা দিতে সাহায্য করেছে।

সবচেয়ে বড় কথা, 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে জসীমউদ্‌দীন হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত বাংলার পল্লীর জীবনে যে বিরোধকে আবিষ্কার করেছেন, তার নাটকীয় সম্ভাবনাকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগিয়েছেন। এ বিরোধই সোজন ও দুলীর প্রেমকাহিনীকে এত উত্তাল তরঙ্গমুখর হতে সাহায্য করেছে। আর ঐ কারণেই সামান্য পল্লী নর-নারীর জীবন নিয়ে লেখা 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র প্রেমকাহিনীর উর্মিমুখর রূপ আধুনিক পাঠককেও আকর্ষণ করেছে।

হাসু

'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের পর প্রকাশিত হয় শিশুদের জন্যে রচিত জসীমউদ্‌দীনের প্রথম কবিতার বই 'হাসু'। শিশুদের জন্যে রচিত এ বইয়ের উৎস-প্রেরণারূপে কাজ করেছে একটি শিশুর স্নেহাকর্ষণ। কবির শান্তিনিকেতন ভ্রমণই এর উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল কবির মনের অজ্ঞাতসারেই।

একবার শিল্পী নন্দলাল বসুর সাথে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়ে কবি সেখানে শান্তিনিকেতনের গ্রন্থগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাসায় বেশ কয়েকদিন বন্ধু নিশিকান্ত, সান্ত্বনা প্রভৃতিকে নিয়ে গল্পের আসর জমিয়েছিলেন। এখানেই তিনি 'হাসু' নামক শিশুটির সাক্ষাৎ পান। হাসু ছিল প্রভাতকুমারের ভাইজি। হাসু কবির মনে সঞ্চার করেছিল এক আশ্চর্য বাৎসল্যবোধ—কবি এক অনন্যপূর্ব স্নেহব্যাকুলতা অনুভব করলেন। এ শিশুর স্নেহ-ব্যাকুল হৃদয়ই কবিতা হয়ে ঝরে পড়েছে এ কাব্যে। এ স্নেহস্মৃতি সম্পর্কে কবি তাঁর 'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়' গ্রন্থে বলেছেন,—"প্রভাতদার ভাই-ঝি হাসুর বয়স তখন পাঁচ-ছয় বছর। তার মুখখানা এমন করুণ মমতা মাখানো। কাছে ডাকিয়া আদর করিলে আদর করিতে দেয়। আমার হৃদয়ের সুপ্ত বাৎসল্যস্নেহ এই ছোট মেয়েটিকে ঘিরিয়া গুঞ্জন করিয়া উঠিল।"[১]

কবির ধারণা তাঁর নিজের তখনও কোন ছেলেমেয়ে হয় নি বলেই 'মনের বাৎসল্য-সুধা পরের ছেলেমেয়ে দেখিলে উৎসারিত হইয়া উঠিত।' ঐ যাত্রায় কবি চার পাঁচদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন এবং ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই হাসুকে তিনি একেবারে আপন করে ফেলেছিলেন। তখন থেকে বেশ কিছুকাল হাসু কবির মন জুড়ে রইল; কবির মন দিনরাত পথ খুঁজে চলল হাসুকে খুশী করতে। হাসুকে খুশী করার চেষ্টা হিসাবেই জসীমউদ্‌দীন শিশুদের জন্যে কবিতা রচনায় ব্রতী হলেন। আর তারই ফল হল 'হাসু' কাব্যটি। এ সম্পর্কে কবির নিজের সাক্ষ্য শুনুন ঃ "এর আগে আমি ছোটদের জন্য কবিতা লিখি নাই। কলিকাতা আসিয়া হাসুকে খুশী করিবার জন্য ছোটদের উপযোগী কবিতা লেখায় হাত দিলাম। আমার যেন দিনরাত্রের তপস্যা হইল, ওই একরত্তি ছোট মেয়েটিকে খুশী করা।[২] হাসুকে খুশি করার

১. জসীমউদ্‌দীন—'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়', প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১৭।
২. জসীমউদ্‌দীন—'ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়', প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১৮-১৯।

উদ্দেশ্যেই কবি 'ছড়া কাটিয়া নানা ছন্দে ভরিয়া' হাসুকে পত্র লিখতে শুরু করেন। এমনি করেই 'হাসু' কাব্যের উপাদান সঞ্চিত হতে থাকে। বেশ কয়েক বছর ধরেই হাসুকে কেন্দ্র করে কবি শিশু-মনোজগতে বিচরণ করেছেন। হাসুর স্নেহাকর্ষণে তিনি বারবার শান্তিনিকতনে ছুটে গিয়েছেন ; তাকে খুশি করার জন্য তিনি তা করেছেন কি ; সর্বগ্রাসী স্নেহক্ষুধার তাড়নায় হাসুকে নিয়ে তিনি নানা খেলায় মেতে উঠেছিলেন। বহুদিন হাসুকে নিয়েই তাঁর সকল কর্ম ও চিন্তা পাক খেয়ে ফিরতে লাগল। কবির নিজের মুখেই তাঁর হাসু-কেন্দ্রিক কর্ম ভাবনার বিবরণ শুনুন ঃ 'ছড়া কাটিয়ে নানা ছন্দে ভরিয়া হাসুকে পত্র লিখিতে লাগিলাম। ছোট্ট মেয়ে। তার সমবয়সীদের সঙ্গে খেলাধুলায় সময় কাটায়। আমার এই অসংখ্য পত্রের উত্তর দেয়ার সময় কোথায়? তবু মাঝে মাঝে আঁকা-বাঁকা হাতের ছোট্ট একখানা চিঠি সে আমাকে পাঠাইত। সেই সব পত্র পাইয়া আমি যেন সাতরাজার ধন হাতে পাইতাম। চিঠি অবলম্বন করিয়া মনে-মনে কল্পনার রথ উধাও ছুটাইতাম। ইহাতেও মনের আশা মিটিত না। অবসর পাইলেই শান্তিনিকতন গিয়া উপস্থিত হইতাম। যাইবার আগে কোন্ কোন্ গল্প বলিয়া হাসু আর তার বন্ধুদের খুশি করিব, বার বার আওড়াইয়া লইতাম। সেখানে গিয়া সুধাদির বাড়িতে পূর্বের মতই আমার গল্পের আসর বসিত। মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে ছোটদের জন্য লেখা বই কিনিয়া হাসু-কে পাটাইতাম। উপহার-পৃষ্ঠায় গবাদাকে দিয়া অথবা প্রশান্তকে দিয়া রঙবেরঙের ছবি আঁকাইয়া লইতাম।'[১] কিন্তু এ জীবন-ছন্দে একদিন ছেদ পড়ল। হাসু আর ছোটটি রইল না, কার অভিশাপে যেন সে কবির কাছ থেকে দূরে সরে গেল। আর পূর্বের মত খেলা জমে না! এ সম্পর্কে কবির মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা শুনুনঃ 'সে বড় হইয়াছে এ কথা আমি যেন ভাবিতেই পারি না। রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালার মত আজ আমার মনের অবস্থা। বুঝিলাম বীণাযন্ত্রের কোন অজ্ঞাত তার যেন ছিঁড়িয়া গিয়াছে।[২] —'হাসু নামে ছোট্ট একটি খুকু আজ যে কোথায় পালাইয়া গিয়াছে, খেলাঘরের খেলনাগুলি তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে। এখানে আর খেলা করিতে আসিবে না।' কবি হাসুর জীবনের এ অনাকাঙ্ক্ষিত অথচ একান্ত স্বাভাবিক পরিবর্তন অনুভবজনিত বেদনা প্রকাশ করেছেন 'পলাতকা' নামে একটি কবিতায়। পরবর্তীকালে 'হাসু' নামে কাব্যগ্রন্থটির সর্বশেষ কবিতা হিসেবে সংযোজতি হয়েছে এ পলাতকা কবিতাটি।

'হাসু'র প্রতি স্নেহ-ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্যে বহুদিন ধরে কবি হাসুকে উপলক্ষ্য করে যে সব ছড়া কেটেছেন, কবিতা লিখেছেন সেগুলো একত্র করেই 'হাসু' পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল প্রভাতকুমারের স্ত্রী সুধা দেবী ও হাসুর মা সুন্দরদিকে। আপন জীবনস্মৃতিমূলক রচনা 'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়' কবি এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ "ভাবিয়াছিলাম এই পুস্তক রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করিব। কারণ, তাঁহারই আশ্রমকন্যা হাসুর উপরে কবিতাগুলি লিখিয়াছি। পরে ভাবিয়া দেখিলাম, রবীন্দ্রনাথকে তো কত লেখকই বই উৎসর্গ করে। এই বই পড়িয়া সবচাইতে খুশী হইবেন আমার জননীসম সুধাদি আর হাসুর মা সুন্দরদি। বইখানি ইহাদের নামে উৎসর্গ করিলাম'।[৩]

হাসুর স্নেহে-বাঁধা পড়া কবি স্নেহের ঋণ শোধ করেছিলেন এমনিভাবে। একটি ছড়ার গল্প ছাড়া মোট পঁচিশটি কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে এ কাব্যে। বলাবাহুল্য একটি শিশুর প্রতি

---

১. জসীমউদ্‌দীন—'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়', প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১৯।
২. জসীমউদ্‌দীন—'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়', প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ২০।
৩. জসীমউদ্‌দীন—'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়', প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ২১।

সুতীব্র স্নেহাকর্ষণের উৎসসুখেই কবিতাগুলো একে একে দল মেলেছে। সে জন্যে এ কাব্যে আমরা শিশুজগতের বার্তাই পেয়েছি। এ জগৎ বয়স্কদের জগৎ থেকে বেশ একটু পৃথকই বটে। শরৎ আকাশের নিয়ত বিচরণশীল মেঘের মত তা সতত ক্রীড়াচঞ্চল, কখন কোথাও ছুটে যেয়ে উধাও হয়ে যাবে কে বলতে পারে? তার কোন সুনির্দিষ্ট রূপ নেই, তার গতিভঙ্গির মধ্যেও নেই কোন নিয়ম-শৃংখলার বাঁধন। মনের আকাশ সেখানে মুহূর্তে মুহূর্তে রঙ পালটে ফিরছে। সে রূপকথার রাজকুমার, রাজকন্যা, পাতালপুরী, কাঁজলা দীঘির কালো জল, খেলার পুতুল, আরশুলা, নেংটি ইঁদুর সব কিছুই একটা মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করে। তাদের পারিপার্শ্বিক তো বটেই। কল্পনা এখানে বল্গাহীন, ছন্দের মধ্যে তাই রয়েছে নৃত্যের চাপল্য। শিশু যে নৃত্যচপল ভঙ্গিকেই ভালবাসে বেশি, ছড়ার ছন্দের তালে তালে নেচে ওঠে তার মন। জসীমউদ্‌দীন ছড়ার ছন্দের নূপুর বাজিয়ে নিজে যোগ দিয়েছেন শিশুর সে চপল নৃত্যের আসরে, সে নূপুরের ঝঙ্কারে শিশু মুগ্ধ হয়েছে ; বয়স্করা যে খুশী হন নি তারও কোন প্রমাণ নেই।

'হাসুর কবিতাগুলো একটি শিশুকে খুশী করার জন্যে লেখা হলেও, কবি এখানে নিছক ছড়া কেটে গল্প বলেই ক্ষান্ত হন নি। শিশুর ছোটখাট সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা বলে কবি তাদের মনের রাজ্যের অনেক তাজা খবরও দিয়েছেন। তিনি যে শিশুদের রহস্য অনুধাবনে কিরূপ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী তা এ সব কথা থেকে বেশ বোঝা যায়। শিশুকে তিনি কেবল কল্পনার ফানুস উড়িয়েই খুশী করতে চান নি। তাকে পারিপার্শ্বিক বাস্তব জীবনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তার জীবন-দৃষ্টির প্রসারতা ঘটাতেও সাহায্য করেছেন। তা ছাড়া তাকে সুস্থ, আদর্শ জীবন গড়ে তোলার অনুপ্রেরণাও যুগিয়েছেন ঐ কবিতার মধ্য দিয়ে। মোট কথা 'হাসু' কাব্যে আমরা 'শিশুপ্রেমিক' জসীমউদ্‌দীনের এক নতুন পরিচয় লাভ করি। প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে, শিশু-মনের খোরাক জোগাতে গিয়ে কবি আমাদের রূপকথা, ছড়া, গল্পের ভাণ্ডার থেকে প্রচুর মালমশলা গ্রহণ করেছেন। তবু তাঁর স্বকীয়তার অভাব দেখা দেয় নি প্রায় কোথাও।

কাব্যের নাম কবিতা 'হাসু'তে কবি প্রথমেই আমাদের হাসুর পরিচয় দিয়েছেন ঃ—

"হাসু একটি ছোট মেয়ে
এদের মত—তাদের মত,
হেথায় সেথায় ছড়িয়ে আছে
খোকা-খুকু যেমনি শত।"

অর্থাৎ আর পাঁচটি সাধারণ শিশুর ন্যায় হাসুও একটি শিশু। সে রূপকথার রাজার কনে নয়—তবু রূপকথার রাজকন্যার চেয়েও কবি তাকে ভালবাসেন বেশি। কারণ সে যে সংসারের আর পাঁচটি শিশুর মত একান্তই আপন স্নেহেরজন। তাকে আদর করে কবি যেন আপন সন্তানকেই আদর করছেন। হাসু নামক এই ছোট্ট মেয়েটির মুখের আনন্দোজ্জ্বল চাহনিতে কবি যেন সংসারের শত শত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরই আনন্দোজ্জ্বল মুখচ্ছবি প্রত্যক্ষ করেছেন। এ শিশুদের উদ্দেশ্যেই যে কবি ছড়িয়ে দিয়েছেন 'হাসু' কাব্যের শ্লোক, ছড়া কবিতাগুলো, তা কবির বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠেঃ—

"হেথায় সেথায় সকল খানে
আছে যারা হাসুর মত,
ছড়িয়ে দিলাম তাদের তরে
আমার বাঁধা শোলোক যত।"

হাসুর মত শিশুদের জন্যে ছড়িয়ে দেয়া কবির প্রথম ছড়া হচ্ছে 'আমার বাড়ী'। ছড়াটিতে শিশুপ্রেমিক কবি চঞ্চল ভ্রমররূপী শিশুকেই যেন আহ্বান করেছেন আপন পল্লীকুটির প্রাঙ্গণে। কবিতার এ অংশে কবি কিন্তু নতুন কোন কথা বলেন নি। ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া পালায় নদের চাঁদের প্রতি বিদায় মুহূর্তে মহুয়ার সাগ্রহ আহ্বানের প্রতিধ্বনি করেছেন মাত্র—ভাষা, ভঙ্গিতে, বক্তব্যে প্রায় সর্বত্র। সাদামাটা গ্রাম্য পরিবেশকেই কবি শিশুর কল্পলোকে পরিণত করেছেন এ কবিতায়। অথচ কোন কষ্টকল্পনার প্রশ্রয় নেন নি। শিশুমনকে নাড়া দিতে এ কবিতার জুড়ি কমই রয়েছে।

'আলাপ' কবিতায় শিশুস্নেহে বিগলিত কবি হৃদয়ের একটি অপরূপ কামনা ব্যক্ত হয়েছে। রূপকথার মায়ালোকে ঘেরা শিশুরাজ্যের সবটুকু মাধুর্য পান করার সংকল্প নিয়েই যেন কবি এ ধরনের শিশু-কবিতা লেখায় হাত দিয়েছেন। প্রথমে কবি একটি ঘুমন্ত শিশুকন্যার কাব্যিক মাধুর্যপূর্ণ সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, তার মুখেতে 'ক দিয়েছেন চাঁদের হাসি মাখি'। এমন সুন্দর শিশুটির সাথে একটু আলাপ করতে ইচ্ছুক কবি। তার সাথে ভাব জমানোর জন্যে তিনি সাগর পারের ঝিনুক হয়ে, রঙীন পাখীর পালক হয়ে, শঙ্খমণির মালা হয়ে, ঢেউয়ের পরে সওয়ার হয়ে, ছুটে যেতে চান। শিশুর কাছ থেকে যদি তিনি আদর পান, তবে তিনি টুনটুনীর মতো আনন্দে নেচে বেড়াবেন ; শুনুন শিশুপ্রেমিক কবির মনো-কামনার কথা ঃ—

"তবে আমি রূপকথারি রূপের নদী দিয়ে
চলে যাব-সাত সাগরে নতুন মাণিক নিয়ে
তবে আমি আদর হয়ে জড়াব তার গায়ে
নূপুর হয়ে ঝুমুর-ঝুমুর বাজব দুটি পায়ে।"

কবির এ কামনা অপরূপ সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ শিশুস্নেহ বিগলিত হৃদয়ের উত্তাপ সঞ্চারিত হওয়ায় কবিতাটি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে।

'ঠিকানা' কবিতায় শিশু ভাইবোনদের সাথে আলাপেচ্ছু কবি আপন ঠিকানা জানাবার ছলে তাদের মনের রাজ্যের অনেক খুঁটিনাটি খবর জেনে নেবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। শিশুর মনে বাসা বাঁধবার ব্যাকুলতা যে কবির কত প্রবল তাও প্রকাশ পেয়েছে এ কবিতায়।

শিশুকে বুঝতে চেষ্টা করে কবি তার হৃদয়ের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করেছেন। কবি যখন শেষে নিজের ঠিকানাটি দিয়ে বলেছেন ঃ—

"বাড়ী আমার গল্পদেশের কল্পনদীর তটের কোলে।
সেখানে ভাই ছোট্টখোকা, ঠ্যাং ভাঙিলে আরশুলাটার
চোখের জলে বক্ষ ভাসায়—ঘর বেঁধেছি কাঁদনে তার।
দেখা সে সব যায় তোমাদের শিশুর মত চক্ষু হলে।"

তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে কবির শিশুর মনে ঢোকবার ক্ষমতাটি। শিশুর জগতে ঘর বেঁধেছেন কবি—সে ঠিকানাটা শিশুরা যে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে এ বিশ্বাস কবির আছে। শিশুর মত চোখ নিয়ে দেখলে এ জগতের আকর্ষণ বড়দের পক্ষেও যে কম হয় না তা এক প্রকার নিশ্চিত।

'চিঠি' কবিতায় কবি তার 'সোনার খুকু' হাসুকে চিঠি লিখতে গিয়ে যেন বড় ভাবনায় পড়ে গিয়েছেন। কি যে লিখবেন ভেবে ঠিক করতে পারছেন না। তারপর যে সব মজার কথা লিখলেন চিঠিতে, তা যে হাসুর পছন্দসই হয়েছে, তা এক প্রকার নিশ্চিন্তেই বলা যেতে পারে।

সরল শিশুকে মজার মজার খবর পরিবেশন করে কবি কিন্তু প্রচ্ছন্ন কৌতুকে মেতে

উঠেছেন! চিঠির শেষে প্রচ্ছন্ন কৌতুকের সুরেই শিশুকে অভিমান মাখা ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছেন, তাড়াতাড়ি উত্তর না দিলে কিন্তু কাঁদতে হবে! কেন না, উত্তর না দিলে সে মিনুদের পেয়ারা গাছের তলায় পেয়ারা কুড়াতে গিয়ে পেয়ারা পাবে না, ফুল কুড়াতে গিয়ে দেখবে সব ফুল অন্যে নিয়ে গিয়েছে, তার পুতুলের বর জুটবে না; মাথার চুলের কাঁটা হারিয়ে যাবে। শুধু কি তাই? খুকুর চক্ষে কড়াই বুড়ী ঢুকে পড়বে! এর পর আর খুকুর সাধ্য কি কবির চিঠির জবাব না দিয়ে পারে? চমৎকার এ চিঠিটি। কবি শিশু মনস্তত্ত্ব যে খুব ভালই বোঝেন এ কবিতা তার প্রমাণ।

'উত্তর' কবিতায় হাসুর আঁকাবাঁকা ছবির মতো আঁখরটানা চিঠির জবাব দিতে বসেছেন কবি। আঁকাবাঁকা শৃঙ্খলাহীন শিশুহাতের লেখার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু কবিত্ব করে ফেলেছেন ঃ—

"পোষ না মানা মেয়ের মত রেখা বেড়া ডিঙিয়ে তারা,
পরের ক্ষেতের ধান খেতে যায় একটু যেন পেলেই ছাড়া।"

হাসুর মজার চিঠিতে প্রত্যাশিত অনেক কথাই লেখা হয় নি, এটাই কবির আক্ষেপের বিষয়। তবু চিঠিখানা কবি যতই পড়ছেন, ততই যেন নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে কবির মনে। ঐ ছোট্ট চিঠির মধ্য দিয়েই যেন খুকীর গাছের ছায়ায় ঘেরা ছোট বাড়ীটির ছবি কবির কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে। ছোট চিঠিখানি যেন কবির নিকট এক আনন্দের খনি। এ চিঠি যেন শিশুরাজ্যের ইশারা রূপেই দেখা দিয়েছে কবির কাছে। শিশুকে নিয়ে কবির যে কিরূপ অন্তহীন কৌতূহল, তাই এ কবিতায় বার বার উঁকি মেরেছে।

'হাসুর দুঃখ' কবিতাটি শিশুমনস্তত্ত্বের এক আশ্চর্য সুন্দর আলেখ্য। একটি শিশুর পরমপ্রিয় খেলার পুতুল ভেঙে যাওয়ার দুঃখের প্রকাশকে কবি বেশ একটু নাটকীয়তা দান করেছেন কবিতাটিতে।

পুতুল ভেঙে যাওয়ায় এ দুঃখটা বয়স্কদের কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে; কিন্তু শিশুর কাছে তা যে কত বড় মর্মান্তিক সত্য, তা জীবনরসিক মাত্রই জানেন।

'দীপালির জন্মদিনে' কবিতাটিতে কবির কৌতুকপ্রিয় মনই বারবার উঁকি মেরেছে। এ কবিতা রচনার পিছনে কবির বাস্তব শিশুস্নেহের একটি সুন্দর আনন্দকর অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। এ কবিতার দীপালি মেয়েটি সম্পর্কে কবি 'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনা' গন্থে স্নেহ-মাখানো ভাষায় অনেক কথা বলেছেন এবং সেখানেই পাওয়া যাচ্ছে এ কবিতার জন্মসূত্র। কৌতূহলী পাঠক 'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়'[১] গ্রন্থ পড়লে সে সব আনন্দ পাবেন। দীপালিকে নিয়ে তার কোন জন্মদিনে কবি যে কৌতুক খেলায় মেতেছিলেন তার অঙ্গ হিসেবেই এ কবিতাটি রচিত হয়েছিল।

'খুকীর সম্পত্তি' কবিতায়ও রয়েছে কৌতুক উজ্জ্বল মনের পরিচয়। শিউলী নামে একটি খুকীর সাথে কবির ভাব জমেছে অনেক দিন থেকে। কবি শিউলীর কাছে জানতে চেয়েছেন জিনিসপত্রের পুঁজির কথা। শিউলী তার হরেক রকম জিনিসপত্রের যে ফিরিস্তিটি দিয়েছে, তা পরিমাণে ও বৈচিত্র্যে কৌতূহলের ব্যাপারই বটে।

খুকীর সম্পত্তির ফিরিস্তি শুনে কৌতুক চাহনি হেনে কবি বিস্ময়ের ভান করে প্রশ্ন করেন,—' এত জিনিস সত্যি?' খুকী ঘাড় বাঁকিয়ে জবাব দেয়,—'বিশ্বেস না হলে বাড়ি গিয়ে দেখে এস না কেন?' অগত্যা কবিকে স্বীকার করতে হয় যে, খুকীর সম্পত্তিটা বড় কম

১. জসীমউদ্‌দীন—'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়', পৃঃ ৮৩-৮৪ দ্রষ্টব্য।

নয়। নানা উপলক্ষ্য করে শিশুর সাথে ভাব জমিয়ে কবি এমনি করে তার মনের খবরটি নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

'পালের নাও' কবিতাটিকে ছড়ার গান বললেই ঠিক বলা হয়! রূপকথা ও ছড়ার অবাধ কল্পনার রাজ্যে জসীমউদ্‌দীন কেমন অবলীলাক্রমে প্রবেশ করতে পারেন, এ কবিতাটি তার আর এক প্রমাণ। পল্লী-বাঙলায় প্রচলিত হাজারো রকমের ছড়া, রূপকথার জগৎ থেকে দৃশ্য, গন্ধ, বর্ণ আহরণ করে কবি এ কবিতাটি রচনা করেছেন। রূপকথা ও ছড়ার রাজ্যে স্বচ্ছন্দ্যবিহারী শিশুরা এ কবিতা পছন্দ করবে তা আর বিচিত্র কি।

নদীর দেশ বাঙলাদেশে 'পালের নাও' যুগযুগান্তর ধরে মানুষকে কল্পনার অবকাশ দিয়েছে প্রচুর। পালের নাও ভর করে শিশুমন ভেসে গিয়েছে রাজকন্যা রাজপুত্রের দেশে, সওদাগরের বেসাতির রাজ্যে। জসীমউদ্‌দীন এ কবিতায় শিশুমনকে আকর্ষণ করেছেন সে চিররহস্যের রাজ্যের দিকেই।

'পুতুল' কবিতাটিও সুন্দর। ছোট শিশু পুতুল নিয়ে খেলা করে। সে বোঝে না এ মাটির পুতুল, মূক পুতুল—একটা খেলনা মাত্র। সারাটা দিন শিশুর স্নেহের অত্যাচার চলে ঐ পুতুলটার উপর। তার সরল শিশুমনে পুতুল একটা সজীব সত্তা রূপেই যেন দেখা দেয়। সে যেন তার কতই আপনার জন ; তার জন্যে সে কিনা করতে পারে। কবি বলেছেন, 'শিশু নিজেও ঐ পুতুলেরই মত'। বস্তুতঃ শিশুর সাথে পুতুলের তুলনা অবান্তর নয়। পুতুলের ন্যায় তারও আপন-পর বোধ নেই, হাসি তার মুখে লেগেই আছে। পুতুলের মতই সেও আপন প্রিয়জনের স্নেহের স্থানটুকু দখল করে আছে। সদা সজীব শিশু ভোরের শিশিরের স্নিগ্ধতা, প্রস্ফুটিত পদ্মের হাসি নিয়ে সংসার জুড়ে রয়েছে। তাকে নিয়েই তো চলছে সংসারের স্নেহাভিনয়।

কবির ইচ্ছে তিনি শিশুর পুতুল হয়ে তার আদর ভোগ করবেন। আর শিশুও তো তার স্নেহেরই পুতুল। দুজনেই দুজনকে খুব আদর করছে। সে স্নেহাভিনয়ের আকাঙ্ক্ষা কি সুন্দর শুনুন ঃ—

"তোমায় আমি চাঁদ বলিব, জ্যোছনা দিয়ে মুছিয়ে দিও মুখ
তোমায় আমি বলব মাণিক, মালা হয়ে জুড়িয়ে দিও বুক।"

শিশুরূপ পুতুলকে নিয়ে কবির এ স্নেহাকাঙ্ক্ষা চূড়ান্ত সমুন্নতি লাভ করেছে যখন তিনি ঘুম হয়ে শিশুর চোখ জুড়ে বসবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন ঃ—

"আমি তোমার কি হব ভাই? পুতুল! আমার রাঙা পুতুল খুকু
ঘুম পাড়ানী মাসী পিসীর ঘুমের দেশের ঘুম-ঘুমুনীটুকু।"

'খোকার আকাঙ্ক্ষা' কবিতাটিতে নীতি শিক্ষাদানের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। শিশুপাঠ্য গ্রন্থে তাই এর স্থান অনায়াসেই হতে পারে। আমাদের সমাজে শিক্ষার যে দুর্গতি ঘটছে প্রতিদিন, তারই প্রতিকার পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি শিশু যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্জনের সংকল্পের মধ্য দিয়ে। যথার্থ শিক্ষা মানুষকে আপন করে নিতেই শিক্ষা দেয়, অপরের দুঃখ-বেদনাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে প্রেরণা দেয়, সকল ভেদবুদ্ধি,অহমিকাকে অস্বীকার করে। কিন্তু তার পরিবর্তে বাস্তব সমাজে আমরা কি দেখতে পাই? একদল শিক্ষা ও ধন-সম্পদের গর্বে স্ফীত হয়ে সমাজের আর পাঁচজন সাধারণ মানুষ থেকে নিজদেরকে আলাদা করে রাখতেই বেশী গৌরব বোধ করে। তারা পাঁচিল ঘেরা বাড়ীতে থাকে, প্রতিবেশীর ঘরে আলো প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে, দুঃখীর বেদনায় সামান্য বেদনা বোধ করে না ; গাড়ী হাঁকিয়ে পথ চলতে গিয়ে লোকের গায়ে ধূলো ছিটায়, চাকার তলে পিষে মারে

মানুষকে—কোন ভ্রুক্ষেপ নেই তাদের। আমাদের খোকনের সংকল্প—সে এ ধরনের লোকদের অনুসরণ করবে না। ধনী হয়ে আত্মসুখের সন্ধান না করে খোকা সবাইর সুখ-দুঃখের সাথী হতে চায়। 'সবার সুখে হাস্‌ব আমি, কাঁদব সবার দুঃখে'—এই হচ্ছে খোকার কামনা। খোকার আকাঙ্ক্ষা ঃ

'আমার বাড়ী বাজবে বাঁশী সবার বাড়ীর সুর।
আমার বাড়ী সবার বাড়ী রইবে নাক দূর।"

বড় মহৎ এ আকাঙ্ক্ষা। এ সুন্দর কবিতাটিতে কবি শিশুমনে মনুষত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলারই প্রয়াস পেয়েছেন। নীতিকথার আধিক্য সত্ত্বেও কবিতাটি মানবিক অনুভূতি-স্পর্শে সজীব।

'কেলাস ফোর' কবিতায় কবির কৌতুকোচ্ছল মনটি আবার চাড়া দিয়ে উঠেছে। ছোট বোনটি তার রাগ করেছে, কেন না কবি তার চিঠির জবাব দেন নি! এটা কিন্তু ভারী অন্যায় কবির। শিশুর এ অভিমান দেখে কবি প্রচ্ছন্নকৌতুক ভরে তাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, এখন আর আগের মত সাহস করে যেমন খুশী তেমন চিঠি কি লিখা যায়? তাঁর বোনটি এখন বড় হয়েছে, 'কেলাস ফোর'-এ পড়ে কত বড় বড় বই পড়ে, তাকে চিঠি লেখার সমস্যা কি কম! কেমন করে যে তার চিঠির শিরোনামা লেখা হবে তাই তো কবি ভেবে পাচ্ছেন না। চিঠি লিখতে গিয়ে কবির মাঝে মাঝে তাই অনেক ভুল হয়ে যায়। এখন তাঁর বোনটিকে তো আর সমীহ না করে পারা যায় না—সে যে ক্লাস ফোরে পড়ে! সে আর এখন খুকী নয়—এখন কি আর তার পুতুল খেলা নিয়ে দিন কাটান সাজে? সে যে এখন অনেক, অনেক বড়—'গঙ্গারামের দাঁত কড়মড় নড়নড় পিসীর মত'। বাঞ্ছারামের খুড়ী যেমন লাঠি ঠক্ ঠক্ করে পথ চলে, তেমনি আমাদের বোনটি 'চল্‌ছে কেলাস ফোরের সোনার রথে'। কবি সস্নেহ কৌতুকে ফেটে পড়েছেন খুকীর গাম্ভীর্য ও রাগ দেখে। বলছেন, 'কেলাস ফোর' কি যেমন তেমন জায়গা ঃ

'সেখানে আত্মারামের ঠানদি বামা,
নিতুই সেথা পড়তে যায়, মাথায় লয়ে ঘুঁটের ধামা।
জগার আঁজী নেত্যকালী সেই কেলাসের ছাত্রী ভাল,
যত জনেই পড়ুক পাড়ায় তাঁর মত কেউ না জমকালো।"

রাত একটার সময় ঘরের কোণে বাতি জ্বালিয়ে কবি ভাবছেন, এত বড় বড় সব মানুষ যার পড়ার সাথী, তার কথা ভাবলেও তো তাকে ভয় হয়! যদি কবির প্রশস্তি শুনে তারা এসে কবির বিছানার কাছে হাজির হয়। সে হবে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। তাই কবি বিছানা ও লেপের শরণ নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছেন। কবির নির্মল কৌতুক বেশ উপভোগ্য হয়েছে এ কবিতায়।

'বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়', 'ফুটবল খেলায়াড়' দুটি কবিতায় কবি ছবি অঙ্কনে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বছিরদ্দির যে চিত্র তিনি প্রথমোক্ত কবিতায় অঙ্কন করেছেন, তা যেমনি বাস্তব, তেমনি স্বভাবসুন্দর। রাতদুপুরে বিলের পথে বছিরদ্দি মাছ ধরতে যাচ্ছে। বাইরে তখন জল ঝরছে, কড়াৎ-কড়াৎ বাজ পড়ছে। ভয়-ডর বছিরদ্দির কিছুই নেই; দুর্যোগের রাতে দারুণ অন্ধকারে টেটা বল্লম হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে মাছ ধরতে। গায়ে তার অদ্ভুত বল, মনে তার দুর্জয় সাহস, তাইতো অন্ধকার রাতে গ্রামের বন-জঙ্গল সমাচ্ছন্ন ভৌতিক পরিবেশেও বছিরদ্দি কোন শঙ্কা অনুভব করে না।

অসম সাহসী বছিরদ্দির এ চিত্রটি বেশ জীবন্ত বলেই স্বীকার করতে হয়। পল্লীতে বছিরদ্দির মত চরিত্র আজও দুর্লভ নয়।

'ফুটবল খেলোয়াড়' কবিতায় তরুণ ফুটবল খেলোয়াড় ইমদাদুল হকের চিত্রটিও বাস্তব। কোন অসাধারণত্ব নয়, চিত্রটির স্বাভাবিকত্বই কবিতাটিকে কিছুটা মূল্য দিয়েছে। হাতে, মুখে, পায়ে শত ক্ষত ও আঘাতের চিহ্ন ইমদাদুল হকের খেলোয়াড়ী চেহারাটিকে প্রথম থেকে স্পষ্ট করে তোলে। সারাদিন খেলা নিয়েই সে আছে। কবি তাকে অনেকদিনই সন্ধ্যার শেষে দেখেছেন হাতে-পায়ে পটি বেঁধে কাঁতরাতে। গিঠে গিঠে মাখছে মালিশের অসুখ। পরেই আবার বিকেল বেলা খেলার মাঠে দেখা গেল ইমদাদুল হক খেলায় মেতে উঠেছে। বল নিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে, চমৎকার ড্রিবলিং করছে। গোল দিচ্ছে। সবাই তার খেলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। খেলা শেষ হয়—দর্শকরা কলরব করে ঘরে ফেরে। ইমদাদুল হক তখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ফিরে শুয়ে পড়ে চিৎপতাং।

মেসের চাকর তার হাতে-পায়ে মালিশ মেখে হয়রান। তার ডাক চীৎকারে রাতে ঘুম ভেঙে যায় অনেকের। একজন তরুণ ফুটবল খেলোয়াড়ের এ চিত্র বাস্তবধর্মীই বটে। কবি তার শিশুবোন হাসুকে আনন্দ দানের জন্যেই এ সব ছবি এঁকেছেন এ কাব্যে।

'বুবুহারা' একটি ছোট কবিতা। একটি ছোট ছেলের স্নেহ-নিষিক্ত হৃদয়ের চমৎকার একটি ছবি ফুটে উঠেছে কবিতাটিতে। বুবুর জন্যে তার মন কাঁদে। বিয়ে হয়ে বুবু তার পরের ঘর করছে। ছোট ভাইটির স্নেহও তাকে বেঁধে রাখতে পারে নি। অনেকদিন ভাইটি তাকে দেখতে পায় নি। বুবুকে ছাড়া তার কিছুই ভাল লাগে না। বুবুর শত স্মৃতি এখানে-ওখানে অথচ বুবু নেই, একথা ভেবে ছেলেটি যেন ব্যাকুলতা বোধ করে। মাকে জানায় তার হৃদয়ের ব্যাকুলতা! বুবু কি তার দুলা-মিঞার ঘরেই থাকবে? সে মাকে অনুরোধ জানায় মা যেন তার আব্বাকে পাঠিয়ে দেয় বুবুজানকে একবার নিয়ে আসার জন্যে। তার ইচ্ছা ঃ

'আব্বা যেন বুবুর কাছে কানে কানে কয়
তাহার তরে খোকা ভাইটির পরাণ মানে নয়।"

বুবুর কথা মনে করে ছেলেটির চোখে জল ভরে আসে! বুবু তার নিশ্চয়ই চলে আসবে এই ছোট ভাইটির দুঃখের কথা শুনতে পেলে—এ ভরসা যে শিশুর আছে তা তার কথাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বড় সুন্দর স্নেহার্দ্র-হৃদয়ের এ ছবি।

'শিশুর দুঃখ' কবিতাটিতেও কবি শিশু-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ছোট শিশুর মনের খবর কেই বা রাখে? অথচ ঐ ক্ষুদ্র শিশু-হৃদয়ের মধ্যেও স্নেহের অমৃতধারা কেমন করে বয়ে যাচ্ছে, তা একবার আবিষ্কার করলে আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কবিতায় কবি সামান্য বিষয় উপলক্ষ্য করে সে আশ্চর্যলোকের বার্তা আমাদের এনে দিয়েছেন। ছোট্ট মেয়ে নরুন্নাহার সারাটি দিন মুখভার করে এখানে ওখানে পালিয়ে ফিরছে। আজ স্নান হয় নি, মাথার চুলে খড়কুটো লেগে আছে। কেউ ডাকলে কাছেও ঘেঁষছে না। কিসের ব্যথা তার বুকে সেই জানে! কৌতূহলী কবি তার মনের কথা বুঝতে চেষ্টা করেন। তাকে কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তার কি হয়েছে? তাকে কি কেউ বকেছে? আদরে গলে যায় সে! অনেকক্ষণ পর চোখের জলে ভেসে সে যখন জবাব দেয়,—জবাই করেছে উহারা আজিকে আমার মোরগটিরে!' তখন সব ব্যাপারটি দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে যায় কবির কাছে। ছোট মোরগছানাটিকে সে জননীর স্নেহে পালন করেছিল। এমন প্রিয় মোরগটিকে যারা জবাই করেছে, তারা কি একবারও ভেবে দেখেছিল ঐ ছোট্ট শিশুটির মনে কি আঘাত লাগবে!

বোঝার চেষ্টাও কেউ করে নি কেন 'শিশু বোনটির চোখ দুটি শুধুই ভাসিছে অশ্রু ধারে'। কবি আপন দরদী মন নিয়ে তা বুঝতে পেরেছেন, বিস্মিত হয়েছেন সাংসারিক স্নেহের মহিমা দেখে। ছোট্ট শিশুর হৃদয়েও যে স্নেহের অমৃতপ্রস্রবণ বয়ে যাচ্ছে, তার মহিমা যে কোন দিক দিয়েই কম নয়—কবি প্রকারন্তরে তাই আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ কবিতাটি আমাদের 'হাসুর দুঃখ' কবিতাটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখানেও আবার একটি খেলার পুতুল ভেঙ্গে যাওয়া উপলক্ষ করে শিশুর স্নেহব্যাকুল হৃদয়ের কান্না ঝরে পড়তে দেখেছি।

'রাজপুত্তুর' কবিতায় কবি রূপকথার রাজ্যে দৃষ্টি ফিরিয়ে পুরাতন পরিচয়টিকে যেন আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিতে প্রয়াস পেয়েছেন। কবি এ কবিতায় অগণিত শিশুর মানসলোকের বার্তাই যেন আমাদের শুনিয়েছেন। রূপকথালোকে স্বপ্নবিহারী শিশুমনের একটি সুন্দর আলেখ্য এ কবিতাটি। শিশু তো রাজপুত্তুরের মতোই মানুষের স্বপ্নলোকের অধিবাসী—কেমন করে যেন ধূলো-মাটির পৃথিবীতে ছিটকে পড়েছে। কিন্তু এ বিচ্ছিন্নতা তাকে পরিপূর্ণ বিস্মৃতি দেয় নি, রাজপুত্তুরের কথা তার মনের কোণে জন্মান্তরের স্মৃতির মতই যেন দেখা দেয়। তাই তো রাজপুত্তুরের সাথে কথা বলার ব্যাকুলতা বোধ করে শিশু। স্বপ্নালু শিশুমনের পরিচয়বাহী এ কবিতাটির মাধুর্য বড় কম নয়।

'চাঁদের বোন উদয়তারা'ও একটি রূপকথাধর্মী কবিতা। এ কবিতায় রূপকথার সৌন্দর্যলোকের একটি সহজ ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ঘটেছে। নীল আকাশ, তেপান্তরের মাঠ, বটবৃক্ষ, নদীর ঘাট, বালুচর, আকাশের চাঁদ, তারার সহজ পরিবেশেই কবি রূপকথার মায়ালোক সৃজনে সমর্থ হয়েছেন। 'আকাশ-প্রদীপ জ্বালি, একলা পথে চলেছে সে আপন মনে খালি, সেই উদয়তারার সন্ধ্যা-সকাল আকাশ পরিক্রমার দৃশ্যটিকে কবি রূপকথার আদল দিয়ে অপূর্ব করে তুলেছেন। রূপকথায় ব্যঞ্জনা প্রাপ্ত হয়ে উদয়তারা আমাদের মনকে জুড়ে বসে রাজকন্যার মতোই।

'কমলাবতী মেয়ে', কবির রোমান্টিকসুলভ রূপপ্রিয়তারই পরিচয় বহন করে। এখানেও রূপকথার আদল লক্ষ্য করা যায়। 'কমলাবতী মেয়ে' যেন কমলালেবুর দেশের সুষমা নিয়েই দেখা দিয়েছে কবির চোখে। সে যেন পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিরই একান্ত প্রতিরূপ। এ কবিতায় প্রকৃতিরই রূপারতি করা হয়েছে। তবে তাতে রূপকথার আদল থাকায় শিশুমনকে নাড়া দেওয়ার ক্ষমতা এর যথেষ্ট রয়েছে।

'মামার বাড়ী'র ছড়াটি বেশ উপভোগ্য। শিশুপাঠ্য অনেক বইতেই স্থান পেয়েছে এ ছড়াটি ; সবচেয়ে বড় কথা ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে ফিরতে শুরু করেছে ছড়াটি। শহরে, পাড়াগাঁয়ে অনেক জায়গাতেই লক্ষ্য করা যায় ছেলেমেয়েরা খেলাধুলার আনন্দের মধ্য দিয়ে কারণে অকারণে নানা সুরে এটি আবৃত্তি করে আনন্দ পায়। শিশুদের হাস্যোজ্জ্বল, আনন্দোজ্জ্বল প্রাণের প্রকাশ প্রতিবিম্বিত হয়েছে এ ছড়াটিতে। বলা বাহুল্য ছড়ার কল্পনার যথেচ্ছাচারিতা এখানেও দেখা যায়। তবে এ ছড়ায় শিশুকে তেপান্তরের মাঠ, রাজপুত্র-রাজকন্যার অনির্দেশ্য রাজ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় নি। শিশু এখানে আমকাঁঠালের বন, খেজুরগাছ, শিমুলগাছ, পদ্মপুকুর ইত্যাদি পরিবৃত পল্লীপথেই পরিক্রমণ করেছে। মামা বাড়ীর মত আনন্দের জায়গা বাংলার শিশুর বোধহয় কিছুই নেই—'মামা বাড়ী ভারী মজা কীল চড় নাই'—এই তো বাঙলাদেশের শিশুরা চিরটাকাল জেনে এসেছে। তাই তো কবি যখন ছেলেমেয়েদের ফুলের মালা গলায় দিয়ে মামার দেশে যাওয়ার জন্যে আহ্বান করেন, তখন শিশুর মন আনন্দে সারা দিয়ে ওঠে। মামার

বাড়ীর যে আকর্ষণীয় বর্ণনা দিয়েছেন কবি, তাতে শিশুর নিশ্চয়ই সেখানে যেতে লোভ হবে।

'খোকার বাড়ী' কবিতায় রূপকথার স্বপ্নলোক থেকে হঠাৎ করেই যেন কবি বাস্তবলোকে ফিরে এসেছেন। এ নতুন অভিজ্ঞতা একটা নতুন চমকের ন্যায়ই দেখা দিয়েছে। ছোট্ট এক খোকা তিড়িং-বিড়িং করে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—দেখা হয়ে গেল কবির সাথে। কবি তাকে ধরে আদর করলেন। ত্রস্তব্যস্ত হয়ে সে কাল আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দৃষ্টির আড়ালে মিলিয়ে গেল ; কবি চেয়ে রইলেন তার গমনপথের দিকে। মনে দেখা দেয় নানা প্রশ্ন।

"কোন্ দেশে তার বাড়ী, কোন্ সুদূরের পাড়ি
কোথায় তাহার ঘর?"

সাথে সাথেই একটা উত্তরও মনে মনে তৈরী করে নেন কবি, আর তখনই আসে রঙীন কল্পনা ভীড় করে।

আর একদিন যখন শিশুর সাথে দেখা হতেই কবি শিশুকে জিজ্ঞেস করেন তার ঠিকানার কথা, তখন শিশুর জবাবই তাঁর এ আচ্ছন্নতাকে দূর করে দেয়। কবির প্রশ্নের উত্তরে শিশু যখন জানায়,—

"নিমতলীর গলি
একটু পায়ে চলি,
কুড়ি নম্বর বলি একতলা যে বাড়ি
সেথায় আমার ঘর, নয় সাগরের পাড়ি।"

তখন কবি স্বপ্নরাজ্য থেকে মুহূর্তেই যেন বাস্তবের সমভূমিতে নেমে আসেন। শিশুটি প্রশ্নের জবাব দিয়েই দ্রুত চলে যায়, কবির কাছ থেকে কোন প্রতিত্তরের অপেক্ষা না রেখেই। কবি অবাক হয়ে ভাবছেন, কি আশ্চর্য ঘরের কোণের এ ছোট খোকাকে নিয়েই না তিনি কত রঙীন ভাবনা ভেবেছেন! স্নেহের চোখে শিশুর গতি-ভঙ্গিমা, তার মুখের আধো-আধো বাণী, তার সব কিছুই কেমন একটা রহস্যময়তা নিয়ে দেখা দেয়—তা-ই এ কবিতায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

'পরীর কবর' কবিতায় একটি ছোট মেয়ের মৃত্যুতে পারিপার্শ্বিকে শোকের গভীর ছায়া পড়েছে, সেটাই কবি অতি সুন্দর করে এঁকেছেন। মৃত্যুপীড়িত সাংসারিক স্নেহের এ করুণ রূপ-অঙ্কনে জসীমউদ্‌দীন বরাবরই সিদ্ধহস্ত। আলোচ্য কবিতাটি শিশুদের জন্য লেখা হলেও এর মূল সুরের আবেদন সার্বজনীন। বাবা-মার অতি আদরের আট বছরের মেয়ে পরী সামান্য জ্বরে ভুগে মায়ের কোল ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছে মৃত্যুর রাজ্যে। সুন্দর হাসিখুশী হলুদ বরণী মেয়েটির মৃত্যুতে চারিদিকে নেমে আসে শোকছায়া। বাপ-মার দুঃখের তো তুলনাই হয় না। পাড়াপ্রতিবেশীরা পর্যন্ত ছোট্ট মেয়েটির বিয়োগ ব্যথায় মুহ্যমান—ও যে তাদের কত আপনার জন ছিল। চোখের জলে ভেসে তারা পরীর সোনার অঙ্গ কবরের মাটিতে ঢেকে দেয়। বুকফাটা আর্তনাদ করে ওঠে পরীর মা, তার বিশ্বাসই হয় না পরী মারা গিয়েছে।

মায়ের ব্যথা সবারই বুকে ব্যথা জাগায়—সবাই চোখের জল ফেলে ; কিন্তু কর্তব্য কাজ তারা সমাধা করে। চারিদিকে শোকের যেন ঢেউ খেলে যায়। রোমান্টিক কবি পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষ করেন তার ছাপ। মৃত্যুর করাঘাতে বিপর্যস্ত স্নেহের রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি এ কবিতায়।

'মাঙনের ছড়া' একটা গ্রাম্য ছড়া। কবির নিজের স্বীকৃতিতেই আমরা জানি, তিনি একে কিছুটা পরিবর্তিত ও মার্জিত রূপে পরিবেশন করেছেন। এ ধরনের ছড়া কেটে নানা ব্রত-পার্বন উপলক্ষে গ্রামে নর-নারীরা মাঙনে নেমে থাকে। তারা বাড়ী বাড়ী ফিরে সুর করে ছড়া কেটে থাকে। মানুষের সহজ ধর্ম-বিশ্বাসকে, স্নেহদুর্বল মনকে কৌশলে নাড়া দিয়ে মোটা রকম চাল, ধান ইত্যাদি সংগ্রহের ব্যবহারিক বুদ্ধিটি এ ছড়ায় একেবারে অনুপস্থিত নয়।

শেষ কবিতা 'পলাতকা'র ঠিক আগেই কবি 'গ্রামের ছড়া' শীর্ষক একটি ছড়ায়-গাথা গল্প পরিবেশন করেছেন আমাদের। এর সূত্রের কাজ করেছে অবশ্য গদ্য, কিন্তু এর আসল উপকরণ ছড়া। আমরা এখানে সংক্ষেপে গল্পটি তুলে ধরছি ঃ—পাড়াগাঁয়ের একটি ছোট মেয়ে। পুতুল খেলার দিনগুলোও তার শেষ হয় নি। কিন্তু এরই মধ্যে তার বিয়ের বাজনা বেজে উঠল। পরের ছেলের সাথে তার বিয়ে হবে। মেয়েটি খেলতে খেলতে ভুলেই গিয়েছিল সে কথা। সাথীরা স্মরণ করিয়ে দিতেই মন তার ভারী হয়ে ওঠে বেদনায়। পরের ঘরে গিয়ে তাকে হতে হবে লজ্জাবতী বউ। সেখানে তো আর খেলাঘর সাজানো যাবে না। তাই সাথীদের সাথে শেষ বারের মত খেলায় মেতে ওঠে সে। কিন্তু গুরুজনেরা তাকে খেলাঘর থেকে টেনে নিয়ে যায় বিয়ের আসরে। বিয়ে হয়ে গেল মেয়েটির। বাপ-খুড়ো চোখের জলে ভেসে তাকে বরের বাড়ি এগিয়ে দিয়ে এল। মা, বাপ, খুড়ী, জ্যেঠী সবাইকে কাঁদিয়ে সে বিদায় নিল। বিশেষতঃ মায়ের কষ্ট চিন্তা করে তার বুক ফেটে যেতে লাগল। তবু স্বামীগৃহে যেতে হল। সেখানে তার নানা কষ্ট, শাশুড়ী-ননদের অত্যাচার, মাত্রাহীন খাটুনী জীবনকে তার দুর্বল করে তোলে। একদিন সে মনের দুঃখে নদীর জলে ডুবে মরতে যায়। এমন সময় দেখতে পায় কারা নৌকা বেয়ে যায়। মনে তার বড় আশা হল যদি বাপ-ভাইয়ের দেশে খবর পাঠান যায়। মেয়েটি জানতো না যে ঐ নৌকার মাঝিরাই তার দাদা। নৌকা কাছে আসতেই সে বাপের বাড়ি যাওয়ার আবদার জানায়। ভাইরা পরে এসে নিয়ে যাবার আশ্বাস দিয়ে বিদায় নেয়। মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ে। তার কেবল মনে পড়তে থাকে, বাপের বাড়ির শত স্মৃতি। তারপর বেশ কিছুদিন পরে ভাইরা সত্যিই এসে তাকে বাপের বাড়ির দেশে নিয়ে যায়। পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে এল দেখতে। কিন্তু এত আদরের মেয়েটির দুর্দশার ছবি দেখে তারা ব্যথা পায়। মেয়েটির কপাল সত্যিই পুড়েছে। স্বামীগৃহে অনাদর, এদিকে পিতৃগৃহেও পিতামাতা বেঁচে নেই। তার খেলার সাথীরাও বিয়ের পরে পরের ঘরে চলে গিয়েছে। দরদী ভাইরা এখন পর হয়ে গিয়েছে। ভাবীরা কথায় কথায় তাকে খোঁচা মারে। দুঃখে উঠোনে বসে মেয়েটি কাঁদে—মায়ের জন্যে, বাপের জন্যে। কিন্তু আজ আর কেউ এসে তার চোখের জল মুছে দিল না। তার ছেলেবেলাকার খেলাঘর শূন্য পড়ে রয়েছে—কত কথাই তার মনে পড়ে। দারুণ অভিমান হয় তার ভাইদের প্রতি। আর সে এ বাড়িতে আসবে না। কিসের জন্যই বা আসবে? লক্ষ্যহীন ভাবে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে স্বামীর ঘরে ফেরার জন্যে। পথে মেজো ভাইয়ের সাথে দেখা—এ ভাইটি তার বাল্যকালে দোলনায় দোল দিয়ে দিত। আজ তার মা নেই, তার জন্যে ভাইদের সে দরদও নেই। তাই অভিমান করেই ভাইকে বলে দিল ঃ—

"এইখানটিতে খেলেছিলাম ভাঁড় কাটি নিয়ে
এইখানটিতে রুধে দিও ময়না কাঁটা দিয়ে।"

এইখানেই গল্পটি শেষ হয়েছে। পিতৃগৃহে ফেরার পথ তার চিরতরে রুদ্ধ হোক এ কামনা কিরূপ মর্মান্তিক, তা স্নেহের অবহেলা যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।

গদ্যের সূত্রে ছড়ায় গ্রথিত এ জীবনচিত্র পল্লীজীবন-বাস্তবের সমর্থনপুষ্ট বলেই স্বাভাবিক ও হৃদয়স্পর্শী হয়েছে। ছড়ার মধ্য দিয়েও পল্লী-বাঙলার মানুষ কেমন করে আপন স্নেহ-ভালবাসা, জ্বালার কথা প্রকাশ করেছে তার পরিচয় মিলবে 'গ্রামের ছড়া'র ছড়ায়-গাঁথা কাহিনীর মধ্যে।

'পলাতকা' হাসু কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা। এ কাব্যের ভূমিকায় 'পলাতকা' কবিতাটির সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আমরা কিছু আলোচনা করেছি। শিশু হাসুকে নিয়ে যে স্নেহের জগৎ কবি গড়ে তুলেছেন, প্রকৃতির নিয়মে সেই শিশু একদিন যখন বড় হল, সে স্নেহের জগতেও বিপ্লব দেখা দিল। যে হাসুকে কবি এতকাল আপন খেলার পুতুলটির মত করে নানা ছন্দে কবিতার মালা গেঁথে উপহার দিচ্ছিলেন, সে হাসু হঠাৎ কালের অনির্দেশ্য ইঙ্গিতে কোথায় যেন পালিয়ে গেল কবির স্নেহবন্ধন থেকে। কবির স্নেহের উৎসমুখ কেমন করে চাপা পড়ে গেল যেন, আর সেখান থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে স্নেহের বাণী বেরিয়ে আসে না। এ বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার ছাপ বহন করছে 'পলাতকা' কবিতাটি। কবিতাটি 'আহেরিয়া' নামক একটি বার্ষিক কাগজে ছাপা হয়েছিল। কবিতাটির মূল ভাবটি কবি নিজেই প্রসঙ্গক্রমে 'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়'[১] গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। আমার মনে হয় কবিতাটি বোঝার পক্ষে তাই যথেষ্ট। কবি লিখেছেন,—"হাসু নামে ছোট্ট একটি খুকু আজ যে কোথায় পালাইয়া গিয়াছে! খেলাঘরের খেলনাগুলি তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে। এখানে সে আর খেলা করতে আসবে না। সে যে পালাইয়া গিয়াছে তা তার বাপ জানে না, মা জানে না, তার খেলার সাথীরাও জানে না, সে নিজেও জানে না। কোন সুদূর তেপান্তরের বয়স তাহাকে আজ কোথায় লইয়া গিয়াছে। কোনদিনই সে আর খেলাঘরে ফিরিয়া আসিবে না।" হাসু খেলার আসর থেকে পালিয়েছে, আর তার সাথে খেলা জমবে না, তাই কবির বাসনা তিনিও এখানেই হাসুর মত শিশুদের সাথে শেষ খেলাটি খেলে যাবেন। কবি 'গ্রামের ছড়া'র গল্পের বোনটির মতই তাই ছড়া কেটে বলেছেন ঃ—

"যেখানটিতে খেলেছিলাম 'ভাঁড় কাটি' সঙ্গে নিয়ে,
সেইখানটিতে দে রুধে ভাই ময়না-কাঁটা পুঁতে দিয়ে।"

কবি সে স্মৃতিপথকে চিরকালের জন্য রুদ্ধ করতে চান ; কারণ স্মৃতি রোমন্থন করে শুধু দুঃখই লাভ হবে। এ অবস্থায় মনকে শক্ত করে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। হাসুর শত স্নেহস্মৃতির রোমন্থন করে তার খেলাঘরের দুরবস্থা লক্ষ্য করে কেঁদেছেন কবি। পৃথিবীর খেলাঘরের এটাই তো স্বাভাবিক পরিণতি।

স্নেহের উৎস-মুখে সৃষ্ট 'হাসু'র এ কবিতাগুলো হাসুর মন তো জয় করেছিলই, হাসুর ন্যায় বাংলাদেশের অজস্র ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও মন জয় করেছে। 'হাসু'র অনেক কবিতাই আজ বাঙলাদেশের শিশুদের মুখে মুখে ফিরে। 'নক্সী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র কবিকে আমরা এক নতুন রূপে আবিষ্কার করলাম 'হাসু'তে। বাঙলার লুপ্তশ্রী, পল্লীর মাধুর্যের ছবি আঁকতে আঁকতে কবি কেমন করে শিশু-স্নেহের প্রবল তাগিদে শিশুদের জন্যে কবিতা লিখতে শুরু করলেন, তার ইতিহাস তো আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে। প্রথম সৃষ্টিতেই যে তিনি শিশুচিত্ত জয়ে সক্ষম হলেন, তা একটা অসামান্য ঘটনাই বটে। জসীমউদ্‌দীনর অকৃত্রিম কবিত্ববোধ, সংবেদনশীল হৃদয়, জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসা ও মানব চরিত্রে স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টিই তাঁকে এ সার্থকতা অর্জনে সাহায্য করেছে।

১ জসীমউদ্‌দীন—'ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়', পৃঃ ২০।

পল্লীর সন্তান তিনি—ছড়া, প্রবাদ, রূপকথার রাজ্যে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহারের সুযোগ বাল্যেই ঘটেছিল ; পরিণত বয়সে সে অভিজ্ঞতার পুষ্টি সাধনের সুযোগও ঘটেছে প্রচুর। ছড়া, প্রবাদ, রূপকথার রাজ্যে তিনি শিশুমনে প্রবেশের চাবিকাঠির সন্ধান পেয়েছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে না। তাছাড়া তাঁর স্বভাবের মধ্যেও রয়েছে শিশুর সরলতা ও আবেগ। কি পেলে শিশু খুশী হয়, সেটা তিনি যেন সহজাত সংস্কার বশেই বুঝতে পারেন। কাব্যের অপরাপর ক্ষেত্রের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও তিনি লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যকে যথেষ্ট কাজে লাগিয়েছেন। ছড়া, রূপকথার রাজ্য থেকে কাব্যের উপকরণ প্রচুর সংগ্রহ করেছেন। তবুও তিনি সমসাময়িক শিশু সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশিষ্ট আসনের দাবীদার। শিশুদের জন্যে লেখা তাঁর কবিতাগুলো অপর কাউকে স্মরণ করিয়ে দেয় না। এ ক্ষেত্রে তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান। বাঙলার শিশুদের সাথে তিনি শিশুর মতই যেন মিশে গিয়ে তাদের অন্তরের কথা বুঝবার চেষ্টা করেছেন। তাদের ছোট-খাট কামনা, বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ মূল্য দিতে চেষ্টা করেছেন কবিতায়। বারবার তাদের পল্লীপ্রকৃতির স্বাভাবিক আবেষ্টনীতে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন রূপকথার জগত থেকে শিশুর বাস্তবজগতের কর্মক্ষেত্রেও কম বিস্ময় লুকিয়ে নেই। তাই তাঁর কাব্যের শিশুরা আমাদের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করতে ভালবাসে বেশী, যদিও কালেভদ্রে অনির্দেশ্য রূপকথালোকেও বিহারের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতারাজ্যের শিশুদের বাড়ি তাই 'নিমতলীর গলিতেই' নির্দিষ্ট হয়েছে প্রায়শই,—সাত সাগরের পাড়িতে নয়। 'হাসু' বাংলা শিশু সাহিত্যে এই দিক দিয়ে একটি উল্লেখ্যযোগ্য সংযোজনই বটে। আমার বিশ্বাস, পরবর্তী 'এক পয়সার বাঁসীতে'ও কবি আপন বৈশিষ্ট্য অনেকটাই বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। বাঙলা শিশু সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র, সুকুমার রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, সুনির্মল বসু প্রমুখ কীর্তিমানদের সাথে জসীমউদ্‌দীনের নামটি উচ্চারিত হলে, সেটা তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত স্বীকৃতি বলেই বিবেচ্য হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

রূপবতী

'রূপবতী' কাব্যটির প্রকাশকাল ১৯৪৬ সাল। কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছিল 'সত্যনিষ্ঠ চির নির্ভীক অক্লান্তযোদ্ধা মৌলভী ফজলুর রহমান, এম এল, এ-কে। উৎসর্গপত্রের আট পংক্তির কবিতায় কবিবন্ধু ফজলুর রহমানের সেবাব্রতী জীবনাদর্শের প্রশংসা করছেন। ক্রোড়পত্রে অজ্ঞাত পল্লীকবির দুটি বিখ্যাত কাব্যপংক্তি উদ্ধৃত করেছেন কবি ঃ—

> "মালিক বাগিচায় ফুলের গাছটি ভোমর উড়িয়া পড়ে,
> তুমি সুজন দেখিয়া করিও পিরীতি, মরিলে বাঁচাইতে পারে।"

এ কাব্যপংক্তির উদ্ধৃতি স্বভাবতই আমাদের মনে কাব্যটির মূল সুর সম্পর্কে একটা ধারণা নিতে উৎসাহিত করে। এ পংক্তি দুটোর তাৎপর্য দৃষ্টে এটাই মনে হয়, সৌন্দর্য ও প্রেমই এ কাব্যের উপজীব্য। পল্লীকবির কাব্যপংক্তির উদ্ধৃতি আমাদের স্বভাবতই বিশ্বাস করতে প্রলুব্ধ করে যে, পল্লীপ্রাণ জসীমউদ্‌দীন এ কাব্যেও হয়ত পল্লীকাব্যের মাল-মশলা কাজে

লাগিয়েছেন। কাব্যের নামকরণটিও কিন্তু এ ধারণার নিতান্ত পরিপন্থী নয়। তবু কাব্য পাঠকালে এ ধারণার তেমন সুষ্ঠু সমর্থন মিলে না। কবি আধুনিক যুগের রোমান্টিক কবিদের ন্যায়ই আপন সৌন্দর্য ও প্রেমভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন। প্রেম-ভাবনাও যেন এ কাব্যে গৌণ ; কবির আশ্চর্য রূপপ্রীতিই এ কাব্যের কবিতাগুলোতে মুখ্যতঃ প্রকাশ খুঁজেছে। প্রেম-ভাবনা যা এসেছে, তা ঐ রূপের অনুষঙ্গ হিসেবেই এসেছে। মোটকথা মানুষের চির অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণারই প্রকাশ ঘটেছে এ কাব্যে। চির চঞ্চল এ রূপ, তাকে কোন বিশেষ আধারেই নিবদ্ধ করে পাওয়া যায় না---নানা দেহের আধারে তার ক্ষণিক উদ্ভাস প্রত্যক্ষ করা যায় বটে ; কিন্তু তাকে একান্ত করে পাওয়া কোন কালেই সম্ভব নয়। অথচ এ চির অধরা রূপকেই তো ধরার অসম্ভব চেষ্টা করে আসছে মানুষ যুগে যুগে। তরুণী নারী যুগ যুগ ধরে তার চোখের কাজলে, মুখের হাসিতে, বাহুর ভঙ্গিমায়, শাড়ীর সুনীল দরিয়ায় সে রূপকেই তো ধরার সাধনা করে আসছে। নারীর দেহের পাত্রে তার বিদ্যুৎ-আভাস লক্ষ্য করেই তো পতঙ্গের মত ছুটে গিয়েছে রূপপাগল প্রেমিকযুবক। রূপের ছোঁয়াচ প্রাণে জাগিয়েছে প্রেমের নেশা ; আবার ঐ রূপেরই আগুনে জ্বলে মরেছে কত প্রেমিকপতঙ্গ ! শিশুর হাসিতে, রমণীর কটাক্ষে, ফুলের হাসিতে, পাখীর কাকলীতে, প্রভাতের শিশিরে, তৃণের শ্যামলতায় এ রূপেরই তো বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করা যায় ; কিন্তু বাসনাবিল মানুষ এর যথার্থ স্বরূপ অনুধাবনে সমর্থ হয় নি কোন কালে ! অথচ দেহ হতে দেহে, প্রাণ হতে প্রাণে তার নিত্যসঞ্চরণ প্রত্যক্ষ করে কবিচিত্তে জেগেছে ব্যাকুলতা, মানব-মানবীর হৃদয়ে গুঞ্জরিত হয়েছে কত সুন্দর কামনা ! তবু রূপ কোনদিন কাউকে ধরা দিল না—চির-চঞ্চল রূপ ক্ষণিকের জন্যে নারীর দেহ-দেহলীতে বাসা বাঁধে, প্রেমের দোলা সৃষ্টি করে তরুণের হৃদয়ে। কিন্তু ওষ্ঠাধর প্রান্তের হাসির রেখার ন্যায়ই তা চকিতে কোথায় মিলিয়ে যায় ! কোন কিছুকে আঁকড়ে ধরে সে যেন স্থির হয়ে ছুটে চলেছে নিরুদ্দেশের পানে। এক অভাগী, প্রেম-বঞ্চিতা, বাকহারা অবলা নারীর ন্যায় সে যেন সারাজীবন কি খুঁজে ফিরছে, 'আপনি সে নাহি জানে।' এ চির-চঞ্চল আপনহারা রূপেরই অনুধ্যান করেছেন কবি নানা দেহের আধারে এ 'রূপবতী' কাব্যে।

রূপের এ সচেতন অনুধ্যান, তার রহস্যানুসন্ধানের এ ব্যাকুলতা পল্লীকবির ভাবনার পরিধিতে আসে নি। রূপের মোহকর প্রভাবে তাঁকেও বিচলিত হতে দেখি, আবেগে উচ্ছ্বসিত হতে দেখি ; কিন্তু তার স্বরূপ সন্ধানের সূক্ষ্ম চেতনা তাঁর মধ্যে তো তেমন লক্ষ্য করি না ! রূপে তাঁরা জগৎ আলোকিত দেখেছেন, 'একদিকে উদয় ভানু চৌদিকে পশর', সে ধারণাও তাঁরা করতে পেরেছেন, রূপের মধ্যে প্রেমের আমন্ত্রণ পেয়েছেন ! কিন্তু রূপকে একটা বিশুদ্ধ idea রূপে, একটা তত্ত্বরূপে তাঁরা ভাবতেও পারেন নি। মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিরা রূপের বন্দনা করেছেন—প্রেমের উজ্জীবকশক্তি হিসেবেই। নারীদেহের আধারে মাঝে মাঝে প্রকৃতিতে তার লীলাচঞ্চল রূপ প্রত্যক্ষ করে হৃদয়ের আরতি নিবেদন করেছেন। তবু হৃদয় গভীরে এ রহস্যানুধাবনের সে প্রচণ্ড তাগিত তাঁরা বোধ করেন নি। মধ্যযুগের শ্বাসরোধকারী সামাজিক পরিবেশে যেখানে ব্যক্তি-চেতনার স্ফুরণ সম্ভব ছিল না, যেখানে মানুষ পারিপার্শ্বিকের প্রায় ক্রীড়নক ছিল, সেখানে এ চেতনা আসবেই বা কেমন করে ! আজ যুগধর্মে মানুষ পারিপার্শ্বিকের উপর প্রভুত্ব অর্জনে অনেকটা সমর্থ হয়েছে, সে আজ বিরাট আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী ; নতুন মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটেছে তার জীবনে—জীবনের বহির্বাটিতেই আজ আর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়, সে আজ মনের অতলান্ত রহস্যানুসন্ধানে ব্যপ্ত। এ বিশেষ জীবনচেতনাই তাকে প্রেম, সৌন্দর্য প্রভৃতি মানবিক বোধগুলোর স্বরূপ

আমরা ইতিপূর্বেই নানা উপলক্ষে নির্দেশ করেছি যে, পল্লীর শ্যামল রূপে মুগ্ধ জসীমউদ্‌দীনের মানসিকতা মূলত ঃ রোমান্টিকের। পল্লীমানুষের স্নেহ-ভালবাসা, দুঃখ-বেদনা, আশা-নৈরাশ্যের বাস্তব প্রতিচ্ছবি আঁকতে গিয়ে বারবার তিনি রোমান্টিক মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষতঃ পল্লীপ্রকৃতির মায়াকাজল রূপে মুগ্ধ কবিচিত্ত তো তাঁর কাব্যে বারেবারেই উঁকি মেরেছে। 'রাখালী', 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ', 'বালুচর', 'ধান-খেত', 'রঙিলা নায়ের মাঝি', 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে', তিনি মুখ্যতঃ পল্লীর জীবনবৃত্তের মধ্যেই পরিক্রমণ করেছেন তা ঠিক, কিন্তু তিনি সে সব ক্ষেত্রে পল্লীচিত্র এঁকেই ক্ষান্ত হন নি—মাঝে মাঝে আপন মনের গভীরে দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রেমসৌন্দর্য ভাবনার বৈচিত্র্য আস্বাদনেরও প্রয়াস পেয়েছেন। এমন কি যেখানে তিনি নিছক সাদামাটি পল্লীপ্রকৃতির বর্ণন দিতে গিয়েছেন, অথবা পল্লী নর-নারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিতে গিয়েছেন, সেখানে তাঁর রোমান্টিক মন মায়াকাজল দৃষ্টি বুলিয়ে তুচ্ছকেও অপরূপ করে তুলেছে। 'নীল নোয়ান সবুজ ঘেরা গাঁয়ের কলাপাতার চামর-দোলানো' কুটিরের মায়া তাই তো তাঁকে আকুল করেছে বারবার। ঐ একই দৃষ্টিতে সাধারণ নর-নারীর প্রেমচিত্রগুলো ও 'শিশির সিক্ত তরুণ পত্রের' ন্যায় মাঝে মাঝে 'অরুণ কিরণে ঝলসিত' হয়ে উঠেছে। এমন অপরূপ দৃষ্টির অধিকারী যিনি, প্রেমসৌন্দর্যের গভীর লোকে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রবল হলে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে! তাই তো পল্লীপথে পরিক্রমণরত কবি একদিন 'বালুচরে'র ঊষরতায় গেয়ে উঠেছিলেন বেদনাদগ্ধ মন নিয়ে, 'ধানখেতে'ও সে বেদনার্ত কবিচিত্তের পদক্ষেপ দৃষ্ট হয়েছে। তাই তো 'রূপবতী'র কবির রূপ-প্রিয়তার তীব্রতা আমাদের কিছুটা চমকিত করলেও তেমন বিস্মিত করে না। 'রূপবতী'তে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করি, তা হচ্ছে এখানে কবি পল্লী-বেশের প্রতি আনুগত্য প্রায়শই রক্ষা করেন নি ; অনেক ক্ষেত্রেই নগরের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। তদনুসারে কবিতার ভাষায়ও লক্ষণীয় পালিশ দেখা দিয়েছে। প্রাকৃতিক আবেষ্টনী থেকে দৃষ্টি তাঁর মনের অঙ্গনে ফিরেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। জীবনচিত্র নয়, প্রেমসৌন্দর্যের অনেকটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভাবনাই মুখ্য হয়ে উঠেছে এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতায়। আর তারই অনুষঙ্গ হিসেবে সৌন্দর্য ও প্রেম সম্পর্কিত স্বপ্ন-কামনার ব্যর্থতা উপলব্ধিজনিত হতাশা, বেদনাবোধ ও দুঃখার্তি বেজে উঠেছে। সকল রোমান্টিক কবিই আদর্শবাদী ও আদর্শসন্ধানী—বাস্তবে সে ধ্যেয় আদর্শের সন্ধান বড় একটা মিলে না, তাই তো রোমান্টিকের হৃদয় অশ্রু-বাষ্পে টলমল ; 'রূপবতী'র কবিও তার ব্যতিক্রম নন। 'বালুচরে'র ন্যায় 'রূপবতী'র কবিও দৃষ্টিভঙ্গির এই বিশেষত্বে রবীন্দ্রানুসারী রোমান্টিক কবিদেরই দলভুক্ত। কাব্যের ভাববস্তু ও প্রকরণগত দিক থেকে তিনি এ ক্ষেত্রে তেমন কৃতিত্বের দাবিদার নন। কাব্যবস্তু যথার্থ ভাষা ও ছন্দে বিধৃত হয় নি বলেই এ ব্যর্থতা!

বস্তুতঃ জসীমউদ্‌দীন 'রূপবতী' কাব্যে নতুন পথের সন্ধান পান নি, 'বালুচরে' যে পথরেখা স্পষ্ট চিহ্নিত হয়েছিল, 'ধানখেতে'র সবুজ আস্তরণেও যা হারিয়ে যায় নি, সে পথরেখাই আর একবার সুচিহ্নিত হয়েছে 'রূপবতী' কাব্যে। তবে এখানে কবির জীবনবৃত্ত পল্লীসীমাকে বিশেষ মান্য না করে নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছে বৃহত্তর ক্ষেত্রে। তাই দেখি 'রূপবতী' কাব্যে 'বালুচর', 'ধান-খেত', 'নদীপারে'র গণ্ডী ছাড়িয়ে কবি রূপকথার রাজপুরী, বাস্তবের জনারণ্যে, নগরীর পথেঘাটে, প্রাসাদে, গরীবের বস্তির মধ্যেও প্রেমসৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন। অবশ্য তাই বলে তিনি পল্লীপরিবেশকে একেবারে বিস্মৃত হয়েছেন এমন বলা ঠিক হবে না। 'বেদেনী', 'চাষীর মেয়ে', 'তোমার দ্যাশে যাব কন্যা' ইত্যাদি বেশ কিছু কবিতায় পল্লীপথরেখার সন্ধান মিলে। পরিবেশের কথা থাক, ভাবনা ও

প্রকাশকলার ক্ষেত্রেও কবি কোন নতুন উদ্ভাবন ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন নি এ কাব্যে। 'রূপবতী'র সৌন্দর্য ভাবনামূলক কবিতাগুলোর মূলগত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান আমরা 'ধান-খেতে'র 'ফুলের পূজারী', 'স্বপনপ্রিয়া'র মত কবিতায় পাই, আবার 'রূপবতী'র প্রেমভাবনার বৈশিষ্ট্য অনেক আগেই বালুচরে'র 'পরাজয়', 'প্রতিদান', 'তোমায় ভুলেছি আজ', 'মুসাফির', 'আর একদিন আসিও বন্ধু', এবং ধান-খেতের 'কারে আমি চাই', 'একা', 'অবেলা', ইত্যাদি কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি। কৌতূহলী পাঠক 'বালুচর', ও 'ধান-খেতের উল্লিখিত কবিতাগুলো স্মরণ রেখে 'রূপবতী'র কাব্য পাঠে অগ্রসর হলেই এ ধারণার সত্যতা যাচাই করতে সমর্থ হবেন।

রূপবতী কাব্যে সংকলিত কবিতার সংখ্যা পঁয়ত্রিশ। অবশ্য কাব্যের মুখবন্ধ বা ভাবকুঞ্জী রূপে সন্নিবেশিত নামহীন কবিতাটিকে এ হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি। 'রূপবতী' কাব্যের মূল সুর যে সুতীব্র রূপপ্রিয়তা ও রূপের স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা—তারই ইঙ্গিত মুখবন্ধের এ কবিতাটিতে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এ কাব্যের সুরের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই আমরা সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। রূপতৃষ্ণাই যে প্রেমের উৎস, রূপ যে চির অধরা—তাই কবি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন কবিতাটিতে। এ রূপের মহিমা অসাধারণ—এ রূপের আরতি করেছে চরাচর, এ রূপের জন্য সর্বস্বত্যাগ করেছে প্রেমিক—এমন কি প্রাণ বলি পর্যন্ত দিয়েছে যুগে যুগে। তবুও রূপের মর্মস্থলে পৌঁছতে পারে নি কেউ। রূপের হাওয়ায় প্রেমের কুসুম ফুটেছে, মুখর হয়ে উঠেছে চরাচর। কিন্তু রূপ চির-চঞ্চল। রূপ চিরটা কাল ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে মানুষকে হাতছানি দিচ্ছে। তাকে পাগল করে তুলছে। রূপের এই রহস্যময় প্রভাব ও মহিমারই স্বীকৃতি শুনতে পাই যখন কবিকণ্ঠে শুনতে পাই ঃ—

"তুমি কি জান না রূপ
দেহের ধূপের পাত্র ভরি,
তোমা লাগি হোম মন্ত্র
ধ্বনিছে দিবস-বিভাবরী
কত যে হইল প্রাণবলি
কত যে হইল তনুক্ষয়।
হায় রূপ! চিরচঞ্চল রূপ।
তবুও তুমি কাহারো ত হলে নয়।
তোমার তনুর হাওয়া লাগি
প্রেমফুল ফুটিয়া টুটিয়া মরে যায়,
কবার কাকলী ওড়ে পথে
সোহাগে আদরে ঝুরছায়।"

'রূপবতী'তে আমরা মানুষের এ অপরূপ রূপতৃষ্ণা ও তজ্জনিত প্রেম, ভালবাসা ও স্নেহের তরঙ্গদোলায় দোলায়িত মানব হৃদয়েরই সুন্দর আলেখ্য প্রত্যক্ষ করি।

রূপবতী কাব্যের 'উপহার' ও 'কুকুম বোনের সুত পরিণয়ে' কবিতা দুটি ছাড়া বাকী কবিতাগুলোকে মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা চলে—এক ঃ রূপসৌন্দর্য-ভাবনামূলক। দুই ঃ প্রেমানুভূতিমূলক। বলা বাহুল্য দুয়ের স্পষ্ট পার্থক্যরেখা সর্বত্র আবিষ্কার করা সম্ভব নয়, কারণ প্রেমভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই সৌন্দর্যের অনুষঙ্গ হিসেবে এসে যায় বলে, দুয়ের পার্থক্যরেখা সব সময় বজায় থাকে না। তবুও 'রূপবতী' কাব্যে এ দু ধারার কবিতা চিনে নিতে

বড় কষ্ট হয় না। যে দুটো কবিতাকে আমরা ব্যতিক্রম হিসেবে ধরেছি, সে দুয়ে সৃষ্টির উপলক্ষে সামাজিক অনুষ্ঠান ও এ উপলক্ষে স্নেহভাজনদের শুভেচ্ছা জানানোর আন্তরিক তাগিদ।

'উপহার' কবিতাটি লেখা হয়েছিল কবিবন্ধু চিরনিষ্ঠাক অক্লান্ত যোদ্ধা ফজলুর রহমানের (যাঁকে কবি রূপবতী কাব্যটি উৎসর্গ করেছেন) বিবাহ উপলক্ষে নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে। 'কুঙ্কুম বোনের শুভ পরিণয়ে' কবির স্নেহস্মৃতি-সিক্ত মন একটি অনাত্মীয়া বোনের বিয়েতে আনন্দ প্রকাশ করেছে। সে মেয়েটির সাথে কবির পরিচয় ছিল মাত্র তিনটি দিনের, কিন্তু তিনটি দিনেই সে কবিকে ভাইয়ের মত আপন করে নিয়েছিল। সে কবিকে জানিয়েছিল অনুরোধ—'আমার বিয়ের দিনে পদ্য একটা সদ্য লিখে, পড়তে হবে স্বয়ং এসে'। সে অনুরোধ পূরণ করতে গিয়েই এ কবিতার সৃষ্টি।

এবার আমরা 'রূপবতী' কাব্যের যা প্রধান সম্পদ, এর সৌন্দর্য ও প্রেমভাবনামূলক কবিতাগুলোর বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হব। রূপবতী কাব্যের নামের মধ্যেই রয়েছে রূপসৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা। বস্তুতঃ এ কাব্যে কবি মুখ্যতঃ রূপের জন্যে মানব মনের শাশ্বতকালের আকুতিকেই ভাষা দিয়েছেন। নানা দেহের পাত্রে ভরে কবি এ রূপের স্তব গান করেছেন শুধু নারীদেহ নয়, প্রকৃতির সবুজ উদার বিস্তারের মধ্যেও তিনি রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এমন কি প্রেমানুভূতির জগতেও সে সৌন্দর্যের বিদ্যুৎ আভাস লক্ষ্য করেছেন। 'রূপবতী'র অধিকাংশ কবিতায়ই রূপের আরতি করা হয়েছে নানা ছন্দে। 'রূপবতী', 'রাজার কুমারী', 'সোনার মেয়ে', 'গৌরী গিরির মেয়ে', 'বেদেনী', 'শ্যামলী', 'চাষীর মেয়ে', 'উমাবতী সেন', 'কল্যাণী', 'হলুদ বাটিতে মেয়ে', 'বস্তির মেয়ে', 'সাহাজাদী', ইত্যাদি কবিতায় নারীদেহের আধারে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন কবি। রূপের নিছক রোমান্টিক কল্পনাবিলাসও প্রত্যক্ষ করা যায় কিছু কবিতায়। আমরা ক্রমান্বয়ে সে সব কবিতার আলোচনা করব। এ কাব্যের প্রেমানুভূতির কবিতাগুলোতে প্রসন্ন পরিতৃপ্তির সুর লক্ষ্য করি, আবার কোথাও রোমান্টিকসুলভ দীর্ঘনিঃশ্বাস, হতাশা ও বেদনার ছাপ লক্ষ্য করি। 'নিশীথ গীতিকা', 'ভাব', 'সুন্দর', 'সার্থক দিন', 'নীরব ভাষা', 'সার্থক রজনী', 'সম্বল', 'আমি ত তোমার কেহ নই', 'একটি বিরহ রাতেরে কথাতে', 'অরবারা পরবাসী', 'স্বপ্ন প্রেম', 'বড় অসময়ে এসেছ বন্ধু', ইত্যাদি কবিতাগুলোতে কবির প্রেমভাবনারই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। প্রথমে আমরা কবির রূপ ও সৌন্দর্য-ভাবনামূলক কবিতাগুলো আলোচনা করছি।

নাম-কবিতা 'রূপবতী' যেন এ কাব্যে বর্ণিত সকল খণ্ড-বিচ্ছিন্ন রূপচিত্রের একীভূত রূপ। এ কবিতাটিকে কবির সৌন্দর্য-ভাবনার বৈশিষ্ট্য দ্যোতক কবিতা বলা চলে। সকল খণ্ড বিচ্ছিন্ন রূপবস্তুর সমবায়েই যেন রূপবতীর দেহ গড়ে উঠেছে। তাই তো 'রূপবতীকে লক্ষ্য করে কবি মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেন ঃ—"তোমার সোনার অধর ঘেরিয়া খেলিছে রূপের স্মৃতি। তার অঙ্গভঙ্গিতে খেলে যাচ্ছে যেন বিজলীর তরঙ্গ, সন্ধ্যার মেঘ যেন 'রাঙা অনুরাগ হয়ে তার গায়ে জড়িয়ে থাকে। 'আকাশের নীল মায়া', 'ধূসর বনানীর শ্যামছায়া', 'মেঘ কুন্তলীর অনন্ত আঁধিয়ার', 'বদ্যোতের আলো', সব কিছুই যেন তার দেহসৌষ্ঠব বাড়াতে সাহায্য করেছে। তদুপরি ঃ—

"নিখিল নরের মমতা-কুসুম একটি একটি ছিঁড়ে
তব কণ্ঠের মালার হার গড়ে নিয়েছিল ধীরে।"

'রূপবতী'র এ মমত্বময় রূপ তুষার ভবনের তন্তুতা নিয়ে বিরাজ করেছে অনন্তকাল ধরে। তার বরণ বহ্নিতেই বিলোক-কামনানলে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে বারবার। ভস্মীভূত হয়েছে সকল স্থবিরতার জঞ্জাল। এ রূপবতী যেন কামনার হোমানলে 'লক্ষ বছর ধরিয়া

'আজি ফুটিয়াছে মন্ত্রসিদ্ধ বাসনার শতদলে'। এ রূপের প্রভাবে 'আকাশ বাতাস কাঁপে থর থর, মূরছে দিগঙ্গনা/ গ্রহ তারাগুলি দুলিয়া শূন্যে পড়িতেছে বন্দনা'। রূপের এ সর্বাতিশায়ী প্রভাব কবিচিত্তকে করেছে আলোড়িত, একে বরণ করে নেবার প্রবল তৃষ্ণায় কবি কামনা করেছেন,—'সে রূপ জ্যোতিরে লয়ে, ছড়ায়ে পড়িব যুগ হতে যুগে স্তবের কুসুম হয়ে'। বড় সুন্দর কবির এ কামনাটি—সকল রূপ পূজারীরই অন্তরের কামনা এতে ধ্বনিত হয়েছে। এ আকাঙ্ক্ষারই একটি চমৎকার কাব্যিক ভাষ্য রচনা করেছেন কবি 'সতীদেহ স্কন্ধে শিবের বিশ্ব পরিক্রমার' পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্য নিয়ে। কথিত আছে পিতার মুখে স্বামী-নিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করলে, শোকোন্মাদ শিব সতীদেহ স্কন্ধে লক্ষ্যহীন ভাবে যখন বেড়াচ্ছিলেন, তখন বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিকৃত সতীঅঙ্গ বিভিন্নস্থানে প্রতিত হয়েছিল এবং ঐ সকল স্থান তীর্থ বা পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। আমাদের কবি কাহিনীটি স্মরণ করেই যেন কামনা প্রকাশ করেছেন তিনি রূপবতীর সারীভূত রূপদেহ স্কন্ধে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে ছুটে যাবেন এবং বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীদেহের ন্যায়ই তার সোনার অঙ্গ হতে রূপকলি খসে পড়ে বিভিন্নস্থানে সৌন্দর্যের পীঠস্থান রূপে পরিণত হবে। যুগ যুগ ধরে রূপের পূজারীরা সে রূপের পূজা করবে।

বলাবাহুল্য এ কবিতায় সৌন্দর্যের খণ্ড বিচ্ছিন্ন রূপের সারীভূত ঐক্যের কল্পনা তাঁর সর্বাতিশায়ী প্রভাবের কল্পনা এবং একান্ত করে সৌন্দেযের পূজারী হওয়ার একটি অপরূপ কামনার যে প্রকাশ ঘটেছে, তা আমাদের রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদৃষ্টির বৈশিষ্ট্যই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়। জসীমউদ্‌দীন যুগধর্মে রবীন্দ্র প্রভাবের দোলা যে বেশ ভাল ভাবেই অনুভব করেছিলেন তা এ কবিতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবশ্য তিনি রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য তীক্ষ্ণ অনুভূতি, কল্পনাশক্তি এবং অসাধারণ কলানৈপুণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাই এ কবিতায় তিনি তত্ত্বের দিক থেকে বেশ মূল্যবান কথা বললেও, তার প্রকাশে তেমন শিল্পকুশলতার পরিচয় দিতে পারেন নি।

'রাজার কুমারী' কবিতাটি জসীমউদ্‌দীনের রূপপ্রিয়তার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। স্বপ্নবাসিনী রূপকথার রাজকুমারীর অলৌকিক অসামান্য রূপ এখানে কবির বর্ণনায় এমনই মূর্ত হয়ে উঠেছে যে, আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে তা নিরীক্ষণ করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। রাজকুমারীর এ সর্বাতিশায়ী রূপ যথার্থই অনুভবগম্য। রাজকন্যার রূপের প্রশস্তি রচনা করতে গিয়ে রূপকথার রাজ্য থেকে উপমা, শব্দ ও চিত্র গ্রহণ করে কবি আপন রোমান্টিক মনোভঙ্গিকেও স্পষ্ট করে তুলেছেন। এতে অসাধারণত্ব নেই কোথাও, কিন্তু রূপকথার আমেজ থাকায় রূপের বর্ণনা উপভোগ্যই হয়েছে।

'সোনার মেয়ে' কবিতায়ও নারীদেহের পাত্রে পুরে সৌন্দর্য-সুধা পান করার প্রয়াস পেয়েছেন। কবিতাটি রচনার উপলক্ষ জুগিয়েছে বুদ্ধদেব বসুর কবিতার দুটি পংক্তিঃ—

"শোনা গো সোনার মেয়ে!—
আমার হৃদয় অধীর হয়েছে তব আঁখি কোণে চেয়ে।"

জসীমউদ্‌দীন এ কাব্য পংক্তির প্রতিধ্বনি করেই বলেছেন ঃ—

"শোন গো সোনার মেয়ে!
আমি যেন আজ বহু কথা কব তব মুখ পানে চেয়ে।"

'সোনার মেয়ে' নামকরণের মধ্যেই কবির স্নেহসিক্ত প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের ছাপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ সোনার মেয়ে রূপকথার রাজকুমারী নয়, কোন কল্পলোকবাসিনী নয়, এ মেয়ে দুঃখ, ব্যথা-সংশয়ম্লান আমাদের প্রাত্যহিক সংসারে কলুষ-কালিমার মধ্যে স্নেহ-প্রেমের শুভ্র নিষ্পাপ হাসি নিয়ে প্রস্ফুটিত একটি সাধারণ মেয়ে।

'গেঁয়ো দেবতার দেউলে পূজার পাত্রখানি' রূপে রক্ষিত পল্লীবালার সরল শুভ্র রূপের বন্দনাই করেছেন এ কবিতায়। তবে কবির দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক রোমান্টিক কবির। রবীন্দ্রানুসারী কবিদের ন্যায় জসীমউদ্‌দীন এখানে আদর্শেরই পূজারী। ধান-খেত কাব্যের' 'ফুলের পূজারী', 'স্বপনপ্রিয়া', প্রভৃতি কবিতায় কবির এই সৌন্দর্যদৃষ্টির পরিচয়টি অনেক আগেই ফুটে উঠেছিল। এখানে তিনি তেমন নতুন কথা বলেন নি। ভিন্ন আধারে তিনি একই রূপকে প্রায় একই দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন এ কবিতায়ও।

'গৌরীগিরির মেয়ে' কবিতায়ও কবির আদর্শায়িত সৌন্দর্যদৃষ্টির পরিচয়টিই ফুটে উঠেছে। কবি যেন সৌন্দর্যতীর্থেই পথিক—সৌন্দর্যের অন্বেষায় তিনি চঞ্চল। কিন্তু কামনা-বাসনাবিল মর্ত্য মানবের পক্ষে সুন্দরের যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি যে অতি সুকঠিন ব্যাপার তা কবি ভালভাবেই জানেন। তাই তো দেখি তিনি গিরি-সুতাকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ—

"কি কুহকে ভুলে ওগো গিরি-সুতা ! এসেছ মরতে নামি,
কে তোমার লাগি পূজার দেউল সাজায়েছে দিবা যামি !
হেথায় প্রখর মরীচি-মালীর জ্বলে হুতাশন জ্বালা,
দহনে তোমার শুকাবে নিমিষে বুকে মন্দার মালা।
মরতের জীব বৈকুণ্ঠের নাহি জানে সন্ধান,
ফুলের নেশায় ফুলেরে ছিড়িয়া ভেঙ্গে করে শতখান।
রূপের পূজারী রূপেরে লইয়া জ্বালায় ভোগের চিতা,
প্রেমেরে করিয়া সেবাদাসী এরা রচে যে প্রেমের গীতা।'

কবির বক্তব্য, কামনার বিষবাষ্পে সমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে যেখানে মানুষের সাধনা, ত্যাগ-তিতিক্ষার মূল্য সম্পর্কে একেবারেই সচেতন নয় সেখানে সৌন্দর্য মহিমার যথার্থ উপলব্ধি ঘটবে কেমন করে? গৌরীগিরির মেয়ে রূপিণী গঙ্গার কল্পনা-সমৃদ্ধ অপূর্ব রূপচ্ছবির মহিমা অনুধাবন করতে গিয়ে রোমান্টিক কবির ন্যায়ই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের অনুধ্যানের প্রয়াসের ব্যর্থতাকে অনিবার্য বলে ধরে নিয়েছেন। ইতিপূর্বে রাখালীর 'কিশোরী' কবিতায়, ধান-খেত কাব্যের 'ফুলের পূজারী' কবিতায় আমরা কবির এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়েছি। তাই তো দেখেছি এখানেও ব্যথাহত কবি সৌন্দর্যসাধানার ব্যর্থতার বেদনাকে চাপা দেওয়ার প্রয়াসেই যেন আকুল হয়ে গিরি-সুতাকে অনুরোধ করেছেন,—'তুমি ফিরে যাও, হে গিরি-দুহিতা, তোমার পাষাণ পুরে'। মর্ত্যের বাসনাদগ্ধ মানুষ যেন তার সৌন্দর্য মহিমা উপলব্ধি করার অধিকার থেকে বঞ্চিত ! তথাপি কবি 'গৌরীগিরির মেয়ে' তথা গিরি-সুতা গঙ্গার রূপের মহিমা পরিস্ফুট করে তুলতে কোন কার্পণ্য করেন নি।

সৌন্দর্য পূজার এ সাধ সকল রোমান্টিক কবিরই এক বিলাস বটে ! হিমালয়বুক-নিঃসৃতা গঙ্গার প্রাকৃতিক রূপকে আশ্রয় করে কবি যে স্বপ্ন-সৌন্দর্যের জাল বুনেছেন, তার বিশিষ্টতা স্বীকার করতেই হয়।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদৃষ্টির প্রতিভাস লক্ষ্য করি এ কবিতায়—যদিও তাঁর শিল্প-চেতনার সূক্ষ্মতা এ কবিতায় অনুপস্থিত। এ কবিতায় একটি লক্ষ্যণীয় জিনিস হল কবি হিন্দু পুরাণ থেকে কিছু কিছু উপাদান কাজে লাগিয়েছেন। তীর্থপরিক্রমার কাল্পনিক চিত্রটিও কবির পৌরাণিক বিষয়ে জ্ঞানের পরিচায়ক। মহাদেব, হৈমবতী, মন্দাকিনী ইত্যাদির উল্লেখেও এ

ধারণার সমথন মিলে। তাছাড়া এ কবিতায় কবি কালিদাসীয় কল্পলোকের দ্বারস্থ হয়েছেন বেশ কয়েক বার। 'অলকার মেয়ে', 'বিরহী যক্ষে'র উল্লেখে এবং 'চিত্রকূটের লেখন বহিয়া ফেরে মেঘ জলধারে', 'দর্ভকুমারী নিবারের বনে তৃণ আছে বিস্মরি', 'কণ্ঠে করিও কিংশুকমালা, পাটল পুষ্প কানে; নীপ-কেশরের রচিও কবরী নব আষাঢ়ের গানে', ইত্যাদি বাণীভঙ্গিমায় কালিদাসীয় কল্পলোকের প্রভাব স্পষ্ট। বলা বাহুল্য এ সূত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছেও ঋণী।

'বেদেনী' কবিতায় কবি সাপের খেলা দেখিয়ে পল্লীপথে ভ্রমণরত বেদে দম্পতির প্র্যাত্যহিক কর্মধারার বর্ণনা-সূত্রেই 'বেদেনীর' রূপের প্রশস্তি রচনা করেছেন। চেকন চোকন গঠন, মাথায় লম্বা কেশ বেদে নারীর চলনভঙ্গিমায় কবি বিজলীর বিচ্ছুরণ প্রত্যক্ষ করেছেন গতানুগতিক ভাবেই তার রাঙা মুখের হাসিতে দেশ পাগল হয়, এ সংবাদও তিনি আমাদের দিয়েছেন। রমণীর হাসির এ ক্ষমতায় জসীমউদ্‌দীন বিশ্বাস স্থাপন করেছেন অনেক আগেই! এতে অভিনবত্ব নেই কিছুই। কিন্তু যখন কবি তার সর্পভূষিত তয়াল সুন্দর রূপের আভাস দিয়ে বলেন, 'সাপগুলো সোনামুখের রূপ দেখে তার ভুলেছে বিষের তাপ', তখন কবির সৌন্দর্যকল্পনার বিশেষত্বটুকু বুঝতে পারি। এ রূপে আমরা অভ্যস্ত নই। হাতে কাল্ অজগর, গলায় কাল্ কেউটে, মাজায় হলুদ বরণ সাপ জড়ানো বেদেনীর চিত্রটি অভিনব সন্দেহ নেই। বোধহয় বেদেনীর রূপ ক্রূঢ় সর্পকেও মোহাবেশে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, কবির এ ধারণার মধ্যেই তাঁর রোমান্টিক মনোভাবটির চূড়ান্ত স্ফূর্তি ঘটেছে। নারী-রূপের প্রশস্তিতে কবিরা কতদূর যেতে পারেন, তার ধারণা আমরা এ কবিতা থেকে অনেকটা করতে পারি।

'শ্যামলী' কবিতায় শ্যামল-বরণী মেয়ের স্নিগ্ধ রূপে মুগ্ধ কবিচিত্তের আকুলতাই যেন প্রকাশ পেয়েছে। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের অভিসারী কবি এখানেও কামনা-বাসনার আবিলতাবোধ-জনিত মানসিক সংকট বোধ করেছেন।

এই যে কামনাবহ্নির জ্বালা, যাকে কবি 'দহন-নাগের' মালা বলে ইতিপূর্বে বহুস্থলে উল্লেখ করেছেন, এটা কোন অনুভূতিলব্ধ সত্য বলে মনে হয় না। কবি রবীন্দ্রপ্রভাবিত বিশুদ্ধ সৌন্দর্য দর্শনের তত্ত্বকেই যেন মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা দিয়ে কিছুটা পরিপাক করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। কিন্তু আমরা বলতে বাধ্য, শিল্পসৃষ্টির দিক থেকে এ কবিতা অকিঞ্চিতকর। ছন্দ, শব্দচয়ন, উপমা ব্যবহার, ভাবকল্পনায় তিনি চূড়ান্ত গতানুগতিক পথের অনুসারী হয়েছেন। সৌন্দর্যপ্রশস্তি রচনা করতে গিয়ে যে সস্তা ভাবালুতার পরিচয় দিয়েছেন কবি, তা কবিতার শিল্পসার্থকতার পরিপন্থী হয়েছে।

'চাষীর মেয়ে' কবিতায় কবির দৃষ্টি পল্লীপথে প্রসারিত হয়েছে ক্ষণিকের জন্যে। কর্মরতা চাষীর মেয়ের শ্যামল রূপ দেখে স্নেহে দ্রবীভূত কবি স্নেহসিক্ত ভাষায়ই তার রূপের তারিফ করেছেন। পল্লীপ্রাণ কবি পল্লীর আভাসেই যে কেমন চাঞ্চল্য ও মাদকতা অনুভব করেন, কেমন শিশুর ন্যায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন এ কবিতায় তার পরিচয় মেলে। এ কবিতায় পল্লীপারিপার্শ্বিক কবির লক্ষ্য নয়, তা নিতান্তই চাষীর মেয়ের অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে। জসীমউদ্‌দীন এ কবিতায় সরলা পল্লীবালিকার সাদামাটা রূপকেই রোমান্টিক মন দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাতে মুগ্ধ হয়েছেন, খুশী হয়েছেন।

'উষাবতী সেন' কবিতায় কবির সৌন্দর্যকল্পনা উদ্দীপিত হয়েছে আধুনিকা নারী উষাবতী সেনের প্রসাধনকলা মণ্ডিত দেহবল্লরীকে আশ্রয় করে। এ কবিতার প্রেরণারূপে জীবনানন্দ দাসের 'বনলতা সেনে'র ভূমিকা স্বতঃই পুষ্ট হয়ে কালোত্তীর্ণ সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করেছে। এ

কবিতা বিশেষ কালের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও কালাতীতের মহিমা লাভ করতে পেরেছে উপযুক্ত কবিশিল্পীর হাতে পড়েছিল বলে। জসীমউদ্‌দীনের 'উষাবতী সেন' কিন্তু সে সৌভাগ্যের অধিকারিণী হতে পারে নি। কবিতার নামকরণে, শব্দ চয়নে, পরিবেশ সৃষ্টিতে, উপমা ইত্যাদি ব্যবহারে কিছুটা আধুনিক মন ও মেজাজের পরিচয় থাকিলেও, 'উষাবতী সেন' কোন কালোত্তীর্ণ সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে নি। যে দুর্লভ শিল্পক্ষমতা ও রসদৃষ্টি কাল-পারিপার্শ্বিকের মর্যাদাকে শিকার করে নিয়েও বিশেষকে দিতে পারে নির্বিশেষের মহিমা, ক্ষুদ্রকে দিতে পারে বৃহতের সাথে যুক্ত করে, সমকালের মধ্যেই অনাগতের পদ সঞ্চরণ উপলব্ধি করতে পারে এবং কালসীমায় সঙ্কুচিত নশ্বর মানুষের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করতে পারে নিত্যকালের মানুষের শাশ্বতরূপকে, সে ক্ষমতা জীবনানন্দের যদি বা ছিল, জসীমউদ্‌দীনে তা একেবারেই অনুপস্থিত। তাই তাঁর 'উষাবতী সেন' বিশেষ স্থানিক ও কালিক বিশিষ্ট্য অতিক্রম করে নিত্যকালের জিনিস হয়ে উঠতে পারে নি। সে জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত কলাকৌশলও জসীমউদ্‌দীনের অনায়ত্ত ছিল। তাইতো আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে গিয়েও তিনি আধুনিক হয়ে উঠতে পারেন নি। মন যার রয়েছে পেছনে বাঁধা, নাগরিক কোলাহলের মধ্যেও যিনি পল্লীরূপের ধ্যানে বিভোর, তাঁর পক্ষে ইচ্ছা সত্ত্বেও আধুনিকতার ডাকে সাড়া দেওয়া তেমন সম্ভব হয় নি। তবু নিজেকে আধুনিক কালের কবি হিসেবে পরিচিত দেখার সাধ কবির কম ছিল না। পল্লীকাব্যের দেহ-মার্জনেই তাঁর সে চেষ্টা সীমিত নয় ; পল্লী-বহির্ভূত জীবনের কথা বলার চেষ্টাও তিনি করেছেন—তাতে খুব একটা সার্থকতা না দেখা দিলেও।

'উষাবতী সেন' কবিতাটি জসীমউদ্‌দীনের কবিস্বভাবের এ দ্বৈধেরই পরিচয় বহন করে। তিনি এখানে বক্তব্যে ও প্রকাশকলায় কিছুটা আধুনিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু তার সেই প্রয়াস তেমন সার্থকতামণ্ডিত হয় নি। তাই আমরা দেখতে পাই আধুনিকা 'উষাবতী সেনে'র আধুনিকতার পরিচয় বাইরের বেশভূষাতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, তা কবিতার স্বভাবের অন্তর্গত হয়ে দেখা দেয় নি।

'কল্যাণী' কবিতায় কবি কল্যাণী নাম্নী প্রেমিকা নারীর রূপেরই আরতি করেছেন রোমান্টিকের মন নিয়ে। নারীরূপ নিয়ে কবির ভাব বিলাসিতায় কিছুটা অভিনবত্ব দেখা দিয়েছে এ কবিতায়। কবিতার শেষ দুই স্তবকে কবি ওমর খৈয়াম ও হাফেজের প্রেমবিগলিত নয়নেই যেন নারীরূপের মহিমাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কবিতাটিতে হিন্দু পুরাণের তথ্য ও ইসলামী আধ্যাত্মসাধনার আদর্শের সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। তবে কবিতার প্রকাশকলার গতানুগতিকতা কবির সীমাবদ্ধ শিল্পীক্ষমতার কথা এখানেও স্মরণ করিয়ে দেয়।

'হলুদ বাঁটিছে মেয়ে' অতি সাধারণ একটি কর্মরতা নারীর চিত্র। রোমান্টিক কবির হাতে পড়ে সে 'দেবীর সৌন্দর্যমহিমা' লাভ করে ফেলেছে।

রোমান্টিক কল্পনার অতিশয্যে কবি কাব্যবস্তু নির্বাচনে, চিত্রাঙ্কনে এখানে ঔচিত্যবোধ ও মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন বলেই মনে হয়।

'বস্তির মেয়ে' কবিতায় সৌন্দর্যের কল্পলোক থেকে কবি বাস্তবের সমভূমিতে নেমে এসেছেন। রূঢ় বাস্তবজীবনের শত ক্লিন্নতার মধ্যেই তিনি সৌন্দর্যের একটি ঝলক প্রত্যক্ষ করেছেন এ কবিতায়। গরীব বাবা-মায়ের সন্তান সে ; অলঙ্কারের আড়ালে তার দেহের স্বাভাবিক লাবণ্যটি চাপা পড়ে নি। তার হাসি যেন প্রথম ভোরের ফুলেরই হাসি, ভোরের টলমল শিশিরের ন্যায় তার অঙ্গের লাবণি, তার সোনার বরণ শরীরের স্পর্শলোভে যেন ভোরের বাতাস পাতাবাহারের পাতা দুলিয়ে ছুটে আসে। বস্তির বদ্ধ পরিবেশে মেয়েটি যেন

এক ঝলক সূর্যের আলো, ফুলের সৌরভ। কবির এ সহজ সৌন্দর্যবোধ আমাদের কিছুটা তৃপ্তি দেয় বই কি।

'শাহ্‌জাদী' কবিতায় পুরুষের প্রেমরাজ্যের সম্রাজ্ঞী নারীর রূপেরই স্তুতি করা হয়েছে। শাহ্‌জাদীর হাসিতে যেন গোলাপ কলি প্রস্ফুটিত হল বলে মনে হয়। শাহ্ জামশিয়াদের জীবনে রঙীন কামনার ঢেউ তুলেছিল এ নারী—গজলের সুরে বুলবুলি পাখীর ন্যায় সে শুনিয়েছে প্রেমের বাণী। এ নারী যেন এক শুভক্ষণে উর্বশীর ন্যায় সমুদ্র তরঙ্গের উপরে ভেসে উঠেছিল। ওমর খৈয়ামের মত কবিরা কবিতায় সে রূপকেই ফুটিয়ে তুলে অমরত্ব লাভ করেছেন। শাহ্‌জাদী অতীত বর্তমানে কত বাদশাজাদারই না স্বপ্ন-কামনার বস্তু হয়ে রয়েছেন। তাজমহল তো এমনি এক নারীর পদতল চুম্বন করে তাঁর রূপের ধ্যান করছে। এ নারীই শাজাহানের 'মমতার মমতাজ'। আজও সেই শাহ্‌জাদী তেমনি জেগে রয়েছে সকল নারীর মধ্যে। তাঁর আবির্ভাবে পৃথিবী যেন আতরের গন্ধে ভরে ওঠে, চাঁদ যেন তাঁর প্রভায় নিষ্প্রভ মোমের বাতির তুল্য হয়ে যায়। মেহেদির রঙে রঞ্জিত তাঁর চরণ-যুগল কত সহস্র হৃদয়ের অনুরাগের রঙেই না রঞ্জিত। প্রেয়সী নারীর মহিমান্বিত সৌন্দর্যমূর্তিই যেন শাহ্‌জাদীর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'সুন্দর' কবিতায় কবি সুন্দরেরই উদাহরণ দিয়েছেন সুন্দর করে। কবি বলেছেন ঃ- 'আকাশের আঙিনায় তুলট মেঘের ফুল ছড়িয়ে সোনার পায়ে হেঁটে চলছে যে চাঁদের কুমারী সে সুন্দর। আর সুন্দর মানস-সরের তীরে রক্তপদ্ম ছিঁড়ে সারা অঙ্গে গহনা রচে যে বিহগী-মরালী সে। এ সবই তাঁর ভাল লাগে। কিন্তু তার চেয়ে সুন্দর বলেই ভাল লাগে—সুন্দর মুখের হাসি ; সে হাসির মধ্যে ভালোবাসার অস্ফুট প্রকাশ থাকলে, তা হয় আরও বেশি সুন্দর'—অতএব কবির আরও বেশী প্রিয়। কোন অসাধারণ বক্তব্য এ কবিতায় নেই, সৌন্দর্যের সহজ বোধকে কবি সহজ ভাবেই ব্যক্ত করেছেন।

নারীদেহের আধারেই শুধু রূপ প্রত্যক্ষ করেন নি কবি, প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও তা আবিষ্কার করেছেন। 'শ্যামলিয়া' কবিতায় রুদ্র গ্রীষ্মের তাপক্লিষ্ট পৃথিবীতে বর্ষার আবির্ভাবে শ্যাম-শস্যের লাবণ্য বিস্তারে প্রকৃতির যে সজীব মূর্তি আত্মপ্রকাশ করল, তারই সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। ছোট এ কবিতাটির দুটি অংশ। প্রথম অংশে গ্রীষ্মের দাবদাহের বর্ণনা আছে—দ্বিতীয় অংশে কবি আকাশে কালোমেঘের বাঞ্ছিত আবির্ভাবের যে ছবিটি এঁকেছেন তা সুন্দর বটে ঃ—

'গলেতে বিজলীমালা বরণ করেছে মালা
আকাশে আঁকিছে রাঙা-রেখা।

শুধু কি তাই? তার চরণপাতের সাথে সাথেই যাদুমন্ত্রের ন্যায় সজীব হয়ে উঠল প্রকৃতি—কদম্ব, কেতকী, কৃষ্ণচূড়া প্রস্ফুটিত হল। আকাশে দেখা দিল রামধনু।

কবি কল্পনা করেছেন রামধনুর শাড়ী পরে মাথায় কৃষ্ণচূড়া ধারণ করে দেখা দিলেন প্রকৃতিদেবী। এ রূপকল্পনা সুন্দর বলতে আমাদের আপত্তি নেই। তারপর গুরুগুরু করে বর্ষার গান শুরু করতেই—প্রকৃতির রূপ একেবারেই যেন পাল্টে গেল,—'শ্যাম-শস্যে ভরিল যে দেশ'। কবি বিস্ময় বিমুগ্ধচিত্তে প্রত্যক্ষ করলেন ঃ—

'নতুন পাতার তলে ফুলের বেসাতি খুলে
বনরাণী ছড়াইছে কেশ।'

প্রকৃতি-রূপমুগ্ধ রোমান্টিক কবির কল্পনা রঙীন মনের স্পর্শে কবিতাটি সমৃদ্ধ। কবিতাটির ছন্দ ও ভাব প্রকাশের উপযোগী হয়েছে। এ কবিতার গ্রীষ্মবর্ণনা এবং এর

ছন্দোভঙ্গি আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'কুহধ্বনী' কবিতার কথা অনেকটা স্মরণ করিয়ে দেয়। যদিও দুই কবিতার মূল সুরে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

'সন্ধ্যা ডুবে যায়' কবিতায়ও কবির সৌন্দর্যচেতনা প্রকৃতির রূপ-আশ্রয়ী। এ সৌন্দর্যচেতনা বহু বন্ধন অতিক্রম করে আলোকপথের অভিসারী হয়ে উঠেছে। অন্ততঃপক্ষে কবিতার শেষাংশে 'তোমার রূপের আলো ছড়িয়ে দিও বায়' কথাটি সৌন্দর্যের অশরীরী কল্পনার আভাস বহন করে। এতে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যকল্পনার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে জসীমউদদীনের স্বকীয়তাও রয়েছে যথেষ্ট। প্রকৃতির সাদামাটা রূপের মধ্যে মাধুর্য আবিষ্কারের একটা সহজাত ক্ষমতা পল্লীকবিদের রচনার ন্যায় জসীমউদ্‌দীনে'র হাতে তা অনেক বেশী কলাশ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

'পেলুম' কবিতায় ছড়ার ছাঁদে কথার মালা গেঁথে কবি সৌন্দর্যের মণিকণিকা সংগ্রহের আনন্দ ব্যক্ত করেছেন।

'রূপবতী' কাব্যে কবি নিছক সৌন্দর্যের কল্পলোকে বিহার করেছেন বললে সত্যেরই অপলাপ হবে। তিনি সৌন্দর্যানুধ্যানের ফাঁকে ফাঁকে বাস্তবলোকেও প্রবেশের যে চেষ্টা করেছেন তার পরিচয় রয়েছে কোন কোন কবিতায়।

'নির্বাসিতা' কবিতায় আমাদের দেশের গৃহবন্দিনী দুঃখ-দৈন্যক্লিষ্ট নারীরূপের যে ছবি কবি অঙ্কন করেছেন, তা যেমনি বাস্তব তেমনি মর্মস্পর্শী। সাংসারিক জীবনের খুঁটিনাটি তথ্যসংবলিত যে ছবিটি তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তা তাঁর সুস্থ বাস্তবচেতনার পরিচয়ই বহন করে। এখানে জীবনভঙ্গিমায় তিনি সম্পূর্ণরূপে আধুনিক কবিদের সগোত্র। একটি সুন্দর উপমা দিয়ে কবি গৃহকোণে নির্বাসিতা নারীর বেদনাক্লিষ্ট ছবিটি ফুটিয়ে তুলেছেন আমাদের সামনে—এ নারী যেন 'রাবণ-রামের গৃহ-কারাগারে কাঁদে বন্দিনী সীতা'। রোমান্টিকতার আমেজ সত্ত্বেও কবিতাটির বাস্তব রস উপভোগ্য।

'তিলেক দাঁড়াও' কবিতায় কবি নারীর গৃহলক্ষ্মী রূপেরই যেন আরতি করেছেন। রোমান্টিক কল্পনার অবলেপ সত্ত্বেও এ কবিতায় জীবনবাস্তবের স্পর্শ আছে। তবে গার্হস্থ্য জীবনের যে মাধুর্যের আভাস কবি দিয়েছেন, তা বিশেষ সামাজিক আদর্শের রঙে রঞ্জিত।

'কল্পনা-বিলাস' কবিতায়ও রোমান্টিক কবি মনের কল্পনা-বিলাসই প্রকাশ পেয়েছে। উপলব্ধির গাঢ়তা নেই বলেই এ কবিতার আবেদন তেমন বেশী হতে পারে নি। কবিতার প্রথম স্তবকে রোমান্টিক মনের বেদনাকাতর বিষণ্ন রূপের আভাস ফুটে উঠেছে।

কবি তাঁর কল্পিত মেয়েটিকে নিয়ে তারপর যথার্থই কল্পনাবিলাসে মেতে উঠেছেন কবিতার একেবারে শেষদিকে। শিশির স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকিত শরৎ রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে কবির মনে হচ্ছে, অমনি একটি মেয়ে যেন 'জোছনা জলে সীনান করিয়া' 'এলোমেলো মেঘ' গায়ে জড়িয়ে, শিশির বিন্দুতে রাঙা মুখের ছায়া দেখে চলতে চলতে অন্যমনস্ক ভাবে ফুলের পাপড়িতে পা লেগে আছড়ে পড়ছে। কবির 'অতি সাধারণ' মেয়েটি ব্যোমচারী কল্পনার স্পর্শে অশরীরী হয়ে উঠছে যেন এখানে। স্বল্প সার্থকতা সত্ত্বেও তিনি কাব্যের এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-নজরুল পরিমণ্ডলের কবি।

'নিশীথ গীতিকা' কবিতায়ও বেদনা ভারাতুর রোমান্টিক কবির মনের পরিচয়টি ফুটে উঠেছে। নাগরিক পটভূমিতে লেখা হলেও কবিতাটিতে বহ্নিপ্রকৃতির ভূমিকাই মুখ্য। গভীর রাত্রি। দিবসের কর্মব্যস্ততার সামান্যতম লক্ষণও কোথাও নেই, সব কিছুই যেন ঘুমে অচেতন। সুসুপ্ত নগরীর রাত্রিকালীন এ নিস্তব্ধ রূপ নিয়ে একটু কবিত্ব করে কবি বলেছেন ঃ 'দিবসের যত কলকোলাহল কুহক ঝোলায় ভরে' 'নগর নটিনী' ঘুমাচ্ছে। বাইরে টিপ্‌টিপ্‌

বৃষ্টি পড়ছে, মাঝে মাঝে বিজলী চমকাচ্ছে চলমান মেঘের বুকে।' চলমান মেঘের বুকে বিদ্যুতের এ আবির্ভাবকে নিয়েও কবি কবিত্ব করেছেন,—'বিজলীর ভীরু মেয়ে কম্পিত শিখা বসনে ঢাকিয়া চলেছে গগন বেয়ে।' এমন রাত্রিতে কবি জেগে আছেন। পাশের বাড়ীতে মেয়েলী কণ্ঠে করুণ সুরের গান ভেসে আসছে, একটি হৃদয়ের কান্না যেন গানের ঐ করুণ সুরে ঝরে পড়ছিল। আকাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় যে বৃষ্টির ধারা ঝরে পড়ছিল, তাও যেন ঐ সুরেই সুর মিলিয়ে ঝরে পড়ছিল। কবির মনে হচ্ছিল ঐ গান কোন নারীর হৃদয়ের উদ্‌গত ব্যথা নয়, তা যেন রাত্রিরই নিঃসঙ্গতার বেদনার গান। রাত্রি যেন ঐ মেয়েটির বুকে বুক রেখে অন্তরের ব্যথা উজাড় করছিল গানের সুরে।

বর্ষারাত্রির নিঃসীম নির্জনতা ও নিস্তব্ধতায় একটি নারীর কণ্ঠের সুর, রাত্রির নৈঃসঙ্গের বেদনাকেই আশ্চর্যরূপে মূর্ত করে তুলেছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'Solitary Reaper' কবিতার একাকী মাঠে কর্মরত বালিকার গানের সুর কবির মনে দোলা দিয়েছিল-"Long after it was heard no more" আমাদের কবির 'নিশীথগীতিকা'ও বোধ হয় এমনি করে নির্জন বৃষ্টিমুখর রাতে আমাদের কানে ভেসে আসে।

যে ভাবনা ও বেদনাবিলাস পূর্ব থেকেই কোন কোন কবিতায় বেশ চড়া সুরে বেজে উঠেছিল, তাই প্রেমের কবিতাগুলোতে অনেকটা সংহত আবেগ রূপে দানা বেঁধে উঠেছে। 'ভাব' কবিতায় কবি যা বলতে চেষ্টা করেছেন, তাও এক প্রকার ভাববিলাসই বটে। তবে এতে মানুষের প্রেম ভাবনার মাধুর্যের স্বীকৃতি আছে। কবি কাব্য করে বলেছেন ঃ -'প্রিয়ার রঙিন ঠোঁট হতে একটি চুমু ছিঁড়ে নিতে পারলে, বোধহয় রূপহীন ভালোবাসা কথাটিকে চিরতরেই বেঁধে রাখা যায়।' কবির এ ভাববিলাস অপরূপই বটে।

'সার্থক দিন' ও 'সার্থক রজনী' কবিতা দুটিতে রূপ ও প্রেমতৃষ্ণার পরিতৃপ্তিজনিত উপলব্ধির আনন্দই যেন ব্যক্ত হয়েছে। প্রথম কবিতায় সে আনন্দ প্রকৃতির রূপাশ্রয়ে ব্যক্ত হয়েছে। মূলতঃ সৌন্দর্যানুভূতির প্রকাশ সমৃদ্ধ কবিতা হলেও, প্রেম এখানে নেপথ্যাশ্রয়ী। তা অনেকটা আভাসে ইঙ্গিতে ধরা দিয়েছে। তা প্রত্যক্ষ করেই যেন কবি বলেছেন ঃ —'আজকে তোমারে দেখিয়াছি আমি ভরিয়াছে মোর প্রাণ'। 'আজকে তোমারে দেখিয়াছি আমি' বাক্যটি ধ্রুব পদের কাজ করে আমাদের পূর্বোক্ত ধারণারই সমর্থন করেছে। প্রিয়াকে প্রত্যক্ষীভূত করার আনন্দই যেন বহিঃপ্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

'সার্থক রজনী' কবিতায় প্রেমের দুর্লভ সার্থকতার কয়েকটি মুহূর্তের আনন্দই যেন ব্যক্ত হয়েছে। প্রেমপথিকের জীবনের নৈরাশ্য ও বঞ্চনার বেদনাই স্বাভাবিক প্রাপ্তি। তাই একটি রজনীর জন্যেও যদি প্রেমের সামান্য সার্থকতা কারও জীবনে আসে, তা দুর্লভ সৌভাগ্যই বটে। সে রজনীটি নিয়ে প্রেমিকার রঙিন কল্পনার শেষ নেই। এ রজনী সকল রজনীর সেরা, কারণ, এ রাত—'শত নিরাশার একটি পরিত সাধ', এ যেন 'মরু কুহেলীর এক-ফোঁটা সরু চাঁদ'। কবি কামনা করেছেন এ রজনী যেন তাঁর জীবনে আর ভোর না হয়। প্রেমানুভূতির মাধুর্য উপলব্ধির গাঢ়তা কবিতাটিকে আস্বাদ্য করে তুলেছে।

'নীরব ভাষা' কবিতায় লাজনম্র প্রেমের চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে। কলহাস্যে পথ মুখরিত করে সখীর সাথে প্রিয়া চলে যাচ্ছে। কবি পথের কোণে দাঁড়িয়ে নীরবে প্রিয়ামুখ দর্শন করে নীরবেই মাথা নত করে আছেন। প্রিয়ার কথা কবির হৃদয়ে প্রেমের কুসুম ফুটিয়ে তোলে। কবির হৃদয়গহনে প্রিয়ার অধরের বাঁশী যেন সর্বক্ষণই বেজে চলছে—তা সকলের অগোচরই থেকে যাচ্ছে। প্রেম এখানে সে আশ্বাসে সমৃদ্ধ বলেই বোধহয় তার ভাষা নীরব। প্রেমের এ

সলজ্জ সুন্দর নীরব প্রকাশের একটা মাধুর্য আছে স্বীকার করতেই হয়। এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক প্রেমকল্পনার সৌন্দর্যচ্ছটা কিছুটা লক্ষ্য করা যায়।

'অনুরোধ' কবিতায়ও রোমান্টিক প্রেমানুভূতির মাধুর্য পরিস্ফুট হয়েছে। স্বপ্নরঙিন প্রেমিক মনের একটি সুন্দর আলেখ্য এ কবিতাটি। প্রিয়াকে ঘিরে কবির কল্পনার অবধি নেই! প্রিয়া কি তার আকাঙ্ক্ষিত রূপ নিয়ে প্রেমিকের জীবনে দেখা দিবে? সে ভরসাতেই কবি কয়েকটি সুন্দর অনুরোধ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন প্রিয়ার কাছে। বস্তুতঃ কবির আকাঙ্ক্ষা প্রিয়া যেন তাঁর মনের বনের বাঁশীটি হয়ে থাকে অর্থাৎ তাঁর চোখে সব সময় আকাংক্ষিত রূপেই দেখা দেয়। প্রেমবিগলিত কবিচত্তের এ প্রকাশটিও সুন্দর।

'নিমন্ত্রণ' কবিতায় সৌন্দর্য ও প্রেমপিপাসু কবি এক পল্লীকিশোরীকে আপন গৃহাঙ্গনে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কবিতার প্রথমাংশে ছন্দে, বর্ণনাভঙ্গিতে, কাব্য-প্রকরণে পল্লীকাব্যের আমেজটি স্পষ্ট। কিন্তু দ্বিতীয়াংশে এসব গৌণ হয়ে গিয়েছে। গৃহাঙ্গন এখানে কবির জীবনাঙ্গনে পরিণত হয়েছে—এ আঙ্গিনায় যাকে আহ্বান করা হয়েছে, কবি প্রেমাবেশ জড়িত কণ্ঠে তারই রূপারতির বিচিত্র বাসনা প্রকাশ করেছেন। পল্লীকিশোরী এখানে কবির স্বপ্নবাসিনী নারীরূপে দেখা দিয়েছে। কবিতাটির ভাবমাধুর্য যথেষ্ট হলেও, এর প্রথমাংশ দ্বিতীয়াংশের প্রকাশকলা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সৌন্দর্যের নন্দন-কাননে পল্লীকিশোরীর প্রতিষ্ঠা, স্বভাবের নিয়মে হয় নি বলেই অসঙ্গতি।

'তোমার দেশে যাব কন্যা' মুর্শিদা-ভাটিয়াল রাগের পল্লীগীতিধর্মী একটি কবিতা। কবিতার ভাষার আঞ্চলিকতা এর কাব্যরস কোথাও ক্ষুণ্ন করে নি। এ কবিতারও মূল সুর প্রেম তবে স্বাভাবিকভাবে সকল পল্লীগীতির মতো এতেও একটা অধ্যাত্মভাব ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়। পল্লীকাব্যের ঢঙ বজায় রেখেও যে উচ্চাঙ্গের কবিত্বশক্তির পরিচয় দেওয়া সম্ভব, জসীমউদ্‌দীন এ কবিতায় তাই প্রতিপন্ন করেছেন।

'সম্বল' কবিতায় সংসারের স্নেহ, মায়া-মমতার মাধুর্য থেকে বঞ্চিত প্রবাস যাত্রীর মনোবেদনা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 'স্নেহ, মায়া-মমতাকে' জীবনের এক মহা সম্বল হিসেবে কল্পনা করায় তেমন কোন অভিনবত্ব না থাকলেও, এ প্রকাশটি মোটামুটি সুন্দর হয়েছে বলতে হয়।

'আমি তো তোমার কেহ নই' কবিতায় একটি প্রেমাভিমানী হৃদয়ের আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে। প্রেমিকার অবহেলায় ক্ষুব্ধ কবিচিত্তের বেদনাই যেন অভিমানের অশ্রু হয়ে ঝরে পড়েছে এ কবিতায়ঃ—

"আমি তোমার কেহ নই বালা, আমারি এ ক্রন্দন,
আমারেই শুধু কাঁদাইবে আজ মথিয়া হৃদয় মন।"

'হৃদয় মন'-মথিত এ কান্নার উল্লেখের মধ্যে আমরা প্রেমিক চিত্তের নিগূঢ় বেদনারই আভাস পাই। কবি ইতিপূর্বেই বালুচর কাব্যে প্রেমের এই ব্যথাহত অভিমানী রূপের প্রকাশ ঘটিয়েছেন অনেক জায়গায়। কবিতাটিতে গীতিকবির অন্তরাবেগ স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে।

'একটি বিরহ রাতেরে কমাতে' আর একটি প্রেমের কবিতা। এ কবিতার আবেগ যেন বৈষ্ণব কবিরই হৃদয়াবেগ। তারই প্রতিধ্বনি সঞ্চারিত হয়েছে এখানে। কৃষ্ণ বিরহিণী রাধিকার চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই এ কবিতার নায়িকার কণ্ঠে। ভালোবাসার গর্বে সে স্ফীত ছিল। কিন্তু ভালোবেসে ভালোবাসার পাত্রের কাছ থেকে কি পেল সে, না—'মরণের নীল ফাঁসী', পেল ঘৃণা। এত ভালোবাসার গর্বের কি এই পরিণাম! 'রাধিকার ন্যায় এ কবিতায়ও দেখছি প্রেমিকা সখীদের অনুরোধ করছে ঃ—

"আমার মরণের পরে দেখা হলে তার সনে,
বলিস্, আমারে দুঃখ দিয়ে তার কী সুখ হইল মনে?'

প্রেমিককে সে প্রথম দর্শনেই আত্মসমর্পণ করেছিল, একবারও ভেবে দেখে নি কি দুর্গতি তার ঘটতে যাচ্ছে। দুঃখদীর্ণ প্রেমিকা অভিমান ভরেই সখীদের বলছেন,—তার বন্ধুর গর্ব বেড়েছে—সে কেবল অপরের পরাণ ভাঙে, কপাল ভাঙে, বুকও নাকি ভাঙে। এতেই তার অহঙ্কার। কিন্তু পরাণ ভাঙলেও পরাণের দুঃখ ভাঙবার কোন ক্ষমতাই তো তার নেই! তার কি সাধ্য আছে 'একটি বিরহ রাতেরে কমাতে' পারার!

নায়কের প্রতি বিরহিণী নায়িকার অঢেল প্রেম অভিমানের ভাষায় দ্রবীভূত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে এখানে। বৈষ্ণব ঐতিহ্যাশ্রয়ী এ প্রেমভাবনার প্রকাশে জসীমউদ্‌দীন কিন্তু বেশ স্বাচ্ছন্দ্য পান বলেই মনে হয়। 'বালুচর' কাব্যেও এ ধরনের প্রেমের কবিতা লিখে তিনি আপন ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

'ঘরহারা পরবাসী' কবিতায়ও কবি আপন প্রেমভাবনার পরিচয় দিতে গিয়ে রোমান্টিক সুলভ ভাবালুতার বশীভূত হয়েছেন। প্রেম এ সংসারে এক দুর্লভ ধন। প্রেমের অভিনয় সর্বত্রই চলে বটে, কিন্তু যথার্থ প্রেমের সৌভাগ্য অনেকের জীবনেই হয় না। বস্তুতঃ অনন্ত প্রেমতৃষ্ণা নিয়ে হরিণের মত ঘরহারা পরবাসী মানুষ দুনিয়ার পথে পথে ফিরছে। এ প্রেম তৃষ্ণার শেষ নেই, কবিতাটিতে রোমান্টিক কবিসুলভ প্রেমাকুলতা এবং প্রেমের ব্যর্থতা জনিত নৈরাশ্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। বালুচর কাব্যেও নৈরাশ্য ও ব্যর্থতাবোধেরই পরিচয় আমরা পেয়েছি অনেক কবিতায়।

'ভগ্নপ্রেম' কবিতায়ও কবির প্রেমভাবনার এই বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে। সংসারী মানুষের জীবনে প্রেম এক জ্বালাময় অনুভূতি, এর দহনে দগ্ধ হচ্ছে নরনারী। তাই তো মিলনের রাখী বেঁধে প্রেমকে তারা স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু সে বন্ধন অটুট থাকে না, ছিন্ন হয়ে যায় অচিরেই। আর একবার বাঁধন ভেঙে গেলে, তা আর জোড়া লাগে না—অথচ প্রেমের স্মৃতি তুষের অনলের মত দগ্ধ করে চলে মানুষকে চিরকাল; প্রেমস্মৃতির শায়ক বিদ্ধ করে মানুষকে শয়নে, স্বপনে, জাগরণে। বিচ্ছেদ –ভীতি, বেদনাবোধ প্রেমের নিত্য সহচর; প্রেমপথের পথিকের জীবনে প্রেমের জ্বালা তাই বড় বেশী। তারপর, ভালোবাসার পাত্রের কাছ থেকেই সংসারের আঘাত আসে বেশী, এমনি নির্মম সাংসারিক প্রেমের আচরণে—'সবারই চাইতে আপন সে দেয় সবাইর চাইতে জ্বালা'।

জীবনের সব সুখ-শান্তি বিসর্জনের আশঙ্কাকে স্বীকার করে নিয়েই এ পথে চলতে হয়, পদে পদে থাকে শঙ্কা। তাই তো প্রেমের উক্তি ঃ—

"বাঘের ঘরেতে শয়ন করিয়া পোহাই দীরঘ রাতি,
সাপের মাথায় মণি রেখে আমি আঁধারে জালাই বাতি।"

আমাদের দেশের বাউল, বৈষ্ণবদের প্রেমসাধনার দুঃখ কন্টকিত পথেরই ইঙ্গিত এ কবিতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আধুনিক কবির রোমান্টিক চেতনা তাকে আর একটু পরিশুদ্ধ রূপে প্রকাশ করেছে মাত্র। প্রেম সম্পর্কে কোন নতুন চেতনা এখানে প্রকাশ পায় নি।

'রূপবতী' কাব্যের শেষ কবিতা 'বড় অসময়ে এসেছ বন্ধু' কবিতায় বালুচর কাব্যের 'মুসাফির', 'আর একদিন আসিও বন্ধু', ইত্যাদি কবিতার সুরেরই অনুরণন শোনা যায়।

প্রেমের ব্যর্থতাজনিত নৈরাশ্য ও বেদনাবোধ একটা আক্ষেপের সুরেই এ সব কবিতায় ফুটে উঠেছে। আলোচ্য কবিতায় প্রেম-বঞ্চিত কবিহৃদয়ের আক্ষেপই রূপ পেয়েছে। প্রেমের স্বপ্নরঙীন দৃষ্টিতে একদিন সব কিছুই কবির চোখে দেখা দিত সুন্দর হয়ে। সে স্বপ্নরঙীন দৃষ্টি

কবি আজ হারিয়েছেন।' বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সব কিছুই ছায়াবাজীর ন্যায় বিলীন হয়ে গিয়েছে কবির চোখের সামনে থেকে। তাই ত ব্যথাহত কবিচিত্ত নৈরাশ্যভাবে প্রপীড়িত। এ নৈরাশ্যের বাণীই মূর্ত হয়ে উঠেছে কবিতার বিষয়ে এবং এর নামকরণে।

'রূপবতী' কাব্য জসীমউদ্‌দীনের পল্লী কেন্দ্রিক সাহিত্য-সাধনার একটি ব্যতিক্রম, একথা বললে নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে না। কবি এ কাব্যে পরিবেশ নিরপেক্ষভাবে আধুনিক রোমান্টিক কবিদের ন্যায় প্রেম ও সৌন্দর্য-ভাবনায় দোল খেয়েছেন। রোমান্টিক কবিদেরই ন্যায় তিনিও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা অনুভব করেছেন, নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন কোথাও কোথাও। প্রেম ও সৌন্দর্যের এক আদর্শরূপের অনুধ্যানের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় প্রায় সর্বত্রই। এ সব ক্ষেত্রে তিনি বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারারই যেন অনুসারী। অবশ্য জসীমউদ্‌দীনের প্রেম ও সৌন্দর্যের ধারণা বৈষ্ণব কবি ও পল্লীকবিদের রচনা দ্বারাও যে কিছুটা পুষ্ট হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এ ক্ষেত্রেও তিনি যে মূলতঃ পুরাতন বাঙলা কাব্যের ঐতিহ্যকেই অনেকটা অনুসরণ করে চলেছেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবু আধুনিক কবিসুলভ চিন্তা ও মননের ছাপ এসব রচনায় পরিস্ফুট। ভাষা ও ভঙ্গিতে তিনি এ কাব্যেও নতুন পথের দিশারী নন। তৎসম, তদ্ভব ও বিদেশী শব্দের প্রয়োগ এ কাব্যে একটু বেশী লক্ষ্য করা গেলেও কবির রচনাতে তা কোন নতুন মহিমা সঞ্চারিত করতে পারে নি। রূপ বর্ণনায়, প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যানে তিনি গতানুগতিক পথেরই পথিক হয়েছেন বারবার। রূপের কথা উঠলেই কবি 'চাঁদ', 'বিজলী', 'ফুল', ছাড়া আর কিছুই যেন দেখেন না। একই শব্দ, উপমার পৌনঃপূনিক প্রয়োগ কাব্যমাধুর্য বৃদ্ধিতে বড় একটি সাহায্য করে নি। কবিতার ভাববস্তু যেমন প্রায়শই একঘেঁয়ে, তার প্রকাশকলাও তেমনি বৈশিষ্ট্যবর্জিত। তবুও রূপবতীর সৌন্দর্য ও প্রেমের কবিতায় অনুভূতির গাঢ়তা সর্বত্র অনুপস্থিত নয়; সার্থক কাব্য পংক্তিও একেবারে বিরল নয়। রসিক পাঠক একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

পদ্মাপার

'পদ্মাপার জসীমউদ্‌দীনের দ্বিতীয় গীতি-সংকলন। গীতি-সংকলন হিসেবে চিহ্নিত করলে অবশ্য বইটির পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় না। কারণ এতে কবির স্বরচিত এবং সংগৃহীত ৪২টি গান ছাড়াও 'পদ্মাপার' নামাঙ্কিত একটি লোকগীতিনাট্য স্থান পেয়েছে। বইয়ের নামকরণও ঐ গীতিনাট্যটির নামানুসারেই করা হয়েছে। অবশ্য গীতিনাট্যটিতে পল্লীগীতির সুর ঝঙ্কারেই সাধারণ ধর্মভীরু পল্লীমানুষের অধ্যাত্ম জীবনপিপাসা মূর্ত হয়ে উঠেছে। আঙ্গিকে নাট্যরীতির অনুসৃতি লক্ষ্য করা গেলেও, 'পদ্মাপার' মূলত ঃ বাঙালীর অধ্যাত্মজীবন সাধনার যে সুর শৈব, সহজিয়া, শাক্ত-সাধনা, বাউল, মুর্শিদা, মারফতী গানে যুগ যুগ ধরে প্রকাশ খুঁজেছে তারই ঝঙ্কার মুখরিত। ভাব পারম্পর্য বজায় রেখে কথার সূত্রে কতোগুলো গ্রাম্যগান জুড়ে দিয়েই 'পদ্মাপার' গীতিনাট্য রচিত হয়েছে। তাই 'পদ্মাপার'কে গানের বই বললেও খুব অসঙ্গত হয় না।

'পদ্মাপার' প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। ইতিপূর্বে 'রঙিলা নায়ের মাঝি' নামে প্রথম গীতি সংকলন প্রকাশকালে জসীমউদ্‌দীন আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে, এটাই হয়ত বা তাঁর শেষ গানের বই হতে পারে। মূলত ঃ গ্রাম্যগানের (স্বরচিত ও সংগৃহীত) সংকলন 'রঙিলা নায়ের মাঝি'তে ঐ কারণেই তিনি স্বরচিত কয়েকটি আধুনিক গানও সন্নিবেশিত

করেছিলেন। গ্রাম্যগান রচনার উদ্দেশ্য ছিল ঃ 'দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণকে আনন্দ দান করা।' তাঁর বক্তব্য থেকেই আমরা জানতে পারি, দীর্ঘদিন পল্লীবাসীর মনের ভাষার সন্ধান করতে গিয়ে তিনি বাঙলাদেশের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়িয়ে গ্রাম্যগান সংগ্রহ করেছেন এবং ঐ সব গানে পল্লীবাসীর অন্তর-ঐশ্বর্যের যে সন্ধান পেয়েছিলেন, তারই কিছু পরিচয় নিয়ে পাঠক সমাজের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। পাঠক সমাজে এবং সঙ্গীতরসিক মানুষ 'রঙিলা নায়ের মাঝি'কে স্বাগত জানিয়েছিল। 'রঙিলা নায়ের মাঝি'র সার্থকতাই কবিকে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে আর একটি গীতিসংকলন প্রকাশে প্রেরণা জুগিয়েছিল বললে অসঙ্গত হবে না। গ্রাম্যগান রচনাকালে প্রথমোক্ত গ্রন্থে তিনি যে বিশেষ রীতি অনুসরণ করেছিলেন 'পদ্মাপার' গ্রন্থেও সেই একই রীতি অনুসরণ করেছেন। কোথাও গ্রাম্যগানের সুরে ও ঢঙে তিনি নতুন গান লিখেছেন। কোথাও গ্রাম্যগানের দু একটি পংক্তিতে ভাবসূত্র রূপে গ্রহণ করে আপনার পথে অগ্রসর হয়েছেন, কোথাও প্রচলিত গ্রাম্যগানকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপে প্রকাশ করেছেন—কোথাও সামান্য পরিবর্তন করে, কোথাও ভাষান্তরিত করে কোথাও বা সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখেও গানগুলো প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে যে তিনি এই বইয়েও কয়েকটি আধুনিক গান জুড়ে দিয়েছেন। আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে 'পদ্মাপার' নামীয় গীতিনাট্যাংশের অধিকাংশ গানও প্রচলিত গ্রাম্যগানেরই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ। একথার স্বীকৃতি কবির কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছে।

মুখ্যত ঃ গ্রাম্যগীতি-সংকলন হলেও গ্রাম্যগীতির দেহ পরিমার্জন, আধুনিক গান সংযোজন এবং গীতিনাট্যের আঙ্গিক গ্রহণে 'পদ্মাপারে'র কবি তাঁর আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার পরিচয়টি যথেষ্টই দিয়েছেন। তবে 'রঙিলা নায়ের মাঝি'র মত এখানেও তিনি অবলীলাক্রমে পল্লীকবিদের গানে সুর মিলিয়ে দিয়েছেন। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও পল্লীর সাথে তাঁর প্রাণের যোগটি যে অক্ষুণ্ন ছিল, কবির প্রায় সকল কাব্য ও গানে তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে ভূরি ভূরি। 'পদ্মাপার' তার ব্যতিক্রম নয়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি 'পদ্মাপার' গ্রন্থটিতে ৪২টি গান ছাড়াও একটি ঐ নামীয় 'গীতিনাট্য' সংযোজিত হয়েছে। স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে বইটি দুটি অংশে বিভক্ত ঃ প্রথমাংশে 'পদ্মাপার' নামীয় গীতিনাট্যটি স্থান পেয়েছে ; দ্বিতীয়াংশে মোট ৪২টি গানের সমাবেশ ঘটেছে। গানগুলোর মধ্যে ১ থেকে ২৭ নম্বর পর্যন্ত গানগুলোকে কোন গোত্রভূক্ত বলে চিহ্নিত করা হয় নি। ২৮ থেকে ৩৪ নম্বরের গানগুলোকে ইসলামী গান রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৩৫ থেকে ৩৮ নম্বর পর্যন্ত গানগুলোকে আধুনিক গান এবং ৩৯ থেকে ৪২ নম্বর পর্যন্ত গানগুলোকে গ্রাম্যগান সংগ্রহ পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। আমরা যথাস্থানে 'জসীমউদ্‌দীনের নাট্যসাধনা' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে 'পদ্মাপার' গীতিনাট্যের বিস্তৃত আলোচনা করব। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা শুধু গানগুলোরই পরিচয় উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পাব। ইতিপূর্বেই আমরা লক্ষ্য করেছি, যদিও ১ থেকে ২৭ নম্বর পর্যন্ত গানগুলো কোন বিশেষ শ্রেণী নামাঙ্কিত নয়, তবুও এই ২৭টি গানকেই পল্লীগীতি হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। এসব গানের কোন কোনটি পুরাতন পল্লীকবিদের রচিতক গীতিরই সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপ (যেমন ২০, ২৩, ২৬, নম্বর গান) ; আবার কোন কোনটি পল্লীকবিদের রচিত গানেরই দু' একটি পংক্তিকে ভাবসূত্র রূপে অবলম্বন করে প্রায় নতুন গান রূপেই বিকশিত (যেমন ৪, ৮, ৯, ২১ নম্বর গান)। বাদ বাকি গানগুলো রচনায় জসীমউদ্‌দীন অনন্যনির্ভর। এ সব গান রচনা করতে গিয়ে তিনি পল্লীকবিদের কণ্ঠের সাথে নিজ কণ্ঠ

এমন করে মিলিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর গানগুলো পল্লীকবিদের রচনা বলেই বিভ্রান্তি জন্মে। এ গানগুলোর মধ্যে পল্লীর হৃদয়ের সুরই যেন ঝংকৃত হয়েছে, পল্লীবাসীর অন্তরের যতটা গভীরে পৌঁছতে পেরেছেন, আর কোন ভাবেই ততটা গভীরে যেতে পারেন নি। পল্লীগীতি সংগ্রাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পল্লীগানের সুবিশাল ঐশ্বর্যভাণ্ডারের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন জসীমউদ্‌দীন। তাই তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল এ ধরনের গান রচনায়। পল্লীগানের প্রাণৈশ্বর্যের সাথে তাঁর আত্মিক পরিচয় ঘটেছিল, তাই তাঁর গানগুলো এত হৃদয়স্পর্শী হতে পেরেছে। জসীমউদ্‌দীনের গানের বিষয়বৈচিত্র্যও কম নয়। বৈষ্ণব গীতিকা, বাউল, মুর্শিদা, মারফতী, ভাটিয়াল, ভাদু ইত্যাদি অজস্র গানে বাঙালীর সহজিয়া প্রকৃতি আপনাকে অবারিত করে দিয়েছে যুগ যুগ ধরে। জসীমউদ্‌দীন সঙ্গীত রচনায় আমাদের সে ঐতিহ্যেরই অনুসারী। তবে যুগধর্মে তাঁর রচনায় আধ্যাত্মভাবনার চেয়ে বাস্তব জীবনভাবনাই যেন বেশী করে প্রকাশ পেয়েছে। গানগুলোর প্রকাশেও সচেতন শিল্পীহস্তের স্পর্শ লক্ষ্য করা যায়, যদিও ভাষা-ভঙ্গিতে পল্লীগীতির আদলটি তিনি নষ্ট হতে দেন নি।

এ গ্রন্থের ১ নম্বর গান 'ও বাবু সেলাম বারে বার, আমার নাম গয়া বাইদ্যা বাবু, বাড়ী পদ্মাপার', একটি অতি লোকপ্রিয় গান। নদীপথে ভ্রাম্যমান বেদের জীবনের মূল সুরটি এ গানে ভাষা পেয়েছে। পরবর্তীকালে 'বেদের মেয়ে' নাটকে জসীমউদ্‌দীন এ গানটিকে কাজে লাগিয়েছেন। ২ নম্বর গান 'কে যাসরে রঙিলা মাঝি, সাঁঝের আকাশ দিয়া, আমার বাজান্‌রে বলিস খবর নাইওরের লাগিয়া রে।' গানটিতে স্বামীগৃহে বন্দিনী দুঃখিনী কন্যার মনের দুঃখ ভাষা পেয়েছে। বাপ তাকে বিয়ে দিয়েছে এক প্রবঞ্চক লোকের সাথে, তারপর আর তার খোঁজ নেয় নি ; এদিকে দুঃখে দিন কাটছে মেয়েটির ; পিতৃগৃহে ফিরে যাবার জন্যে সে ব্যাকুলতা বোধ করে, কিন্তু পথ খুঁজে পায় না ; নদীর ঘাটে জল ভরতে এসে বিদেশী নৌকার মাঝিকে উদ্দেশ্য করে তার পিতার কাছে তার করুণ মিনতি পৌঁছে দিতে অনুরোধ জানায়। ৩ নম্বর গান 'তুমি কবে খুলিবা নাও আমি যেন জানিরে, রঙিলা নার মাঝি' এতেও দুখিনী নারীর অন্তর্বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। ৪ নম্বর গান 'আমায় ডুবাইলিরে, আমায় ভাসাইলিরে অকূল দরিয়ার বুঝি কূল নই রে' প্রসিদ্ধ মুর্শিদা গানের কলি অবলম্বনে রচিত। গানটিতে ভবপথযাত্রী অসহায় মানুষের হৃদয়ের ব্যাকুলতাই যেন ফুটে উঠেছে। ৫ নম্বর গান 'এই না গাঙের কোণেরে বন্ধু', ৬ নম্বর গান ও তোর নাম শুনিয়ারে, ও তোর রূপ দেখিয়ারে', ৭নম্বর গান 'সখি তারে বল, বল, বল', ইত্যাদি গানে প্রেমের বিভিন্ন ভাবানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। এগুলোতে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা দুর্লক্ষ্য নয়। আবার ৮ নম্বর গান 'ধান কাটিব কচাকচ', ৯ নম্বর গান 'ও বাজান চল যাই চল মাঠে লাঙল বাইতে', ১০ নম্বর গান 'পেটের জ্বালায় জ্বইলা মইলাম রে', ইত্যাদি গানে দরিদ্র পল্লীবাসী মানুষের কর্মের আনন্দ, জীবনস্বপ্ন, ব্যথা-বেদনা ও দারিদ্র্যের মর্মজ্বালা ব্যক্ত হয়েছে। ১১ নম্বর গান 'ও আমার সাধের মশারি', ১২ নম্বর গান 'পানির কল বানাইছে কলিমউদ্দিন মিয়া', ইত্যাদি গানে গরীবের ক্ষুদ্র অভাব মোচনের আনন্দে-উদ্বেল হৃদয়ের ছবিটি চমৎকারভাবে ধরা দিয়েছে। পাঁচ টাকার মশারি কিনে মশার কামড় থেকে রেহাই পেয়ে তার আনন্দ বাঁধ মানে না। আবার পল্লীর চিরন্তন পানীয় জলের কষ্টের মধ্যে কোন এক কলিমউদ্দীনের প্রচেষ্টায় একটি পানির কল বসান হলে তৃষ্ণার্ত চাষীদের আনন্দ দেখে কে? ঐ পানির কল তার কাছে তাজমহলের চেয়ে বড় সম্পদ হয়ে দেখা দেয়। আরও কত বিচিত্র ধরণের গানই না আছে। ১৩ নম্বর গান 'হাসু মিয়ার পাঠশালাতে যাই', বেশ কৌতুকপূর্ণ। গানটিতে প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন বর্ণের সুকৌশল গাঁথুনি রীতিমত চমকপ্রদ। ১৪-নম্বর গান

'সোনার বরণী কন্যা সাজে নানা রঙ্গে, কালো মেঘ যেন সাজিল রে', স্নানরতা কন্যার সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবিচিত্তের আনন্দ-তরঙ্গিত প্রকাশ। ১৫ নম্বর গান 'মোহন সুরে ও বাঁশি বাজল', ১৬ নম্বর গান 'গান আমার বন পুড়ান, মন পুড়ান প্রাণ পোড়ান কুল মজান ও আমার সব খুয়ান বাঁশীরে', ১৭ নম্বর গান 'লাল নটে ডুগু ডুগু রক্ত মাখা ঠোঁটে, লো রক্ত মাখা ঠোঁট', ১৮ নম্বর গান 'আমার দুরন্ত প্রাণ, আমার দুরন্ত প্রাণ, তোরে আমি কোন সুখেতে গৃহে রাখি', ১৯ নম্বর গান 'সোনার বন্ধুর সনে দেখা হবে বলে সখি লো, আমি জল আনিতে যাই', ২০ নম্বর গান 'ওই না রূপে নয়ন দিয়ে আমার গৃহে থাকা হইল দায়', ২১ নম্বর গান 'বৃন্দাবনের বনে বনে ফুল তুলিব ও ; ২২ নম্বর গান 'রাধা বিনে প্রাণ বাঁচে নারে আইনা দেরে ও সুবল ভাই', ২৩ নম্বর গান 'আমি কেমনে ধরিব রে যে মোর মন নিল হরি', ২৪ নম্বর গান 'ও বন্ধু রঙিলা রঙিলারে আমারে ছাড়িয়ারে বন্ধু কই গেলারে', গানটিতে বিরহিণী নারীর হৃদয়ের আর্তি বেজে উঠেছে। ২৫ নম্বর গান ' ও ললিতে! পারবিনি বলিতে', ২৬ নম্বর গান 'ছাইড়া গেছে প্রাণনাথ আমারে দিয়ে ওরে ফাঁকি', এবং ২৭ নম্বর গান 'ভিজা কাষ্ঠে আগুন জ্বলে রে কানাই নিশিদিন', প্রভৃতি গানে কবি যেন বৈষ্ণব-কবিদের সুরেই সুর মিলিয়েছেন। প্রেমের অন্তর্জ্বালা, হতাশা, দুঃখবোধ, নৈরাশ্য, বিরহের আর্তি এসব গানে ভাষা পেয়েছে। তবে বৈষ্ণব-কবির গানের ন্যায় এ গান বৈকুণ্ঠাভিসারী নয়। এগুলো মানব মানবীয় অন্তরাভিসারী গীত। এ গানগুলোর অধিকাংশই বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং অন্যান্য পল্লীকবির রচিত গানের ন্যায় লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরছে। পল্লীর ভাটিয়ালী, মুর্শিদা, বাউল ইত্যাদি গানের সুরে গীত এ গানগুলো প্রাণে আকুলতা সৃষ্টি করে অতি সহজেই।

'ইস্‌লামী গান' পর্যায়ে ৭টি গান সঙ্কলিত হয়েছে। এ বইয়ের ২৮ নম্বর থেকে ৩৪ নম্বর পর্যন্ত গানগুলো ইস্‌লামী গানরূপে চিহ্নিত। এর মধ্যে ২৮ নম্বর গান 'রসুল নামে কে এল মদিনায়, আকাশের চাঁদ কেড়ে ও কে আনল দুনিয়ায়', এবং ২৯ নম্বর গান 'নবী দীনের রসুল, তারে হয় না যে ভুল', যথাক্রমে লালন ফকীরের কোন একটি গান এবং একটি গ্রাম্য পংক্তি অবলম্বনে রচিত হয়েছে।। বাকী পাঁচটি গান কবি অনন্যনির্ভর হয়ে রচনা করেছেন। ৩৩ নম্বর গান 'আগুন জ্বালো! আগুন জ্বালো', এবং ৩৪ নম্বর গান 'সোনার বাঙলা কাঙ্গাল হইল, ভাইরে,—এ দুটি গান ইস্‌লামী গান পর্যায়ে সঙ্কলিত হল কেন বোঝা ভার। প্রথমটিতে জড়তা-ক্লিষ্ট তরুণ সমাজের জাগরণের জন্যে খোদার কাছে তীব্র দহন-জ্বালা কামনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে দেশবন্ধু ও মোহ্‌সীনের জন্মভূমি বাঙলার দুরবস্থায় ব্যথিত কবির প্রাণের বেদনা ব্যক্ত হয়েছে। অন্নাভাবে দেশ গোরস্তানে পরিণত হয়েছে এ কথা চিন্তা করে কবিপ্রাণ কেঁদে উঠেছে। প্রথম কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের 'এই করেছ ভাল নিঠুর', গানটির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ ২৮ নম্বর থেকে ৩২ নম্বর পর্যন্ত মোট পাঁচটি গানই যথার্থ ইস্‌লামী গান রূপে চিহ্নিত হতে পারে। ২৮ নম্বর গানটিতে হযরত মুহম্মদের (দঃ) পূত চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। মানুষের প্রাণের ব্যথা দূর করে তিনি চিরকাল মানুষের মনের কোঠায় স্থান পেয়ে আছেন। দুনিয়ার মানুষের জন্য তিনি এক মস্ত আশ্বাস ও ভরসা! ২৯ নম্বর গানটিতেও দীনের রসুল নবীর চরিত্রমাহাত্ম্য স্মরণ করে ভক্ত প্রাণের আকুলতা জেগেছে। ৩০ নম্বর গান 'ধীরে ধীরে চালাও ছুরি রে সীমার, আমায় গলায়', গানটিকে বোধহয় মুর্শিদার পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। কারবালা প্রান্তরে মৃত্যুপথযাত্রী হোসেনের করুণাঘন হৃদয়ের আর্তিই যেন এই গানটিতে ভাষা পেয়েছে। এ গানটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ৩১ নম্বর গান

'আমার খোদারে দেখিয়াছি আমি গরীবের কুড়েঘরে', খোদাভক্তিমূলক গান। শুধু ঈশ্বরভক্তি নয়, সাথে সাথে মানুষের দুঃখ-বেদনায় সন্তপ্ত কবিচিত্তের সহানুভূতির পরিচয় ফুটে উঠেছে এ গানে। ভক্তের চোখে ঃ—

"জায়নামাজের পাটি আমাদের, আকাশের চেয়ে বিস্তৃত ঢের
তাই ত আকাশ লুটাইছে হের, দুনিয়া মসজিদ ঘরে।"

স্পষ্টতঃই আকাশের চেয়ে দুনিয়ার দিকেই কবির মনোযোগ বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ৩১ নম্বর গান ' তোমার রাহে আমি হই কোরবান, তোমার রাহে সঁপি এ জান', গানটিতে একদিকে খোদাভক্তি আর একদিকে মানব-প্রেম একাকার হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এসব ইসলামী গান রচনার প্রেরণা জসীমউদদীন সম্ভবতঃ নজরুল ইসলামের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। অন্ততঃ দৃষ্টিভঙ্গির মিল দেখে তাই মনে হয়। এ সব গানের সার্থকতা এখানে যে এগুলো বাঙালাদেশের মুসলমানের মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিতে পেরেছে। দুঃখের বিষয়, জসীমউদদীন এ ধরনের গান খুব বেশী রচনা করেন নি। লক্ষ্য করার বিষয় এ গানগুলোর ভাব পল্লীগিতির আঞ্চলিকতা-দোষ থেকে মুক্ত। ভাষা সহজ কিন্তু শিল্পগুণ বর্জিত নয়।

আধুনিক গান পর্যায়ে মাত্র ৪ টি গান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ পর্যায়ে গানগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ৩৫, ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ নম্বর গান। এ গানগুলোতে জসীমউদদীনের রোমান্টিক স্বপ্নাতুর কবিমনের ছবিই বেশী করে ফুটে উঠেছে। ভাষায়, ভঙ্গিতে এগুলো পদবাচ্য। এসব গানের কথায় রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গানের কথার ছাপ পাওয়া যায়। সঙ্গীতমূল্য ছাড়াও কোন কোন গানের কাব্যমূল্য যথেষ্ট রয়েছে। ৩৫ নম্বর গান 'গানের সুরের লিখন লিখি পাঠাই দূরের পানে', কবিহৃদয়ের একটি আশ্চর্য ব্যাকুলতার প্রকাশে সমৃদ্ধ। কবি তাঁর নাম-না জানা ভালোবাসার পাত্রের উদ্দেশ্যে গানের সুরের লিখন পাঠাচ্ছেন—তাতে কবি প্রিয়ার উদ্দেশ্যে নিজের হৃদরের প্রেম-ব্যাকুলতা যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমনি ভেবেছেন হয়ত কোন গাঁয়ের নিরালা ঘরের কোণে ফুলের মালা গেঁথে প্রিয়া তাঁরই প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে 'কাঁদছে গানে গানে'। কবির অন্তরের কথা আর কেউ তো জানে না। অদ্ভুত সুন্দর এ কল্পনাটি। গানটিতে রবীন্দ্রসংগীতের আমেজ অনেকটা পাওয়া যায় বলে মনে হয়। ৩৬ নম্বর গান 'কেন সন্ধ্যায় তুমি এলে', 'ধান-ক্ষেত' কাব্যের 'অবেলায়' শীর্ষক কবিতাটিরই একটু পরিবর্তিত সংক্ষিপ্ত রূপ। ঐ কবিতার দ্বিতীয় স্তবকটি বাদ দিয়ে বাকি অংশ একটু মেজে-ঘসে এ গানটি তৈরী করা হয়েছে। সন্ধ্যার পটভূমিতে সান্নিধ্যের ক্ষণিক স্মৃতির বেদনা গানটিতে ফুটে উঠেছে। ৩৭ নম্বর গান 'নদী তীরে ওই সন্ধ্যা ডুবিল, এখন বিদায় দাও', সংসারে প্রিয়সান্নিধ্য হতে বঞ্চিত হওয়ার বেদনায় নিষিক্ত প্রেমিকচিত্তেরই প্রকাশ। প্রবাসীপথিক কবি ভিন গাঁয়ে এসে কিছুক্ষণের জন্য খেলার আসর জমিয়েছিলেন, দিবাবসানের সাথে সাথে সে খেলা থামিয়ে তাঁকে পাড়ি জমাতে হল চিরআঁধিয়ার, চিরবিস্মৃতির পারাবারে। হয়ত সাথীদের ঘরে প্রদীপ জ্বলবে, চাঁদের সোনার কনে রাতে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে তাঁকে আলোকিত রাখবে, কিন্তু কবির পক্ষে তো আর থাকা সম্ভব নয়। তাঁকে চির-বিস্মৃত নদীর পরপারে এখন চলে যেতেই হবে।

কবিতাটিতে রোমান্টিকসুলভ প্রেমাকুল মনের ছাপ আছে—তবে এর আধ্যাত্মিক ব্যাঞ্জনাটিও স্পষ্ট। ৩৮ নম্বর গান 'তোমার সনে দেখা হবে, ছোট নদীর বাঁকে', ঐ একই রোমান্টিক প্রেম-ব্যাকুল মনের সুর বহন করছে। এ গানটির কাব্যমাধুর্য যথেষ্ট। জলের আরসী 'পরে সন্ধ্যা-সকালের নাচন প্রত্যক্ষ করেন যিনি, 'ভাটীর সুরে গানখানি ঘুমিয়ে

পড়ে,' এমন কল্পনা যিনি করতে পারেন , তিনি অসাধারণ কল্পনাপ্রবণ কবিমনের অধিকারী, এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

এ গীতি সঙ্কলনের বাকি চারটি গান, ৩৯,৪০, ৪১ এবং ৪২ নম্বর গান, গ্রাম্যগান সংগ্রহ পর্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এগুলো কবির নিজস্ব রচনা নয়, তাঁর সংগৃহীত গান। কবি এদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য প্রকাশকালে ভাষার কিছুটা পরিমার্জন করেছেন। ৩৯ নম্বর গান 'ধীরে ধীরে বায়া মথুরায় লাগায়া দেরে নাও, ওরে কানাই! অপমান আর করো না!' রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক গান। পসারিণী রাধা ও দানী কৃষ্ণের উত্তরে –প্রত্যুত্তরের আকারে এটি রচিত। নৌকা দিয়ে রাধাকে পার করণচ্ছলে কৃষ্ণ রাধার প্রতি প্রেম নিবেদন করছে এবং বাধাকে ব্যঙ্গচ্ছলে তার জবাব দিচ্ছে। কৃষ্ণ নৌকা ডোবাবার ভয় দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত রাধাকে কোলে আশ্রয় দিয়েছে। উত্তর-প্রত্যুত্তরের আকারে রচিত এ ধরনের গ্রাম্যগানগুলোই অনেক সময় লোকনাট্য হিসাবে পল্লীবাসীর নাট্যরস পিপাসও কিছুটা চরিতার্থ করে। ৪০ নম্বর গান 'সাঁঝের বেলা জলের ঘাটেরে, পায়ের নূপুর খইসা যায় হে নাগর', ঈষৎ পরিবর্তিত একটি গান। এ গানটিতে জলের ঘাটে নায়ক–নায়িকার সাক্ষাৎ উপলক্ষে পরস্পরের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পরস্পরের প্রেমাকর্ষণ বর্ণিত হয়েছে। গানটি আমাদের 'মৈমনসিংহ গীতিকার' 'মহুয়া' পালার জলের ঘাটে মহুয়া ও নদের চাঁদের সাক্ষাৎকার, নদের চাঁদের প্রেম নিবেদন এবং তা উপলক্ষ করে তাদের উক্তি প্রত্যুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাষার সামান্য রদবদল ছাড়া এ গানটিকে মৈমনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালার উল্লেখিত অংশ বলেই বিভ্রম হয়। এ গানটিতেও নায়ক–নায়িকার কথোপকথনে কিছুটা নাটকীয়তা দেখা দিয়েছে। ৪১ নম্বর গান 'পরশী আপনার নয় বান্ধবরে', কুচবিহারের একটি গ্রাম্যগানেরই ভাষান্তরিত রূপ।

এ সংগ্রহের শেষ গান ৪২ নম্বর গান 'আমার গলার হার খুলে নে ওগো ললিতে', একটি বিরহগীতি। গানটিতে কৃষ্ণবিরহিণী রাধিকার অন্তর্জ্বালা ব্যক্ত হয়েছে। সখীদের উদ্দেশ্য করে রাধা আক্ষেপ সহকারে বলছে, গলার মালা, হাতের বালা, কানের পাশা এসব রেখে আর লাভ কি? কৃষ্ণই যদি না এল তবে বেঁচে থাকার সাধ নেই। সে যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়ে জীবনজ্বালা জুড়াবে এ সঙ্কল্পই সখীদের কাছে ব্যক্ত করেছে। কৃষ্ণরাধার প্রেম বিষয়ক এরূপ সহস্র গীতি এককালে বাঙলার পল্লীবাসীর মুখে মুখে ফিরত।

'রঙিলা নায়ের মাঝি' ও 'পদ্মাপার' গীতি সঙ্কলন দুটিতে জসীমউদ্‌দীন একদিকে যেমন নিজের সংগীত রচনার ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, অপর দিকে লোকসংগীতের প্রতি দেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন। তিনি এই দুটি বইতে রচয়িতা ও সংগ্রাহকের দ্বৈত ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আধুনিক গান রচনা করে যেমন যুগের সাথে তাল মানিয়ে চলেছেন, আবার পল্লীসংগীতের ঐতিহ্যানুসরণ কবে পল্লীগীতির আদল অক্ষুণ্ন রেখে অনেক গান রচনা করে পল্লীগীতির প্রতি আধুনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌল পরিবর্তন সাধনে সাহায্য করেছেন। মোট কথা শহুরে সমাজে আজ যে পল্লীগীতির আদর দেখা যাচ্ছে তার মূলে জসীমউদ্‌দীনের সাধনাই কাজ করেছে। জসীমউদ্‌দীন আর একটি মহৎ কাজ করেছেন, বাঙলার লোকসংগীতের বহু মূল্যবান সম্পদকে অবলুপ্তির হাত থেকে উদ্ধার করে আমাদের পুরাতন লোকসংগীতের ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দ্বার আমাদের জন্যে মুক্ত করে দিয়েছেন। জসীমউদ্‌দীন নিজ কাব্য ও নাট্য সাধনার ক্ষেত্রে লোকসংগীতের প্রভাবকে বরণ করে নিয়েছেন ব্যাপকভাবে। তাতে করে আধুনিক যুগের বাঙলা সাহিত্যের আসরে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিকে মনে হয় মধ্য যুগের কাব্যকুঞ্জ থেকে ভেসে আসা পুষ্পের সৌরভের

মতো। তবু তা আধুনিকতার লক্ষণ বিরহিত নয়। জীবনের স্বীকৃতি এ সাহিত্যে আছে —তবে সে জীবন শহুরে মানুষের ঐশ্বর্যের জৌলুসমুক্ত সাদামাটা পল্লীজীবন। সে জীবনের মৌল-স্বভাবের স্বীকৃতি তাঁর সাহিত্যকে একটা অনন্যতা দিয়েছে। সে জীবনের মূল মধ্য যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্তই প্রসারিত। কালধর্ম তাতে পরিবর্তনের অনপণেয় রেখা অঙ্কিত করে যাচ্ছে তা ঠিক এবং সে পরিবর্তনের স্বীকৃতি জসীমউদ্‌দীনের রচনায়ও আছে ; তবু তা কখনই মূলের সাথে বিছিন্ন হয় নি, যেমন হয়েছে আমাদের আধুনিক নাগরিক জীবন। তাই তো, নাগরিকতার দুর্জয় প্রভাবের দিনে জসীমউদ্‌দীনের পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্য-সাধনা একটা ব্যতিক্রম বলেই অনেকের কাছে প্রতিভাত হয়েছে। আমাদের বাঙলাদেশের আবহমান কালের জীবনধারার ব্যতিক্রম আমাদের একালের নাগরিক জীবন ; কিন্তু সে ব্যতিক্রমটাই নানা ঐতিহাসিক কারণে আজ জীবনে একান্ত সত্য হয়ে উঠতে যাচ্ছে। তা হোক, তাতে যুগ-যুগান্তশায়ী আমাদের শান্ত নিঝুম পল্লীর আপাতঃ নিস্তরঙ্গ জীবনের মূল্য একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। 'বিস্মৃতির মর্মে বসি', আজও তা আমাদের রক্তে যে কিরূপ দোলা দিয়ে যাচ্ছে, পল্লীগানের সহজ সুরে আমাদের প্রাণ যখন আলোড়িত হয়ে ওঠে তখন আমরা তা বেশ বুঝতে পারি। জসীমউদ্‌দীন তাঁর কাব্যে ও গানে তারই স্পষ্ট স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

এক পয়সার বাঁশী

শিশুস্নেহের উৎসমুখে বেরিয়ে এসেছিল জসীমউদ্‌দীনের প্রথম শিশু-কবিতার বই 'হাসু'। 'হাসু'র লেখাগুলো শুধু হাসুকেই নয়, হাসুর মতো সকল শিশুকেই যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছিল। 'হাসু'র সাফল্যই জসীমউদ্‌দীনকে উৎসাহিত করেছিল শিশুদের জন্যে লেখা চালিয়ে যেতে। জসীমউদ্‌দীনের এ প্রচেষ্টারই ফল তাঁর শিশুদের জন্যে রচিত দ্বিতীয় কবিতার বই 'এক পয়সার বাঁশী'। সতেরটি শিশুপাঠ্য কবিতার সঙ্কলন এ বইটিতে শিশু-দরদী জসীমউদ্‌দীনের মনের পরিচয়টি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। শিশুদের যে তিনি কিরূপ ভালোবাসেন, তাদের সামান্য দুঃখ-বেদনার কথাও তাঁকে যে কিরূপ আকুল করে তোলে 'এক পয়সার বাঁশী' কাব্যটিতে রয়েছে তার আন্তরিক প্রকাশ। 'এক পয়সার বাঁশী'র কবি শিশুকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন তা স্ব স্বরূপে। তিনি বেশ জানেন খেয়ালী শিশুর জগতটা বয়স্কদের জগত থেকে বেশ একটু আলাদা। সে জগত আমাদের বয়স্কদের জগতের ন্যায় ছকে বাঁধা নয় ; সেখানে বাস্তব ও কল্পনার কোন বিরোধ নাই, তাই সেখানে সম্ভব-অসম্ভব, উদ্ভট ও অদ্ভুতের অবাধ রাজত্ব । সে রাজত্বে জড়ে-চেতনে কোন পার্থক্য নেই। মানুষ, পশু-পাখী, বনের গাছপালা, লতা, ফুল সেখানে এক সূত্রে বাঁধা নয় ; সবাইর সাথে যেন শিশুর নিবিড় সম্পর্ক। সবাই যেন তার কথা বলার, ভাব করবার উপযুক্ত সাথী। শিশু মনের অবাধ স্বাধীন সঞ্চরণপ্রিয়তাই তাঁকে সব সময় প্রেরণা দেয় গণ্ডী অতিক্রমণের। তাই তাঁর রাজ্যের সীমানার চিহ্ন প্রায় বিলুপ্ত। 'এক পয়সার বাঁশী'তে ঝংকৃত কবিতাগুলি বল্‌গাহীন শিশুমনেরই সজীব স্পর্শে প্রাণবন্ত । এ কাব্যে কবি শিশুকে নিয়ে শুধু কল্পনার জগতে রামধনু পাখা মেলে বিচরণ করেন নি, তাকে বাস্তব প্রতিবেশেও প্রত্যক্ষ করেছেন। সমাজ-বাস্তবের কুশাঙ্কুরে ক্ষতবিক্ষত অসহায় শিশুর ম্লান মুখ তাঁকে ব্যথিত করেছে সবচেয়ে বেশী। 'এক পয়সার বাঁশীতে সে ব্যথা বারবার বেজে উঠেছে। তবু কবি শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার কাজটি কখনই বিস্মৃত হন নি। ছড়া কেটে, গল্প বলে, স্নেহের আদরের কথা বলে

তাদের আপন করে নেওয়ার চেষ্টা পেয়েছেন প্রায় সর্বত্র। 'এক পয়সার বাঁশী'র সুর তাই আনন্দ ও বেদনায় কম্পমান।

এবার আমরা এ কাব্যের কবিতাগুলো বিশ্লেষণ করে উপরোক্ত ধারণার সমর্থন মিলছে কিনা, বিচার করে দেখব। 'এক পয়সার বাঁশী'তে কবি শিশুমনেরই আশ্চর্য রহস্যময় ক্রীড়াশীল রূপটি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন একটির পর একটি কবিতায়। একটি স্নেহ বিগলিত হৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করা যায় প্রতিটি কবিতায়। বয়স্ক মানুষের দৃষ্টিতে শিশুর অনেক আচরণই অদ্ভুত বলে মনে হয় ; তার অনেক ভাবনাই নিছক শিশুর খেয়ালীপনা, অনেক কথাই অর্থহীন কাকলি বলে মনে হয়। কিন্তু স্নেহের চোখে সব কিছুই একটা মহৎ তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেয়। সরল নিষ্পাপ ঐ শিশুদের আধোআধো বুলি, অনাবিল হাসি স্বর্গের সুধা নিয়ে উপস্থিত হয় মানুষের ঘরে ঘরে, বইয়ে দেয় আনন্দের স্রোত। তার শত তুচ্ছ খেলার সামগ্রী সাত রাজার ধন মাণিক্যের চেয়েও মূল্যবান মনে হয়, যখন ঐ সাদামাটা তুচ্ছ জিনিসগুলোকেও পরম মমতায় আঁকড়ে ধরে শিশু সংসারী মানুষের ন্যায় অভিনয় করে। স্নেহাতুর মনের কাছে শিশুর ঘরকন্নার ঐ তুচ্ছ দৃশ্যটিও অসামান্য মাধুর্য নিয়ে দেখা দেয়। তা ছাড়া শিশুর খাপছাড়া জগতে যেখানে রঙ-বেরঙের ফানুস ওড়ে, সেখানে সাংসারিক নিয়মাবদ্ধ মানুষ একটা মুক্তির আস্বাদনও লাভ করে ; তার মূল্য বড় কম নয়। শিশুকে নিয়ে কবিতার খেলা খেলতে কবিরা তাই তো এত ভালোবেসে কবিতার খেলায় মেতেছেন ; শিশুদের আনন্দ দানের চেষ্টা করেছেন এবং নিজেও আনন্দ পেয়েছেন যথেষ্ট। বাস্তব জাগতের রূঢ়তা তাকে মাঝে মাঝে ম্লান করে দিলেও, সে আনন্দধারাকে কখনই একেবারে শুকিয়ে ফেলতে পারে নি। কবিতাগুলোর আলোচনায় তাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

নাম-কবিতা 'এক পয়সার বাঁশী' এ কাব্যটির প্রথম কবিতা হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে। স্নেহের অগাধ সমুদ্র মন্থন করে যে শিশুটির আবির্ভাব পৃথিবীতে, তাকে কবি উপহার দিতে চেয়েছেন 'এক পয়সার' একটি অকিঞ্চিৎকর 'বাঁশী'। এ কবির কেমন ধারা ব্যবহার! এত স্নেহের ভালোবাসার ধনকে কিনা দিলেন স্বল্পমূল্যের একটি বাঁশী উপহার! কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে কবির 'এক পয়সার বাঁশী'টি একটি অসামান্য উপহারই বটে। এ বাঁশীটি কৃত্রিম আভিজাত্যের বেড়ি থেকে শিশুর মনের মুক্তি সাধনে সাহায্য করবে, তাকে দরিদ্র, রিক্ত, সর্বহারা শিশুদের সুখে-দুঃখে শরীক হওয়ার প্রেরণা দিবে ; তাতে সামাজিক বৈষম্যের অবসান সূচিত হবে, বিপ্লব ঘটবে জীবনদৃষ্টিতে, বিশ্বব্যাপী মানবতার জয় হবে ঘোষিত। এ মহৎ মানবিক বিশ্বাসই উদ্বুদ্ধ করেছে 'এক পয়সার বাঁশী' উপহার দিতে। কবির স্নেহ-ঘন দৃষ্টিটি যে সব সময়ই শিশুটির উপর নিবদ্ধ রয়েছে তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে। জসীমউদ্‌দীন কবিতাটিতে রূপকথার কল্পলোক থেকে শিশুকে একেবারে নামিয়ে এনেছেন বাস্তবের সমভূমিতে।

'গল্পবুড়ো' কবিতায় কবি গল্পপ্রিয় শিশুদেরই মনোরঞ্জনের প্রয়াস পেয়েছেন। পূর্ণিমা নামে ছোট মেয়েটি গল্প শুনতে খুবই ভালোবাসে। তার সে পিপাসা মেটানোর জন্য গল্পবুড়োর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন কবি। সারাজীবন গল্প করতে করতেই তো সে বুড়ো হয়েছে। কবি তাই প্রচ্ছন্ন কৌতুকপূর্ণ ভাষায় গল্পবুড়োকে বলেছেন তার পেটি ভরে তো 'রূপকথা সব গিজ গিজ গিজ করে'। সে যদি 'শোলক এবং হাসির, ছড়ার, পড়ার কথার ভারে', চলতেই না পারে এবং তার 'ইলিমিলি কিলি কথা খালি-খালি ছড়িয়ে যেতে চায় পথের ধারে', তবে তার প্রতি অনুরোধ সে যেন দয়া করে পূর্ণিমাকে ডাক দেয়। পূর্ণিমা বেশ আগ্রহ করেই শুনবে সে সব কথা।

এ কবিতায় কবি প্রকারান্তরে গল্প-প্রিয় শিশুদের গল্প শোনার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষারও স্বীকৃতি দিয়েছেন।

'মা ও খোকা' কবিতায় একদিকে স্নেহবুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ের একটি আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে, অপরদিকে শিশু-মনস্তত্ত্বের একটি সুন্দর পরিচয় বিধৃত হয়েছে। মা যতই স্নেহ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে তার ছোট খোকাকে ঘিরে রাখতে চান, নিষেধের বেড়ি দিয়ে তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস পান, ততই যেন খোকার বিধি-নিষেধ লঙ্ঘনের উৎসাহ বেড়ে যায়। সে যে আর ছোট্টটি নেই, তাই প্রমাণ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে আরও বেশী। মায়ের উদ্বেগ বাড়ে, খোকার ছোটাছুটিও বাড়ে। দস্যি ছেলের লীলার অন্ত পায় না মা, তখন শাসন নয়, সোহাগে বেঁধে খোকাকে মা আরও নিবিড় করে পেতে চায়। মা ও শিশু। এ স্নেহের খেলা চিরন্তন—ঘরে ঘরে চলছে চিরটা কাল ধরে। জসীমউদ্‌দীন সে স্নেহ-তরঙ্গিত জীবনদৃশ্যই রূপায়িত করেছেন 'মা ও খোকা' কবিতায়।

'খোসমানী' ও 'আসমানী' কবিতা দুটির মাধুর্য অনুধাবনের জন্যে দুটি কবিতাই একই সঙ্গে পঠিতব্য । সমাজের দুই বিপরীত কোটিতে স্থাপন করে দুটি ছোট্ট মেয়ের জীবনধারার ছবি এঁকেছেন কবি। তাদের অবস্থাগত বৈষম্য নিঃসন্দেহে পীড়াদায়ক। 'খোসমানী' ও 'আসমানী' বস্তুতঃই দুই দেশের অধিবাসী। খোসমানীর জীবনে খুশীরই ছড়াছড়ি। সে যেন রূপকথার স্বপ্নরাজ্যেরই অধিবাসিনী। রোদ ঝিম্‌ঝিম্ তেপান্তরের মাঠের মাঝখানে যেখানে 'বটবিরিক্ষি ঠাণ্ডা পাতার বায়ে বাতাসেরে শীতল করে ছড়ায় মাটির গায়ে', সেথায় থাকে নাকি আমাদের সোনারবরণী মেয়ে খোসমানী। তার হাসিতে ফুল হাসে, গানের সুরে নাকি বুলবুলি নাচে। সকাল বেলা 'দুর্বাশীষের নীহার জলে নেয়ে', সে নাকি খুশীতে ফুলের রেণু খেয়ে আকাশ দিয়ে নেচে বেড়ায়। এ মেয়ের মাটিতেই যেন পা পড়ে না। 'খোসমানীর এ রূপের ছবি আমাদের আকৃষ্ট করে সন্দেহ নেই। তাকে আমাদের সমাজের উচ্চকোটির অথাৎ বিত্তবান-ভাগ্যবান ঘরের মেয়ের প্রতীক বলেই সন্দেহ জাগে। এর পাশে গরীবের ঘরের জীর্ণা-শীর্ণা রুগ্না মেয়ে আসমানী কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তাতো আমরা সবাই বুঝি। তবু যখন খোসমানীর রূপের কথা শুনিয়ে কবি আমাদের বলেন 'এই খুকীটির সঙ্গে তোমার আলাপ যদি থাকে ; বলো যেন আসমানীরে বারেক কাছে ডাকে', তখন আসমানীর কথা নতুন করে ভাবতে ইচ্ছে হয় বই কি। আসমানীর ঠিকানাটা অবশ্য কবি প্রথমেই আমাদের দিয়ে রেখেছেন। আসমানীকে দেখতে হলে, কবি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, 'রহিমদ্দির ছোট বাড়ি রসুলপুরে যাও'। ভেন্নাপাতার ছাউনি দেওয়া তাদের ঘরকে কবি বাড়ি না বলে পাখীর বাসাই বলতে চেয়েছেন। সামান্য বৃষ্টিতেই তাতে পানি পড়ে। সামান্য হাওয়া হলেই ঘর নড়বড় করে, সেই ঘরেই 'আসমানীরা থাকে বছর ভরে'। সে যে পেট ভরে দু মুঠো ভাতও খেতে পায় না, তার পাঁজরার হাড় দেখে তা বেশ বোঝা যায়। দারুণ অভাব তার মুখের হাসিটিও নিভিয়ে দিয়েছে। পরণে তার শতছিন্ন বসন ; তার সোনারবরণ শরীরকে যেন তা উপহাস করছে। ভ্রমর-কালো চোখে তার কৌতুক হাসির পরিবর্তে ঝরে পড়ছে 'অশ্রু রাশি রাশি'। বাঁশীর মত মিষ্টি ছিল তার গলার সুর, সুযোগ হলে তাতে গানের সুর বাঁধা যেত। কেঁদে কেঁদেই সে গলা ক্ষয় করেছে। ব্যাঙের ছানা ও শ্যাওলাপানায় ভরা, ম্যালেরিয়ার মশকের আবাসভূমি বদ্ধপুকুরের তীরে তাদের ঘর। সেই বিষাক্ত পুকুরের জলে তাদের রান্না, খাওয়া-দাওয়া চলে। প্রতিদিন সে জ্বরে ভোগে, পেটে তার পিলে। 'বৈদ্য ডেকে ওষুধ' খাবার পয়সাও তাদের নেই। এ হেন আসমানীর প্রতি খুব বেশী মনোযোগ কি কারো পড়তে পারে? 'খোসমানী' আর 'আসমানী' যে সম্পূর্ণ দুই ভিন্ন দেশের

আধবাসী তা জেনেও কবি যখন প্রশ্ন করেন, 'কওত যাদু, কারে নেবে অধিক ভালবেসে'? তখন জবাব দেওয়াটা খুব সহজ হয়ে ওঠে না। যদিও বুঝতে কষ্ট হয় না যে কবির সহানুভূতিটা আসমানীই দিকে। কবি খোসমানীর ঐশ্বর্যের ছবির পাশে আসমানীর দৈন্যের মূর্তি স্থাপিত করে বোধহয় আমাদের দৃষ্টি বাঙলাদেশের অজস্র অন্যাদৃত শিশু-কুসুমের প্রতি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। কবির সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

'খোকা পাখী' কবিতায় শিশুস্নেহেরই কাব্য-মাধুর্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। স্নেহবুভুক্ষু মানবাত্মার উৎসার শিশুকে অবলম্বন করে যেমন ঘটে, এমন বুঝি আর কিছুতে ঘটে না। শিশু চিরকালের বিস্ময়ের বস্তু হয়ে রয়েছে তাঁর কাছে, তাকে ঘিরে স্নেহের স্বপ্নজাল বুনে চলেছে সে যুগযুগান্তর ধরে অন্তহীন কথায় সূত্রে। স্নেহের চোখে শিশু কত রূপেই না ধরা দিয়েছে তাঁর কাছে। শিশুকে কখন তাঁর মনে হয়েছে সাঁঝ আকাশের তারা, কখন মনে হয়েছে হলদে পাখির ছানা, আবার কখনও রূপকথার রাজপুত্র, এমনি আরও কত কি? স্নেহের চোখে শিশুকে যা ভাবা যায় তাই বলেই মনে হয়। এ এক অদ্ভুত অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতা মানুষের। আলোচ্য কবিতায় আমাদের ঘরের খোকা স্নেহের চোখে পাখী হয়েই যেন দেখা দিয়েছে। খাঁচায় বদ্ধ পাখীর ন্যায় সেও যেন নীল আকাশের হাতছানি দেখতে পেয়ে ডানা ঝটপট করে পালাতে চায়। কবি তার 'খোকা পাখীটি'কে কিন্তু বেঁধে রাখাটা পছন্দ করেন না, তাকে নীল আকাশের বুকে উড়িয়ে দিতেই চান, তা হলেই তো 'ঝরবে মুখে হাসি কুসুম'। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্যই তাকে দিতে হবে অবাধ মুক্তির আনন্দ। সে আয়োজন করতেই যেন কবি ব্যস্ত ; তাই তাঁকে বলতে শুনি ঃ—

"আজকে তারে ঘরের কোণে রাখব না আর এমনি বেঁধে,
তাহার সাথে করতে খেলা আকাশটারে আনব সেধে।"

এমন একটা মজার রাজ্যে অবাধে বিচরণের সুযোগ পেলে খোকা যে খুশী হবে তা তো নিশ্চিত। এর পরে 'খোকা পাখী' হতে না এসে পারে কি? বস্তুতঃ শিশু-মনোরঞ্জক এ কবিতাটি যে বেশ উপভোগ্য তা স্বীকার করতে বাধা নেই।

'হাসু মিঞার পাখীস্থান' ও হাসু মিঞার চিঠি' কবিতা দুটি কোন বিশেষ শিশুকে উদ্দেশ্য করে লেখা হলেও সকল শিশুরই মনোরঞ্জন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। শিশুর মন ও মর্জি বোঝবার ক্ষমতা লেখকের অসাধারণ। শিশু বাস করে জাগর-স্বপ্নের এক অদ্ভুত রাজ্যে; সে রাজ্যের সাথে আমাদের প্রতিদিনকার জগৎটার অনেকটাই অমিল। সেখানে এমন অনেক ব্যাপার ঘটে যা পৃথিবীতে ঘটে না, এমন অনেক জিনিস পাওয়া যায়, যা পৃথিবীতে মিলে না। সেখানে কেবলই ব্যতিক্রম। তবু তাকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয় এমন সাধ্য কার। কবি বলেন, সে রাজ্যে যেতে হলে 'দুটি পায়ে ঝলমল ছড়ার নূপুর চাই', আর রাঙ্গা মেঘের রঙ্গিন জামা পরতে হবে গায়ে', একবার ছড়ার নূপুর পরে, রঙিন জামা গায়ে দিয়ে অগ্রসর হলে সে রাজ্য অবিশ্বাস্য, অলীক বলে মনে হবে না ; আকর্ষণীয়ই মনে হবে। হাসু মিঞার পাখীস্থানটার কথাই ধরুন না ; ওটা আদপেই কোন কল্পনার রাজ্য নয় কিন্তু । 'পাখীস্থানে'র বাসিন্দা পাখীদের নাম শুনলেই তা বেশ বোঝা যায়—বুলবুলি, বউ কথা কও, কোকিল, পাপিয়া, শালিক, শ্যামা, দোয়েল, ফিঙে এমনি সব পাখী সেখানে আছে। কিন্তু নিত্য 'ছড়ার নূপুর পায়ে দিয়ে', 'রঙিন মেঘের জামা', গায়ে দিয়ে সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র সব যেন কেমন পাল্টে গেল। চেনা পাখীরা যেন অচেনা রাজ্যের বাসিন্দা হয়ে গেল। ঐ কারণেই যেন শিশুর কাছে তাদের আকর্ষণ গেল আরও বেড়ে। কবির বর্ণনাগুণে হাসু মিঞার 'পাখীস্থান'টি মর্তলোকেই রূপকথার রাজ্যের মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

'হাসু মিঞার চিঠি'ও স্নেহঝরা ভাষায় লিখিত। ছোট্ট শিশু হাসু মিঞার চাঁদপানা মুখের হাসিতে কবির হৃদয় ভরে গিয়েছে। ছোট শিশু হাসু মিঞাকে নিয়ে কবির রঙিন কল্পনার বহর দেখুন—হাসু মিঞা নাকি,'ছোট্ট এত্তটুকুন' যে প্রজাপতির পাখায় সওয়ার হয়ে ফুল হতে ফুলে ঘুরে বেড়াতে পারে ; দুর্বাফুলের নৌকা গড়ে তাতে চড়ে হাসু মিঞা নাকি শিশির -ফোঁটায় ভাসতে পারে। শুধু কি তাই, ভোমরার পাখায় শুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে নাকি ফুলগুলোর নিশ্বাস ফেলবারও শব্দ শুনতে পায়। স্নেহের দৃষ্টিতে দেখলে পরে শিশুকে নিয়ে কত মধুর কল্পনাই না করা যায়। এমন শিশুর কাছে যদি চিঠি লিখতেই হয় তা তো আর যেমন- তেমন চিঠি হতে পারে না। তাকে কবি চিঠি লিখছেন 'টুনটুনির পাখে', সে রঙিন চিঠি যাবে নাকি 'রাম ধুনকের ডাকে।' 'চাঁদের বুড়ীর সূতো দিয়ে', কবি চিঠির গায়ে রেখা টেনেছেন, শরষে ফুলের পাঁপড়ি নিয়ে তা রঙ করেছেন। এমন চিঠি হাসুর নিশ্চয় ভালো লাগবে। কবি কামনা করেছেন হাসু যখন মায়ের আঁচলে ঘুমিয়ে পড়বে, জানালা দিয়ে চাঁদ এসে তার মুখে হাসি ছড়াবে, তখন তার 'ঘুমাল চোখে' তার পত্রখানি যেন রঙিন স্বপন এনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শিশু-স্নেহসিক্ত রোমান্টিক কবির মনের আশ্চর্য স্ফূর্তি ঘটেছে ছোট এ কবিতাটিতে। স্নেহের চোখে সামান্যও যে কেমন করে স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হয়, এ কবিতা তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

'দুষ্টু মেয়ে' কবিতাটি স্নেহপ্রবণ কবিমনের আর একটি ঐশ্বর্যময় প্রকাশ। বাৎসল্য রসে সিক্ত মন নিয়ে কবি এ কবিতায় একটি দুষ্টু মেয়ের লীলাচঞ্চল রূপটি তুলে ধরেছেন। চিত্রটি যেমনি বাস্তবধর্মী, তেমনি হৃদয়গ্রাহী। কবিতাটির ছন্দেও যেন চঞ্চলা মেয়েটির গতিভঙ্গিটি ধরা পড়েছে ; প্রতি স্তবকে কবির স্নেহপ্রবণ হৃদয়টি যেন ঢেউ খেলে খেলে তাকেই অনুসরণ করে চলেছে। কবিতার বক্তব্যে তেমন কোন অসাধারণত্ব নেই ; একটি দুষ্টু মেয়ের অতি স্বাভাবিক একটি চিত্রই এর সম্পদ। স্বাভাবিকত্বের গুণেই তা মনকে নাড়া দেয়।

শিশুকে নিয়ে ছড়া কাটতে, গল্প বলতে, কৌতুক করতে জসীমউদদীন ভালোবাসেন। নিজেকে তিনি শিশুদের খেলার সাথী মনে করেই যেন আনন্দ পান বেশী। উপলক্ষ একটা পেলেই হলো, তিনি মিষ্টি কথার ঝুমঝুমি বাজিয়ে তাদের নিয়ে আসর জমাতে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব করেন না।

'বাশুমণির জন্মদিনে', ও 'খোকনের জন্মদিনে', কবিতা দুটিতে লক্ষ্য করি, কবি শিশুকে নিয়ে মিষ্টিকথার ফুলঝুরি সৃষ্টির বেশ সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন। 'বাশুমণির জন্মদিনে', আনন্দে অংশগ্রহণের জন্যে কবি আহ্বান করেছেন সোনারবরণ ময়ূরকে, কালো কোকিলকে, রাজহংসকে, এমন কি গাঁয়ের ক্ষেতের সরষে ফুলকেও। কবি নিজেও যে সে আনন্দে অংশগ্রহণে আগ্রহী তা বোঝা যায় তাঁর 'ঘরের সকল দুয়ার খুলি থাকব বসে'— এই বাসনার প্রকাশে। কবি বয়োধর্মে শিশুর রাজ্য থেকে নির্বাসিত, এখন আর সে রাজ্যে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় জেনে কল্পনাতে সে রাজ্যের স্মৃতি মনে টেনে এনে যেন আশ্বাস পান। ভাষার যাদু দিয়ে, কল্পনার রঙ দিয়ে তিনি শিশুর রাজ্যকে এমন সুন্দর করে তুলেছেন কবিতাগুলোতে যে, শিশুরা কেন, বয়স্করাও মুগ্ধ না হয়ে পারে না।

'খোকনের জন্মদিনে' কবিতায় খোকনকে নিয়ে কবি বড় কৌতুকে মেতে উঠেছেন। সমস্ত কবিতাটির মধ্যে কৌতুকহাস্যে উজ্জ্বল কবির মুখটি যেন আমরা প্রত্যক্ষ করি। কবি এক একটি কৌতুকের কথা বলছেন আর মুখ টিপে হাসছেন। বাইরে থেকে কিন্তু মনে হবে তিনি ভারী গুরুতর সব কথা বলছেন। খোকনের জন্মদিনের আসরে কবির নিমন্ত্রণ পড়েছে ; কিন্তু

সেখানেই হয়েছে কবির মুসকিল। কবির সাথে যাওয়ার বায়না ধরেছে নাকি— শেয়াল, বিড়াল, নেংটি ইঁদুর, কুকুর—আরও অনেকে।

"মাসীপিসী বনকাপাসী
চাঁদের খুড়ী ঘুটের বুড়ী সঙ্গে লয়ে দাঁড়ায় আসি।"

খোকনের জন্মদিনে নিমন্ত্রণে তো আর যাকে-তাকে নিয়ে যাওয়া যায় নাঃ—

"সিংহ যেথায় আসর জমায়, ব্যাঘ্র যেথায় আপ্যায়ণে
হস্তী যেথায় ছিটায় গোলাপ জল যে তাহার সুড়ের সনে।
ফিঙে কোকিল বুলবুলিতে গানে যেথায় আসর জমায়
হলদে পাখী শালিক শ্যামা নিত্য যেথা নৃত্য দেখায়,
এবং 'ময়ূর যেথায় পাখার গায়ে নানা ছবি দেখায় আঁকি—"

এমন সভ্য-ভব্যদের আসরে এত লোক সঙ্গে করে গেলে কবি হবেন সবাইর নিন্দার পাত্র! আর তা ছাড়া সেখানে তো যাকে-তাকে ডাকা যায় না! কবি কিন্তু খুবই গম্ভীর ভাবেই কথাগুলো বলতে চেষ্টা করছেন ; কিন্তু তাঁর চোখেমুখে কৌতুকের হাসি যে ঝলক দিয়ে খেলে যাচ্ছে, তা আর বুঝতে কষ্ট হয় না!

কবি কিন্তু এত গুরুতর একটা সমস্যার সমাধান সহজেই করে ফেলেছেন ; তিনি একাই নিমন্ত্রণের আসরে এলেন ; সবাইকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলেন যে 'নিমন্ত্রণের মিষ্টি কিছু সঙ্গে করে আসব নিয়ে', শুধু মিষ্টি নয়, তাদের জন্যে তিনি 'কোকিল পাখীর ঠোঁট ভরে গান', খোকনের পায়ের ঝুনঝুনির তান, ময়ূর পাখার ছবি আর 'বুলবুলিদের পাখতুলিতে 'রামধনুকের রঙগুলিতে' যে কথা হয় তা এঁকে নিয়ে আসবেন। খোকনের জন্মদিনে কবির আনন্দটাই যে বেশী তা কিন্তু চাপা থাকছে না। কবির স্নেহপ্রবণ কৌতুক-উচ্ছল মনটির আশ্চর্য সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে এ কবিতায়।

'আবল-তাবল' কবিতাটি ইংরেজী' Nonsense Rhyme' জাতীয় রচনা। অসংলগ্ন, আজগুবি কথা জড়াজড়ি করে ভীড় করেছে কবিতাটিতে। তাদের রকমারি দেখে অবাকই হতে হয়। এদের কোন অর্থ খুঁজে বের করতে গেলে কিন্তু পণ্ডশ্রমই সার হবে বলে মনে হয়। তবু ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত নানা কথার ফোড়ন দিয়ে কবি যে কথার আতশবাজী তৈরী করেছেন তার বর্ণালিতে মুগ্ধই হতে হয়। বল্গাহীন কল্পনার রাজ্যে ভেসে বেড়াতে অভ্যস্ত শিশুমন কিন্তু এ আবল-তাবল শুনে বেশ খুশীই হয়। তার মনেরই মত এ কবিতার কথার রঙ মুহূর্তে মুহূর্তে বদলায় ; তাই তো এ কবিতা তাঁর কাছে অত তাৎপর্যবিহীন মনে হয় না। বক্তব্যের অস্বাভাবিক রকম অসংলগ্নতাই কিন্তু এ কবিতার আকর্ষণের হেতু। বাঁধা কথার আসর থেকে মন এখানে মুক্তি পায় বলেই, বন্ধনক্লান্ত মন এ অসংলগ্নতাকেই একটা মস্ত রিলিফ বলে মনে করে। তাই এ জাতীয় রচনা শ্রুতি-সুখকরও বটে। হাল্কা ভাষায়, হাল্কা ছন্দে লেখা এ কবিতা পড়ে শিশুমন প্রজাপতি পাখা মেলে উড়ে বেড়ায় ; বারবার গতিপথের পরিবর্তন ঘটে। পলক পাল্টাতেই দৃশ্য পাল্টায়, তাই যে দৃশ্যের মিছিল চলতে শুরু করে সামনে দিয়ে তাদের কোনটির সাথেই আমাদের পরিচয়টা বড় পাকা হয়ে উঠতে পারে না। একটা দৃশ্য চলে যেতে না যেতেই আর একটা হুড়মুড় করে এসে উপস্থিত ; সাধ্য কি এর সার্থে তাল রেখে চলে কেউ? তবু বৈচিত্র্যের আস্বাদে তা মন ভরে দেয়।

'কবি ও চাষার মেয়ে' কবিতাটি নানা দিক দিয়ে এ কাব্যের একটি বিশিষ্ট কবিতা। 'কবি ও চাষার মেয়ে'র উক্তি প্রতুক্তির মধ্য দিয়ে কল্পলোক ও বাস্তবের দূরতিক্রম্য ব্যবধানটি যেমন স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে তেমটি বাস্তব-বিমুখ কল্পনাবিলাসী কবিমনের প্রতি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গবাণও বর্ষিত হয়েছে। মিষ্টি কথার ঝুমঝুমি বাজিয়ে, রূপকথার স্বপ্নজাল সৃষ্টি করে শিশু ভোলানোর কাজটি কবিদের প্রিয় সন্দেহ নেই। শিশুর প্রতি অপরিমেয় স্নেহ থেকেই হয়তো তা উৎসারিত হয়। যে শিশুকে সংসারের দারিদ্র্যের কন্টকজ্বালা ভোগ করতে হয় না ; তাকে নিয়ে স্নেহের এ খেলা সত্যিই জমে ভাল। কিন্তু জন্মাবধি যে শিশু মাতাপিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত, দারিদ্র্য যার মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে—যে শিশুর গায়ের কাপড় জোটে না, পেটে ভাত পড়ে না, পিতৃ-মাতৃহীন এমন অনাথ শিশুকে কি শুধু মিষ্টি কথা দিয়েই ভোলানো যায়? আর সে চেষ্টা কি একটা নিষ্ঠুর পরিহাসের মত মনে হয় না? আলোচ্য কবিতায় কবি স্নেহের এ নির্মম প্রহসনকেই যেন ব্যঙ্গ করেছেন।

কবিতাটির প্রকাশকলার বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। কবির স্নেহ মাখানো, স্বপ্ন জড়ানো, শিশু ভোলানো সুন্দর কথার জবাবে অভাব, বেদনা-ক্ষুব্ধ চাষার মেয়ের কারুণ্য সঞ্চারকারী সরল, নিরলংকৃত , ব্যথাদীর্ণ ভাষা যেন একটা তীব্র প্রতিবাদ রূপেই ধ্বনিত হয়েছে। কবিকে সে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে তাঁর ঐ ভালোবাসার, স্নেহের ভনিতা অর্থহীন ; কারণ, তাতে বাস্তব-জীবনের দুঃখ-বেদনার স্বীকৃতি নেই একেবারে। কিন্তু এ প্রতিবাদের ভাষা খুব সহসা কবি বুঝে উঠতে পারেন না ; তাই তো দেখি শিশুর কথার যথার্থ জবাব কবির কাছ থেকে আসে না। তিনি মিষ্টি কথার, সুন্দর কথার ফুলঝুরি সৃষ্টি করে চলছেন। আর অসহায় শিশু তার অসহায়ত্বকেই তখন যেন আরও বড় করে দেখতে পেয়ে কাতর আর্তনাদে তার প্রতিবাদ জানায়। তখন সে আর্তনাদে কবির স্বপ্ন টুতে যায়!

জসীমউদ্‌দীন এ কবিতায় আর একবার প্রমাণ দিয়েছেন, তাঁর বাস্তব-চেতনা কত তীব্র। কবিত্বের স্বপ্নালোকে বিহার করলেও, বাস্তবের সম্পর্কে তিনি ভালো ভাবেই সচেতন।

'জলের মেয়ে' কবিতায় কবি ফিরে গিয়েছেন রূপকথালোকে 'জলকুমারী'র দেশে। বিদেশী সাহিত্যে 'Mermaid'এর কথা নিয়ে যথেষ্ট গল্প কবিতার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যে 'পাতলপুরীর রাজকন্যা', ক্ষীর সায়রের রাজকন্যা, কোথাও বা সাগরকন্যার নাম শোনা গেলেও সে কন্যার বর্ণনার সাথে জল-জগতের যোগটা কোথাও বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ নদী-নালা হাওরের দেশের রূপকথায় জলের জগতের খবরটাই কিন্তু প্রত্যাশিত। জসীমউদ্‌দীন আমাদের জলের দেশেই জলকুমারীর সন্ধান দিয়েছেন। জলের ছায়ায় ভেসে চলছে মাছগুলো অনির্দেশ পথে ; তাদের দেখে কবির মনে হচ্ছে তারা বোধহয় এমন করে ভেসে চলছে 'সাত সাগরের শঙ্খ ঝিনুক তরে'।

কবি অনুমান করেছেন, জলের দেশে যেথায় 'শিয়রে মণির প্রদীপ জ্বালি', 'ঢেউয়ের দোলায় ঘুম ঘুমিয়ে', 'জলকুমারী হাসছে খালি খালি', সেথায় হয়তো তার কালো কেশের 'শোভার কুসুম হতে রঙ-বেরঙের মাছেরা', সব ছুটে চলছে। জলকন্যা হঠাৎ হয়ত ঢেউয়ের দোলায় জেগে উঠে তার 'কেশের মাঝে মাছের নাচন দেখবে কুতুহলে'। এমন দৃশ্য দেখার জন্যে আমাদের কবিরও ইচ্ছে করে মাছের সাথে ভেসে চলে যেতে 'অথই জলে রাজকুমারীর দেশে'। সেখানে তিনি তার শিয়রে প্রহর জেগে শেওলার পটে লিখন লিখবেন। তিনি জানতে চেষ্টা করবেন তার শিয়রে স্বপ্নঘেরা জীবনের রহস্য। জলের ঢেউ কেমন করে ছড়া কেটে তাকে ঘুম পাড়ায়, প্রবাল কেমন করে তার ঠোঁটে চুমু এঁকে দেয়, কেমন করে তার কালো কেশ ছড়িয়ে যায়, আর কেমন করেই বা তার গাঙ্গজলী কেশ রঙিন হয়ে ওঠে

তারই রহস্য-মন্ত্র ছড়াটি কবি জানতে চাইবেন। সেই ছড়াটি তাঁকে শিখিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানাবেন মেয়েটিকে , কারণ, কবির কথা 'তারির লোভে ভেসেছি আজ জলের দেশান্তরে'। এ বর্ণনাতে নদীমাতৃক বাঙলাদেশেরই সৌন্দর্য যে অনেকটা প্রতিবিম্বিত হয়েছে তা বেশ বোঝা যায়। তবু এ কবিতায় রূপকথার আদলটিই বেশি করে লক্ষ্য করা যায়।

'পূর্ণিমা' কবিতায় কবি রূপকথার জগৎ থেকে একেবারে বাস্তবের সমভূমিতে নেমে এসেছেন। কবিতাটিতে একদিকে বিগত যুগের পল্লীর প্রকৃতির পরিবেশে অনাবিল শান্তি ও আনন্দময় জীবনের প্রসাস্ত কীর্তন করা হয়েছে, অপর দিকে শহরের কৃত্রিম সুখৈশ্বর্যের হাতছানিতে মুগ্ধ স্বাস্থ্য-সম্পদরিক্ত পল্লীসন্তানের দুর্গতির ও চূড়ান্ত বিপর্যয়ের ছবি আঁকা হয়েছে। প্রসঙ্গত লেখক সাধারণ শহরবাসীর জীবনের অভিশাপের বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন এবং এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্নও তুলেছেন। আলো-বাতাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত এ মানুষগুলোর দুর্দশার একটি বলিষ্ঠ প্রতিকার কামনা ব্যক্ত হয়েছে এ কবিতায়। কবির মানবপ্রেমিক আদর্শবাদী মনটি যেমন এ কবিতায় সুন্দর পরিস্ফুট তেমনি তাঁর সুগভীর পল্লীপ্রীতি এবং নাগরিক জীবনের প্রতি অনীহাও প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাটি কবির বাস্তব কোন অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়াজাত বলেই মনে হয়। পূর্ণিমা নামে একটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেয়ের জীবনে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসার ফল যে কিরূপ মর্মান্তিক হয়েছিল তারই কাহিনীর মাধ্যমে কবি নাগরিক জীবনের রূঢ়তার ছবি তুলে ধরেছেন এবং তুলনায় জৌলুসহীন পল্লীজীবনেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। অবশ্য নাগরিক মানুষের দুর্দশার প্রতিকারে একটি বলিষ্ঠ সুন্দর সংকল্পও তিনি কবিতার শেষে ব্যক্ত করে নিজ মানবপ্রেমী হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন।

'গানটি রচি কার তরে' কবিতায় কবি তাঁর রচনার লক্ষ্য যারা তাদের কথাই বলেছেন। কবি গান লিখেন, কবিতা রচনা করেন ; তা বিশেষ কাউকে লক্ষ্য করেই করে থাকেন, যদিও সাধারণভাবে সকলেই সে রচনা উপভোগ করতে পারে। আমাদের কবির রচনার লক্ষ্য হচ্ছে সে সব মুখচোরা , লাজুক, ঘরকুনো ছেলেমেয়ে যারা,—

"কয় না কথা, রয় না কাছে হয় না আলাপ যার সাথে,
চায় না কিছু খায়, না কিছু ভরে দিলেও দুই হাতে।"

ঘরকুনো মুখচোরা ঐ শিশুকে কেউ ভালো বলে না। কেউ কাছে ডেকে আদর করে না ; সে খেলায় না, বেড়ায় না—ঘরের নির্জন কোণেই তার দিন কাটে। কেউ তার ভালো চায় না, সেও ভালো হওয়ার গরজ বোধ করে না। সারাদিন সে কি যে ভাবে, কি যে করে সেই জানে। এমন ছেলেকে আপন করে নেওয়ার জন্যে কবি কিই না করেছেন। প্রকৃতির বর্ণ, গন্ধ, গান, রূপ-রসের ভাণ্ডারকে রঙে রেখায় উজ্জ্বল করে তার সামনে তুলে ধরছেন কবি। যেমন করেই হোক, তাকে তিনি কাছে ডেকে আনবেনই ; সেই যদি কাছে না এল তা হলে তার এত রঙিন ছড়ার কথারই বা প্রয়োজন কি, রামধনুর জাঁক, চাঁদের হাসিই বা কিসের জন্যে? শিশুর মুখেই যদি হাসি না ফোটান গেল, তবে কবির মত আমাদের মনেও প্রশ্ন-জাগে—"কোন সুখে সে হাসে যদি নেই হাসি সেই চাঁদ মুখে।" কবির শিশুস্নেহ অপরূপ মহিমা লাভ করেছে এ কবিতায়।

এ কাব্যগ্রন্থের শেষ রচনা হচ্ছে সতীরাণী নামে একটি পরিচিত ছোট্ট মেয়েকে উদ্দেশ্য করে লেখা স্নেহ-কথার নির্ঝর 'দুষ্টু' কবিতাটি। সদাহাস্যমুখর, চঞ্চলগতি ছোট্ট মেয়েটি কবির স্নেহ যে কি পরিমাণে কেড়ে নিতে সমর্থ হয়েছিল তা কবিতার বক্তব্যে ও নামকরণেও প্রকাশ। কবিতাটির শেষে পাদটিকায় কবি জানিয়েছেন—'এই কবিতাটি লেখার কয়েক মাস

পরেই সতীরাণী তার বাপমাকে কাঁদিয়ে চিরতরে চলে গেছে'। মেয়েটির মৃত্যু যে কবিকে বিচলিত করেছিল, তা এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর তাতেই কবির স্নেহার্দ্র হৃদয়ের রূপটি স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। কবিতার 'দুষ্টু' নামকরণে সে স্নেহেরই হৃদয়স্পন্দন অনুভব করা যায়। ছোট্ট শিশুর চলন-বলন সবটাই যেন কবির কাছে মাধুর্যময় মনে হয়েছে ; তাই তো তার কালো চোখের হাসি, কালো চুলের রাশি, তার নৃত্যচপল গতিভঙ্গিমা সবই কবির চোখে ভালো লেগেছে। এতটুকুন শিশু হলে হবে কি , তাকে ঘরের আঙিনায় ধরে রাখা যেত না, বাড়িময় ছুটোছুটি করে বেড়াতো সে -- 'এধার ওধার সেধার দিয়ে ঠিকরিয়ে যে পড়ে'।

এই ছোট শিশুটি কবির হৃদয়ে তুলেছিল স্নেহের ঢেউ। কি করে যে কবি সে স্নেহ প্রকাশ করবেন তার যেন ইয়ত্তা পাচ্ছেন না ; কত সুন্দর কথাই না তিনি বলছেন। বলছেন, গোটা আকাশটাকেই যদি হাতের কাছে পাওয়া যেত তবে তিনি তাকে সেখানেই রেখে দিতেন, উপায় যদি থাকত তবে 'আকশি দিয়ে চাঁদ পেড়ে তার দিতাম গায়ে মাখি' এমনি তাঁর ইচ্ছে। ফোটা ফুলের মতো সুন্দর এ মেয়েটি, সম্ভব হলে সেই ফুলের সৌরভের মতো ছড়িয়ে দিতেন তাকে শূন্যে। কবি বৃথাই তাকে চোখের কাজল করে চোখ দুটিতে ভরে রাখার প্রয়াস পান ; কিন্তু দুষ্টু মেয়েকে কিছুতেই যেন তিনি ধরে রাখতে পারছেন না। 'কখন সে যে চোখের তারার আড়াল দিয়ে পালিয়ে যায় কোন স্বপন-মাখা গায়' কবি তার কোন হদিসই করতে পারছেন না। ছোট্ট মেয়েটি যে আর চিরকালই ছোট থাকছে না, স্নেহান্ধ মানুষ তা বোধহয় ভুলেই যায়। তাই তো এতটুকুন শিশুকে চিরকালের জন্যে নয়নের কাজল করে ধরে রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। স্নেহের দৃষ্টিতে শিশু যে অন্তরের আভাস বহন করে আনে তাই কবির কবিত্বপূর্ণ উক্তিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্নেহের অনন্তাভিসারী রূপেরই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এ কবিতায়। জসীমউদ্‌দীনের এ কবিতা নিছক শিশু ভোলানো কবিতা নয় ; স্নেহপুত্তলি শিশুর অপার রহস্যকে অনুধাবনেরই চেষ্টা।

'এক পয়সার বাঁশী'তে শিশু-কবিতা রচনায় জসীমউদ্‌দীনের কাব্যিক সিদ্ধি বোধহয় 'হাসু' চেয়েও বেশী। 'হাসু'র কবিতাগুলো লেখা হয়েছিল 'হাসু' নামক কোন শিশুকে আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে। একটি স্নেহসিক্ত কবিমন সেখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উন্মুখ হয়েছিল। 'এক পয়সার বাঁশী'র লক্ষ্য কিন্তু কোন বিশেষ শিশু নয়, এ বাঁশীটি তিনি তুলে দিতে চেয়েছেন, —নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বহারা, বিশ্বের অগণ্য শিশুর হাতে। 'হাসু'র কবি শিশুর জগতের কথাই বলেছেন বটে। তার ছোটখাট আনন্দ-বেদনার কথা যেমন দরদ ভরে বলেছেন ; তাকে নিয়ে নির্মল হাস্যকৌতুকেও মেতে উঠেছিলেন। ছড়া, রূপকথা, কিংবদন্তীর দেশের খবর শুনিয়ে শিশু-মনকে স্বপ্নরাজ্যেও নিয়ে গিয়েছেন। শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে নিজ জ্ঞানেরও পরিচয় রেখে দিয়েছেন। অনাড়ম্বর সরল প্রকাশভঙ্গির জন্যেও কবিতাগুলো শিশু মনোরঞ্জনে সহায়ক হয়েছিল। 'এক পয়সার বাঁশী'তে কবি শিশুকে শুধু মিষ্টি কথার ঝুমঝুমি বাজিয়ে, ছড়া কেটে, গল্প বলে খুশী করতে চান নি। তাকে নিয়ে মাঝে মাঝে হাস্যকৌতুক করেছেন তা ঠিক। কিন্তু শিশুকে বাস্তব পরিবেশের সাথে সংযুক্ত করে অনেকটা নতুন দৃষ্টিতেই দেখেছেন। সমাজ-সমস্যার কুশাঙ্কুরে ক্ষত-বিক্ষত শিশুকে যেমন তিনি মানবতার অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন, তেমনি তার সমস্যারও মানবিক সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। একটি উচ্চ নৈতিক মানবিক আদেশে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন শিশুকে। শিশুর মনোজগতের রহস্যানুধাবনের চেষ্টা এখানে অনেক ব্যাপক ও গভীর। স্নেহের রহস্যানুসন্ধানে তিনি এখানে অনেক বেশী তৎপর। কবির অভিজ্ঞতার জগত এখানে অনেকটাই বিস্তৃত। শিশুকে আনন্দ দানের জন্যে ছড়া, রূপকথার উপচার যেমন তিনি সাজিয়েছেন, তাকে সংসারের

দারিদ্র্য, দুঃখ, বেদনার মধ্যে উপস্থাপিত করে ভবিষ্যতের সমাজ-বাস্তবের মোকাবেলার জন্যে তৈরী করে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। প্রকাশে কাব্যিক-মাধুর্য সঞ্চারে তিনি সমান মনোযোগী। উপমায়, শব্দচয়নে, কাব্যবস্তুর অভিনবত্বে, কল্পনার সমৃদ্ধিতে 'এক পয়সার বাঁশি'র কবিতাগুলো 'হাসু'র কবিতাগুলোকে যে পেছনে ফেলে এসেছে বুঝতে অসুবিধে হয় না। 'হাসু'র কবিতাগুলোতে কবিত্বের রঙ ধরেছিল ঠিক কিন্তু আলোচ্য কাব্যের কবিতাগুলো রঙে, রেখায় অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। মোট কথা, ভাব ও ভাবনার প্রকাশে 'এক পয়সার বাঁশিতে কবি-প্রতিভাকে কোন রকমেই অস্বীকার করা যায় না।

মাটির কান্না

'মাটির কান্না' জসীমউদ্‌দীনের কাব্যসাধনার ইতিহাসে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। সকল সমালোচকই এ কাব্যটিকে জসীমউদ্‌দীনের পূর্বাপর সকল কাব্য থেকে একটু ব্যতিক্রম বলেই চিহ্নিত করেছেন। এ ব্যতিক্রমের হেতু এ কাব্যে কবির জীবনদৃষ্টির মৌলিক পরিবর্তন। যে কবিকে আমরা পূর্বাপর দেখে এসেছি আধুনিক যুগের জটিল জীবনাবর্ত থেকে দূরে সরে, চিন্তা ভাবনার সকল জটিলতা পরিহার করে পল্লীবাংলার সরল মানুষের দুঃখ-দারিদ্র-ব্যথাদীর্ণ অথচ স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, রস-সিঞ্চিত জীবনের কাহিনী বর্ণনা করে, চিত্র এঁকে ও পল্লীপ্রকৃতির রূপারতি করে চরম আনন্দ ও পরম তৃপ্তি লাভ করেছেন, সেকথা তিনি যুগ-জীবনজিজ্ঞাসার পরিবর্তে মাঝে মাঝে উনিশ শতকীয় রোমান্টিক কবিদের ন্যায় প্রেম ও সৌন্দর্যের তত্ত্ব ভাবনায় বেশী উৎসাহবোধ করেছেন, সেই কবি এখানে যেন যুগ-জীবনজিজ্ঞাসায় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। সত্য বটে, এ কাব্যেও পল্লীজীবন ও প্রকৃতির কথা আছে, কিন্তু এ কাব্যে ব্যবহৃত জীবনের ক্যানভাসটি আরও বড়। এ কাব্যে জীবনকে নিছক পারিপার্শ্বিক-চেতনাবিহীন ভাবুকের চোখে দেখা হয় নি, দেখা হয়েছে তার দেশ কাল-বিধৃতরূপের বৈচিত্র্য ও জটিলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন আধুনিক চিন্তাশীল মানুষের চোখে। কবি এখানে রীতিমতো সমাজ-সচেতন ; তাঁর চিন্তার দিগন্ত বহুদূর প্রসারিত। পল্লীজীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের অনুধ্যানে তাঁর আগ্রহের অভাব নেই, তাই বলে দেশব্যাপী সমকালীন মানুষের জীবনের তরঙ্গ-দোলার প্রতি ঔদাস্য এখন আর তিনি সহ্য করতে প্রস্তুত নন। তিনি এখানে শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন। মানুষের যুগযুগান্ত ব্যাপী অপমান, লাঞ্ছনা ও শোষণের পুঞ্জীভূত বেদনা, সামাজিক বৈষম্য, অর্থগৃধ্নু কুটিল স্বার্থপরতা, নিপীড়িত মানুষের অসহায়তা প্রত্যক্ষ করে কবির মনে জেগেছে বিক্ষোভ, জেগেছে বলিষ্ঠ প্রতিকার কামনা। নতুন কবিতা লেখার সংকল্প করেছেন কবি আর্তমানবতার 'কান্নাকে' ভাষা দেওয়ার জন্যে। শুধু কি তাই? কবি সমকালীন সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশ ভাবনায় দোল খেয়েছেন। মানুষের জীবন-মহিমার উপলব্ধির প্রয়াস পেয়েছেন তিনি মানব হিতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ মানব সন্তানের কীর্তি স্মরণ করে। ইতিহাসের পাতা থেকে খুঁজে বের করেছেন সে মহিমান্বিত মানুষকে, আপন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেও পেয়েছেন তার সাক্ষাৎ। 'রাখালী', 'নকসী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'বালুচর', 'ধান-খেত', 'রূপবতী', ইত্যাদি কাব্যে কবির এরূপ অনেকটাই অপ্রত্যাশিত বলে মনে হয় না কি?

'মাটির কান্না'য় কবি ভাবের ক্ষেত্রে সত্যি সত্যিই নতুন পথের পথিক। এখানে কবি আর নির্লিপ্ত দর্শক মাত্র নন, তিনি এখানে নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত মানুষের জীবনের

শরীক। তাদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং দেশ-কাল চেতনায় সঞ্জীবিত মানুষের জীবন-মহিমা উপলব্ধির প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। স্বভাবতঃই একালের সমাজতন্ত্রী মানুষের মনে এ কাব্যের আবেদন রয়েছে যথেষ্ট। তাই দেখি ১৯৫৯ সালে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়ে এ পুস্তক সে দেশের মানুষের মনকে স্পর্শ করেছিল। 'মাটির কান্না' তাই বলে কবির কাব্যসাধনার মূল ধারা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। এ কাব্যেও গ্রাম্যজীবনের প্রতি কবির সহজ অনাবিল প্রীতির পরিচয়জ্ঞাপক যথেষ্ট কবিতা রয়েছে। বাঙলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখানেও তাঁকে ক্ষণেক্ষণে দোলা দিয়েছে। তবু কবি স্বভাবের মৌল পরিবর্তনটি বুঝতে কোন্ কষ্ট হয় না।

'মাটির কান্না'য় কবিস্বভাবের এ মৌল পরিবর্তনটি কিন্তু কবিতার আঙ্গিকে তেমন প্রতিফলিত নয়। ভাষা, ছন্দ ও উপমা ব্যবহারে জসীমউদ্‌দীন মূলতঃ পুরাতনেরই অনুবর্তন করেছেন। সেই স্বরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পৃষ্ঠে দোল খেতে খেতে রামধনু আঁকা স্বপ্নে বিভোর, চাঁদের চুমোর স্মৃতিতে বিবশ, বিজলীলতার চমকে ভাস্বর উপমা ও শব্দের অকুণ্ঠ প্রয়োগে কবিতার চুমকি রচনা করে চলেছেন কবি। এখানে সেখানে নতুনের পলেস্তরা পড়লেও ভাষাদেহের সে পরিবর্তন তেমন লক্ষণীয় নয়। কোন কোন কবিতায় ভাষার পরিমার্জন বিষয়ের অনুরোধে একটু বেশী হয়েছে এটা ঠিক। তবে ভাষা ব্যবহারে কবির ঔচিত্যবোধ প্রায় কোথায়ও ক্ষুণ্ন হয় নি। এ কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হয়, কবির কাব্য-ভাবনার পরিবর্তন, উপযুক্ত আঙ্গিক-পরিচর্যা দ্বারা সমর্থিত হয় নি। পল্লীকবিতার ক্ষেত্রে যে ভাষা-ছন্দ আশ্চর্যরূপে সার্থক, তাই এ কাব্যের নতুন বক্তব্যের প্রকাশে অনেক কম সার্থক। বোধহয় এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করেছেন বলে, কোন কোন সমালোচকের কাছে জসীমউদ্‌দীনের এ নতুন কাব্য প্রচেষ্টা স্বাভাবিক বলে মনে হয় নি, তাঁরা একে 'আধুনিক হয়ে ওঠার ঘর্মাক্ত' প্রচেষ্টা বলে আক্ষেপ করেছেন, তাঁদের মতে এর ফলে কবি তাঁর কাব্যের প্রসাদগুণ হারিয়ে ফেলেছেন। এ অভিযোগের সারবত্তা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কবির 'রাখালী', 'নকসী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র দুর্লভ কাব্যিক সিদ্ধি এ কাব্যে ঘটে নি, তবু 'মাটির কান্নায়' কবির কলানৈপুণ্যের হ্রাস ঘটেছে এমন কথা স্বীকার করা যায় না। যে সব কবিতায় কবি পল্লীজীবনের প্রতি সহজ অনাবিল প্রীতির পরিচয় রেখে গেছেন, সেখানে তিনি তো মোটামুটি স্বভাবের খাতেই চালিত হয়েছেন ; সেখানে তাঁর সার্থকতা তো খুব কম নয়। আবার যেখানে তিনি আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার বশে কাব্যে নতুন চিন্তা ও ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন, সেখানেও তিনি সম্পূর্ণ নীরস হয়ে পড়েন নি। তাঁর বক্তব্য সেখানে অনুভূতির আন্তরিকতায় দ্রবিভূত, তাই বেশ স্বচ্ছ এবং মননের জটিলতা থেকে মুক্ত। এ ক্ষেত্রে তিনি অতি আধুনিকদের সাথে পাল্লা দেওয়ার মোটেই স্পর্ধা রাখেন না। সত্যেন্দ্র নজরুলের বিশেষত ঃ নজরুলের, মানব-প্রীতির আদর্শই তাঁকে এ বিষয়ে পথ দেখিয়েছে। তাঁদেরই পথরেখা তিনি অনুসরণ করেছেন বক্তব্যের অনুধাবন ও প্রকাশনের ক্ষেত্রে। তবু জসীমউদ্‌দীনের স্বকীয়তা এ ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ন হয় নি। তাঁর বিশিষ্ট মানসপ্রকৃতিটি এখানেও প্রকাশিত। তিনি সত্যেন্দ্রনাথের মতো নিরাবেগ পাণ্ডিত্যশাসিত মনের অধিকারী নন, আবার নজরুলের ন্যায় প্রচণ্ড আবেগ উচ্ছ্বাসের অধিকারীও নন ; তিনি একটি প্রশান্ত স্নেহাশ্রুবিগলিত মাতৃহৃদয়েরই অধিকারী যেন। এ হৃদয়ে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় না, এ হৃদয় বেদনা-মথিত হয়ে কেবল অশ্রু ঝরায়, মাঝে মাঝে দুঃখ, বেদনার প্রতিকার কামনায় বদ্ধমুষ্টি হলেও আপন অসহায়তায় বিব্রত বোধ করে, আক্ষেপ প্রকাশ করে। তবে মানবতার সুস্থ-সুন্দর রূপের অনুধ্যানে

জসীমউদ্‌দীন নজরুলের মতো উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। মানুষের জীবন-মাহাত্ম্য বর্ণনেও তাঁদের সমান তৃপ্তি।

আবেগের প্রচণ্ডতায় নজরুল সবক্ষেত্রেই একটু বেশী উচ্চকণ্ঠ, জসীমউদ্‌দীন অনেকটাই মৃদুকণ্ঠ। ভাবনার সাদৃশ্য সত্ত্বেও তাই দুই কবিকে আলাদা করে নিতে কোন কষ্ট হয় না। নজরুল যুগ-জীবন তরঙ্গে সওয়ার হয়েই সব কিছু পর্যবেক্ষণ করেছেন বলে তাঁর কবিতার বক্তব্যে তরঙ্গ-দোলা খুব বেশী অনুভূত হয়। জসীমউদ্‌দীন বাস্তব-জীবনে সে তরঙ্গ-দোলা কিছুটা বোধ করলেও, কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে বরাবর তা থেকে দূরেই ছিলেন। তারপর বাস্তব-জীবনেও সে তরঙ্গ থেকে অনেক দূরেই সরে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে সে তরঙ্গ-দোলা তা কখনই সঞ্চারিত হয় নি। তিনি তাঁর আপন পারিপার্শ্বিকে, জীবনের যাত্রাপথে লাঞ্ছিত মানবতার কত সহস্র ছবিই তো ইতিপূর্বে অবলোকন করেছেন। সে অভিজ্ঞতার ঘনীভূত আবেগই জন্ম দিয়েছে 'মাটির কান্না'র এ ধরনের কবিতাগুলোর। তাই এখানে সামাজিকের তীক্ষ্ণ সমালোচনার পরিবর্তে সংবেদনশীল একটি মনেরই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে বেশী করে। তাই বক্তব্য তাঁর নীরস হয়ে ওঠে নি প্রায় কোথাও। তবে ঐ যে বললাম, জসীমউদ্‌দীন এ কাব্যে নতুন কোন শিল্প-সম্ভাবনার পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হতে পারেন নি। ভাবনার নবদিগন্ত উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীসত্তা নতুনভাবে সাড়া দেয় নি। এটা জসীমউদ্‌দীনের সমগ্র কাব্যসাধনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন সুরের আলাপনের প্রয়াস হিসাবে 'মাটির কান্না'র একটা স্বতন্ত্র মূল্য অবশ্যই থেকে যাচ্ছে।

'মাটির কান্না'র কবিতাগুলোর কাব্যমূল্য নির্ধারণের জন্যে এবার কবিতাগুলোর একটু বিচার-বিশ্লেষণ করা যাক। 'মাটির কান্না'য় কবির মোট ৩১টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। নাম-কবিতা 'মাটির কান্না'য় কাব্যের মূল সুরটির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কবিতাটির নামকরণে ও বক্তব্যে কাব্য-ভাবনার একটি নবতর বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পরিস্ফুট হয়েছে। সামাজিক মানুষের উদ্দেশ্যে একটি অতি সরল অথচ তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরে, কবি শুরু করেছেন তাঁর কাব্যে প্রথম কবিতাটি,—

'মাটির কান্না তোমরা শুনিতে পাও?'

কবি তাঁর নিজ অন্তরে এ সরল প্রশ্নের 'অস্তি বাচক' জবাব পেয়েছেন এবং তাতে ভর করেই আপনার অন্তরের নতুন ভাবনাকে প্রকাশ করতে ব্রতী হয়েছেন। এতকাল কবি পল্লীর শান্ত রূপের ধ্যানেই কাটিয়েছেন, কচিৎ বা প্রেমসৌন্দর্যের রহস্যালোকে বিচরণ করেছেন ; সহৃদয়ের মতো ব্যথাদীর্ণ চিত্তে মানুষের দুঃখ-বেদনামথিত স্নেহার্দ্র রূপ অবলোকন করেছেন ও কালে-ভদ্রে তার এক-আধটি ছবিও এঁকেছেন। কিন্তু তাদের সম্পর্কে কোন সামাজিক দায়িত্ব পালনের তাগিদ তিনি অন্তরে অনুভব করেন নি। করে থাকলেও, কাব্যে তার কোন পরিচয় রেখে যান নি। এইবার তিনি মানুষের যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত লাঞ্ছনা, অপমান, বঞ্চনা, বেদনা ও অতলস্পর্শী দুঃখের কথা শুধু অন্তর দিয়ে অনুভবই করলেন না ; মূক মাটির মানুষের দুঃসহ দুঃখ ও মর্মজ্বালাকে কাব্যে মূর্ত করে তুলে কবির সামাজিক দায়ীত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হলেন। তাই এ কবিতায় দেখতে পাচ্ছি কবি তাঁর সমস্ত চেতনাকে উন্মুখ করে দিয়ে মূক মাটি—তথা মূক নিপীড়িত মানুষের বেদনাকে অনুভব করেছেন, তাকে ভাষা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। গহন নিশীথের নিস্তব্ধতায় কান পেতে কবি যেন এ মূক মাটির কান্না শুনতে পান—আকাশের তারারা তখন শত আঁখি মেলে চেয়ে থাকে নির্নিমেষে, রাতজাগা পাখী রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে ডেকে ওঠে। সহস্র সুরে ঝিঁ ঝিঁ কণ্ঠে কবি যেন ঐ মূক মাটির কান্নাই শুনতে পান। কবির মনে হয় ঐ নিস্তব্ধতার

মধ্যেই 'গহন মাটির ঘরে' যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত ব্যথা বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে যে হতভাগ্যেরা, তারাও বোধহয় জেগে উঠে মূক মাটির কণ্ঠে তাদের কণ্ঠ মিলায়। দূর আকাশের তারায় তারায় তাদেরই কান্না বোধহয় কেঁপে কেঁপে ওঠে। রোমান্টিক কবির অনুভূতিশীল মনের বেদনার প্রকাশও যে কি অপরূপ হতে পারে, এখানেই তার পরিচয় পাচ্ছি। কবি বলেন,—

"কাঁদে এই মাটি, আমি শুধু শুনি মাটিতে এ বুক পাতি,
মাটির বুকের স্পন্দন শুনি জাগিয়া দীঘল রাতি।"

অন্য কেউ হয়তো এ ব্যথা-বেদনার ভাষা বোঝেন না, কিন্তু কবি বেশ বুঝতে পারেন। রাত্রির আঁধারে বাতাসের হু হু শব্দের সে কান্নাই ভেসে আসে 'সহস্র মারে ক্ষত-বিক্ষত যারা শাসনের বাণে' তবু 'কাঁদিতে যারা না জানে' সেই হতভাগ্যদের কান্নাই যেন গুমড়ে ওঠে মাটির বুকে। গভীর নিশীতে মূক মাটি যেন সজীব হয়ে ওঠে। সে যেন পাগলিনীর মতো বুক আঁচড়ে কেঁদে কেঁদে ওঠে। সে আর্ত-কান্নার এক অসহায় শ্রোতা ও দর্শক আমাদের কবি। কত করুণ দৃশ্যই না কবির সামনে ভেসে ওঠে একের পর এক। যে সব শিশু-কুসুম দারিদ্রের কশাঘাতে অকালে অবহেলায় মায়ের কোল থেকে ঝরে পড়েছিল, শুষ্কস্তন্য মা যাদের সামান্য স্তন্য-পিপাসাও মিটাতে পারে নি, কবির মনে হয়, গভীর নিশীথে মূক মাটি যেন কবর থেকে তার সেই অসংখ্য হতভাগ্য মৃত সন্তানদের একে একে তুলে জোনাকির আলোয় তাদের অদৃষ্টের কাহিনী পড়তে চেষ্টা করে। কোন সন্তান হয়তো তার শ্রমের ফসল বুলবুলিরূপী শোষকদের মড়াইতে বোঝাই করে দিয়ে বাধ্য হয়ে অভিমানে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে কবরের তলে আশ্রয় নিয়েছে। আর তারই অভাগিনী জায়া সন্তানদের বক্ষে জড়ায়ে ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলে জ্বলে মরণের প্রতীক্ষা করছে।

কবির ধারণা, গহন নিশীথে এই সব হতভাগ্যদের কথা স্মরণ করে বুঝি 'কাঁদে মূক মাটি'। আর সে কান্নায় বিচলিত হয়েই যেন আকাশের তারা খসে পড়ে, পাতাল থেকে সহস্র ফণা মেলে নাগ ফোঁস ফোঁস করে উঠে নিশ্বাসে নিশ্বাসে ঢেলে দেয় যুগ-যুগ সঞ্চিত বিষ। যুগ যুগ সঞ্চিত মানুষের পুঞ্জীভূত বেদনাই যেন আজ সহস্র ফণাজাল বিস্তারী নাগের মতই আমাদের বর্তমানকে বিপন্ন করতে উদ্যত। মানবতা আজ এক মহাদুর্যোগের সম্মুখীন। তারই কল্যাণে এ দুঃসহ অবস্থার অবসান প্রয়োজন, এমনি একটা ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে কবিতাটির শেষ দিকে। কবির যুগচেতনা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি ইতিপূর্বে মূক মানুষের বেদনার চিত্র এঁকেছেন বটে কিন্তু কোথাও আপন মানসিক প্রতিক্রিয়া বড় একটা ব্যক্ত করেন নি। এখানে তিনি কিন্তু প্রায় স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন 'মানুষের যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত পুঞ্জীভূত অপমান, লাঞ্ছনা বঞ্চনা ও বেদনা' এক দারুণ ঝঞ্ঝার রূপ নিয়ে মানুষের ভবিষ্যতের পক্ষে 'মহাত্রাসের' কারণ হয়ে উঠেছে। অতএব মানবতার স্বার্থেই এর আশু প্রতিকার বাঞ্ছনীয়। রোমান্টিকতার আমেজ সত্ত্বেও অনুভূতিতে দ্রবমান এ কবিতাটি যুগচেতনার স্বাক্ষর বহন করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতাটির ভাষায় অবশ্য কবি তেমন কোন নতুন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারেন নি।

যে নতুন চেতনার স্বাক্ষর পেলাম আমরা প্রথম কবিতা 'মাটির কান্না'য় তাই কবিকে 'নতুন কবিতা'র পথনির্দেশ করেছে। গ্রন্থের তৃতীয় কবিতা 'নতুন কবিতা'য় কবি কাব্যের নতুন পথেই চলবার সংকল্প জানিয়েছেন। কবি যে সত্যি সত্যিই নতুন কিছু লিখতে যাচ্ছেন তার আভাস কবিতার নামেই রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ কবি তাঁর কবিস্বভাবের বৈশিষ্ট্যটি যে কি তা ইঙ্গিতে এক প্রকার স্পষ্ট করেই বলে নিয়েছেন এবং আলোচ্য কবিতায় যে কেন

স্বেচ্ছায় সে পথ ত্যাগ করে নতুন পথে চলতে ব্রতী হয়েছেন তাও আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। 'মাটির কান্না' যে কবির দীর্ঘ কাব্যসাধনার ধারায় একটি ব্যতিক্রম, কবি প্রকারান্তরে এ কবিতায় তা স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন। বড় সুন্দর করে কবি 'নতুন কবিতা' লেখার সংকল্প প্রকাশ করেছেন,—

"রামধনুরে ধরতে পারি রঙের মায়ায়,
ধরব না তা ;
বিজলী এনে ভরতে পারি রঙের খাঁচায়
আনব না তা।
আক্‌সী দিয়ে পাড়তে পারি পারি চাঁদের চুমো,
ছড়ার নূপুর বাজিয়ে তোমায় করতে পারি ঘুমো ঘুমো ;
পাতালপুরীর রাজকন্যে সাতমাণিকের প্রদীপ জ্বালি ;
ঘুম ঘুমিয়ে ঘুমের দেশে ঘুমলী স্বপন হাসছে খালি ;
এসব কথা ছড়ায় গেঁথে বলতে পারি,
বলব না তা ;
পাখীর পাখায় লিখন তারে লিখতে পারি,
লিখব না তা ;
লিখব আজি তাদের কথা, কথা যারা বলতে নারে,
একশ' হাতে মারছে যাদের সমাজনীতি হাজার মারে।"

এতকাল 'রামধনু', 'বিজলী', 'চাঁদের চুমো', 'ঘুমন্ত পাতালপুরীর রাজকন্যার হাসি মুখের' স্বপ্নেই কবি বিভোর ছিলেন ; ছড়ার নূপুর বাজিয়ে তাদেরই গান গেয়েছেন কবি। এবার তিনি সঙ্কল্প করলেন, তিনি আর ও ধরনের কথা লিখবেন না, তিনি লিখবেন যে সব শিশু-কুসুম অকালে ঝরে পড়ছে তাদের কথা, লিখবেন তাদের কথা যারা 'অনাহারের চিতায় জ্বলে মরছে পলে পলে', 'চোখ থাকতে অন্ধ যারা—'বদ্ধ যারা জ্যান্তমৃত পশুর পারা'। তিনি লিখবেন কেমন করে অজ্ঞ পিতা সন্তানকে অজ্ঞানতার অন্ধকারায় ঠেলে দিচ্ছে, কেমন করে মূর্খমাতা সন্তানের মুখে বিষ তুলে দিচ্ছে নিজের হাতে, তার হৃদয়বিদারক কথা। তিনি লিখবেন তাদের কথা 'নগর ছাড়া শহর ছাড়া অজ্ঞানতার অন্ধকারা যুগের যুগের অত্যাচারে তিলে তিলে 'মরছে যারা' এবং

"আশাহারা ভাষাহারা সুদূর গাঁয়ের একটি কোণে
রোগ ব্যাধি আর শোষণকারী, সমান যুঝে সবার সনে"

সেই পল্লীর কোলে নির্বাসিত সংগ্রামী মানুষগুলোর কথা। কবি আকাশের উদারতাকে বক্ষে ধারণ করে তাদের আহ্বান জানাবেন নিজ হৃদয়ের দ্বারে, শোনাবেন আশার বাণী। কবির সংকল্প তিনি এ সব হতভাগ্যের দুঃখকাহিনী লিখবেন—'আগুন দিয়ে, ঝড়ের রাতের বিজলীর অট্টহাসি নিয়ে', লিখবেন 'ধ্বস-পাখীর প্রলয়-পাখায় বজ্র দিয়ে', 'জীবনদানের রক্ত-ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে'। ছড়া-রূপকথার সৌন্দর্য ও স্বপ্নালোক বিহারী কবি এবার কঠোর সংগ্রামীর মনোভাব নিয়ে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষের জীবন-যন্ত্রণার প্রতিকারের সঙ্কল্প নিয়ে লেখনী ধারণ করবেন। কবিতার বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কবি একটা সুতীব্র মর্মজ্বালাবোধ করছেন মানবতার লাঞ্ছনা ও অপমানে ; তিনি তার প্রতিকারপ্রয়াসী, তাই তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠেছে সংগ্রামীর কঠোর সঙ্কল্প, কিন্তু পরবর্তী কোন কবিতায় সে

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।

সংগ্রামী মনোভাব পরিদৃষ্ট হয় না ; বরং তার পরিবর্তে ব্যথিত কবিচিত্তের আকুলতাই প্রকাশ পেয়েছে বেশি। কারণ মূলতঃ কবির মনোভঙ্গি সংগ্রামী মানুষের নয়, স্বভাবকোমল হৃদয়বান মানুষের। তথাপি দুর্গত মানব-সন্তানের দুঃখবেদনায় মর্মাহত কবিচিত্তের এ নবজাগরণ একেবারে অর্থশূন্য হয়ে পড়ে নি।

'নতুন কবিতা'য় ব্যক্ত সংকল্প অনুযায়ী কবি আশাহারা, ভাষাহারা সুন্দর গাঁয়ের কোণে নির্বাসিত দারিদ্র্য-ব্যাধির সাথে যুগযুগ ব্যাপী সংগ্রামে বিপর্যস্ত, ক্লান্ত সাধারণ মানুষদের দ্বারে দ্বারে ফিরে সহানুভূতি বিলিয়েছেন অনেক কবিতায়ই। শুধু তাই নয়, মানুষের দেশ-কাল বিধৃত গতিশীল জীবনের মহিমাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন নানা ভাবে। কবিমনের রোমান্টিক স্পর্শ 'মাটির কান্না।' কাব্যগ্রন্থের অন্যান্য কবিতাগুলোকে কিছুটা স্বাদু করে তুললেও, যুগ ও জীবন-চেতনার প্রকাশকে অনেকটাই বাধাগ্রস্ত করেছে স্বীকার করতে হয়। এই প্রসঙ্গে 'হাসু মিঞার ভাই' কবিতাটির কথা উল্লেখ করা যায়।

হাসু মিঞার স্বপ্নজগত থেকে কবি এখানে হাসু মিঞার ভাইয়ের রূঢ় দুঃখ-দারিদ্র্য-ব্যথা কন্টকিত ধূলি সমাকীর্ণ বাস্তব জগতে নেমে এসেও শেষ পর্যন্ত সেই স্বপ্নজগতেই প্রত্যাবর্তনের কামনা প্রকাশ করেছেন। কবিতাটিতে কবির বক্তব্য প্রকাশে কিছুটা অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। দুই সম্পূর্ণ বিপরীত প্রাকৃতিক পরিবেশের সমাবেশ ঘটিয়ে কবি তাঁর কবিতার ভাবসত্যটিকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। হাসু মিঞার স্বপ্নজগতের সৌন্দর্য স্মৃতির রোমান্টিক আবেশে আচ্ছন্ন কবিমন হাসু মিঞা'র ভাইয়ের রূঢ় বাস্তব জগতে কেমন করে উত্তীর্ণ হল, তারই কথা বলতে গিয়ে বড় ভাবনায় পড়ে গিয়েছেন কবি ; তাই বলেছেন,—

'কি করে বা এলো সে যে, কোন পথটি পেরিয়ে এলো
কোন পথে বা কাহার সনে দেখা হল
একা একা ভাবছি বসে তাই।'

বস্তুতঃ হাসু মিঞার স্বপ্ন-জগত থেকে হাসু মিঞার ভাইয়ের বাস্তব-জগতে জাগরণের অভিজ্ঞতাটা এতই বিপরীত যে, স্বপ্নাচ্ছন্ন কবির কাছে তা একটা রূঢ় আঘাতের মতই ঠেকেছে। তবু অভিজ্ঞতার এ নবদিগন্তে এসে কবি চোখ ফিরিয়ে নেন নি। প্রকৃতির শ্যাম-স্নিগ্ধ আনন্দময় রূপের জগৎ থেকে রূদ্রগ্রীষ্মের সর্বরিক্ত, দাবদগ্ধ শ্রীহীন জগতে উত্তীর্ণ হওয়ার রূপকে কবি এ অভিজ্ঞতার বিবৃতি দিয়েছেন।

এ প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের অত্যাচার শোষণে জর্জরিত সর্বরিক্ত বাস্তব জীবনেরই চরম দৈন্যের রূপ। এ চূড়ান্ত দৈন্য ও হতাশার রাজ্যে হাসু মিঞার ভাই এল সংগ্রামী মানুষের রূপ নিয়ে 'বজ্রে গড়া বাঁকা লাঙল হাতে' আর 'সূর্যরথে সাতটি ঘোড়া তপ্ত আগুন জ্বালায় জ্বলে এলো তাহার সাথে'। পরাজয় মেনে সে এ কৃপণা পৃথিবীর বিরূপতার কাছে। চৈত্র রোদের তপ্তদাহে দগ্ধ পৃথিবীর বুকে কালবৈশাখীর মেঘ যেমন বিদ্যুৎজ্বালা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করে, পুরাতনের জীর্ণতাকে নিঃশেষ করে দেয় অথচ তারই মধ্য দিয়ে সে সৃষ্টি করে নতুনের, সুন্দরের ; আগমন সম্ভাবনা হাসু মিঞার ভাইটিও তেমনি 'শুষ্ক, বন্ধ্যা পৃথিবীকে অন্যায়, মিথ্যা নীতির পাথর ঢেলা ভেঙে, মৃত অতীতের জঞ্জালরূপ আগাছা উপড়িয়ে, সব বাধাবন্ধনকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে, চৈত্রের অগ্নিজ্বালার ন্যায় সকল নোংরা আবর্জনাকে পুড়িয়ে ভস্মাসাৎ করে তাকে করে তুলবে আবার মানব সন্তানের জন্যে আশা-ভরসার স্থল ; শোষণ, অত্যাচার মুক্ত জীবনের উপস্থাপন ঘটবে সেখানে। সেই শুভ মুহূর্তে কবি কল্পনা করছেন, হাসু মিঞা মুখে চাঁদের হাসি মেখে, মাঠে

বাঁশী বাজিয়ে নতুন ফসল বপনের কাজে এগিয়ে আসবে, সংগ্রামী ছোট ভাইটির মহিমা সে উপলব্ধি করতে পারবে, তখনই তাদেরর মিলন ঘটবে। হাসু মিঞার স্বপ্নের জগৎ আর হাসু মিঞার ভাইয়ের দুঃখ-ব্যথা কন্টকিত ধূলি ধূসরিত জগতের মধ্যে পার্থক্যরেখা তখন ঘুচে যাবে। গোটা পৃথিবীই শেষে মুক্ত মানব সন্তানের আনন্দ-নিকেতন হবে।

'হাসু মিঞা'র ভাই' কবিতাটিতে কবির যুগ-জীবন চেতনা কিছুটা তীব্রতা নিয়ে বেজে উঠলেও, শেষ পর্যন্ত কবির রোমান্টিক মনের স্বপ্নাবেশ সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে। 'লক্ষ নরের' কান্নায় জেগে উঠে কবি 'মিথ্যানীতির বন্ধ রাহা' 'অতীত দুর্গন্ধ রাহা' অতিক্রম করে মানুষের জন্যে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন ঠিকই। কিন্তু তাতে সংগ্রামীর মনোভাবটি ততটা পরিস্ফুট নয় যতটা রয়েছে রোমান্টিক মনের খেয়াল। যে স্থানে কবি সর্বনাশের অগ্নি-জ্বালায় মিথ্যা যাহা, স্বপ্ন যাহা, বন্ধ যাহার ধ্বংস কামনা করেছেন, যে স্থানটিতে কবির সংগ্রামী মনোভাবটি, বিপ্লবী মনোভাবটির পরিচয় পরিস্ফুট হতে পারত, সে স্থানেই কবিতাটির দুর্বলতা বেশী। আসলে স্বপ্নালু দৃষ্টি নিয়ে বাস্তবের অভিসারে বেরোলে এর চেয়ে ভাল ফল লাভ করা প্রায় অসম্ভব।

'মাটির কান্না'র বেশ কিছু কবিতায় আমরা লক্ষ্য করি দারিদ্র্য দুঃখ-মথিত মানুষের জন্যে কবির হৃদয়ের আর্তি। কবি পূর্বের ন্যায় আর মানুষের দুঃখ-দৈন্যের নীরব দর্শক বা চিত্রকর হয়ে তৃপ্তি পাচ্ছেন না। তিনি এখন তাদের পক্ষ হয়ে ফরিয়াদ করছেন, মৃদু বাদ-প্রতিবাদও করেছেন সব রকম শোষণের, সামাজিক অবিচারের।

'দেশ' কবিতাটির কথাই আলোচনা করা যাক। আপাতদৃষ্টিতে কবি সবুজ প্রান্তর-বিধৃত, বনানী-অলংকৃত, নদনদী বিধৌত বাঙলার ঐশ্বর্যময় রূপটিকেই স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য সহকারে এ কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ঐশ্বর্যের মধ্যেই যদি কবি ডুবে থাকতেন, তবে কবিতাটি হয়ে দাঁড়াত নিছক স্বদেশের রূপ বর্ণনামূলক কবিতা। কিন্তু যখনই আমরা লক্ষ্য করি, দেশের এ ঐশ্বর্যময় রূপের কথা ভাবতে ভাবতেই, কবি তাতে দেশের সাধারণ মানুষের কোন অধিকার নেই বলে আক্ষেপ করছেন, তখনই কবিতাটির সুর আশ্চর্য রকম পালটে যায়। আমরা ঐশ্বর্যের স্বপ্ন থেকে হঠাৎ রিক্ততার বেদনায় জেগে উঠি। তিনটি স্তবকে দেশের রূপ ও ঐশ্বর্যের স্তব করেছেন কবি ; কিন্তু প্রতি স্তবকের শেষেই কবি যখন বেদনা ভরে বলেন, —'এর কোন কিছুতেই আসমানীদের নেইক অধিকার, জীর্ণ পাঁজর বুকের হাড়ে জ্বলছে হাহাকার', তখন আমাদের কাছে যেন সেই সৌন্দর্যের ছবি ম্লান হয়ে যায়। সব ঐশ্বর্যের মাঝেও আমরা রিক্ততার হাহাকার অনুভব করি। ইতিপূর্বেও তিনি পল্লী-বাঙলার রূপ বহু জায়গায় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোথাও তো এমন সুতীব্র ভাবে তিনি অধিকার বঞ্চিত মানুষের জন্যে বেদনা অনুভব করেন নি। অন্ততঃ সেরূপ চেতনার উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি নি। কবিতাটিতে জসীমউদ্‌দীনের সহজাত কবিত্বশক্তির স্পর্শ পাওয়া যায়, সাদামাটা প্রাকৃতিক দৃশ্য কবির বর্ণনা গুণে অসাধারণ মাধুর্য লাভ করেছে।

'সোনার মেয়ে' কবিতায় কবি আমাদের সমাজে মেয়েদের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করে আক্ষেপ করেছেন। শিশু মেয়েটির কাজল টানা চোখ, মধুর মুখের হাসি, মিষ্টি কথার কাকলি, আদরে-সোহাগে, মানে-অভিমানে চল-চঞ্চল রূপ কবির প্রাণে যেন স্নেহের প্রস্রবণ বইয়ে দেয়, ইচ্ছে করে তাকে প্রাণ ভরে আদর করতে। কিন্তু কবি যখন ভাবেন, শিশির বিন্দুসম শিশুর প্রাণটি যে দেহ-মন্দিরে অবস্থান করছে, তারি চারিদিকে অলক্ষ্যে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন রাক্ষস-সংসার মিথ্যা নীতি কুসংস্কারে গেঁথে রচনা করে চলেছে

নির্মম কারাগার, তখন কবি বড়ই অসহায়তা বোধ করেন। তার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কবির চোখে জল আসে। যে দেহের রূপ-মাধুরী কবির মনে এখন স্নেহের উদ্রেক করছে, একদিন ঐ দেহই ডেকে নিয়ে আসবে তার মহাশত্রুকে, তাকে বিচ্ছিন্ন করবে এত আদরের মাতা আর পিতা থেকে। ঐ মাতা-পিতাই তার রচনা করবে 'বদ্ধ দুয়ার অন্ধ হেরেমে', প্রবেশের পথ। সেখানেই চিরজীবনের জন্যে বন্দিনী হতে হবে তাকে, আমৃত্যু সেখানেই কাটাতে হবে তাকে। বস্তুতঃ আমাদের সমাজে মেয়ে হয়ে জন্মানো একটি অপরাধেরই সামিল যেন। কৈশোরের লীলাচঞ্চল দিনগুলো শেষ হতে না হতেই রাক্ষস-সংসার মিথ্যা নীতি ও কুসংস্কারের বশে তার সকল স্বাধীনতাকে করে খর্ব। শুধু তাই নয়, তাকে তার আদরের মাতা-পিতার কাছ থেকে ছিন্ন করে নিয়ে নিক্ষেপ করে এক অপরিচিত পুরুষের বদ্ধ দুয়ার হেরেমে। সেখানেই কাটে তার জীবন। কবির প্রাণ কেঁদে ওঠে তার অসহায়তার কথা চিন্তা করে; মুখের আদরের কথা অর্ধোচ্চারিতই থেকে যায়। তার যে কোন সাধ্য নেই তার এ দুর্দশা ঘোচানোর। কবিতাটিতে কোন অসাধারণ বক্তব্য নেই কিন্তু নারী সম্পর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের আচরণ যে কবির মনঃপুত নয়, তা বুঝতে কোন কষ্ট হয় না।

'নির্বাসিতা' কবিতায় পল্লীর কুটিরকোণে চিরদারিদ্র্যে, উপেক্ষায় নির্বাসিতা নারীর চরম দুঃখের মূর্তি প্রত্যক্ষ করে কবি বেদনাবোধ করেছেন। এখানেও কবির রোমান্টিক মন বিশেষ ভাবেই ক্রিয়াশীল রয়েছে। তথাপি কবির বাস্তব-চেতনা এখানে তীব্র। গরীবের কুঁড়েঘরে বন্দিনী নারীর পরনে আজ ছিন্নবসন, চুলে তেল নেই, পেটে ভাত নেই, মুখখানি রোগপান্ডুর মলিন। জীবনে তার হাসি-গান সব ফুরিয়েছে দারিদ্র্যের অভিশাপে। অনাহারে শুষ্ক দেহ, স্তনে তার দুধ নেই, কোলের শিশুটি কঙ্কালসার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। অথচ একদিন কি তার না ছিল! রূপ, হৃদয় ঐশ্বর্যে সে তো রাজনন্দিনীর মতই ঐশ্বর্যময়ী ছিল—তার রূপের 'সন্ধানে রাজপুত্রেরা ফিরিত পাথার বন'। কবির ভাষায় তার 'হাতে ছিল চাঁদ,পায়ে ছিল চাঁদ, মুখেতে পদ্ম ফুটিত খুশীর ভরে'। বাবামায়ের ঘরে সে রাজকন্যার আদরই ছিল—'সোনার খাটেতে শয়ন করিয়া পান সে করিত রূপোর গ্লাসে জল'। অভাব-দস্যু তার সকল রূপ-ঐশ্বর্য লুন্ঠন করে নিয়েছে, অভাবের যন্ত্রণায় মুখ তার আজ ক্রন্দনমলিন। আজ তার সামান্য বিশুদ্ধ পিপাসার জলও জোটে না। তার হৃদয়ের রাজা স্বামী সর্বরিক্ত হয়ে মাঠে নেমেছে লাঙল হাতে, দারুণ চৈত্রের রোদে পুড়ে মাটি খুড়ছে, ফসল বুনছে। কিন্তু এত কষ্টের তার মাঠ ভরা সোনার ফসল সমাজের দস্যুরূপী শোষকরা মুঠোয় ভরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আপন কষ্টার্জিত ক্ষুধার অন্ন এভাবে অপরের হাতে তুলে দিয়ে জনম ভর সে ক্ষুধার জ্বালার চীৎকার করে ফিরছে। বড় নির্মম, বড় করুণ এই দারিদ্র-নিষ্পেষিত মানুষের ছবি। পল্লীর কোণে নির্বাসিত অভাব বেদনাক্লিষ্ট নর-নারী জীবনের লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার চিত্র কবি ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করলেও, এমন সহানুভূতি ও দরদ দিয়ে বোধহয় আঁকেন নি। লক্ষ্য করার বিষয় কবি এখানেও আপন সুতীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। তবে তাতে তেমন তিক্ততা নেই। মাটির মানুষের অভাব,বেদনাবিদ্ধ রূপেই ছবি তুলে ধরে তিনি ইঙ্গিতে এর প্রতিকার কামনাই যে ব্যক্ত করেছেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

'আনোয়ারা' কবিতায় কবি গরীব চাষীঘরের মেয়ে আনোয়ারার জন্যে আপন অন্তরে স্নেহক্ষুধা অনুভব করেছেন এবং তার মর্মান্তিক দুঃখ-দৈন্যের মূর্তি দেখে যথেষ্ট মানসিক পীড়া বোধ করেছেন। আনোয়ারার মত 'ভাষাহারা', 'ভাগ্যহারা', পল্লী সন্তানের দুঃখে কবিচিত্ত ভীষণ আন্দোলিত হয়েছে। এদের অভাব-বেদনা মোচন করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার কাজ একটি মহান কীর্তি বলেই কবির কাছে প্রতিভাত হয়েছে। এ কাজ যিনি

করতে পারছেন তার কীর্তি 'তাজমহল' স্থাপনের কীর্তির চেয়ে কোন অংশে নূন্য হবে না, এ কথা কবি স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন। বাস্তব-জগতের মানুষের দুঃখ-ব্যথা সম্পর্কে কবি যে গভীরভাবে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং তাদের কথা বলার পবিত্র সামাজিক দায়িত্ব অনুভব করেছেন, তা কবির বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তথাপি কবি রোমান্টিকতার মোহাবেশ থেকে যে একেবারেই মুক্তি পান নি তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে দীন-দুঃখিনী আনোয়ারা'র মায়াময় রূপের বর্ণনা থেকে।

'বস্তীর মেয়ে' এই জাতীয় আর একটি কবিতা। এ কবিতায় কবির বাস্তব-জীবন চেতনা অনেক বেশী তীব্র। বস্তীবাসিনী এক দুঃখী মেয়ের জীবন দরিদ্রের চরম অভিশাপে যে দুঃসহ রূপে দেখা দিয়েছে তার মধ্যে মানবতার দুর্গতি প্রত্যক্ষ করে কবিপ্রাণে বেদনা বোধ করেছেন। মানুষের এ দুর্ভাগ্যের মূল খতিয়ে কবির ধারণা হয়েছে এর মূলে রয়েছে এক শ্রেণীর মানুষেরই দুষ্কৃতি। তাদেরই বিরুদ্ধে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে ফরিয়াদ। মানুষ কর্তৃক মানুষের এ অন্যায় শোষণ ও নিপীড়নের অবসান না ঘটলে অদূর ভবিষ্যতেই যে মানবতার চূড়ান্ত দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে, তা কল্পনায় প্রত্যক্ষ করেই যেন কবি এগিয়ে এসেছেন বলিষ্ঠভাবে আপন কর্তব্য-সাধনের জন্যে। কবি সংকল্প জানিয়েছেন, তিনি সকল অসাম্য, সকল অবিচারের অবসান ঘটানোর জন্যে চালিয়ে যাবেন আপন সংগ্রাম, তিনি রচনা করে যাবেন শোষণকারীদের কবর। এ কবিতায় কবি রোমান্টিক কল্পনার স্বর্গ থেকে একেবারেই ধরার ধূলিতে নেমে এসেছেন। তিনি এখানে নির্মম জীবন-বাস্তবের মূক দর্শক মাত্র নন, তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানবতার দুর্গতি নিবারণের সংগ্রামে তৎপর। কবি হিসেবে যতটা সামাজিক দায়িত্ব পালন সম্ভব কবি তাই করতে আপন প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন। যুগ-মানুষের ব্যথা-বেদনায় কবিচিত্তের এ জাগরণ খুব কম কবিতায়ই এতটা প্রত্যক্ষ। 'বস্তীর মেয়ে' কবিতাটি এদিক থেকে 'মাটির কান্না' কাব্যের মূল সুরের যথার্থ পরিপোষক এবং কবির নতুন কবিতা লেখার সংকল্পের বাস্তবায়নে একটি বিশিষ্ট পদক্ষেপ।

'পাকিস্তান' কবিতাটিতে একদিকে বাঙলাদেশের প্রাকৃতিকসৌন্দর্যে মুগ্ধ কবিপ্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায়, অপরদিকে মামুলি ধরনের দেশ প্রীতিমূলক কথার উৎসার লক্ষ্য করা যায়। কাব্যাংশ হিসাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনামূলক অংশ অবশ্যই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু যেখানে কবি স্বদেশের কল্যাণ কামনা ব্যক্ত করেছেন, সে অংশ বক্তব্যের সারবত্তা সত্ত্বেও কাব্যসৃষ্টির দিক থেকে নিতান্তই দুর্বল। উপকথার শেষে নীতি উপদেশের মতো তা যেন অনেকটা হাল্কাভাবে জুড়ে দেয়া কতকগুলো নিতান্ত কাজের কথা। বাঙলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বস্তুতঃই চিত্তহারী। নদ-নদী বিধৌত সবুজ ক্ষেতের আঁচল ঘেরা বাঙলাদেশের প্রকৃতির রূপপ্রশস্তি কবির কণ্ঠেই শুনুন,—

'আয়নামতি পদ্মা নদীর
বক্ষেতে রূপ ধরি,
ধান কাওনের করছে সাজন
এই রূপসী পরী।
বাঁকিয়ে দূর আকাশ তীর
কে ছুড়িয়া মেঘের নীর
অপরূপা শ্যামলীরে
করিয়ে যায় স্নান।

কবিতায় এ পর্যন্ত জসীমউদ্‌দীনকে আমরা একজন সৌন্দর্যের রূপকার কবি হিসেবেই পাই। কিন্তু এর পরে যখন কবি দেশপ্রীতির বাণী উচ্চারণ করে আমাদের জানিয়ে দেন এদেশে বসবাসকারী সকল হিন্দু-মুসলমান (স্বয়ং কবিও) এ দেশের মান রাখতে জীবন পর্যন্ত পণ করতে প্রস্তুত এবং এ দেশকে এমন করে যতন ভরে গড়বে সবাই যে 'চুমবে আকাশ লুটিয়ে দূরে মাটির বেহেশ্‌ত খান', তখন এ সাধু সংকল্পের জন্যে কবিকে ধন্যবাদ জানিয়েও আমাদের বলতে হয়, ওটা নীতিকথার মতই সুন্দর বটে, কিন্তু তাতে কবিত্ব বড় একটা আছে বলে তো মনে হয় না। বস্তুতঃ শিশুদের নীতিকথা শিক্ষা দানের মতই স্বদেশকে ভালোবাসা, তার জন্যে প্রাণপণ করে কাজ করে যাওয়ার আবশ্যকতার কথাই যেন কবি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এখানে। অবশ্য স্বদেশের প্রতি কবির গভীর প্রীতি কবিতার শেষে 'মাটির বেহেশ্‌ত' রচনার কামনার মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে।

"বাস্তুত্যাগী" কবিতাটিতে সমকালীন জীবন ও রাষ্ট্র-ভাবনারই সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। কবিতার সকল অংশের কাব্যমূল্য সমান না হলেও, এটি এ কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবি অত্যন্ত দরদী মন নিয়ে আমাদের সমকালীন রাষ্ট্রীয় জীবনের একটি মানবিক সমস্যার মানবীয় সমাধান কামনা করেছেন এ কবিতায়। হিন্দু-মুসলমানের দেশ বাংলাদেশ। দেশ বিভাগের পরবর্তী কালে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে বহুলোক পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হয়। এর ফলে বাংলাদেশের পল্লীজীবন বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়, পল্লী আপন শ্রী ও সৌন্দর্য থেকে অনেকটাই বঞ্চিত হয়। কবি স্বচক্ষে সে সব প্রত্যক্ষ করে বেদনা বোধ করেছেন। তাঁর মানবদরদী, বিশেষতঃ পল্লীদরদী প্রাণ কেঁদে উঠেছে। আলোচ্য কবিতায় তিনি বাস্তুত্যাগীর প্রতি উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন, সকল তিক্ততা বিস্মৃত হয়ে ঘরে ফিরে আসতে—পিতৃপুরুষের সহস্র স্মৃতি বিজড়িত পল্লীতে ফিরে আসতে। তিনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, অতীতে ভুল বোঝাবুঝির ফলে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে ব্যথা দিয়েছে, তাই বলে এ হিন্দু-মুসলমানের দেশ—এ সত্য তো আর মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না। এ দেশের প্রতি ভালবাসা ও ত্যাগের দাবিতে সবারই অধিকার থাকবে। বিশেষতঃ কবি বিশ্বাস করেন নতুন রাষ্ট্রসাধনায় ব্রতী একজন স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে নতুন দৃষ্টি দিয়ে রাষ্ট্র গড়ার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছেন, তা সার্থক হতে পারে একমাত্র এ দু' সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। অজ্ঞানতার অভিশাপে এ সত্য আজ আমরা বিস্মৃত হলেও কবি বিশ্বাস করেন, একদিন 'বনের ছায়ায় গাছের তলে স্নেহের নীড়ে, খুঁজিয়া পাইব হারাইয়া যাওয়া আদরের ভাইটিরে'। সমকালীন রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে কবির এ ভাবনার মূল্যও যথেষ্ট। এতে একদিকে তাঁর জীবন-দৃষ্টির উদারতার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর রাষ্ট্র ও সমাজ কল্যাণকামী দূরদর্শী মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতার শেষাংশে কবি স্বাধীন রাষ্ট্রকে গড়ে তোলার যে মহৎ আহ্বান সর্ব শ্রেণীর লোককে জানিয়েছেন তাতে তাঁর আদর্শবাদী মনের পরিচয়টিও পরিস্ফুট। তবু কবিতার এ অংশে কাব্যিক সিদ্ধি তেমন ঘটে নি, যেমন ঘটেছে বাস্তুত্যাগীদের বিদায়ে জনশূন্য পল্লীর করুণ অবস্থার নিখুঁত বর্ণনায় ও তজ্জনিত সুতীব্র অন্তর্বেদনার প্রকাশে। প্রাসঙ্গিক বিধায় আমরা 'বাস্তুত্যাগী' কবিতার শ্রেষ্ঠ অংশ জনশূন্য পরিত্যক্ত পল্লীর মূক, বেদনামথিত, আশ্চর্যরূপে বাস্তব অথচ কাব্যমাধুর্য পূর্ণ চিত্রটির অংশ বিশেষ এখানে তুলে ধরছি ঃ—

"দেউলে দেউলে কাঁদিছে দেবতা পূজারীরে খোঁজ করি,
মন্দিরে আজ বাজে নাকো শাঁখ সন্ধ্যাসকাল ভরি।
তুলসীতলা সে জঙ্গলে ভরা, সোনার প্রদীপ লয়ে,

রচেনা প্রণাম গাঁয়ের রূপসী মঙ্গল কথা কয়ে।
হাজরা তলায় শেয়ালের বাসা সেওড়া গাছের গোড়ে
সিঁদুর মাখান, সেই স্থান আজি বুনো শূয়োরেরা কোড়ে।
আঙিনার ফুল কুড়াইয়া কেউ যতনে গাঁথে না মালা,
ভোরের শিশিরে কাঁদিছে পূজার দূর্বাশীষের থালা।
দোলমঞ্চ যে ফাটলে ফাটিছে, ঝুলনের দোলাখানি,
ইঁদুরে কেটেছে, নাটমঞ্চের উড়েছে চালের ছানি।"

বলা বাহুল্য এ চিত্রটি একটি পরিত্যক্ত হিন্দু-পল্লীর চিত্র। কবির জীবনাভিজ্ঞতা এতই ব্যাপক যে তিনি সামান্যতম বাধাগ্রস্ত বোধ করেন না এ বর্ণনায়। কবি এখানেই থেমে যান নি; পল্লীর কাক-চোখ জল পদ্মদীঘি কবে কোন মেয়ের আলতা ছোপান চরণের রঙে রাঙা হয়ে উঠেছিল কল্পনা করে কবি যেন কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েন। আজও লাল হিজল ফুল বুকে নিয়ে দীঘি যেন অপলক নেত্রে সে চরণই ধ্যান করছে, এমনি মনে হয় কবির। স স্মৃতি ভারাক্রান্ত পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি যখন বলেন,—

"ঘুঘুরা কাঁদিছে উহু উহু করি, ডাহুকেরা ডাক ছাড়ি
গুমরায় বন সবুজ শাড়ীর দীঘল নিশাসে ফাড়ি।"

তখন তাতে যথেষ্ট রোমান্টিকতা সত্ত্বেও হৃদয়ানুভূতির স্পর্শ উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় না। কবির মনে হচ্ছে যেন, জনমানব শূন্য পল্লীর তরুলতার বাঁধে বাস্তুত্যাগীদের অতীত দিনের মায়া-মমতা কেঁদে ফিরছে। কবি পারিপার্শ্বিকে তার যে প্রতিবিম্বন ঘটিয়েছেন তা লক্ষ্য করুন,—

"সুপারির বন শূন্যে ছিঁড়িছে দীঘল মাথার কেশ
নারকেল তরু উর্ধ্বে খুঁজিয়ে তোমাদের উদ্দেশ।
বুনো পাখিগুলি এ ডালে ও ডালে, কইরে কইরে কাঁদে
দীঘল রজনী খণ্ডিত হয় পোশা কুকুরের নাদে।"

কবিতার এসব অংশ আমাদের 'কবর', 'পল্লীজননী'র মত 'কবিতার দুর্লভ সার্থকতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেবে। রোমান্টিকতার আমেজ সত্ত্বেও এ কবিতার সুতীক্ষ্ম বাস্তব চেতনা উপলব্ধি করতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না।

ক্ষুদ্র কবিতা 'চাষীর মেয়ে'তে পল্লীদুলালী চাষীর মেয়ের স্নিগ্ধরূপের বর্ণনায় কবি চরম রোমান্টিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তার রূপে তিনি পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিরই প্রতিবিম্বন লক্ষ্য করেছেন। পল্লীর মায়াময় রূপের কল্পনা যে কবির মনে এখনও কেমন নেশা ধরায় এ কবিতায় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তৎসত্ত্বেও কবি এখানে বাস্তব জীবন-চেতনা বর্জিত নন। তাই তো দেখি চাষীর মেয়ের মায়াময় রূপের কথা বলতে গিয়ে কবি তার মলিন ছিন্নশত তালী দেওয়া বসন লক্ষ্য করে আর্তনাদ করে উঠেছেন 'হায় হায় কেবা বন্দী করিল তারে অভাবের কারাগারে'। দারিদ্র্য পল্লীবাসীর জীবন-মাধুর্য কেমন করে কেড়ে নিচ্ছে, পল্লীরূপ-মুগ্ধ কবি সে সম্পর্কে হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠেছেন। তাই তো স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় কম্পমান এ কবিতাটি নিছক পল্লীপ্রকৃতির রূপ বর্ণনায় পর্যবসিত হয় নি, তাতে আধুনিক মানুষের জীবন-ভাবনার কিছুটা প্রতিফলন ঘটেছে। তথাপি এ কবিতাটি মুখ্যতঃ এক রোমান্টিক কবির পল্লীরূপ-মুগ্ধ মনেরই প্রক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

'চাকর' কবিতার কাব্যমূল্য যেমনই হোক, এতে মনুষ্যজীবনের প্রতি যে শ্রদ্ধা দরদবোধের পরিচয় কবি দিয়েছেন তা কবির জীবন-দৃষ্টির আধুনিকতাকেই স্পষ্ট করে

তোলে। স্নেহের চোখে দেখলে অতি সাধারণ, অতি তুচ্ছ মানুষটিও যে একটা মহিমা লাভ করে 'চাকর' কবিতায় সেই সত্যই কবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সামান্য একটি ঘটনা উপলক্ষ্য করে কবি তাঁর চাকর 'শামসুর' ভিতরকার মানুষটিকে আবিষ্কার করে এক অপরূপ স্নেহ-ব্যাকুলতা অনুভব করেছেন। শামসু কবির বাসার চাকর। কবি সুখে-দুঃখে দূর প্রবাসে একটি বছর এই শামসুকে নিয়েই কাটিয়েছেন। এই এক বছরে নানা উপলক্ষ্যে শামসুর কাজের ত্রুটি দেখতে পেয়ে তিনি তাকে কত অপমান, কত গাল মন্দই না করেছেন। কিন্তু শামসু নীরবে সে সব সয়ে গিয়েছে, কোন উচ্চ-বাচ্য করে নি। এও কবি লক্ষ্য করেছেন এক আধটি মিষ্টি কথায়, ছোটখাট উপহারে শামসু খুবই খুশি হত। শামসু মাইনে করা চাকর-- এর বেশী তার কোন পরিচয় থাকতে পারে এ কথা কবির মনে হয় নি। কবি আপন ভাবনাতেই সব সময় ব্যস্ত রয়েছেন—বাড়ী থেকে কত শুভাশুভ খবর এসে এই একটি বছরে কবিকে আশা-নিরাশায় দুলিয়েছে। কখন কবির ভাগ্নে, ভাগ্নিরা নানা আব্দার করে তাঁকে চিঠি লিখেছে। কখনও ভাইয়ের কাছ থেকে খবর এসেছে পিতার অসুখের, সাথে এসেছে টেলিগ্রামে টাকা পাঠাবার অনুরোধ। পিতার অসুখের সংবাদে দুশ্চিন্তায় কবির হয়ত রাত্রিতে ঘুম হয় নি--পোষ্ট অফিসে ছোটাছুটি করে ফিরেছেন, চিঠি লিখেছেন, টাকা পাঠিয়েছেন। বাড়ীতে মা রয়েছেন, বোনেরা রয়েছে। সবারই জন্যে কবি ব্যাকুলতা বোধ করেছেন। অশুভ চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে কবি কত দুঃস্বপনে ঘেরা চিত্রই না মনে মনে রচনা করেছেন। কবি ভাবতেন, যত দুশ্চিন্তা বুঝি তাঁরই ; তাঁর চাকর শামসুকে বোধ হয় কিছুই ভাবতে হয় না, সে শুধু কাজ করেই যায়। কবি কোনদিন তাকে চিঠি লিখতে দেখেন নি। অথচ কবির কত চিঠিই তো শামসু ডাকে ছেড়েছে।

হঠাৎ একদিন শামসুর নামে এল এক দুঃসংবাদবাহী টেলিগ্রাম। মায়ের তার ভীষণ অসুখ, সে যেন অবিলম্বে বাড়ী চলে আসে। সজল চোখে শামসু এসে দাঁড়ায় কবির সামনে টেলিগ্রামটি হাতে। কবি তার ছুটি মঞ্জুর করলেন, পাওনা কড়ায়-ক্রান্তিতে বুঝিয়ে তো দিলেনই, কিছু বকশিসও দিলেন।

বিদায় নিয়ে চলে যায় শামসু নীরব চরণ ফেলে তার সুন্দর গাঁয়ের উদ্দেশ্যে। এই প্রথম কবি যেন শামসুর জন্যে কেমন এক ব্যাকুলতা বোধ করলেন। কবির মনে উপলব্ধি জাগল শামসুও তারই মত একটি স্নেহতাড়িত মানুষ। আজ মায়ের অসুখের সংবাদে ব্যাকুল হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে ঘরের দিকে। কবির মন তার যাত্রাপথকে অনুসরণ করে পৌঁছে যায় সেই অবজ্ঞার পল্লীকুটিরে যেখানে রোগপাণ্ডুর চোখ দুটি মেলে মা হয়ত তার আদরের দুলালের জন্যে অপেক্ষা করছে। রুগ্ন মায়ের শিয়রের প্রদীপটির ন্যায় প্রাণও নিবু নিবু ; তার অন্তিম বাসনা বোধ হয় আর পূর্ণ হয় না। এদিকে ছেলে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কত খেয়া ঘাট, পদ্মের-বিল, শস্য ক্ষেত্র, নদী-নালা পার হয়ে ছুটে চলেছে গৃহের উদ্দেশ্য। দিন গড়িয়ে যায় 'আসে তারা ভরা নিশি কুহকিনী আঁধারের পাখনায়'। প্রহরের পর প্রহর অতিক্রম হচ্ছে—গৃহমুখে ধাবমান শামসুর পায়ের তলায় শুষ্ক পথের ধূলি যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে। একটা অশুভ আশঙ্কায় কবির মন কেন যেন কেঁদে ওঠে, শামসুর হয়ত পৌঁছবার পূর্বেই গৃহে তার অভাগিনী মা অনন্তের পথে পাড়ি জমাবে। এই মুহূর্তে কবির স্নেহসিক্ত দৃষ্টিতে শামসু একটা মহিমান্বিত মানুষ হিসেবেই দেখা দেয়। শামসু যে তাঁরই মত একটি মহিমান্বিত মানুষ, তাঁরই মত স্নেহ-ব্যাকুলতা অনুভব করে, এ সত্য কবির কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং তিনি শামসুর সাথে নিজের মিল খুঁজে পেয়ে তার মানবিক মর্যাদায় আস্থাশীল হয়ে ওঠেন।

শ্রেণীবৈষম্য কন্টকিত আমাদের সমাজে মানুষ হিসেবে মানুষের মহিমার কথাই কবি স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছেন এ কবিতায়। একমাত্র স্নেহের দৃষ্টিতেই যে মানুষের যথার্থ রূপটিকে আবিষ্কার করা যায়, সে কথাও কবি প্রকারান্তরে আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন। কবিতাটির ভাষা ও ছন্দ নিতান্ত গতানুগতিক।

'জাহানারার কবরে' কবিতায়ও কবি সর্বহারা মানবসন্তানেরই দুঃখ-বেদনার প্রতিকার কামনা ব্যক্ত করেছেন এবং বিশ্বব্যাপী সর্বহারাদের জাগরণকে অভিনন্দিত করেছেন। কবির জীবনচেতনা এখানে সম্পূর্ণরূপেই আধুনিকের। তা প্রকাশের উপলক্ষ্যটিও নতুন বটে। ইতিপূর্বে কোথাও তিনি কবিতার জন্যে ইতিহাস বা মহৎ জীবনের দ্বারস্থ হন নি। এখানে তিনি ইতিহাসের পাতায় মহৎ জীবনাদর্শ সন্ধান করে তারই আলোতে মাটির মানুষের দুঃখবেদনার প্রতিকার কামনা করেছেন। সাথে সাথে আধুনিক যুগে সর্বহারাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে স্বাগত জানিয়েছেন। মোগল সম্রাট শাহ্‌জাহানের আদরের দুলালী জাহানারার কবর দর্শনে কবির মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে নানা ভাবনা। আজ তিনি তাঁর ফুলের দেহ, ফুলের প্রাণ, ফুলের সুবাস নিয়ে কবরে ঘুমাচ্ছেন। একদিন ঐশ্বর্যবিলাসের মধ্যেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। কোন অভাবই তাঁর ছিল না ; ইচ্ছা করলেই তিনি আপন বাসনা পূরণ করতে পারতেন। কিন্তু হেরেমের ঐশ্বর্যবিলাসের মধ্যে থাকতে তিনি তৃপ্ত বোধ করেন নি। দীন-দরিদ্র নর-নারী, শিশুর আর্ত ক্রন্দনে তার প্রাণ কেঁদে উঠত। হেরেমের কোণে বাস করেও তাদেও জন্যে তিনি কেমন যেন ব্যাকুলতা বোধ করতেন। কবি কল্পনা করেছেন, হয়ত সেই সব শিশুদের মা হয়ে, বোন হয়ে স্নেহ ভালোবাসায় তাদের প্রাণ ভরে দিতে একটা উদগ্র ক্ষুধা অনুভব করতেন তিনি। হেরেমের বাইরে আসার সাধ্য তাঁর ছিল না ; অথচ অনাহারী ভাইবোনদের কথা তিনি কোনদিনই ভুলতে পারেন নি। মৃত্যুকালে তিনি বলে গিয়েছিলেন—'আমার কবর রচিও তোমরা দুর্বাঘাসের ছায়'। কবির ধারণা মৃত্যুর পরে শান্ত শীতল দুর্বা শীষের স্নেহেতে জড়িয়ে মাটির বুকে থাকবার এ বাসনা তাঁর হয়েছিল গরীব ভাইদের কথা স্মরণ করেই হয়ত। জীবনে যাদের তিনি ভালবেসেও কাছে পান নি, মরণে তাদের সবাইর সাথে এক হয়ে থাকবার বাসনা প্রকাশ করেছেন। তাই তো তাঁর করুণ মিনতি—'কবরে আমার গড় নাক তাজ, মর্মর দিও নাক।'

শাজাহান-কন্যা জাহানারা কত কাল হল, সেই সব মৃত ভাইদের লাশ বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন কবরের তলে। আজ পৃথিবীতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। নতুন জীবনের জোয়ার দেখা দিয়েছে চারিদিকে—সর্বহারাদের জাগরণ শুরু হয়েছে; পরবশ্যতার বিরুদ্ধে, সমস্ত অত্যাচার, যন্ত্রণা ও শোষণের বিরুদ্ধে তারা আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। জাহানারার স্বপ্ন আজ সার্থক হতে চলেছে। কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে, জাহানারা কি আজ নতুন জীবনে জেগে উঠবে না? জেগে উঠলে বড় ভাল হত, এই বোধ হয় কবির বলবার অভিপ্রায়। কারণ সর্বহারা মানুষের নতুন যাত্রাপথে জাহানারার ন্যায় বোনের সহানুভূতি, অনুপ্রেরণাই আজ সর্বাধিক প্রয়োজন। তাই তো কবিকণ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে কামনা ঃ—

"আজকে এমন বোন চাই মোরা তাতারী মরুর ঝড়ে,
বেদেনীর মত আগে আগে চলে বিদ্যুৎ লয়ে করে।"

শাজাহান-কন্যা জাহানারার স্মৃতি তর্পণ করতে গিয়ে কবি এখানে যথার্থই আধুনিক মানুষের জীবনবোধ দ্বারা চালিত হয়েছেন। সর্বহারার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে স্বাগত জানিয়ে তিনি যুগজীবন জিজ্ঞাসাকেই জয়যুক্ত করেছেন।

'মাটির কান্নায়' কবির চেতনার এক নব দিগন্তের সন্ধান পাওয়া যায় 'খ্রীষ্ট' 'প্রাচ্যগুরু

জামালুদ্দিন', 'নাজির' এই তিনটি কবিতায়। কবিতাগুলোতে মানবতার কল্যাণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ মহাপুরুষদের স্মৃতিতর্পণ উপলক্ষে কবি স্বদেশ স্বজাতির কল্যাণ কামনাই ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে কবি সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুলের মহাপুরুষ স্মৃতিতর্পণমূলক কবিতাগুলোর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন বলেই মনে হয়। এ সব কবিতায় তিনি প্রকারান্তরে দেশ, জাতি ও সমাজের নানা ক্লেদ, গ্লানির কথা উল্লেখ করেছেন। মানবতা বিরোধী, হিংসা, বিদ্বেষ এবং সর্বপ্রকার শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানিয়েছেন; মহাপুরুষদের জীবনাদর্শ সামনে রেখে সকল মানবিক সমস্যার মানবিক সমাধানে ব্রতী হওয়ার জন্যে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। কবির এসব কবিতার কাব্যমূল্য খুব বেশী না হলেও কবির চিন্তার দিগন্তে এগুলো অবশ্যই নতুন পদক্ষেপ বলে গণ্য হবে। মানব জীবন মহিমা উপলব্ধির যে চেষ্টা এ কবিতাগুলোতে দেখা যাচ্ছে, তা বস্তুতঃই আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসাপ্রসূত নতুন চেতনার ফল।

'খৃষ্ট' কবিতায় কবি মানববন্ধু মহাপ্রাণ যীশুখৃষ্টের জীবনমাহাত্ম্য স্মরণ উপলক্ষে অপরূপভাবে পরাধীনতার জ্বালা প্রকাশ করেছেন। দীন-দরিদ্র সর্বহারার বন্ধু যীশু দুনিয়াতে এসেছিলেন হতাশাগ্রস্ত মানুষের বুকে ভরসা জাগাতে, ম্লান মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে। বিপথগামী মানুষকে পথের সন্ধান দিতে কবে কোন সুদূর অতীতে জেরুজালেমের আঙ্গুর লতার বনে 'মেষের চালক' যীশুর আবির্ভাব হয়েছিল! 'মেষের চালক' যীশু সেদিন হারান মেষরূপী মানুষকেই খুঁজে বের করার জন্যে দুনিয়ার ঘরে ঘরে কেঁদে ফিরেছিলেন। মানুষের সকল দুঃখ-ব্যথাকে মাথা পেতে নিয়েছিলেন তিনি। তাই তো মানববন্ধুর আগমনকে অভিনন্দিত করেছিল সর্বস্তরের নর-নারী। কর্মরত অবস্থায়ই হয়ত তাঁর আগমন স্মরণ করে আনমনা হয়ে বেবিলন নারী কখন মিহিসুরে গান গেয়ে উঠত; নগরবাসীরা 'যৈতুন পথ ছায়' পাগড়ী বিছিয়ে দিয়ে অস্থির আগ্রহে পথের উপর মানববন্ধুর প্রতীক্ষা করত। জেলেরা দরিয়ার কিনারে নৌকা থামিয়ে যীশুর অমৃতময় বাণী শুনত, গ্রাম্যচাষীরা জনারের খেতে লাঙল থামিয়ে তাঁর কথা শুনত। কাফেলার পথে যত মরুচারী তাঁর হাসি মুখ স্মরণ করে ভরসা পেত; ক্রীতদাসী তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিল হাসিমুখে মনিবের পীড়নজ্বালা সহ্য করার আশ্চর্য ক্ষমতা। তিনি যেন সকলের জন্য নিয়ে এসেছিলেন 'স্বর্গের ফুলমালা'। সেবা, স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা দিয়ে, ভরসা দিয়ে, দুঃখিত তাপিত হতভাগ্য মানুষের জন্যে পৃথিবীটাকে তিনি করেছিলেন অনেকটা সরস ও সুন্দর। দুঃখীর মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা, ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। আর্তমানবতার জন্যে সান্ত্বনা, ভরসা ও আশ্বাসের বাণী বহন করেই তিনি দুনিয়াতে এসেছিলেন। সেই মানববন্ধু যীশু খৃষ্টের উদ্দেশ্যেই কবি আমাদের জাতীয় জীবনের সকল দুঃখ, লাঞ্ছনা, অপমানের প্রতিকারের আশায় ফরিয়াদ করেছেন। কবিচিত্তে দারুণ দুঃখ বেজেছে এই ভেবে যে, মানববন্ধু খৃষ্টেরই নাম নিয়ে তাঁরই ভণ্ড শিষ্য পরদেশী ইংরেজেরা ভারতের (বর্তমান বঙ্গ-ভারতের) বুকে চেপে বসেছে, গোটা দেশকে করেছে গোলামখানায় পরিণত। দেশবাসীকে ক্রীতদাসের মত সহ্য করতে হচ্ছে তাদের নানা অত্যাচার, নিপীড়ন। শাসকের শত নিষেধের বেড়ি মানুষের বাক-স্বাধীনতাকেও হরণ করেছে, তাই তো আবেগে কেঁপে উঠেছে কবির হাতের লেখনী। কত অসহায় বিদেশী শাসনের নাগপাশে বদ্ধ এদেশের মানুষ, সে কথাই বলতে গিয়ে কবি বলেছেন—

"আমরা তোমার হারান শাবক, উচ্চে কাঁদিয়া তোমারে যে দিব ডাক
কণ্ঠ মোদের চাপিয়া ধরেছে বিদেশী রাজার শাসনের রশি লাখ।"

কবি তাঁর স্বদেশের দুর্দশতার প্রতি খৃষ্টের করুণার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন, এ ভারতভূমি তো যীশুজননী মরিয়মরূপী এক বন্দিনী নারীর তুল্য। কবির দুঃখ, যীশুর ভণ্ড শিষ্যরা তাঁরই মায়ের সন্তানদের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে। কবিতাটিতে কবি পরাধীনতার মর্মজ্বালা ব্যক্ত করেছেন এবং প্রসঙ্গতঃ মানববন্ধু যীশুর মহৎজীবন-সাধনার প্রতি আপন অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে, খৃষ্টীয় আদর্শের ঝাণ্ডাবাহী অত্যাচারী বিদেশী ইংরেজ শাসকদের উদ্দেশ্যে ধিক্কার বর্ষণ করেছেন।

'প্রাচ্যগুরু জামালুদ্দিন' কবিতায় কবি মনীষী জামালুদ্দীন আফগানীর প্রতি আপন অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বিশ্ব মুসলিমের এক চরম দুর্দিনে মনীষী জামালুদদীনের আবির্ভাব ঘটে। সেদিন স্পেন থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত প্রাচ্যের সকল দেশেই মুসলিমরা পতনের গভীর অন্ধকারে নেমে গিয়েছিল। সেই দুর্দিনে তৌহিদের মশাল দুই হাতে তুলে ধরে তিনি উচ্চ কণ্ঠে জানালেন মুসলিম জাগরণের আহ্বান। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে জেগে উঠতে শুরু করেছিল বিভিন্ন দেশের মুসলমান। কিন্তু সে জাগরণের পূর্ণরূপ দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। আধুনিক মুসলিম জীবনের নব-প্রভাতের সূচনাতেই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন, প্রভাতী শুকতারার মত। তারপর মিশর, তুর্ক, হিন্দুস্তান, পারস্য, কাবুল একে একে সব জেগে উঠেছে ঃ—

'জেগেছে মিশর জেগেছে তুর্ক জাগে হিন্দুস্তান
নীলনদী আর আরব সাগরে উঠেছে নবীন বান।
সাকী সিরাজীর খোয়াব ভাঙিয়া পারস্য আজি গাহে
আফিঙের ঘুম ভাঙিয়া কাবুল চারিদিক পানে চাহে।"

কিন্তু যে যুগস্রষ্টা বিশ্বপথিক তাপসের আহ্বানে মুসলিম জীবনে এসেছিল এই জাগরণ, তিনি কিন্তু বেঁচে রইলেন না সে জাগরণের আনন্দে অংশ গ্রহণের জন্যে। তাই সমস্ত মুসলিম জাহানই তাঁর বিদায়ে গভীর ব্যথায় ব্যথিত। কবি সেই দুঃখানুভূতির প্রতিধ্বনি করে বক্তব্য শেষ করেছেন 'যার ডাক শুনি হায়, জাগিল মানব, সে কেন আজ ঘুমায় মরণ-ছায়।' এ কবিতায় কবি আধুনিক মুসলিম জাগরণের অগ্রনায়ক জামালুদ্দীন আফগানীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আপন যুগসচেতনতারই পরিচয় দিয়েছেন। কবি এখানে মুসলিম পুনরুজ্জীবনের স্বপ্নে বিভোর এবং সে স্বপ্নের সার্থকতায় বিশ্বাসী। কবিতার এই দিগন্তে কবি নজরুল ইস্‌লামের আদর্শবাহী।

'নাজীর' কবিতায় কবি পরহিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নাজীর নামক এক যুবকের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় ছুরিকাঘাতে মর্মান্তিক মৃত্যুবরণের কথা স্মরণ করে বেদনা বোধ করেছেন এবং আমাদের দেশে মানবতার অপমৃত্য ঘটানোর জন্যে মিথ্যা সমাজ ও ধর্ম-ভেদের যে হীন চক্রান্ত যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে, তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কবিতাটিতে নাজীরের কর্মধারার বর্ণনাত্মক অংশে এবং যে অংশে কবি চিন্তা ও ভাবনায় আদর্শবাদিতার সজ্ঞান পরিচয় দিয়েছেন, সেখানে কাব্যগুণ তেমন নেই। কিন্তু যে অংশে কবি নাজীরের মৃত্যুজনিত বেদনাবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা যথেষ্ট কাব্যগুণ মণ্ডিত ও মর্মস্পর্শী হয়েছে।

'মাটির কান্না'য় কবির জীবন-দৃষ্টির প্রসারের সাক্ষ্য বহন করেছে এর হাসপাতাল-জীবন সম্পর্কিত পাঁচটি কবিতা। এ পাঁচটি কবিতা হচ্ছে, যথাক্রমে 'হাসপাতাল', 'রাতের পরী', 'এ লেডী উইথ এ ল্যাম্প', 'খান্দান', 'রজনীগন্ধার বিদায়।'

এতকাল কবি আমাদের মুখ্যতঃ পল্লীমানুষের কথাই শুনিয়েছেন। এমন কি 'মাটির

কান্না'য় যে যুগচেতনার পরিচয় দিয়েছেন জীবন-ভাবনায়, সেখানেও অবলম্বন ঐ পল্লীর মাটির মানুষগুলোরই জীবন, তাদেরই দুঃখ-ব্যথা। 'রূপবতী' কাব্যের কোন কোন কবিতায় নাগরিক জীবনকে অবলম্বন করে কবিতা লেখা হলেও, সেখানে রোমান্টিক কবির প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতি নগরচেতনাকে একেবারেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। 'মাটির কান্না'র হাসপাতাল-জীবন সম্পর্কিত কবিতাগুলোতে যে জীবনদৃশ্য তিনি তুলে ধরেছেন, তার অভিনয়স্থল মূলতঃ নগর।

'হাপাতাল' নাগরিক জীবনের এক অত্যাবশ্যকীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জীবন সেখানে সব সময় 'অশ্রু টলমল' অথচ প্রত্যাশায় দীপ্ত। মেঘের আনাগোনা সেখানে সব সময় চললেও, মাঝে মাঝে আলোকের ঝিলিকও দেখা যায়। এ এক বিচিত্র রাজ্য—এখানে পঙ্গু, খঞ্জ, অন্ধ, ব্যধিজর্জর পাণ্ডুর মুখ মানুষেরা ছুটে আসছে প্রতিনিয়ত নানাদিক থেকে একটু সান্ত্বনা, একটু সেবা, একটু ভরসার আশায়; আর তাদের অভ্যর্থনার জন্যে সেবার হস্ত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তার, নার্স, শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা। এখানে একদিকে চলছে বিদায়ের করুণ আয়োজন, অপর দিকে বিরাজ করছে নবজীবনের আশ্বাস। ব্যাধিক্লিষ্ট মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য এখানে চলেছে রাতদিন সাধনা, মৃত্যুর বিরুদ্ধে চলেছে রাতদিন সমবেত সংগ্রাম। পৃথিবীর কোথাও যদি মানবতার সাধনা চলে থাকে তা তো এ হাসপাতালেই চলছে। আত্মত্যাগ ও সেবার মহান আদর্শের প্রতিনিয়ত পরীক্ষা হচ্ছে এখানে। মানুষের দুঃখ-ব্যাধি পীড়িত জীর্ণ রূপের পাশাপাশিই এখানে প্রত্যক্ষ করা যায় তার স্নেহ ভালবাসাসিক্ত অপূর্ব ত্যাগ ও সেবার কল্যাণমূর্তি। এ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবশেই বোধহয় কবি হাসপাতাল জীবন-সম্পর্কিত এ কবিতাগুলো রচনা করেছেন। কবিতাগুলোর মধ্যে 'হাসপাতাল' ও 'খানদান' কবিতা দু'টি বাস্তব চিত্র হিসেবে বিশেষ সমৃদ্ধ এবং কবির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তিরই পরিচয় বহন করে। এর মধ্যে 'খানদান' কবিতাটিতে কবি সমাজ জীবনের কুপ্রথা ও সংস্কারের অভিশাপের দিকটি তুলে ধরে সমাজ সংস্কারকামী মনের পরিচয় দিয়েছেন। এগুলোতে তিনি রোমান্টিকসুলভ মন নিয়ে নার্সদের অপূর্ব মমতাময়ী সেবিকা রূপেরই যেন স্তুতি করেছেন। কবি এখানে হাসপাতালের বাস্তব জীবনদৃশ্যকে রোমান্সের স্বপ্নালোকে উত্তীর্ণ করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। কবিতার দেহসৌষ্ঠব বিধানেও এখানে তিনি কিছু বেশী মনোযোগী বলে মনে হয়।

'হাসপাতাল' কবিতায় কবি হাসপাতালের অভ্যন্তরে প্রতিদিন জীবননাট্যের যে অভিনয় হচ্ছে তার একটি নিখুঁত আলেখ্য তুলে ধরেছেন। হাসপাতালের জীবনপ্রবাহের একটি চমৎকার বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে। জীবন-মৃত্যুর প্রতিযোগিতায় সদা তরঙ্গায়িত হাসপাতালের এ জীবন। জাতি ধর্ম ভাষার ভেদবিচ্ছেদ এ হাসপাতালরাজ্যে নেই। রোগীদের পরিচিতি এখানে মাত্র বিশেষ সংখ্যা দ্বারা। প্রেম, ভালবাসা, সৌহার্দ্র্য, বিরাগ এ গণ্ডীর মধ্যে সহজেই আপনার পথ করে নেয়। এখানে তাই পাশাপাশি বেডের রোগী এক বিপ্লবী দাদার সাথে ডেপুটি পদপ্রার্থী কাজীর ভাব জমাতে দেরী হয় না। দাদার সূত্রে দাদার দর্শনার্থিনী দিদিদের সাথেও আলাপ জমাতে অসুবিধে হয় না তার। আবার সেই দাদা ভাল হয়ে চলে যাওয়ায়, সেখানে নতুন রোগীর আগমন ঘটে—তাকে কিন্তু কাজী পছন্দ করতে পারেন না। কারণ তাকে দেখতে আসে নাকি তার 'মোটা তিন কাকা'। সুন্দরী দিদিরা শাড়ীর ঢেউ খেলিয়ে আর আসেন না। অতএব কাজী যেন বিরাগ ভরেই তার বেড ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। আর এক বেডে এলেন দত্ত নামধারী রোগী—'অপ্রশস্ত যেন কাগজের ঘুড়ি'। একেবারে 'তলীচেরা নৌকা'র মত নিতি ভরাডুবির সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে এ রোগী।

লেডী-ডাক্তার তাকে সাহস যোগাচ্ছেন প্রতিদিন সকালে এসে; কিন্তু বিকেলে 'দেখেন সকল সাহস ফুরায়েছে একেবারে'। সপ্তাহ ধরে সাহসের নিতি ভরাডুবিই চলেছে। সপ্তাহ শেষে দত্তগৃহিনীর আগমনে দত্তের আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দেয়—'দত্ত আজিকে মহাবীর বর ঘরে পরে সবখানে'। খুব কৌতুকজনক হয়ে ওঠে তার আচরণ—কবি তাকে নিয়ে কৌতুক করেই বলছেন ঃ—

"ডোন্টকেয়ার' করিবেন তিনি যদি কেহ কাটে গোঁপ
কিংবা তাহার স-জাত শ্মশ্রু করেন কেহই লোপ।"

'অপারেশনের' রোগী দত্তকে নিয়ে হাসপাতালে যথেষ্ট কৌতূহল রয়েছে। তার ভাবভঙ্গি নিয়ে হাসাহাসি হয় অন্য রোগীদের মধ্যে। রোগীদের এই মেলায় সকাল থেকেই শুরু হয় ডাক্তারদের আগমন। হয়ত কেউ এলেন মুখে হাসিভরে, তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি কোন্দল বেঁধে যায় রোগীদের মধ্যে। কেউ বা বন্ধুর মত মিষ্টি কথা বলে তাদের খবরাদি নেন, আবার কেউ ব্যস্তবাগীশের মতো রোগীদের মধ্য দিয়ে দ্রুত পদসঞ্চারণে চল যান। একটা নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিনই আসেন বড় ডাক্তার, সাঙ্গাপাঙ্গ, অনুচর পরিবেষ্টিত হয়ে—যেন সপারিষদ কোন রাজা রাজ্য পরিদর্শনে বেরিয়েছেন এমনি একটা দৃশ্যের অবতারণা হয় ঐ বিশেষ সময়ে। কবির মুখে বর্ণনা শুনুন,-

"দশটা বাজিতে বড় ডাক্তার ঘুরে যান প্রসেশনে,
সুন্দরী নার্স, ছাত্রছাত্রী মিলি পঞ্চাশ জনে!
সেকালের কোন রাজা মহারাজা রাজ্য করিতে জয়,
মহা-সমারোহে চলেছে প্রতাপ ছড়ায়ে ভুবন ময়।"

দৃশ্যটি কিন্তু আশ্চর্যরূপে বাস্তব! নার্সরা সব হাসি-খুশি মুখে মিষ্টি কথা কয়ে ঘুরঘুর করে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতিদিন কত নতুন জীবন এখানে এসে আশ্রয় নিচ্ছে—কারো জীবনপ্রদীপ হয়ত নিবু নিবু, কারোটা বা হঠাৎ নির্বাপিত হয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু এখানে মানুষের সব সময়ে সাথী তবু সবাই চেষ্টা করে হাসি-মুখে তাকে ভুলে থাকতে। বিচিত্র করুণ জীবননাট্যের অভিনয় চলছে এখানে। সে জীবননাট্যেরই একটি দৃশ্য উন্মোচন করেছেন কবি কোন এক বেডের রোগী আশি বছরের বুড়ো এক লোলচর্ম সাহেবের করুণ কাহিনী বর্ণনা করে। বেচারা রাতদিন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে, মাঝে মাঝে সম্বিত হারিয়ে ফেলেছে। সে ছিল এক জাহাজের নাবিক, সমুদ্র পথে অর্ণবপোত ভাসিয়ে দেশে দেশে ফিরেছে সে কত কাল; আজ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়ে সে সেই হারান দিনের স্বপ্ন দেখে ঃ—

"কতো দারুচিনি-ছায়া-ঘেরা দ্বীপ, প্রবাল মাণিক জ্বালি,
ডাকিত তাহারে দূর দিগন্তে উড়ায়ে ধূসর বালি,
কতো লবঙ্গ এলাচ পাতার সুগন্ধি বায়ু ভরে,
দিগাঙ্গনার সোনার লেখন উড়েছে তাহার তরে।
সুমেরু পথের কুহেলী বালিকা সন্ধ্যাকমল দলে,
আসন রচিয়া চরণ দু'খানি ডুবায়েছে রাঙা জলে।"

'কতো ঝড়ো রাতে ফেনিল উর্মিরথে' সে তার জাহাজকে চালিয়ে নিয়েছে—সকল বাধা তুচ্ছ করে ছুটে চলেছে সে। আজ রোগের ঘায়ে তার জীবন-জাহাজ কোন্ অকূল দরিয়ায় বিধ্বস্ত হয়ে ডুবতে বসেছে। রোগের বিকারের ঘোরে মজ্জমান জাহাজের কাপ্তানের ন্যায় সে চীৎকার করে বলে—"কোথায় 'সোকানি, কোথায় সারেং—সাগরে উঠেছে জোর।' একদিন সত্যিই নবীনের উষ্ণ রক্ত তার বক্ষে ছিল। সমুদ্রের বুকে ঝড়ের দাপটে তার জাহাজের

পাল ছিঁড়েছে, হাল ভেঙেছে তবু সে অকুতোভয়ে ঢেউয়ের সাথে সংগ্রাম করে সামনের দ্বীপ লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়েছে। দারুণ বিপদের মুখেও সে সুতীব্র সাহস-মদিরা পান করে মরণের সাথে যুঝেছে। সে সংগ্রামে সে জয়ী হয়েছে ; কিন্তু আজ জীবন-রণে বড় অসহায় হয়ে পড়েছে। বাজুতে তার আর সে জোর নেই। তাই 'মরণ তাহারে হায়, বড় অনায়াসে নিয়ে গেল-চিরবিস্মৃত ছায়।' বড় হতভাগ্য সে—সংসারে তার কেউ নেই। তাই তো কবি বড় আক্ষেপ বলেছেন ঃ—

"কেউ কাঁদিল না, কেউ বসিল না তাহার শিয়র দেশে'
কেউ জ্বালিল না মাটির প্রদীপ কবরের কাছে এসে।"

এমন কত করুণ দৃশ্যেরই তো অভিনয় চল্‌ছে হাসপাতালে। কিন্তু ক'জনেই বা তার খবর রাখে? জসীমউদ্‌দীন আমাদের হাত ধরে নিয়ে এসেছেন সে রাজ্যে। অসহায় আর্তমানবতার করুণ মুখচ্ছবির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কবি একদিকে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, অপরদিকে মনুষ্যজীবনের প্রতি অপরিসীম কৌতূহল ও দরদের পরিচয় দিয়েছেন।

'খানদান' কবিতা যেন 'হাসপাতাল' কবিতায় বর্ণিত জীবননাট্যেরই আর একটি অধ্যায়। কিন্তু এ কবিতায় কবির বক্তব্যের লক্ষ্য নিবদ্ধ রয়েছে অন্যত্র। আহত অবস্থায় হাসপাতালে নীত একটি বালকের করুণ মৃত্যু উপলক্ষ্য করে কবি আমাদের সমাজের একশ্রেণীর রক্ষণশীল পরিবারের নারী-জীবনে পর্দা প্রথার অভিশাপের করুণ দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। ছেলেটি মোটরের ধাক্কায় আহত হয়ে ক্ষতবিক্ষত রক্তাপ্লুত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছিল। দিনরাত যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল আর মার নাম করে চীৎকার করে কেঁদেছিল মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। কিন্তু তার মা পর্দাপ্রথার অভিশাপ বহন করে আকুল হৃদয়ে ঘরের কোণে গুমড়ে মরেছে, ছেলেকে একবার দেখ্‌তে আসতে পারে নি। ছেলেটির বড় ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞেস করে কবি জানতে পেরেছিলেন, তাদের খানদানঘরের মেয়েদের নাকি বাইরে আসাটাই মহা অসম্মানের ব্যাপার। কবির কাছে কিন্তু ব্যাপারটা নির্মম একটা ব্যঙ্গের মত ঠেকেছিল। কবি প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় হাসপাতালের অভ্যন্তরে স্নেহের এক চূড়ান্ত পরাভব লক্ষ্য করেছেন এবং তার কারণ খতিয়ে দেখতে গিয়ে নিষ্ঠুর পর্দাপ্রথার অভিশাপকে প্রত্যক্ষ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যে প্রথা বিপন্ন সন্তানের কাছ থেকে মাকে নিষ্ঠুরভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, তাকে কবি কখনই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। কবির প্রাণ কেঁদে উঠেছে নিষ্ঠুর সমাজ-প্রথার অসহায় ক্রীড়ানক মানুষের জন্যে।

'রাতের পরী', 'এ লেডী উইথ এ ল্যাম্প', 'রজনীগন্ধার বিদায়'—এই তিনটি কবিতায় কবি হাসপাতালে 'নার্সিংবৃত্তি' গ্রহণকারিণী সেবাময়ী নারীদের প্রতিই যেন আপন অন্তরের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম নিবেদন করেছেন। কবি রোমান্টিক স্বপ্নজড়িত দৃষ্টি নিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে নারীর সেবাময়ী রূপের আরতি করেছেন এ কবিতাগুলোতে। আমাদের সমাজে 'নার্সিংকে' এক মহৎ বৃত্তি বলে স্বীকার করা হলেও, নার্সিং বৃত্তিধারিণী নারীকে তেমন সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখা হয় না। কবি যে সে সংকীর্ণ মনোভাবকে এখানে বেশ সহজ ভাবেই কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন, তা তাঁর জীব-নদৃষ্টির উদারতারই পরিচয় বহন করে। 'রাতের পরী, 'রজনীগন্ধা' ইত্যাদি শব্দের রূপকে কবি নার্সিং বৃত্তিধারিণী নারী-জীবনের সৌন্দর্য, শুভ্রতা ও পবিত্রতার ইঙ্গিতটি পরিস্ফুট করে সমাজের চোখে তাদের নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সে হিসেবে কবির মনোভঙ্গির প্রগতিশীলতাকে অবশ্যই প্রশংসা করতে হয়। তবে মাত্রাতিরিক্ত রোমান্টিক কল্পনার লীলা কবিতার বক্তব্যের বস্তুধর্মিতাকে অনেকটাই

ক্ষুণ্ণ করেছে। হাসপাতালের নার্স কবি-কল্পনায় মানবীরূপে না দেখা দিয়ে প্রায় পরী হয়েই যেন দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে কল্পনার মনোহারিত্ব স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, কবি কাব্যের মূল বক্তব্যের প্রতি ততটা সুবিচার করতে পারেন নি। এসব কবিতায় সুতীক্ষ্ম জীবন-জিজ্ঞাসার পরিবর্তে এক ধরনের ভাববিলাসিতাই প্রশ্রয় পেয়েছে।

'রাতের পরী' কবিতায় কবি রাতের বেলা শ্বেতবসনে সুসজ্জিতা নার্সিং বৃত্তিধারিণী নারীর হাসপাতাল কক্ষে আবির্ভাবের একটি চমৎকার কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন এবং তার অক্লান্ত সেবারত রূপের আরতি করেছেন। শুভ্র রজনীগন্ধা ফুলের ন্যায় চারিদিক সৌরভে পূর্ণ করে, চাঁদের আলোতে হাসপাতাল কক্ষ আলোকিত করেই যেন গভীর রাতে হাসপাতাল কক্ষে পরীর ন্যায় আবির্ভাব ঘটে সেবাময়ী নারীর। তার পর চলে তার রাত-ভর অতন্দ্র সেবাকার্য—ক্লান্তিতে হয়ত সোনার অঙ্গে ঘুমের জড়িমা নেমে আসে। শ্রান্তিভরে চেয়ারের গায়ে দেহ এলিয়ে দেয়—মুখের উপর হয়ত নেমে আসে 'কেশের ছায়ার মায়া।' মনে হয়—

"যেন লুবানের ধূঁয়ার আড়ালে মোমের বাতির রেখা,
কবরের পাশে জ্বালাইয়া কেবা রচিতেছে কোন রেখা।' '

চারিদিকে আশেপাশে মুমূর্ষ রোগীরা শায়িত, জীবনপ্রদীপ তাদের প্রায় নিবু নিবু—মৃত্যুর সংকেত বহন করে উতলা বাতাস যেন বাইরে এসে বারবার কেঁদে ফিরছে। মরণের দূতও বুঝিবা আসতে আসতে শ্রান্তিতে অবসাদে ঘুমিয়ে পড়া এ পরীকে দেখে থমকে দাঁড়ায় সরমে সম্ভ্রমে। সেবা ও ত্যাগের বিজয়িনী মূর্তির কাছে মৃত্যুর আত্মসমর্পণের এক অপরূপ কল্পনা করেছেন কবি ঃ—

"মরণের দূত আসিতে আসিতে থমকিয়া থেমে যায়,
শিথিল হস্ত হতে তরবারি লুটায় পথের গায়;
যুক্ত করেতে রচে অঞ্জলি বার বার ক্ষমা মাগে,
রাত্রের পরী মেলি দেহভার ঝিমায় ঘুমের রাগে।"

রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' রূপের কাছে মদনের পরাভবের দৃশ্যটি স্বভাবতঃই এ প্রসঙ্গে মনে আসে। জসীমউদদীন এইভাবে রোগীর অতন্দ্রসেবায় রত নারীর আরতি করেছেন।

কবিতাটিতে কবি সেবাময়ী নার্সদের পবিত্র, শুভ্র মহৎ জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট হলেও, কবি আর্তমানবতার সেবারতা নারীর রূপের রোমান্টিক কল্পনায় বিভোর হয়ে রয়েছেন। হাসপাতালের কক্ষে তার আবির্ভাব ও রাত্রিব্যাপী অতন্দ্র সেবার চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি তাকে একেবারে রূপকথার পরীরূপে কল্পনা করেছেন। তার আবির্ভাবলগ্নের প্রাকৃতিক পরিবেশের যে ছবি কবি অঙ্কন করেছেন তাতেও রোমান্টিক কবির স্বপ্নিল মনেরই ছাপ প্রত্যক্ষ করা যায়। সবচেয়ে মজার কথা, কবি শহরের হাসপাতালের নার্সের জীবন নিয়ে কল্পনা করতে গিয়ে যে পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি করেছেন তাতে শহর অনুপস্থিত—সেই ঝিঁঝি পোকার শব্দে স্পন্দিত, জোনাকীর আলোয় উদ্ভাসিত পল্লীপথ, আকাশের তারা, রাতজাগা পাখী, ভোরের শিশির, পদ্মপাতা, দীঘির জল ইত্যাদির উল্লেখে পল্লীপার্শ্বিকই মূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। কবির স্বপ্নালোক জুড়ে রয়েছে পল্লী—তাই নাগরিক পরিবেশের উপাদান নিয়ে কাব্য লিখতে গিয়েও তিনি বারবার পল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। অবশ্য নার্সকে 'রাতের পরীরূপে কল্পনা করতে গিয়ে পল্লী পরিবেশের উদার ব্যাপ্তিতে আশ্রয় করা ছাড়া বোধহয় গত্যন্তর ছিল না। মোট কথা নাগরিক পরিবেশে জসীমউদদীনের কবিকল্পনা কখনই স্ফূর্তি পায় নি, আর সে পরিবেশের স্বরূপ

অনুধাবনেও তিনি সমর্থ হন নি। তাই নাগরিক পরিবেশ থেকে কাব্যের উপাদান গ্রহণ করলেও তা শেষ পর্যন্ত পল্লীপরিবেশেরই আশ্রয় খুঁজে ফিরেছে। উপমা, শব্দচয়নে, ছন্দে তিনি এখানেও কোন অগ্রগতির পরিচয় দিতে পারেন নি। রোমান্টিক কল্পনার রঙটা এখানে আর একটু গাঢ় হয়েছে, এই যা।

'রজনীগন্ধার বিদায়' কবিতায় কবির রোমান্টিক মনের চূড়ান্ত স্ফূর্তি ঘটেছে। 'রজনী গন্ধার' রূপকে শুভ্র, পবিত্র নার্সিং বৃত্তিধারিণী সেবাময়ী নারী রূপের প্রশস্তিটি কবি-কল্পনার অনেকটা সূক্ষ্মতারই পরিচয় বহন করে। আলোচ্য কবিতায় কবি রজনীগন্ধা পুষ্পের বিদায়ের রূপকে রাতের কর্মক্লান্ত নার্সদের প্রভাত সূচনায় বিদায়ের দৃশ্যটিই তুলে ধরেছেন। রজনীগন্ধা আপন শুভ্ররূপ ও অপূর্ব সৌরভ নিয়ে রাত্রির বুকে আবির্ভূত হয়, সৌরভ ছড়ায় রাত ভরে, কিন্তু ভোর হতেই কেমন যেন ক্লান্ত স্তিমিত হয়ে পড়ে। অঙ্গ থেকে তার বেশভূষা কেমন খসে যায়। তবুও বিদায় লগ্নে সে তার রূপমাধুরী ও সৌরভের স্মৃতিতে সবারই মন আচ্ছন্ন করে রেখে যায়। শুভ্রবসনা সেবাময়ী নার্সরাও তো তেমনি সেবা-স্নেহের মমতার সৌরভ নিয়েই রাত্রিতে দেখা দেয় হাসপাতাল কক্ষে। সারা রাত-ভর রোগীর সেবা করে। রাত্রি শেষে ক্লান্ত চাঁদের মতই ঘুম নেমে আসে রজনীগন্ধারূপিনী নার্সদের চোখে। শ্রান্তিতে শরীর শিথিল হয়ে আসে, শেষ রাতের বাতাস এলোমেলো করে দেয় তাদের কেশ; তবুও প্রাণপণে জেগে থাকতে চেষ্টা পায় রোগীর শিয়রে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায়—বাইরে তখন হয়ত প্রভাত পাখীর মৃদু গান শোনা যেতে থাকে। দিগন্তে 'হস্তে লইয়া রাঙা দিবসের অস্ফুট কুসুমমালা' উষার আভাস দেখা দেয়। তখন রজনীগন্ধার মত বৃন্ত হতে খসে পড়া শিথিল দেহা নার্সরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে। সে ঘুমন্ত রূপে কবি মুগ্ধ—তাই তো বিস্ময়াভিভূত কবির মন্তব্য 'বিধাতা বুঝিবা ধ্যান করিতেছে যুগ যুগ রহি চুপ'। কবি আরও কল্পনা করেছেন যে রজনীগন্ধা তথা রজনীগন্ধারূপিণী নার্সদের রূপমহিমায় ঈর্ষান্বিত হয়েই বুঝিবা রূপসী উষা রাত্রি ভোরে তার অঙ্গের সব ভূষা কেড়ে নেয়। রাত্রি শেষে উষার আগমনের আভাসে আকাশে বাতাসে, পারিপার্শ্বিকে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তারই কাব্যপূর্ণ একটি বর্ণনার মাধ্যমে কবি রজনীগন্ধারূপিনী নার্সদের রাত্রিশেষে বিদায়ের করুণ গাথা রচনা করেছেন।

'রজনীগন্ধার বিদায়' কবিতাটিকে 'রাতের পরী' কবিতার একটি উপযুক্ত উপসংহার বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হবে। সেখানে রজনীগন্ধার আবির্ভাবের স্বপ্নই শেষ দিকে বিদায়ের কারুণ্যে কিছুটা রক্তিম হয়ে উঠেছিল। এ কবিতায় সেই বিদায় দৃশ্যেরই সমগ্র আয়োজনটি চমৎকার কাব্যময় ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। দুই কবিতায়ই কবির বাস্তব-দৃষ্টি রোমান্টিক স্বপ্নবেশে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এখানেও কবি শব্দ চয়নে, উপমা ব্যবহারে, পুরাতন পথের অনুসারী। এখানে কবির কল্পলোক জুড়ে রয়েছে রূপকথা-ছড়ার রাজ্য, ঝিঁঝি পোকার শব্দে স্পন্দিত জোনাকীর আলোতে আলোকিত পল্লীই বটে। বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও তার পরিবেশনায় আধুনিক রোমান্টিক কবির মনন ও কল্পনার ছাপ আছে তা ঠিক, কিন্তু কবিতার মেজাজ সে আধুনিকত্বটি যথার্থভাবে ধরা দেয় নি।

আর্ত-মানবতার সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ নার্সদের সেবাময়ী, মমতাময়ী রূপের যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে "এ লেডী উইথ এ ল্যাম্প" কবিতাটিতে। রোমান্টিকতার আমেজ সত্ত্বেও এ কবিতায় কবির বাস্তব-চেতনা তেমন ক্ষুণ্ণ হয় নি। নার্সিং বৃত্তিধারিণী সেবাময়ী নারীর জীবন-মহিমার যথার্থ অনুধাবন প্রচেষ্টা এ কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। "মরণ প্রতীক্ষাতুর রোগীদের মাঝখানে সে যে জননী-মূরতি।"—এ কল্পনায় কবির সে জীবন-মহিমা

উপলব্ধির গভীরতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবিতার 'এ লেডী উইথ এ ল্যাম্প' নামকরণ এটা স্পষ্ট করে তুলেছে যে কবি এতে মহিয়সী নারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রতি আপন অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। আর্ত-মানবতার সেবায় এ নারীর ভূমিকা চিরকাল সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখের দাবী রাখে। "ক্রিমিয়ার" যুদ্ধে আহত শত শত ইংরেজ সৈনিক যখন সেবা ও শুশ্রুষার অভাবে অকালে প্রাণ হারাচ্ছিল, তখন সে হৃদয়বিদারক সংবাদ শুনে ফ্লোরেন্সের প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। সামাজিক বিরূপতা ও বিরুদ্ধতা অগ্রাহ্য করে সেদিন ফ্লোরেন্স ছুটে গিয়েছিলেন ইংলন্ড থেকে সুদূর ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে। রাতের অন্ধকারে দীপবর্তিকা হাতে শিবিরে শিবিরে ফিরেছেন অসুস্থ আহত সৈনিকদের মধ্যে সেবা, স্নেহ, মমতা বিলিয়ে সাক্ষাৎ জননীর মতো। তাতে কত অসহায় প্রাণ ভরসা পেয়েছিল, কত রুগ্ন, আহত প্রাণ নতুন জীবন লাভ করেছিল ইয়ত্তা নেই। ফ্লোরেন্সের সে সেবার আদর্শই আজ মূর্ত হয়ে উঠেছে বিশ্বের দেশে দেশে নার্সিং বৃত্তিধারিণী নারীদের জীবনে। কবি কল্পনা করেছেন, গভীর রাতে আজও যেন হাসপাতালের মরণ প্রতীক্ষাতুর রোগীদের মাঝে সেবাময়ী নার্সদের বেশে ফ্লোরেন্সই ঘুরে বেড়াচ্ছেন ; জননীর স্নেহ ভালাবাসা দিয়ে রুগ্ন সন্তানকে বাঁচিয়ে তোলার অতন্দ্র সাধনা করে চলেছেন—কবির চোখে ফ্লোরেন্সবেশী নার্সরা যেন নিখিল নরের আদিম জননীর মতো রুগ্ন সন্তান শিয়রে সদা-সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত। কবির সমস্ত মনপ্রাণ উন্মুখ হয়ে উঠেছে সেই 'নিখিল নরের আদিম জননীর প্রতি' শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে। কবিতার শেষদিকে নিরালা শয্যার পাশে তার আঁচল ছায়া স্বপ্ন হয়ে জড়িয়ে থাকার সাধ প্রকাশের মধ্যে কবির সেই শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের ভাবটিই ফুটে উঠেছে। কবিতাটিতে আধুনিক যুগোচিত জীবন-মহিমার ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

'মাটির কান্না'র অবশিষ্ট দশটি কবিতা 'কৃষাণী', 'জলের কন্যা', 'তারাবি', 'মা', 'বানরযূথ', 'কন্যাসাজানী সিমলতা', 'কমলা রাণীর দীঘি', 'নমুর মেয়ে', 'গোড়াই নদীর চর', ও 'শেষ রাত্রে'। এই কবিতাগুলোতে কোন যুগ-ভাবনা বা জীবন-জীজ্ঞাসার পরিচয় মেলে না। এগুলোতে জসীমউদ্‌দীন তাঁর পূর্বতন কাব্যধারারই অনুবর্তন করেছেন। এ সকল কবিতায় কেমন একটা nostalgic feeling এর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সেই পল্লীর পথঘাট, মাঠ, নদীর চর, মেঠো হাওয়া, গাছপালা, মায়া ঘেরা আবরণ, কৃষাণ ছেলেমেয়ের মায়াময় রূপ, পল্লীর নানা রূপকথা, কিংবদন্তী তাঁর মনের কোণে আবার গুঞ্জরণ করে উঠেছে। বাংলাদেশের ক্ষয়িষ্ণু পল্লীজীবনের সহস্র স্মৃতি তাঁকে উন্মনা করে তুলেছে। একথা বলার মানে এই নয় যে, ইতিপূর্বে আলোচিত কবিতাগুলোতে কবি পল্লীজীবনের কথা বলেন নি। বস্তুতঃ পল্লীকে বাদ দিয়ে তাঁর কবিতা বেশীদূর এগোতে পারে না। এ কাব্যে কবির লক্ষ্য মূলতঃ পল্লীর রূপে নিবদ্ধ নয়, নিবদ্ধ মানুষের দুঃখ-বেদনাপূর্ণ জীবনের দিকে। কবি এই প্রথম দুঃস্থ মানবতার পক্ষ হয়ে সকল সামাজিক অসাম্য, অন্যায়, অত্যাচারের প্রতিবাদ জানানোর সামাজিক কর্তব্যের তাগিদ বোধ করেছেন এবং কবি হিসেবে সামাজিক দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তাছাড়া যুগোচিত জীবন ভাবনার অন্যতর পরিচয়ও এ কাব্যে রয়েছে। আলোচ্য কবিতাগুলোতে কবি এ নব ভাবনার দোলা কাটিয়ে উঠে একেবারেই পল্লীপ্রকৃতি ও জীবনের রূপমাধুর্যের জগতে ফিরে এসেছেন। তাই এ কবিতাগুলোকে 'মাটির কান্না'র নুতন সুরের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম বলেই ধরা চলে। অথচ জসীমউদ্‌দীনের সুদীর্ঘ কাব্যসাধনার ধারার সাথে এ কবিতাগুলো যথাযথ সমঞ্জসিত বললে সত্য কথাই বলা হবে। আসল কথা পল্লীরূপে মুগ্ধ কবি মাটির কান্নায় যুগঝঞ্ঝার প্রচণ্ড

দোলায় যুগজীবন সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হয়ে উঠলেও পরমুহূর্তেই স্নেহ ভালবাসার নীড় পল্লীর মোহাবেশে আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। 'মাটির কান্নার'র ইতিপূর্বে আলোচিত কবিতাগুলোর পাশে আমাদের আলোচিত কবিতাগুলো দাঁড় করালেই উভয়ের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এবার আমরা উদ্দিষ্ট কবিতাগুলো একের পর এক আলোচনা করছি। প্রথমেই 'কৃষাণী' কবিতাটির আলোচনা করা যাক। 'কৃষাণী' কবিতায় কবি পল্লীর সরলতা ও শ্যামলতার প্রতিমূর্তি কৃষাণ-কন্যার 'মমতা মাখান রাঙা মুখখানি' স্মরণ করে স্নেহব্যাকুলতা বোধ করেছেন। ঘন বাঁশঝাড়, বন-জঙ্গল, লতাপাতা বেষ্টিত পাখীর কাকলীতে মুখরিত মায়াময় পল্লীপরিবেশে দরিদ্রের কুটিরে আবির্ভূত এ মেয়েটি যেন পল্লীপ্রকৃতিরই নিজ হাতে গড়া। কবির কথায় বলতে গেলে—'ও ধারের বন' জাংলার লতা, আর ঘন বাঁশঝাড় কেউ ফুল দিয়ে, কেউ ফল দিয়ে, কেউ পাতা দিয়ে মনের মতন যতন ভরে মেয়েটিকে গড়ে 'রঙিন ফুলের ফোটার মন্ত্র পড়ে জীবন দিয়েছে'। 'গহন বনের রহস্যভরা' তার সোনার দেহের দিকে চেয়ে কবি মনে অতীত স্নেহস্মৃতির দোলা অনুভব করেন। এ মুখ যেন তাঁর কত পরিচিত মনে হয়। পল্লীসন্তান কবি এ মুখের স্নেহের কাকলী শুনেই তো কতকাল কাটিয়েছেন। কিন্তু কখন মোহাবেশে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে সবকিছু ভুলে গিয়েছিলেন, তা আর মনে করতে পারছেন না। আজ বহুকাল পরে গাঁয়ের পথে চলতে গিয়ে অজানা কোন কৃষাণীর মুখের কথা হঠাৎ শুনতে পেয়ে কবির মনে আবার সেই সুন্দর মমত্বময় পরীরূপ জেগে উঠেছে। সে রূপ হৃদয়-আরসীতে ধারণ করে কবি এক অসহ্য পুলক অনুভব করেছেন। অবশ্য 'সে অসহ্য পুলকের' যে বাচনিক প্রকাশ কবিতায় লক্ষ্য করি, তা অসহ্য রকমেরই খেলো হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। পুলক কবির হয়েছে, কিন্তু ভাবাবেগের মাত্রাধিক্যে তা প্রকাশের ভাষা কবি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছেন। বহুকাল পরে পল্লীদুলালী কৃষাণবালার সোনার মুখের কথা শুনে কবি যখন পুরাতন স্মৃতির দোলা অনুভব করে বলেন,—'মনের গহনে কে দোলায়ে গেল সেই পরিচয় লতা', তখন সে প্রকাশ স্বাভাবিক। পরমুহূর্তেই সেই মমত্বময় মুখচ্ছবি স্মরণ করে কবি যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন,—'আমি মরে যাব, আমি মরে যাব, আরসীতে তারে ধরি' তখন তা সস্তা ভাবালুতার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কবিতার ভাবপ্রবাহের সাথে কবিতার শেষ পংক্তিতে উচ্চারিত এ হৃদয়োচ্ছ্বাস খুব সমঞ্জসিত নয় বলেই আমার ধারণা। কোন উল্লেখযোগ্য কবিত্বশক্তির পরিচয় এ কবিতায় প্রস্ফুটিত নয় বলেই আমার মনে হয়। তবে পল্লীচিত্র অঙ্কনের সহজ পটুত্বের পরিচয় এ কবিতায়ও জসীমউদ্‌দীন রেখে দিয়েছেন। 'বন, লতাপাতা, ফুল-ফলের আখর লয়ে' 'পাখির কাকলী সনে' অবুঝ ভাষায় পল্লীপ্রকৃতি যে কাহিনী বলে যাচ্ছে নিত্যকাল ধরে, জসীমউদ্‌দীন সে ভাষা যে অনেকটাই বুঝতে পারেন, এ কবিতায়ও তার পরিচয় মিলে।

'জলের কন্যা' কবিতাটিতে বর্ষায় নতুন জলস্রোতে প্রতিবিম্বিত খালবিল-নালা পরিপূর্ণ নদ-নদী বিধৌত পূর্ব বাংলার অপূর্ব মায়াময় রূপের ছবিই অংকিত হয়েছে। তরলে শ্যামলে গড়া বংগপ্রকৃতির বুকে বর্ষার জলস্রোতের আবির্ভাব যে সাড়া জাগায়, তার সাথে একমাত্র তুলনা চলে স্বামীগৃহে প্রবাসী কন্যার পিতৃগৃহে আগমনের আনন্দের। নিরানন্দ গৃহে কন্যার আগমনে যেমন আনন্দের হিল্লোল বইতে শুরু করে, নির্জীব বঙ্গপ্রকৃতির বুকে বর্ষাসমাগমে তেমনই নতুন প্রাণের সঞ্চরণ ঘটে ; প্রকৃতি আবার মায়াময়ী রূপে দেখা দেয়। জলস্রোতবাহী বর্ষাকেই কবি এ কবিতায় জলের কন্যা বলেছেন। জলের রথে চড়ে জলপথ

দিয়ে জলের কন্যার আবির্ভাব ঘটে। সে আবির্ভাবে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও জীবনে যে কেমন সাড়া পড়ে যায় তা কবি স্বাভাবিক কবিত্ব সহকারে অঙ্কন করেছেন। এ চিত্রাঙ্কনে স্বভাব শিল্পীর নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়েছে। ছোটবড় পাঁচটি স্তবকে কবি লীলাময়ী জলকন্যার আবির্ভাবে তরঙ্গায়িত বঙ্গপ্রকৃতির মায়াময় রূপের ছবি অংকন করেছেন।

'তারাবি' একটি দীর্ঘ অথচ সুখপাঠ্য কবিতা। কবিতাটিতে কবি একদিকে বিগতশ্রী পল্লীর অতীত দিনের সরল স্বভাব ও ধর্মনিষ্ঠ মানুষের জীবন-মাধুর্যের আনন্দ-স্মৃতি মন্থন করেছেন এবং অপরদিকে পল্লীর বর্তমান দৈন্যদশা ও পল্লীসন্তানের অসহায় দারিদ্র্যক্লিষ্ট মূর্তি প্রত্যক্ষ করে মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন।

রোজার তারাবি উপলক্ষ্যে গ্রামে এককালে ধর্মভীরু, সরলপ্রাণ মুসলিমদের জমায়েতে যে অপূর্ব ধর্মাবেশ ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যেত, শত দুঃখ-দৈন্য সত্ত্বেও পল্লীবাসীদের জীবনকে তা একটা মর্যাদা দান করেছিল। সরল ধর্ম-বিশ্বাসে জীবনের আনন্দ-বেদনাকে সহজ প্রাপ্তি মনে করে সুখে-দুঃখে পল্লীবাসী ধনী-নির্ধন সকলে একদিন পল্লীতেই পাশাপাশি বসবাস করত। মোল্লাবাড়ীর 'রোজার তারাবির' স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে কবি বিগতশ্রী পল্লীর অতীত দিনের এ মাধুর্য স্মরণকে কেমন যেন একটা আকুলতা বোধ করেছেন। আজ কিন্তু রোজার তারাবির জামাত তেমন জমে না ; পল্লীর অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন মানুষেরা এখন শহরের পথে পাড়ি জমিয়েছেন। ধন-সম্পদ, খ্যাতির স্বপ্নে তাদের দিন কাটে। পল্লীর দিকে তারা ফিরেও তাকান না। দুঃখী, গরীব পল্লীসন্তান আজ অন্নাভাবের জ্বালায়, দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। পল্লী আজ সব রিক্ত পুরাতন জীবন-ঐশ্বর্য নিঃশেষিত প্রায়। রিক্ততার বেদনা নিয়ে মূক পল্লী আজ আপন অন্তিম প্রহর যেন গণনা করে চলছে। 'রোজার তারাবি'র মধুর স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে কবি এমনি করে দৈন্যদশাগ্রস্ত পল্লীমানুষের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। কবিতায় বর্ণিত মোল্লাবাড়ীতে অনুষ্ঠিত 'রোজার তারাবি'র জামাতের দৃশ্য বিগতশ্রী, দৈন্যদশাগ্রস্ত বর্তমান পল্লীর সরল ও একনিষ্ঠ ধর্ম বিশ্বাস-সমৃদ্ধ মুসলিম চাষী জীবনেরই অতীত জীবনমাধুর্যের ইঙ্গিতবাহী। এ অঙ্কিত চিত্রে কোথাও সামান্যতম আতিশয্য নেই। কবি যেন আপন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই বিবৃতি দিয়েছেন; মুসলিম সমাজ ও ধর্ম-জীবনের বৈশিষ্ট্যটি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তিনি স্বভাব শিল্পীর ঔচিত্যবোধ ও সংযম দ্বারা চালিত হয়েছেন। শব্দ চয়নে তিনি কাব্যবস্তু ও পারিপার্শ্বিকের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। মুসলিম ধর্মবিশ্বাস ও জীবনাদর্শের স্ফূর্তির প্রয়োজনে তিনি আবরী-ফার্সী শব্দ যেমন সহজ নৈপুণ্যে প্রয়োগ করেছেন, আবার চাষী-জীবনের আবহটি ফুটিয়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন বোধে ভাষাদেহে গ্রাম্য বাকভঙ্গির প্রভাবকে বরণ করে নিয়েছেন। অথচ আধুনিক কালের শিল্পীর মতো তিনি ভাষার পরিমার্জনে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দিতে কার্পণ্য করেন নি। রোমান্টিকসুলভ অতীতপ্রীতি, হারানো অতীতের জন্যে স্মৃতির ব্যাকুলতা এ কবিতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে এক সহজ পল্লীপ্রীতি অপর দিকে শোষিত নিপীড়িত দারিদ্র্য-ব্যাধিক্লিষ্ট পল্লীমানুষের জন্যে দরদবোধ প্রকাশ পেয়েছে এ কবিতায়। তবু এ কবিতায় কবিমন যুগজিজ্ঞাসায় উচ্চকিত নয়; সামাজিক মানুষের দুঃখ-দৈন্যের অবসান কামনার কোন বলিষ্ঠ চেতনাও এখানে ধরা দেয় নি। একটা প্রতিকারহীন দুঃসহ দুঃখচেতনায় আচ্ছন্ন কবিপ্রাণের অসহায়তার ভাবটিই কবিতাটিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কবিতার সমাপ্তিতে কবি বলেন,—

"সারা গ্রামখানি থম থম করে স্তব্ধ নিরালা রাতে,
বনের পাখিরা আছড়িয়া কাঁদে উতলা বায়ুর সাথে।
কিসে কি হইল, কি পাইয়া হায় কি আমরা হারালাম,
তারি আফসোসে শিহরি শিহরি কাঁপিতেছে সারা গ্রাম।
ঝিঁঝিরা ডাকিছে সহস্র দিকে, এ মূক মাটির ব্যথা
জোনাকি আলোয় ছড়ায়ে চলিছে বন-পথে যথা তথা।"

রোমান্টিক কবির হৃদয়াভিসারের ফলশ্রুতি এ ছাড়া আর কিই বা হতে পারে? ভালবেসে ভালবাসার পাত্রের দুঃখ-দুর্দশা দেখে চোখে জল ফেলা ছাড়া আর কি যে করা যেতে পারে, তা তার ভাবনার মধ্যেই আসে না। তবু কবিচিত্তের অনুভূতি ও আবেগ স্পন্দিত এ প্রকাশের মানুষ অস্বীকার করা যায় না। পল্লীর সাথে কবির নাড়ীর সম্পর্ক ; তাই পল্লীর প্রতি সুগভীর ভালবাসা ও দরদের প্রকাশে কবির আন্তরিকতায় সংশয় জাগে না আমাদের কোথাও। 'তারাবি' কবিতায় কবির এ পরিচয় নতুন কিছু নয়। এখানে তিনি আপন স্বভাবের ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছেন। 'রাখালী', 'নকসী কাঁথার মাঠ', 'ধান-খেতে'র ফেলে আসা জগতের স্মৃতি ভাবনাই এখানে প্রবল হয়ে আপন মাধুর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে।

'মা' কবিতায় শহর প্রবাসী ছেলে ও পল্লীকুটির নিবাসিনী মায়ের বিচ্ছেদ-কাতরতা ও পারস্পরিক স্নেহাকর্ষণের সূত্র ধরে কবি অশ্রুবাষ্পে কম্পমান চিরন্তন মাতৃস্নেহেরই আরতি করেছেন। একই আকাশের দুই প্রান্তে দুই দেশে বিচ্ছিন্নভাবে থেকে মা ও ছেলে পরস্পরের জন্যে চোখের জল ফেলে, পরস্পরকে স্মরণ করে ব্যাকুলতা বোধ করে। শহরে থাকলেও ছেলের মন পড়ে আছে গ্রামে। মাকে ছেড়ে তার কিছুই ভাল লাগে না; লেখাপড়ার কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বারবার মা'র কথা মনে পড়ে। চিঠিতে সে সব কথা মাকে লিখে একটু স্বস্তি পায়। 'নিবিড় পাতার মমতা মাখান' 'মায়াবিনী গাঁও' এর সবখানি মায়া উজার করে আসে মায়ের চিঠি তার কাছে। সেই চিঠির বুকে পাতা ছবির মতনই যেন ভেসে ওঠে গ্রামের সেই ছোট নদী, আঁকাবাঁকা সরু পথ, তার পাশে খোলা আকাশের নীচে ঘর। সেই পথেই কলসী কাঁখে মা রোজ যাচ্ছেন জলে ; চোখে তার ভেসে ওঠে বাড়ীর 'সাদা ধবধবে উঠানের পরে ছোট ভাইবোন খেলে'। ঐ চিঠির মধ্যে ভেসে আসে পুত্র-বিচ্ছেদকাতরা মায়ের ব্যাকুল আর্তি—'বাছারে আমারো মন পরদেশে তোরে ফেলিয়া আজিকে করিতেছে ক্রন্দন।' দুইজন দুই দেশে থেকে পরস্পরের জন্যে সুতীব্র ব্যাকুলতা বোধ করছে, অসহায়ের মত পরস্পরকে স্মরণ করে চোখের জল ফেলছে। কবি কল্পনা করছেন, তাদের বিচ্ছেদ রচনাকারী মহাদূরত্ব-জ্ঞাপক অনন্ত শূন্য আকাশও বুঝি বা মেঘের লহর তুলে আকুলতা প্রকাশ করছে। ওই আকাশের বুকেই 'পাখায় পাখায় মালিকা গাঁথিয়া পাখীরা সুদূরে ধায়', চাঁদ, তারা ভেসে যায়, 'রৌদ্রের জাল পাতি', রবি গড়িয়ে যায়। ঐ পথেই নানা বরণে সজ্জিত মেঘও ভেসে বেড়ায় 'মেঠো রাখালের করুণ সুরের বাঁশী'—এই দেশে থেকে মা ও ছেলে তা লক্ষ্য করে প্রতিদিন এবং এসব দৃশ্য পুরাতন স্মৃতিকে মনে করিয়ে দিয়ে বিচ্ছেদ ব্যথাকে যেন আরও তীব্র করে তোলে। আকাশের ঐ নীল সামিয়ানাটাই যেন সমস্ত অনর্থের মূল, সমস্ত ব্যবধান রচনাকারী বলে মনে হয় তাদের কাছে। তাই তাদের ইচ্ছে ওটাকে 'ছিঁড়ে করি ছাতানাতা'। এ ব্যাকুল স্নেহের চিত্রটি রোমান্টিকতার আমেজ সত্ত্বেও বেশ বাস্তবধর্মী ও হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে।

স্নেহের পথ চিরকালই অশ্রুবাষ্পসিক্ত বিরহের রাজ্যের দিকে প্রসারিত। স্নেহের পাত্রদের মধ্যে তাই দেখি চিরকাল ব্যবধান রচনা করে দাঁড়িয়েছে 'যোজনের পথ, বিচ্ছেদের

রেখা। সেই পথেই যুগ যুগ ধরে 'বিরহের গান' করে কত বিদেশী পথিকই না চলে গিয়েছে। সেই পথেই কেঁদে ফিরেছেন যীশু-জননী মরিয়ম, ইমাম হাসান-হোসেনের জননী ফাতেমা, নিমাই-জননী শচীদেবী। সেই পথ দিয়েই মা কৌশল্যার বুকে স্নেহের চিতা জ্বালিয়ে বনে গিয়েছে রাম-লক্ষ্মন ও সীতা। মাকে কাঁদিয়ে কি মায়ের সন্তানরাই রেহাই পেয়েছে? মায়ের অশ্রুজলে সিক্ত পথেই তো আজ শচীরূপী জননীর নিমাইরূপী সন্তানরা গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর গেঁয়ো কৃষাণের কণ্ঠে কণ্ঠে বারমাসী গানে সে ব্যথাই যেন বেজে ফিরেছে। আমাদের আলোচ্য কবিতার মা ও ছেলে সেই ব্যথার সুরেই সুর মিলিয়েছে। তাদের চোখের জল ঐ বিচ্ছেদের অশ্রুশক্তি পথকেই আরও সিক্ত করে তুলেছে।

স্নেহচিত্রাঙ্কনে জসীমউদ্‌দীনের প্রতিভার একটা স্বাভাবিক স্ফূর্তি ইতিপূর্বে অনেক কবিতায় আমরা লক্ষ্য করেছি। এখানে চিত্র নয়, ভাবনাই কবিচিত্ত জুড়ে রয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় চিত্রের ন্যায় ভাবনার ক্ষেত্রেও পল্লীই উদ্দীপকশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। স্নেহের বিশেষ কালিক ও স্থানিক রূপ কবিতার শেষে দেশকালাতীত আনুভূতিক সত্যের ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। পুরাণ, ইতিহাসের পাতায় লেখক খুঁজে পেয়েছেন সে সত্যের সমর্থন। তবে এ কবিতায় কবি কোন উচ্চাঙ্গের শৈল্পিক ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নি। তাঁর ভাষা-ভঙ্গি, ছন্দ নিতান্ত গতানুগতিকই রয়ে গিয়েছে।

'বানরযূথ' কবিতায় কবি পল্লীর এক বনের গহনে ইতর প্রাণী বানরদের মধ্যে স্নেহ-মমতার যে অপূর্ব অভিনয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাই রোমান্টিকের স্বপ্নিল মন নিয়ে বড় দরদের সাথে বর্ণনা করেছেন। কবিতাটিতে কবি রোমান্টিকসুলভ যথেষ্ট ভাবালুতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই তো লক্ষ্য করি তাঁর দৃষ্টিতে স্নেহের যোগে ইতর প্রাণী মনুষ্যত্বের দুর্লভ মহিমা নিয়ে দেখা দিয়েছে।

'কন্যাসাজানী সিমলতা' কবিতাটিতে জসীমউদ্‌দীন পল্লীর কোন এক কৃষকের বাড়ীতে দেখা 'কন্যাসাজানী সিমলতার জাঙ্‌লার' যে রূপচিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, তা আমাদের মনেও কিছুটা সাড়া জাগায় বৈ কি! কবিতাটির শেষে প্রদত্ত পাদটীকা থেকে জানা যায়, কবি ঢাকা জেলার মাঝের চর গ্রামে কোন একবার ভ্রমণ উপলক্ষে একটি কন্যাসাজানী সিমের জাঙ্‌লা দেখেছিলেন। সে সিমের জাঙ্‌লার সৌন্দর্য যে তখনই তাঁকে আকর্ষণ করেছিল তার প্রমাণও ঐ পাদটীকায় রয়েছে। তাতে কবি লিখেছেন; "এই সিমের পাতাগুলি লালে নীলে আর সবুজে মিশিয়া এক অপূর্ব শোভা বিস্তার করে। তার উপর রঙিন ফুল আর কচি কচি সিমের রঙে রামধনুকে পরাজিত করে।" কবি চোখের দেখা এ সৌন্দর্য-দৃশ্যকে মনের মাধুরী মিশিয়ে আর একটু অপরূপ করে তুলে ধরেছেন আলোচ্য কবিতায়। পরিচিত ক্ষেত্রে জসীমউদ্‌দীনের কবি-কল্পনা যে কিরূপ নিরঙ্কুশ হতে পারে, এখানে আমরা তার পরিচয় পেলাম। কবিতার এ বিশেষ জগতে জসীমউদ্‌দীন যে আজও জুড়িবিহীন তা একান্ত নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে।

'কমলা রাণীর দীঘি' একটি খাঁটি পল্লীগাথা জাতীয় কবিতা। কবি একটি প্রাচীন কিংবদন্তী অবলম্বনে রূপকথার ভঙ্গিতে এ কবিতাটি রচনা করেছেন। আমাদের দেশের নানা স্থানে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বা লুপ্তপ্রায় চিহ্ন সম্পর্কে এমনি ধরনের কত কাহিনীই না ছড়িয়ে রয়েছে। আলোচ্য কবিতায় আমরা কবির কাছ থেকে তেমনি একটি সুন্দর কাহিনী শুনতে পেয়েছি। কাহিনী বর্ণনা উপলক্ষে কবি যেভাবে পল্লীমানুষের সরল বিশ্বাস, তাদের নানা অদ্ভুত সংস্কার এবং সর্বোপরি প্রাচীনকালের বেশভূষা ও আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে সব খুঁটিনাটি কথা উল্লেখ করেছেন, তাতে কবিতাটি একটি খাঁটি পল্লীগাথার নমুনা হয়ে

দাঁড়িয়েছে। এ কবিতাটি সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় বলেছিলেন,---"এই কবিতায় আমরা কবির মারফত একটি সুন্দর কাহিনী শুনিলাম। কবে কোন্ মহাপ্রাণা জমিদার-গৃহিণী দেশের দারুণ জলকষ্ট নিবারণের জন্য প্রাণ দান করিয়াছিলেন—দেবতাও সদয় হইয়াছিলেন,-এবং তাহার ফলে যে আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আজও স্থানীয় নর-নারীগণ বিস্মৃত হয় নাই; কমলা রাণী তাহাদের মনে দেবী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ভাষা ও ভঙ্গিতে একটি রূপকথার মত হইয়াছে; এই ভঙ্গিটিই এই কবিতার কবিত্ব।" এ কবিতায় গ্রামবাসীর সরল বিশ্বাস, মনের নানা অদ্ভুত সংস্কার; আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির উল্লেখ থাকায় এটি পল্লীগাথার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে; এমন কথারও ইঙ্গিত দিয়েছেন মোহিতলাল। মোহিতলালের উক্তি যে যথার্থ তা কাব্যবস্তু বিশ্লেষণেও প্রতিপন্ন হয়।

'কমলা রাণীর দীঘি' একদিন কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। জলের বুকে রীতিমত ঢেউ খেলত। পল্লী নবধূরা কলসী ভরতে ভরতে কমলা রাণীর কাহিনী স্মরণ করে 'আঁখি ছল ছল' হত। আজ সে দীঘি শুকিয়ে গেছে, এর কর্দমাক্ত বুকে 'কঠিন পায়ের আঘাত হানিয়া গরুগুলি ঘাস টুকে'। কোথাও এক ফোঁটা জলের চিহ্নও বোধ হয় নেই। অথচ একদিন দেশের তৃষিত জনের জলকষ্ট নিবারণের জন্যে করুণাবিগলিত চিত্ত কোন রাজতুল্য জমিদারের মনের ঘরে জেগেছিল 'সাগর দীঘির মহা-কল্পনা'। মনে তার যে করুণার প্লাবন দেখা দিয়েছিল প্রজার কষ্টে তাই 'মাটির পাত্রে ভরিয়া দেখার তরে' তিনি করেছিলেন সাগর দীঘি খননের পরিকল্পনা। হুকুমে তার কাজে লেগে গিয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। কোদালের আঘাতে আঘাতে কঠিন মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে তারা তৈরী করল মস্ত দীঘি; কিন্তু 'উঠিল না হায় কল জলধারা গহন পাতাল ফুঁড়ি'। এদিকে ঘরে ঘরে 'কাঁদে শিশু মার শুষ্ক কণ্ঠ ধরি, ঘরে ঘরে কাঁদে শূন্য কলসী বাতাসে বক্ষ ভরি'। জলের আশায় মাটির বুক আরও গভীর করে খনন করা হল, কিন্তু কোথায় জল-'কঠিন মাটির থেকে, শুষ্ক বালুর ধূলি উড়ে যায় উপহাস যেন হেঁকে'। ডাক পড়ল ভাট ব্রাহ্মণ, গণক দলের। তাদের গুণে দেখতে বলা হল 'কেন দীঘিতে ওঠে না জল?' কিন্তু আকাশ, পাতাল, দশদিক গুণেও তারা ঠিক করে বলতে পারল না 'দীঘিতে কেন যে জল ওঠে নাক'। কবি অতি সুন্দর ভাবে লোকবিশ্বাস মতে দৈবজ্ঞ, গণৎকার প্রভৃতির গণনা কার্যে যে সব মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় তার আভাস দিয়েছেন। আকাশের তারা, পাতালের নাগরাজ বাসুকি-ঈশান কোণ, দক্ষিণ দিক প্রভৃতি দেবতা এবং সুন্দর বনের শাহ মান্দার পীর—কেউ এ মন্ত্রের আওতা থেকে বাদ যায় নি। দৈবজ্ঞেরা ব্যর্থ হলেন কারণ নির্ণয় করতে। মহাভাবনায় পড়ে গেল সবাই। এরই মধ্যে একরাতে কমলারাণী স্বপ্নে দেখলেন কে যেন তাকে এসে বলছে যে, রাণী যদি দীঘিতে প্রাণদান করতে পারে তবে 'পাতাল হইতে শতধারা মেলি জাগিবে জলের বান'। রাত প্রভাতে পূর্ব গগণ যখন রক্তিমচ্ছটায় সূর্যের আগমন আভাস দিচ্ছিল, তখন স্বপ্নভঙে জেগে উঠলেন এক মহান আত্মদানের সংকল্পে ব্যাকুল হয়ে। স্বামীকে জানালেন তার ব্যাকুল বাসনার কথা। স্বামীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই বুঝি শোনালেন জীবনের অনিত্যতার কথা—

"শোন শোন ওহে পরাণের পতি, ছাড়গো আমার মায়া।'
'উড়ে চলে যায় আকাশের পাখী পড়ে রয় শুধু ছায়া।"

এতে আমরা পল্লীগীতিকার

"উইড়া যায়রে হংস পংখী পইড়া রয়রে ছায়া,
দেশের মানুষ দেশে যাইব কে করিবে মায়া।"

পার্থক্যেরই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করি না কি? এখানে আমরা পল্লীবাসীরা জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে যে সরল দার্শনিক প্রত্যয়ের অধিকারী তারই প্রকাশ লক্ষ্য করি। রাণী প্রস্তুত হলেন আত্মবিসর্জনের জন্যে। পেটরা খুলে অষ্ট অলংকারে সাজলেন, রাসমণ্ডল শাড়ী পরলেন, কৌটা খুলে কপালে পরলেন সিঁদুরের টিপ। প্রাচীন সাজসজ্জার ও বেশ-ভূষার উল্লেখ একটা পুরাতন কালের আবহাওয়াই এখানে সৃষ্টি হয়েছে। রাণীর এ বিদায় মুহূর্তের সাজ-সজ্জা লক্ষ্য করে কবি বেশ কবিত্ব করেই বলেছেন-

"দুর্গা প্রতিমা সাজিল বুঝি বা দশমীর বাঁশি স্মরি।"

এ উপমাটি সুন্দর ও যথেষ্ট কাব্যমাধুর্য মণ্ডিত হয়েছে। তারপর কমলা রাণীর আত্মবিসর্জনের দৃশ্যটি কবি একেবারে যেন আমাদের চাক্ষুষ করে তুলেছেন। দীঘির পারে দাঁড়িয়ে কাঁদছে হাজার হাজার নর-নারী ঐ মহিয়সী জমিদারগৃহিনী কমলারাণীর করুণ বিদায়দৃশ্য অবলোকন করে। রাণী ধীরে ধীরে সাগর দীঘির মাঝখানে এসে দাঁড়াতেই মন্ত্রবলে যেন 'পাতাল হইতে শতধারা মেলি নাচিয়া আসিল জল'। কলোচ্ছ্বাসে ছুটে এসে পড়ল জলধারা রাণীর পাদমূলে--যেন মহাখুশিতে হেসে ওঠে খল খল করে। জল ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল ; জল যখন পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত উঠল, রাণী খুলে ফেললেন তার চরণের নূপুর, কোমর জলে রাণী ছিঁড়লেন কোমরের চন্দ্রহার, বুকজলে কণ্ঠ হতে খুললেন তার গজমোতি হার। একবার করুণ ভাবে সতৃষ্ণ নয়নে তাকালেন কোলের ছেলে জয়ধরের উদ্দেশ্য ; জল গলা পর্যন্ত উঠতেই রাণী ভাসিয়ে দিলেন তার খোঁপার চাঁপা ফুল। এই ভাবে চারধার থেকে জলধারা এসে দীঘিকে ভরে দিল আর লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে কাঁদিয়ে কমলা রাণী মিশে গেলেন জলধারার সঙ্গে চিরকালের জন্যে। কমলা রাণীর স্মৃতি বহন করে ঐ দীঘিরই নাম হয়েছিল কমলা রাণীর দীঘি।

বহুকাল, হয়তো সহস্র সহস্র পল্লীবাসীর পিপাসা মিটিয়েছে ঐ দীঘির জল। আজ সেই দীঘিরও বুক শুষ্ক, শ্রীহীন। কবি কল্পনা করেছেন দীঘি যেন কার অভিশাপে তার অঙ্গ থেকে 'জলকুমুদির সাজ' খুলে ফেলেছে। আজ আর তার বুকে জলের ঢেউ খেলে না, পল্লীবধূর 'কলসীর ঘায়ে দোলে না ইহার জল'। কমলা রাণীর কাহিনী হয়ত এখন কারো মনে পড়ে না ; রাখালের বাঁশীতে সে করুণ কাহিনী আজ আর নিশীথের বুকে কেঁদে ফেরে না। তবু দীঘির চারিপাশের গাঁয়ের লোকদের একটি অদ্ভুত সংস্কার আজও যেন সংগোপনে সে ব্যথাময় স্মৃতিকেই লালন করে চলছে। আজও গাঁয়ের ঘরে নতুন বউকে বরণ করে এনে পল্লীবাসীরা সেই বরণ-কুলাটি রেখে যায় দীঘির বুকে। লোকের বিশ্বাস—

"গভীর রাত্রে সেই কুলা খানি মাথার করিয়া নাকি
আলেয়ার মত কে এক রূপসী হেসে ওঠে থাকি থাকি।"

এখানেই কবিতাটি শেষ হয়েছে। রূপকথার আদল সত্ত্বেও পল্লীবাসীদের সহজ সংস্কার, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রাচীনকালের বেশভূষা ইত্যাদির উল্লেখে কবিতাটিতে পল্লীগাথার বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। জসীমউদ্‌দীন এই ধরনের কবিতা লিখতে যে কি রকম সিদ্ধহস্ত তার প্রমাণ ইতিপূর্বেও দিয়েছেন। উপযুক্ত ভাষা ও ভঙ্গির প্রয়োগে কবিতাটি সুখপাঠ্য হয়েছে।

'নমুর মেয়ে' কবিতায় কবি এক শ্যামলা পল্লীকিশোরীর রূপের প্রশস্তি রচনা করেছেন। রোমান্টিক কল্পনার আতিশয্য সত্ত্বেও এ বর্ণনায় বাস্তব প্রতিবেশের স্বীকৃতি রয়েছে। কবিতার উদ্দিষ্ট 'নমুর' মেয়েটি কবির চোখে দেখা একান্ত চেনা, কাছের মানুষ। নমঃশূদ্র

সমাজের এক কালো মেয়ে 'দুলী'ই তো তার 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের নায়িকা রূপে দেখা দিয়েছিল। এখানেও তিনি সেই নমুদের এক কালো মেয়ের রূপ বর্ণনা করেছেন। কালো রূপের মধ্যেই কবি দেখতে পেয়েছেন আলোর নাচন। তাঁর 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যের নায়ক 'রূপাই' কালো, 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের নায়িকা 'দুলী' কালো, আমাদের আলোচ্য কবিতার মেয়েটিও কালো। কালো রূপের মধ্যে যেন কবি বাঙলার শ্যামল রূপেরই প্রতিবিম্বন লক্ষ্য করেছেন সর্বত্র। এ কালো রূপের মহিমা আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যেও কীর্তিত হয়েছে। বৈষ্ণব কাব্যে আমরা কৃষ্ণের কালো রূপের আকর্ষণে রাধাকে ঘর ছাড়তে দেখি। শাক্ত কবি তো কালীর কালো রূপের বন্দনায় বিভোর। এ যুগের কবিদেরও তো দেখছি 'কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ' দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কালোর মহিমা চিরদিনই এদেশে স্বীকৃত। আসলে কালো এ দেশের স্বভাবসুন্দর রূপ। কালো রূপের মহিমা কীর্তনে জসীমউদদীন কাব্যসাধনার অন্যত্র যে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন, আলোচ্য কবিতায়ও (সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও) সে সার্থকতা একেবারে অনুপস্থিত নয়। এ কবিতাও পল্লীকিশোরীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি যথা সম্ভব পল্লীপ্রতিবেশ থেকেই উপমা, রূপপ্রতীক সংগ্রহ করে কাজে লাগিয়েছেন। তবে 'রাখালী', 'নকসী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র কবি-প্রতিভা এখানে যে অনেকটাই নিষ্প্রভ তা স্বীকার না করে উপায় দেখছি নে। আলোচ্য কবিতায় কবি পংক্তি বিশেষ সতেজ সুন্দর উপমা ব্যবহার করে আপন কবি ক্ষমতার কিছুটা পরিচয় দিতে সক্ষম হলেও সমগ্রভাবে বিশেষ কোন সার্থকতার পরিচয় দিতে পারেন নি। শব্দ প্রয়োগে, উপমা নির্বাচনে তিনি সর্বত্র না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরাতন পথের পথিক। কিন্তু পূর্বতন কাব্যের সহজ শৈল্পিক সার্থকতা দেখা দেয় নি।

'গোড়াই নদীর চর' কবিতায় নদ-নদী বিধৌত পল্লীবাঙলার চর অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা 'বালুচর' কাব্যের 'উড়ানীর চর' কবিতায় চর অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আভাস পেয়েছি। আলোচ্য কবিতায় তিনি সেই চর অঞ্চলের প্রাকৃতিক সোন্দর্যকেই সকাল, দুপুর ও রাতের আলো-আঁধারের পটভূমিতে প্রত্যক্ষ করেছেন। যে 'গোড়াই নদীর' চরের দৃশ্য এ কবিতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে আমরা সোজন-দুলিকে সে নদী তীরেই প্রথম খেলাঘর পাততে দেখেছিলাম। সে নদীর পারিপার্শ্বিকের প্রতি কবির আকর্ষণ এ কবিতায়ও স্পষ্ট। 'উড়ানীর চরে'র বর্ণনার ন্যায় গোড়াই নদীর চরের বর্ণনাও আমরা কবির কবিত্বশক্তির বিদ্যুৎচমক লক্ষ্য করি।

রোমান্টিক কবির কল্পনায় সকাল, দুপুর, রাতের চরপ্রকৃতির দৃশ্য পরিবর্তনের অতি সাধারণ ব্যাপারটাই অপরূপ রহস্যের অবগুণ্ঠন টেনে উপস্থিত হয়েছে আলোচ্য কবিতায়। এ কবিতায় জসীমউদদীনের শিল্পী-স্বভাবের সাড়া রয়েছে। পল্লীজীবন এবং প্রকৃতি সম্পর্কে কথা বলতে তিনি যে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, এ কবিতায় তার প্রমাণ আর একবার দিলেন।

'শেষ রাত্র' এ কাব্য গ্রন্থের শেষ কবিতা। রাত্রি শেষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন কবি এ কবিতায়। তাতে রোমান্টিক মনের স্বপ্নালুতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাত্রি শেষে জেগে উঠেছেন কবি। বাইরে তখন গাছে গাছে পাখীরা ডেকে উঠেছে। গাছের পাতায় ঘাসের বুকে শিশির পড়েছে। আকাশ থেকে চাঁদ তখনও হেসে জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে। কবি কল্পনা করেছেন 'বনদেবী' যেন নিহারে স্নান করে 'গায়েতে জ্যোৎস্না মাখে।' রাতের তারারা প্রায় বিদায় নিয়েছে, শুধু চাঁদ একাকী আকাশের তেপান্তরের মাঠে হেঁটে চলেছে।

কবি কল্পনা করেছেন চাঁদ কুমারী 'গাঁয়ের গাঙেতে নাহিতে যাইয়া' আসমান-তারা শাড়ী ছেড়ে এসেছে আর সেই শাড়ীর তারাফুলগুলো ছিঁড়ে পড়েছেও; রোমান্টিক কল্পনার আতিশয্য এখানে স্পষ্ট। মৃদু বাতাসে গাছের পাতা সব নাচছে, সেই পাতার ফাঁক দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে চাঁদের আলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছে । তাতে করে গাছতলার আঁধারও টুক্‌রো হয়ে গিয়েছে। বাতাসে পাতাগুলো দোলা খাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে যেন গাছের ছায়ায় আলো আঁধারে লুকোচুরি খেলা চল্‌ছে। বাতাসের দোলায় টুপটাপ গাছ থেকে ফুল খসে পড়ছে। কবির মুখেই শোনা যাক সে দৃশ্যের বর্ণনা,—

"বনতলে আজ বাতাস নাচিছে, পাতার করাতে কাটি
চাঁদের আলোরে খণ্ড করিয়া উজল করিছে মাটি।
টুক্‌রো আঁধার হেলিয়া দুলিয়া কুড়ায় জ্যোৎস্না গুড়া
গন্ধের মদে মাতাল বাতাস ভাঙিছে ফুলের চূড়া।"

'পাতার করাতে-কাটা চাঁদের আলোর খণ্ড' গাছের তলের মাটি উজ্জ্বল করছে, আর গাছের তলার টুক্‌রো আঁধার হেলিয়া দুলিয়া জ্যোৎস্নাগুড়া কুড়াছে বলে কবি যে কল্পনা করেছেন তার নতুনত্ব উপভোগ্য।

ধীরে ধীরে রাত ভোর হয়ে আস্‌ছে, আকাশে শুকতারকার দীপ 'ভোরাই নদীতে' ভেসে চলছে। আকাশের বুক থেকে চাঁদ ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল। কবি কল্পনা করেছেন 'আকাশ কুমারী মুছিল ভালের কনক চাঁদের টিপ'। তারপর যথার্থই রাত্রি শেষ হল যখন পূর্ব গগনে রক্তিম আভা সৃষ্টি করে দেখা দিল অন্ধকার বিজয়ী সূর্য। দূর হল অন্ধকার। প্রভাত-সূর্যের রক্তরাগকে কবি 'হত-আঁধারের রক্তিম দেহ' কল্পনা করেও অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ক্ষুদ্র কবিতাটিতে কবি রূপক-চিত্র অঙ্কনে নৈপুণ্য দেখিয়েছিন যথেষ্ট। তবু এ বর্ণনাভাঙ্গ প্রায়শঃ বড় কৃত্রিম বলেই মনে হয়। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সীমানায় যে সব জিনিস ধরা দেয়, তাদের নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত রোমান্টিকতার অবশ্যম্ভাবী পরিণামই এ কৃত্রিমতা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

'মাটির কান্না' কাব্য-পাঠের পর যে সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছি তা হল এই ঃ কবি এ কাব্যে গ্রামীণ নাগরিক উভয় পরিবেশ থেকে কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তদনুসারে পূর্ব পূর্ব কাব্যের চেয়ে এ কাব্যে কাব্যবস্তুর বৈচিত্র্য বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়। এ কাব্যে কবির জীবন-দৃষ্টিতে একটা মৌল পরিবর্তন দেখা যায়। এ কাব্যে তিনি সর্বপ্রথম যুগ-জীবন জিজ্ঞাসার দোলা অনুভব করে তাতে শিল্পী হিসেবে সাড়া দিয়েছেন। তবে কবিস্বভাবের রোমান্টিক প্রবণতা এ কাব্যেও অক্ষুণ্ন রয়েছে। এ কাব্যে যুগচেতনার প্রকাশ ঘটেছে যুগমানুষের দুঃখ-বেদনার ভাবনায়, সকল সামাজিক অন্যায়, অত্যাচারের অবসান কামনায়, মহৎ জীবনাদর্শের অনুধ্যানে, স্বদেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় ও নানা বাস্তব জীবন সমস্যার উপস্থাপনায়। তবে স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে, এ কাব্যে চেতনার নতুনত্ব সত্ত্বেও গ্রামীণ পরিবেশেরই আধিপত্য বজায় রয়েছে। ভাষাভঙ্গিতেও কিছুটা পরিমার্জন ছাড়া তেমন লক্ষণীয় ব্যতিক্রম দেখা দেয় নি। যে নতুন চেতনার প্রকাশে এ কাব্য একটা স্বাতন্ত্রের দাবীদার, তা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরাতনকে পথ ছেড়ে দিয়ে কবির মূল স্বভাবকেই জয়যুক্ত করেছে। কবি শেষ পর্যন্ত পল্লীপথের পথিকই রয়ে গিয়েছেন। তবু সত্যের অনুরোধে স্বীকার করতেই হয় যে, এ কাব্যে মনোভঙ্গিতে তিনি কিছুটা পরিবর্তিত মানুষ হিসেবেই দেখা দিয়েছেন।

সকিনা

'মাটির কান্না'র নতুন সুরের আলাপন তেমন জমে উঠল না। কবি আপন হৃদয়ের গভীর থেকে তেমন কোন সাড়া না পেয়েই যেন থেমে গেলেন। 'সকিনা'র মধ্য দিয়ে তিনি ফিরে এলেন আবার বেশ পেছনে ফেলে আসা 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র পল্লীগাথার রাজ্যে। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্য প্রকাশের পর থেকে 'মাটির কান্না'র প্রকাশের বহুদিন পর পর্যন্ত কবি আর কাহিনীকাব্য রচনা করেন নি। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি নানা সুরের অজস্র খণ্ডকবিতা, শিশু-কবিতা এবং লোকনাট্য, রূপকথা, জীবন-স্মৃতিমূলক নানাবিধ গদ্য-সাহিত্য রচনা করেছেন। রূপবতী কাব্যের কিছু কিছু প্রেম ও সৌন্দর্য ভাবনামূলক কবিতা, 'মাটির কান্না'র যুগচেতনা সঞ্জাত কিছু কিছু দেশ ও জীবন-ভাবনামূলক কবিতা এবং জীবন-স্মৃতিমূলক কিছু গদ্য রচনা ছাড়া তিনি এ সময় অবশ্য পল্লীবৃত্তের মধ্যে থেকেই সাহিত্য-সাধনা চালিয়েছেন। তবু তিনি যে গ্রাম্যগাথার রাজ্যে আবার ফিরে আসবেন এমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তাই বহুকাল পরে 'সকিনা'য় কবি যখন সে গ্রাম্যগাথার জগতকেই আহ্বান করলেন, তখন স্বভাবতঃই একটু বিস্ময়ের সঞ্চার হয়েছিল। তবু 'নক্‌সীকাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র কবির হাতে 'সকিনা'র সৃষ্টি নিতান্ত অপ্রত্যাশিত নয়। এখন প্রশ্ন উঠবে, 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র পঁচিশ বছরেরও বেশী পরে 'সকিনা'য় কবি নিছক পুরাতনেরই অনুবৃত্তি করেছেন, না, নতুন কোন সার্থকতার ইঙ্গিত নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন?

'সকিনা' কাব্যের বহিরঙ্গ বিচারে পুরাতনের অনুবৃত্তি সুস্পষ্ট হয়েই ধরা দেয়। গ্রাম্য কবিদের রচনাবলী থেকে এখানেও তিনি প্রতি পরিচ্ছদের ভাবসূত্র গ্রহণ করেছেন। তারপর গ্রাম্যকবির রচনা থেকে তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা-পংক্তি, শব্দ, উপমা এমন কি ক্ষেত্রবিশেষ ছন্দ পর্যন্ত গ্রহণ করে তিনি স্বীয় কাব্যদেহ বয়ন করেছেন। কোথাও কোথাও তিনি ভাষা-ভঙ্গি ও ছন্দে পল্লীকবিদের অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। অন্যত্র কাহিনীর উপন্যাসোচিত প্রবাহকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ধীর লয়ে হ্রস্ব দীর্ঘ পংক্তিতে বিন্যস্ত করে বইয়ে দিয়েছেন। পল্লীকাব্যের আবহটি বজায় রাখার জন্যে তিনি স্বভাবের রাজ্য থেকে যথেষ্ট পরিমাণে শব্দ, উপমা চয়ন করেছেন। তবে কাব্যপাঠকের কাছে এ সত্য গোপন থাকে না যে কবি 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র ভাষা ও ছন্দের সে সরসতা এ কাব্যে সঞ্চার করতে পারেন নি, গ্রাম্যকবিতার ছন্দকে আশ্রয় করেও। 'সকিনা' কাব্যের কোন অংশ শব্দ যোজনায়, সুন্দর উপমা প্রয়োগে ও স্বাভাবিক ছন্দ সংযোগে বেশ উপাদেয় হয়েছে। কিন্তু অনেক জায়গাই কবির ভাষা অতি ব্যবহারে ম্লান, গতানুগতিক শব্দ-উপমার অনুবৃত্তিতে প্রাণহীন। মাত্রাবৃত্তির ছকে ফেলা নীরস গাদ্যিক বর্ণনা, বিবৃতি ও বিশ্লেষণে কাব্যদেহকে ভারাক্রান্ত করে ফেলেছেন কবি। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের ভাষা, ছন্দ ও উপমার সজীবতা 'সকিনা'য় অনেকটাই অনুপস্থিত বলে মনে হয়। দীর্ঘ কালের ব্যবধানে এই কাব্যে কবির পরিচয় তাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি ; বরং পূর্বের তুলনায় অনেকটাই ম্লান মনে হয়। বহিরঙ্গ বিচারে 'সকিনা'র কবি নিছক পুরাতনের অনুবৃত্তিই করেছেন ; তাতে পুরাতনের গৌরব সঞ্চারিত হয় নি, অথচ গতানুগতিকতার সমস্ত দোষ বর্তেছে।

কাব্যের অন্তরঙ্গ-বিচারে সকিনার কবি কিন্তু কিছুটা প্রশংসা দাবি করতে পারেন বলেই মনে হয়। সত্য বটে 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' 'সোজনবাদিয়ার ঘাটে'র মত, সকিনা'ও পল্লী নরনারীর প্রেমকাহিনী। তবু 'সকিনা'র কাহিনী আপন বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্রের দাবিদার। 'নক্‌সী

কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র জগত 'প্রেমে মোহে গাঁথা' এক স্বপ্নেরই জগত যেন। সে জগতে দেশ-কাল-জীবন যেন পল্লীপ্রকৃতির শ্যামল রূপের ধ্যানে বিভোর। প্রেম সেখানে স্বভাবের নিয়মে এসে নর-নারীর হৃদয়ে দোলা দেয়, আবেগ সৃষ্টি করে ভালবাসায় বিবশ হয়ে যায় তারা। প্রেমে পড়ে তারা ঘর বাঁধে, সুখস্বপ্ন দেখে। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগেরই ন্যায় ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হয়ে তাঁদের সুখের নীড় ভেঙে দেয় ; তারা ডুকরে কাঁদে, অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। তবু মনের গভীরে লালন করে সে প্রেমস্মৃতিকে আমৃত্যু। কোন সংশয়, কোন জটিলতা যেখানে নেই। প্রেমের পথে পথে যা কিছু বাধা সেখানে, তা যেন নিতান্তই বাইরের আর সেটাকে তারা দৈব বলেই মেনে নিয়ে থাকে। নর-নারী সেখানে অবোধ প্রেমের শিশু যেন। কোন জটিল চিন্তাভাবনা প্রেমের পথকে সেখানে আকীর্ণ কর তোলে না। প্রেমের পূর্বরাগের স্বপ্নেই যেন তারা বিভোর থেকে গিয়েছে শেষ পর্যন্ত। 'রূপাই ও সাজু', 'সোজন ও দুলীর' বেদনামধুর প্রেমকাহিনী তাই আগাগোড়া একটি স্বপ্নাবেশ নিয়েই যেন আমাদের সামনে উপস্থিত। শ্যামলা পল্লীপ্রকৃতির মধ্যেই আত্মনিমজ্জন করে রয়েছে এ প্রেম। তার নিজস্ব স্বাধীন কোন সত্তা নেই। তাই প্রকৃতির বুকে বর্ণালির মতই তার আবির্ভাব ও বিলয়। গোটা মধ্যযুগের জের বয়ে বিশ শতকের প্রথম দুতিন দশক পর্যন্ত পল্লী এমনি করে মানব-সন্তানকে আপন স্নেহাবেষ্টনীর মধ্যে অবোধ শিশুর ন্যায়ই তো পালন করেছে। মাথার উপর দিয়ে ঝড়ঝঞ্ঝা তো কম যায় নি। কিন্তু পল্লী সন্তান সব কিছুকে অদৃষ্ট বলে মেনে নিয়ে জীবনের স্বাভাবিক প্রাপ্য বলে গ্রহণ করে নীরবে দিন কাটিয়েছে। জীবনব্যাপী অভাব-দৈন্যের মধ্যে প্রেমের দীপালোকে সে কিছুটা আশা, কিছুটা ভরসা, কিছুটা আনন্দের আভাস পেয়েছে। সে দীপ ফুৎকারে নিভে গেলেও তাকে মনে হয়েছে স্বপ্নের মত সুন্দর। তাই তো মধ্যযুগের কাব্যে প্রেমের 'ধ্রুবতারার' এত বন্দনা।

বৈষ্ণব কব্যের রাধা মংগল কাব্যের বেহুলা, খুল্লনা ফুল্লরা গ্রাম্যগীতিকার মহুয়া, মলুয়া, মদিনা, ভেলুয়া সুন্দরী ইত্যাদি নারীর অশ্রুঝরা প্রেমকাহিনী পল্লীসন্তানের বুক জুড়ে রয়েছে। প্রেমিকের প্রতি একটি নিঃ-সংশয়িত বিশ্বাসে এ প্রেম সমর্পিত। প্রতিদিন সর্বত্র না মিললেও এ প্রেম কখনও প্রশ্ন কণ্ঠকিত হয়ে ওঠে নি। জীবনের প্যাটার্ণে সে প্রশ্ন দেখা দেওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। 'নকসী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের তরুণ কবি পল্লী নর-নারীর প্রেমচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে স্বভাবের অনুরোধেই মধ্যযুগের আদর্শবাহী একনিষ্ঠ প্রেমের আত্মসমর্পিত রূপের ছবি এঁকেছেন। সে ছবি সুন্দরও হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তার দীর্ঘ পঁচিশ বছরেরও পরে প্রৌঢ় কবি সকিনার যে ঐ প্রেমচিত্রেরই পুনরাবৃতি করেন নি, সেটাই তাঁর পক্ষে বড় প্রশংসার কথা হয়েছে। 'সকিনা'য় কবি প্রৌঢ় বয়সে ক্রম পরিবর্তনশীল দেশ, কাল, সমাজ ও মনুষ্যজীবন সম্পর্কে ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার আলোকে পল্লী নর-নারীর প্রেমের নতুন মহিমা খুঁজে পেলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন দুঃখ-দারিদ্র তাড়িত সরল সহজ পল্লী নর-নারীর জীবন বস্তুতঃ নিস্তরঙ্গ নয়; সে জীবন যথার্থই সরল রেখায় প্রলম্বিত নয়। বৃহত্তর দেশের জীবন-প্রবাহের সাথে যুক্ত হয়ে তা এ যুগে বেশ কিছুটা আন্দোলিত হচ্ছে। সকিনায় প্রেমের চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি তাই সুযোগ মত দেশব্যাপী বন্যায় প্রপীড়িত মানুষের দুঃখবেদনার কথা, আর্ত মানবতার বেদনা মোচনে বিভিন্ন জাতির সহযোগিতার কথা ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। তাতে কাব্যের মূল্য বেড়েছে কিনা সে কথা স্বতন্ত্র। সকিনার যেটা সবচেয়ে লক্ষণীয় বস্তু তা হচ্ছে এর নর-নারীর প্রেমভাবনার জটিলতা। এ জটিলতা যে জীবন পারপার্শ্বিকের নিষ্ঠুর বৈরিতা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, তা কবি বাস্তবদৃষ্টি সহকারেই তুলে ধরেছেন। পল্লীজীবনের ন্যায় পল্লী নর-নারীর

জীবনভঙ্গিও যে আজ অনেকটা পরিবর্তিত, তাদের মধ্যেও যে ব্যক্তিআত্মার ধীরে ধীরে উদ্বোধন ঘটছে তা জসীমউদদীন বাস্তববুদ্ধি দিয়েই অনুধাবন করেছেন। পল্লী মানুষের 'মন' বলে যে জিনিসটি এতকাল প্রায় অজ্ঞাতই ছিল, সে মন এখানে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। স্বামী পরিত্যক্তা ও সমাজ শকুনিদের লাম্পট্যের শিকার পল্লীনারী সকিনা ও আদিলের প্রেমের জটিলতার মূলে ব্যক্তিমনের ক্রিয়াশীলতাই তো প্রধান উদ্বোধকশক্তির কাজ করেছে। এ প্রেমচিত্রের পরিকল্পনায় জসিমউদদীনের প্রাগ্রসর মন যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছে তা শিল্পীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দেয়। এ প্রেমে একদিকে লক্ষ্য করছি তারুণ্যের দুঃসাহস, উদারতা ও সংস্কার মুক্তির সুতীব্র ব্যাকুলতা, অপর দিকে চিরাচরিত সংস্কারের পিছুটান ও তজ্জনিত নানা সংশয়, দ্বিধাদ্বন্দ্বের কন্টকজ্বালা।

আদিল ও সকিনার জীবনে আধুনিক নর-নারীর ব্যক্তি-আত্মার উদ্বোধনই যে এ জটিলতার সৃষ্টি করেছে তাতে সন্দেহ নেই। সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে গিয়েও কেমন করে বারবার তারা সংস্কারজালে জড়িয়ে পড়ছে; প্রাণপণে সে জাল ছিন্ন করার প্রয়াস পাচ্ছে, কেমন করে বিরুদ্ধ চিন্তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় তারা ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, কেমন করে শেষ পর্যন্ত নিষ্করুণ সমাজ-বাস্তবের কাছে মাথা নত করে তাদের বিচ্ছেদকেই বরণ করে নিতে হয়েছে, তা কবি অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নৈপুণ্য সহকারেই দেখিয়েছেন। কবির রোমান্টিক মন শেষ পর্যন্ত প্রেমের ভাবলোকেই এদের মিলন কল্পনা করে সান্ত্বনা খুঁজলেও, নির্মম জীবনসত্যকে অস্বীকার করতে পারে নি। সকিনার প্রেমচিত্রে নকসী কাথার মাঠ ও সোজন বাদিয়ার ঘাটের দুর্লভ কাব্যসৌন্দর্য দেখা না দিলেও তাতে কবি নর-নারীর মনোবিশ্লেষণে যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা কবির ঔপন্যাসিকোচিত জীবনবীক্ষারই ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। এদিক দিয়ে তিনি 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যকে অনেকটাই ছাড়িয়ে এসেছেন। কাব্যোপন্যাস হলেও 'নকসী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' মূলতঃ প্রেমেরই কাব্য, 'সকিনা'ও কাব্যোপন্যাস : কিন্তু 'সকিনা' মূলত ঃ প্রেমের উপন্যাস হয়েই দাঁড়িয়েছে। 'সকিনা'র কাহিনীর ঔপন্যাসিক প্রকৃতিই কবির শৈল্পিক সামর্থ্যকে একটা নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছে। সে পরীক্ষায় কবি সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হতে পারেন নি বলেই মনে হয়। তবে এরূপ ক্ষেত্রে মহত্তর প্রতিভাও সার্থক হতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

'সকিনা' কাব্যে যৌবন-স্বপ্নে আছন্ন 'নকসী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র কবি প্রৌঢ়ত্বের মোহমুক্ত নির্মম বাস্তব অভিজ্ঞতার রাজ্যে জেগে উঠেছেন। কিশোর-কিশোরীর প্রেমভাবালুতার স্বপ্নমধুর জগৎ ছেড়ে 'সকিনা'য় কবি সংসারের নানা মিথ্যা সংস্কার, সংশয় কন্টকিত শ্বাসরোধকারী নির্মম বাস্তব পরিবেশে দ্বিধাদ্বন্দ্ব নৈরাশ্যে জর্জরিত মানুষের বাস্তব প্রেমের অম্লমধুর ছবি অঙ্কনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ক্লেদাক্ত বাস্তব সংসারের অনেক ক্লেদ এসে এ কাব্যের নর-নারীর প্রেমকে বিষিয়ে তুলেছে। তাদের মুহূর্তের জন্য স্বস্তি দেয় নি। হৃদয়ের পাত্রে প্রেমসুধা পান করতে গিয়ে তারা সুতীব্র হলাহল সঞ্চারিত দেখে শিউরে উঠেছে। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে, সে তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে অপরূপ প্রেমসুধা নর-নারী নিজ নিজ বক্ষে প্রচুর পরিমাণেই ধারণ করে রেখেছে। কিন্তু হায় পরস্পরের মুখে সে সুধা তুলে দিতে গিয়েই তারা দেখে সুধাপাত্র কোথা থেকে সন্দেহ, সংস্কারের বিষে নীল হয়ে যাচ্ছে। এ কি যে সংকট। একদিকে অপরিমেয় ভালবাসার আকর্ষণ, অপর দিকে সামাজিক মানুষের চিরাচরিত সংস্কারের তীব্র বিরুদ্ধতা। এ দ্বিমুখী হৃদয়বৃত্তির টানাপোড়নে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে নর-নারী। না পারছে তারা

পরস্পরকে আঁকড়ে থাকতে, না পারছে সকল সম্পর্ক ঘুচিয়ে দূরে সরে যেতে। একদিকে মিলনের তীব্র আকুতি, আর একদিকে সকল বন্ধন সম্পর্কে সুতীব্র বিরাগ। একদিকে অমৃতের হাতছানি, আর একদিকে হনন উদ্যত ঘৃণাসংশয়-সংস্কারের বিষবাণ।

'সকিনা' 'নক্‌সী কাঁথার মাঠে'র 'সাজু' বা 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র দুলি নয়—সরলা পল্লীকিশোরী নয়। সে এক স্বামীতাড়িতা ভাগ্য বিড়ম্বিতা, লাঞ্ছিতা যুবতী নারী। প্রেমের সৌভাগ্যস্পর্শ জীবনে আসার পূর্বেই তার জীবনে নারীত্বের চূড়ান্ত অপমান ও লাঞ্ছনা ঘটে গেছে। গরীবের ঘরে অঢেল রূপ তার জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়ে তার নারীত্বকে বারবার ঠেলে দিয়েছে দুর্গতির মুখে। পিতার অবিবেচনায় এক কুখ্যাত দাগী চোরের সাথে তার বিবাহ থেকেই তার দুর্ভাগ্যের সূচনা। সে দুর্ভাগ্যজনক বিবাহের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় সে হল সমাজ-শকুনিদের লাম্পট্যের শিকার। যে দেহ হতে পারত প্রেমের সিংহাসন, তাকে নিয়ে মাংসলোলুপ লম্পটদের চলল কাড়াকাড়ি। হয়তো তাদের জৈবিক ক্ষুধা মিটাতেই তার নারী জীবনের চূড়ান্ত অপঘাত ঘটত। কিন্তু একদিন আদিলের প্রেমমূর্তি তার জীবনে এসে উপস্থিত হয়ে এক চূড়ান্ত বিপ্লব ঘটিয়ে দিল। সবলে মোড় ফিরিয়ে দিল তার জীবনের। বিষপান করে মৃত্যুনীল হয়ে এসেছিল তার নারীসত্তা, এবার সে অমৃতের সন্ধান পেয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। রূপের ঐশ্বর্যে বিড়ম্বিতা সকিনা এবার প্রেমের ঐশ্বর্যে বলবতী হয়ে পেল ক্লেদাক্ত জীবন থেকে মুক্তির সন্ধান। সে তার অতীতকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে প্রেমের সাধনায় রত হল। কিন্তু সে সাধনাও নিষ্কন্টক হল না। তার শিয়রে জেগে রইল 'পশ্চাতের স্মৃতি'। তাকে সে যেন কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিল না। ভীরু কপোতীর ন্যায় সে আদিলের বক্ষে আশ্রয় নিল, নতুন বঞ্চনার আশঙ্কায় কম্পমান হৃদয়ে।

উদারহৃদয় আদিল সকিনা রূপমোহজাত প্রেমের প্রবল আকর্ষণে সকল দ্বিধা সংশয়কে দূর করে সকিনাকে গ্রহণ করেছিল ঠিক; কিন্তু শীঘ্রই শুরু হল তার মানসিক প্রতিক্রিয়া। সকিনার ক্লিন্ন অতীত যেন বিভীষিকা নিয়ে উপস্থিত হল তার সামনে ; চিরাচরিত সামাজিক সংস্কার, 'লোকভয়' অবিশ্বাস তার মনকে বিষিয়ে তুলতে লাগল সকিনার বিরুদ্ধে। একটা 'কুলটা' নারী হবে তার সন্তানের জননী এ ধারণা যে অসহ্য ! মনের সাথে নিদারুণ যুদ্ধ করে আদিল শেষ পর্যন্ত সকিনাকে দেয় নির্বাসন। সকিনার আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়। দুর্ভাগ্য যার আজন্মের সহচর তার পক্ষে এ বঞ্চনা অসহনীয় হল না। সকিনা আদিলের উপেক্ষাকে মাথায় নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে পথে। কিন্তু সকিনার জীবনে প্রেম ব্যর্থ হল না। উপেক্ষিতা সকিনা প্রিয় প্রেমের স্বল্পকালীন সান্নিধ্যকে মাতৃত্বের অক্ষয় মহিমা দিয়ে নিজের জীবনে শাশ্বত করে তুলল। সন্তানকে অবলম্বন করে চলে তার প্রিয়প্রেমের দুশ্চর তপস্যা ও দুঃখ দাহন, লোকচক্ষুর আড়ালে নিরবে। সংসার বিরাগী তিনু ফকিরের স্নেহ ও দরদ হয়েছিল তার এ তপস্যার সার্থকতার সহায়ক। শেষ পর্যন্ত তার সাধনা জয়যুক্ত হল। বিবেকবান প্রেমিকচিত্ত আদিল বুঝতে পারে তার অন্যায়ের কথা, অনুশোচনা জাগে তার মনে—সকিনার প্রেমে সে হয়ে উঠে নিঃসংশয়। আবার বাহু প্রসারিত করে আহ্বান জানায় সকিনাকে ফিরে আসতে। সকিনা প্রলুব্ধ বোধ করে, কিন্তু অতি কষ্টে সংযত করে নিজ হৃদয়কে। সন্তানকে তুলে দেয় অনুতপ্ত প্রেমিকের হাতে; কিন্তু নিজের জন্য বেছে নেয় সেই নির্বাসিত জীবনকেই। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সে বুঝেছে যে, তার ক্লিন্ন অতীত মৃত্যুবান উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে তার সকল প্রেমস্বপ্নের পিছনে। তাকে উপেক্ষা করে চলতে চেষ্টা করলে বারবার বিড়ম্বিতই হতে হবে তাকে। জীবনে প্রেমের সাধনায় কোন শান্তি নেই তার জন্যে। তাই প্রিয়-বিরহের অগ্নিদাহে নিজেকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে সে আজীবন

তার লাঞ্ছিত নারীআত্মার মুক্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে যাবে বলে সংকল্প গ্রহণ করল। এইভাবে প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় সকিনা আপন নারীত্বকে জয়যুক্ত করেছে। ট্র্যাজেডির কারুণ্যে নিষিক্ত এক ভাগ্য-বিড়ম্বিতা পল্লীনারীর এ অপূর্ব প্রেমগাথা জসীমউদদীনের শ্রেষ্ঠ কবি-সুলভ চারিত্রিক অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং ঔপন্যাসিকসুলভ বাস্তব-জীবন সত্য অনুধাবনের ক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

সকিনা ও আদিলের জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বমুখর প্রেমের কাহিনীটি কিন্তু একটি নিটোল রসরূপ লাভ করতে পারে নি; আমার মনে হয় তিনু ফকিরের চরিত্রটির প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত মনোনিবেশ কাহিনীর শৈল্পিক সার্থকতার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। তিনু ফকিরের ভূমিকা আরও সংক্ষেপ হলে কাব্যটির রস-সৌন্দর্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেত, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সকিনা ও আদিলের প্রেমভাবনার জগতে তিনু ফকিরের স্থান নিতান্তই গৌণ। কবি সে সত্য বিস্মৃত হয়ে সকিনার আশ্রয়দাতা তিনু ফকিরের কর্মধারা, তার চরিত্রের বিস্তৃত বিবরণ এ কাব্যে উপস্থিত করেছেন। এ তিনু ফকির বাংলার আউল-বাউল ফকিরদেরই যেন আধুনিক বংশধর, যদিও তাদের অধ্যাত্মসাধনার কোন ছাপই তার চরিত্রে লক্ষ্য করা যায় না। সংসার-বিরাগী এ মানুষটি গাঁয়ের পথে পথে সারিন্দা বাজিয়ে মানুষকে বাস্তব জীবনের সুখ দুঃখের কথা শোনায়। তাদের আশা-আকাংক্ষাকে গানের মধ্যে ভাষা দেয়, দুঃখের দিনে তাদের সাথী হয়ে আশা ভরসার বাণী শুনিয়ে থাকে। কবি তাঁরই সারিন্দার সুরে বিরহিণী সকিনার মর্মব্যথাকে ভাষা দিয়েছেন অনেকটা। সকিনার দুঃখ-ব্যথাকে তিনি সার্বজনীন ব্যথায় রূপান্তরিত করে তাকে একটা মহিমা দান করেছেন তা ঠিক। একদিকে অসহায় প্রিয় পরিত্যক্তা সকিনাকে আশ্রয় দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, ভরসা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে, অপর দিকে সকিনার বেদনাকে সারিন্দার সুরে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে অনুতপ্ত আদিলের সাথে সকিনার মিলনের পথকে কিছুটা প্রশস্ত করে তুলতে ফকিরের ভূমিকাটির মূল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু আদিল-সকিনার পুনর্মিলনের ভূমিকা প্রস্তুত হয়েছিল মুখ্যতঃ আদিলেরই প্রেমার্ত হৃদয়ে। সেখানে তিনু ফকিরের কিছুই করণীয় ছিল না। সকিনার সন্ধানে পথে বেরিয়ে আদিল তিনু ফকিরের গানের পথ ধরে সকিনার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল নিতান্ত দৈবগতিকে। তার আগে পরে যা ঘটেছে তা নিতান্তই আদিল-সকিনার নিজস্ব জগতের ব্যাপার! প্রেমকাহিনী রচনা করতে বসে কবি তিনু ফকিরের ঐ গৌণ ভূমিকাটিকে দীর্ঘায়িত করে কাব্যের সামগ্রিক সার্থকতার পরিপন্থি কাজই করেছেন। সত্য বটে ফকিরের সারিন্দার সুরে তিনি আমাদের সুখ-দুঃখে গাথা গ্রামবাঙলার জীবনকেই অনায়াস ছন্দে রূপায়িত করেছেন, তাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ-প্রপীড়িত সমকালীন মানুষের দুঃখ-বেদনার কথাও অনেক বাস্তব সত্যনিষ্ঠা সহকারে ব্যক্ত হয়েছে এবং কবির সমকালীন দেশ-ভাবনারও ছাপ পড়েছে; কিন্তু 'সকিনা'র প্রেমকাহিনীর দিক থেকে সেসব অবান্তরই মনে হয়। 'সকিনা'র প্রেমকাহিনী এ অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণায় অনাবশ্যক রূপে দীর্ঘায়িত হয়েছে এবং অনিবার্য ভাবে কাহিনীর মাধুর্য কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাছাড়া আধুনিক উপন্যাসধর্মী কাব্যকাহিনী রচনা করতে বসে কবি কাব্যের অংশবিশেষে গ্রাম্যকবিদের বিশেষ ঢঙে গ্রাম্যছন্দ প্রয়োগ করে কি নতুন সার্থকতা লাভ করেছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। আধুনিক যুগের কাব্য মুখ্যতঃ পাঠ্য, তার অংশবিশেষে গ্রাম্য ধরনের সুরেলা ভঙ্গির প্রবর্তন কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকে। গ্রাম্য মানুষের হৃদয়ের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টার কৈফিয়ৎ এ প্রসঙ্গে শুধু অবান্তরই নয়, হাস্যকরও বটে। কবির উদ্দেশ্য যদি নিরক্ষর গ্রাম্যমানুষের মনোরঞ্জন হয়ে থাকত তা হলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি গ্রাম্যকবিতার সোজা রাস্তা ধরলেই যথার্থ কর্তব্য করতেন।

সকিনার কাব্যবস্তুর জটিলতা ও চরিত্রের সূক্ষ্ম মানসিক বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা উদ্দেশ্যের অন্যথাই প্রমাণ করে। আর গ্রাম্যফকিরের বাচনভঙ্গিকে স্বাভাবিকতা দানের অনুরোধের যুক্তিও এখানে অচল মনে হয়। ফকির চরিত্র এ কাব্যের কোন প্রধান উদ্দিষ্ট বিষয় নয়। তাছাড়া ফকির সম্পর্কিত বক্তব্য এর চেয়ে যথেষ্ট সার্থক ভাবে ও সংক্ষেপে আলোচ্য কাব্যের স্বভাবছন্দেই বলা চলতে পারত বলে আমাদের ধারণা। তাতে কাব্যের সামগ্রিক উৎকর্ষ যথেষ্ট বাড়ত বই কমত না।

'সকিনা'য় কবি যে কাহিনী আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাতে কবির বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় রয়েছে বলে মনে হয়। পল্লীতে পল্লীতে সকিনার মত কত দুর্ভাগা নারীর জীবনেই তো এমন ট্র্যাজেডি ঘটে চলেছে কতকাল ধরে। ক'জনের খবরই বা আমরা রাখি। জসীমউদ্‌দীন ঔপন্যাসিকের বাস্তব নিষ্ঠা ও কবির সহানুভূতি দিয়ে এমন একটি অভাগী নারীর ট্র্যাজিডিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। একথা সত্য 'সকিনা'য় শেষ পর্যন্ত কবি অনেকটাই ভাবের আদর্শলোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন; তবু সকিনায় কবির বাস্তব জীবনদৃষ্টির তীক্ষ্মতা রীতিমত প্রশংসার দাবী রাখে; আদিল ও সকিনা, জসীমউদ্‌দীনের হাতে আদর্শের অনুরঞ্জন সত্ত্বেও, রক্তমাংসের মানুষ হিসেবেই ফুটে উঠেছে। কবি তাদের চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন, তাই তাদের বাস্তবতা দান করেছে অনেকটা। তিনু ফকিরের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কবি একদিকে সকিনার মতো পল্লীনারীদের ব্যথাকে ভাষা দিয়ে যেমন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, অপরদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত আর্তমানবের দুঃখ-বেদনাকে ভাষা দিয়ে পবিত্র সামাজিক কর্তব্য পালন করেছেন। এ কাব্যগ্রন্থ হয়তো 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' বা 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র পূর্ণ গৌরব দাবি করতে পারে না; তবে এতে ঐ সব কাব্যের যে অনেকটা রক্ষিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সকিনার কবি স্বাভাবিক ভাবেই জীবন-দৃষ্টিতে প্রাগ্রসর মনের পরিচয় দিয়েছেন। সকিনার চরিত্র পরিকল্পনায় যে সৎসাহসের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তা তাঁকে উচ্চস্তরের জীবন-শিল্পীর মর্যাদা দান করেছে। তিনি ঔপন্যাসিকের ন্যায়ই বিশ্লেষণী মন নিয়ে সকিনার কাহিনীকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে কাহিনীর উপসংহারে তিনি সকিনাকে যেভাবে প্রেমের তপস্বিনীতে পরিণত করেছেন এবং তার মুখে দিয়ে প্রেমের অমৃতলোকে পৌছার জন্য দুঃসহ ত্যাগ ও সাধনার সংকল্প গ্রহণের যে কথা বলেছেন তাতে সকিনা এক কল্পলোকবাসিনী নারী হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। বস্তুতঃ ঐখানে ঔপন্যাসিকের উপরে কবিই জয়ী হয়েছেন। তবু 'সকিনা'তে উপন্যাসের ধর্মই বেশী লক্ষ্য করা যায়। আদিল ও সকিনার প্রেমের উন্মেষ বিকাশ ও পরিণতি চিত্রণে জসীমউদ্‌দীন যে সূক্ষ্ম চারিত্রিক অন্তর্দৃষ্টি ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তা কেবল ঔপন্যাসিকের পক্ষেই সম্ভব। 'সকিনা'তে নর-নারীর হৃদয়াবেগের প্রকাশের ক্ষেত্রে অকৃত্রিম কবিত্বের স্পর্শও একেবারে দুর্লভ নয়। তবে সকিনার জীবন জটিলতা, আদিলের প্রাথমিক দুর্বার প্রেমাবেগ ও পরবর্তী পর্যায়ের দুঃসহ অন্তর্দ্বন্দ্ব কবিতার চেয়ে ঔপন্যাসেরই বেশী উপযোগী বিষয়। কবি এ জটিল কাহিনীকে কাব্যরূপ দিতে গিয়ে স্বভাবতই বাধাগ্রস্ত হয়েছেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি যে তাতে অনেকটাই সার্থক হয়েছেন তা আমরা স্বীকার করি। এ কাব্যগ্রন্থের ভাষা ও ছন্দ সর্বত্র বিষয়ের উপযোগী না হলেও তাতে জসীমউদ্‌দীন মাঝে মাঝে নক্‌সী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাটের গৌরব কিছুটা সঞ্চার করতে পেরেছেন বললে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না। মোট কথা পরিণত বয়সেও জসীমউদ্‌দীন প্রমাণ করে দিয়েছেন, তিনি এখনও 'পল্লীকবি' হিসাবে নিঃশেষিত হয়ে যান নি।

'মা যে জননী কান্দে'

'মা যে জননী কান্দে' কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। 'সকিনা'র পর 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যের প্রকাশ কাহিনী-কাব্যের রাজ্যে কবির প্রত্যাবর্তনকে এক প্রকার নিশ্চিতি দান করেছে। আলোচ্য কাব্যে 'সকিনা'র রূপ ও রীতির অনুবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও, এটি নিছক 'সকিনা'র অনুকরণ বা অনুসরণ নয়। 'মা যে জননী কান্দে, কাব্যটির শিল্পসার্থকতা যেমনই হোক না কেন এ কাব্যে কবির জীবন-দৃষ্টি অন্যান্য কাহিনী-কাব্যের থেকে কিছুটা স্বাতন্ত্র অর্জন করেছে। 'সকিনা'য় কবি মূলতঃ 'নকসী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্য দুইটির জের টেনে পল্লী নর-নারীর প্রেমবৃত্তাশ্রয়ী জীবনকেই ধ্যান করেছেন। সমাজ-পারিপার্শ্ব ও বাস্তব-জীবন এসব কাব্যে কম বেশী সক্রিয় ভাবে উপস্থিত থাকলেও, কোথাও বিশেষ আধিপত্য স্থাপন করতে পারে নি। অন্য কথায়, এ সব কাব্যে বাস্তব-সমাজের কলকোলাহলকে ছাপিয়ে বেজে উঠেছে প্রেমের সুর। কোন জীবন জটিলতার কন্টক প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে সে প্রেমের ছন্দে বাঁধা জীবনকে বেসুরো ঠেকতে দেয় নি। প্রেম-ভাবনার প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য এবং ব্যক্তি ও পারিপার্শ্ব ভেদে তারতম্য সত্ত্বেও 'নকসী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ও 'সকিনা' কাব্যত্রয়ে কবি ঐ একই প্রেমগীতিহার রচনা করেছেন। 'রাখালিয়া বাঁশীর' সুরে প্রেমগীতিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন দিক্ দিগন্তে। 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যে সে সুরে ছেদ পড়েছে লক্ষ্য করছি। এই কাব্যে কবি জটিল জীবনারণ্যচারী হয়ে দেখা দিয়েছেন। প্রেম সেখানে জীবনের অরণ্যপথে নানা সমস্যার আবর্তে হারিয়ে গিয়ে অলক্ষ্যে জীবন-জটিলতা বৃদ্ধিতেই সাহায্য করেছে। ভাবুকের হৃদয় দিয়ে নয়, বাস্তববাদীর সদাজাগ্রত অনুসন্ধানী দৃষ্টি ও সুতীক্ষ্ম বিশ্লেষণী মন নিয়েই এ জীবন-জটিলতার রহস্য অনুধাবন করা সম্ভব। কবির ভাবের পথে নয়, ঔপন্যাসিকের তথ্যনিষ্ঠ বিচার বিশ্লেষণের পথেই তাঁর শিল্পরূপ দান সম্ভব। কবি অবশ্য এখানেও 'নকসী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ও সকিনার ন্যায় পল্লীকাব্যের প্রকাশভঙ্গিকেই আশ্রয় করেছেন। কিন্তু 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যের উপজীব্য বিষয়ের জটিল প্রকৃতিই এর কাব্যিক সার্থকতার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'মা যে জননী কান্দে' কাব্যে কবি পল্লী নর-নারীর অভ্যস্ত প্রেমের রাজ্যে পদচারণা না করে নগর-উপান্তবাসিনী 'আমিনা' নাম্নী এক কুট্টির মেয়ের দুঃসাহসিক সমাজদ্রোহী প্রেম কি ভাবে সমাজশক্তির প্রচণ্ড আঘাতে কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো দুর্বার গতিতে অনিবার্য বিনাশের দিকে এগিয়ে গিয়েছে এবং লাঞ্ছিত প্রেম কেমন করে মাতৃত্বের স্নিগ্ধ দীপশিখা জ্বালিয়ে আপন পারিপার্শ্বের অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রাণপণ প্রয়াস পেয়ে শেষ পর্যন্ত ত্রূঢ় বাস্তবের তাড়নায় স্নেহের আধারকে অপরের হাতে তুলে দিয়ে চরম নিঃস্বতা অবলম্বন করেছে, তারই বিচিত্র জটিল অরণ্যপথে অগ্রসর হয়েছেন। 'আমিনা'র সমাজদ্রোহী নারীআত্মার করুণ প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাস রচনা করেছেন কবি সতেরটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যে। ঔপন্যাসিকের বাস্তববাদী ও তথ্যনিষ্ঠ মন নিয়ে কবি আমিনার কাহিনীকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়েছেন। কবি সংক্ষেপে আমিনার বাল্য-কৈশোর জীবনের কথা বলে যৌবন-সন্ধিক্ষণের অরুণাভাসে তাকে উপস্থিত করেছেন সর্বসমক্ষে। গরীব বাপ-মা ও পাড়া-প্রতিবেশীর শিরঃপীড়ার কারণ হল আমিনার রূপ-যৌবন। রূপ ও রূপার যোগসাজসে আমিনা বন্দী হল এক বৃদ্ধ জমিদারের অন্দর মহলে, অবশ্য সমাজের অনুগ্রহে তার ধর্মপত্নী রূপেই। আমিনার স্পর্ধিত যৌবন

জীবনের এ ফাঁকিটাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। যে সমাজ-বিধান তাকে এক বৃদ্ধের হাতে তুলে দিয়ে তাকে বঞ্চিত করেছে মাতৃত্বের স্বাভাবিক অধিকার থেকে, তাকে সে মেনে নিতে পারে না। লোকনিন্দা, সমাজ-শাসনের ভয়, সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে সে জমিদারের গাড়ীর 'ড্রাইভার' তরুণ যুবকের ইশারায় সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়ে পথে। আশ্রয় নেয় তারা বড় শহর কলকাতার বস্তী এলাকায়। প্রেমের উত্তাপে আমিনা ভুলে যায় অভাব-দারিদ্রের ব্যথা। স্বপ্ন দেখে শান্তির নীড় রচনার। অলক্ষ্যে এ সমাজগর্হিত প্রেমের নিধনযজ্ঞের যে আয়োজন চল্‌ছিল, আমিনা তার খবর রাখে নি বটে। কিন্তু তার নবীন প্রেমিকটি সে বিপদের অক্টোপাশের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টায় প্রথম সুযোগেই স্বার্থপরের ন্যায় গর্ভবতী আমিনাকে ফেলে পালিয়ে যায়। শুরু হল আমিনার সমাজদ্রোহী প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত। পিতৃগৃহে ঠাই মিল্‌ল না তার—ক্ষমাহীন আক্রোশে পিতা 'কুলটা' বলে গাল দিয়ে বের করে দেয় তাকে পথে। আশ্রয় সন্ধানে পথে পথে ফিরে অবশেষে আমিনা পেল এক বৃদ্ধ চাষীদম্পতির স্নেহাশ্রয়।

একদিকে বুড়ো-বুড়ীর অপার স্নেহ পেয়ে ও অপর দিকে আপন মাতৃসত্তার অমৃত উৎসারে আমিনা কিছুকালের জন্যে বিশ্বাস ফিরে পায় জীবনে। স্বামী ত্যাগের কলংক সন্তান স্নেহের ফুলের মালা হয়ে তার সকল বুক জুড়ে রইল। কিন্তু 'আমিনা'র জন্যে অপেক্ষা করছিল এক ভয়াবহ করুণ শাস্তি। দুর্ভিক্ষের করাল হস্ত নির্মমভাবে ভেঙে দিল আমিনার এ সুখাশ্রয়। সর্বরিক্ত চাষী পিতা-মাতার হাত ধরে সন্তান কোলে 'আমিনা' বেরিয়ে পড়ে নগরের পথে দুমুঠো খেয়ে বাঁচান সুযোগ পাওয়ার আশায়। দুর্ভিক্ষের ক্রূঢ় ছোবলে শীঘ্রই ঢলে পড়ে তার আশ্রয়দাতা পিতা- মাতা। ভীতা পক্ষী-মাতার ন্যায় সন্তানকে ডানার আড়াল রচনা করে বাঁচানোর চেষ্টা চালায় সে। সন্তানকে দুর্ভিক্ষের মৃত্যুছোবল থেকে বাঁচানোর জন্যে চলে মরণপণ সংগ্রাম। সে সংগ্রামে নিঃশেষিত শক্তি আমিনা অবশেষে উপায় না দেখে সন্তানকে তুলে দেয় এক মিশনারী সাহেবের হাতে চিরজন্মের তরে পর করে দিয়ে। যে শিশুর জন্যে সে চরমতম কলংককে গলার মালা করে নিয়েছিল, শত দুঃখ লাঞ্ছনাকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ার শক্তি পেয়েছিল, তাকে কিনা নিষ্ঠুর জীবন-বাস্তবের রূঢ় পরিহাসে তুলে দিতে হল অপরের হাতে সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে। এ আঘাত সহ্য করতে সে পারে নি, উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল।

'আমিনা'র এ মহাদুঃখকর হৃদয়হরনকারী অথচ অতি জীবনঘনিষ্ঠ, রূঢ় বাস্তব বিড়ম্বিত জীবন-কাহিনী কবি 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যে বর্ণনা করেছেন, বড় দরদ দিয়ে, বড় করুণা দিয়ে। এ কাহিনী নিয়ে ভাবালুতা প্রকাশের অবকাশ কোথায়? জসীমউদ্‌দীন জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্রেরই ন্যায় দুর্লভ হৃদয়বোধের পরিচয় দিয়ে, সুগভীর সহানুভূতি সহকারে 'আমিনার' জীবনকে নারীর প্রতি আমাদের মূঢ় সমাজের হৃদয়হীন আচরণের একটা প্রতিবাদ হিসেবেই যেন উপস্থিত করেছেন। সমাজ-বিধানকে অমান্য করার দুঃসাহস দেখিয়ে আমিনা যে লাঞ্ছনা ডেকে এনেছিল নিজের জীবনে, তার জন্যে সেই কি শুধু দায়ী? সমাজের কি এ ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেই? ঐ হৃদয়হীন সমাজ তাকে বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক এক বৃদ্ধের হাতে তুলে দিয়ে তার অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়েছিল তা ঠিক, কিন্তু সাথে সাথে তার নারীত্বকে করেছিল চূড়ান্তরূপে অপমানিত, তাকে বঞ্চিত করেছিল নারীর স্বাভাবিক অধিকার মাতৃত্বের সার্থকতা অর্জনের পথ থেকে। আমিনা এ অবিচার, এ বঞ্চনাকে মেনে নিতে রাজি হয় নি, এ অপরাধটাই কি বড় হয়ে থাকবে? সে তো নারীত্বের স্বভাব-বিরোধী কোন কাজ করে নি। সমাজ তাকে মাতৃত্বের অধিকার দিতে চায় নি, আমিনা বিদ্রোহ করে সে অধিকার অর্জন

করেছে এবং আপন নিষ্ঠা ও ত্যাগ দিয়ে তাকে গৌরবমণ্ডিত করে তুলেছে। সমাজ গর্হিত আচরণের দোহাই দিয়ে আমিনার মাতৃত্বের এ সাধনাকে হেয় মনে করতে ইচ্ছে হয় কি? বরং আমিনার প্রতি সহানুভূতিতে আমাদের মন বিগলিতই হয়ে ওঠে। এখানেই জসীমউদ্‌দীন মহৎ শিল্পীর জীবন দৃষ্টির অধিকারী হয়েছেন।

আমরা স্পষ্টতঃই দেখতে পাচ্ছি 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যে কবি বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকের ন্যায়ই জীবন-জটিলতার জট মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন এবং প্রশ্ন উচ্চকিত মন নিয়ে প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। একটা স্বচ্ছ সমাজ-দৃষ্টি ও পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ দ্বারা তিনি চালিত হয়েছেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

কবিতাকারে লেখার চেয়ে গদ্যেই এ কাহিনীর প্রকাশ স্বাভাবিকতর ও সুন্দরতর হতে পারত, এ কথা বুঝেও কবি যে ঐ কবিতার পথেরই আশ্রয় নিয়েছেন, তা আমাদের মনে কিছুটা বিস্ময়ই জাগায় বটে। এককালে লোককাব্যের ঐতিহ্যানুসন্ধানে বেরিয়ে যে ছন্দে, যে ভঙ্গিতে তিনি 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্য লিখেছেন এবং অতি আধুনিককালেও 'সকিনা'য় তার জের টেনেছেন; আজ ভিন্নতর ক্ষেত্রে মানুষের জটিল জীবনাবর্তকে রূপায়নে তাগিদ বোধ করেও তিনি পুরাতন প্রকাশপথকেই আঁকড়ে রইলেন, এ কেমন অদ্ভুত যেন ঠেকে। এ পন্থা গ্রহণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে কবির মনেও যে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল, কাব্যটির মুখবন্ধের দীর্ঘ বক্তব্য থেকে তা বেশ বোঝা যায়। তবুও কবি সাহস করে নতুন পথে পা বাড়াতে পারেন নি। কাহিনীর রাজ্যে গদ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য লক্ষ্য করেও, কবি কেন কবিতাকারেই পুরানো অভ্যাসের জের টেনে কাহিনী পরিবেশন করেছেন, তার পক্ষে একটা জুতসই কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

গদ্যে কাহিনী লেখার রীতি সুপ্রচলিত এবং তাতে যথেষ্ট জনপ্রিয় রচনা যে সম্ভব হাতের কাছেই তার প্রমাণ রয়েছে জেনেও যে তিনি কবিতাকারে গল্প লেখার প্রয়াস পেলেন, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গদ্যের চেয়ে কবিতাকারে লেখার, তাঁর মতে, সুবিধার দিকটি তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, 'বর্তমান যুগের এক্সরে দৃষ্টির মত গদ্যের লেখক মানব-মনের যে সব অন্ধি সন্ধি খুঁটিয়ে বাহির করেন, কবিতা লেখকের সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাই। কিন্তু কবিতাকারে মানব মনের যে পেলবতা (delicacy) ও গভীর অনুভূতি প্রকাশ সম্ভব গদ্যে তা সম্ভব নয়। ...হয়ত গদ্য লেখকের মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক দৃষ্টি তাঁহার নাই, কিন্তু কবিদৃষ্টি লইয়া তিনি যাহা দেখেন গদ্য লেখকের দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়ে না।'[১]

তিনি অন্যত্র ভিন্নতর প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কবিতার ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে মানব মনের যে স্থানটি স্পর্শ করা যায় গদ্যে তাহা সম্ভবপর হয় না। গদ্যেরও ধ্বনি আছে; কিন্তু তাহা কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিতে পারে না।' অতএব তিনি কবিতাকেই শ্রেয়ঃ মনে করেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে কবি আরও কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করেছেন। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের লোকপ্রিয়তা দেখে কবির মনে হয়েছে আমাদের দেশে এখনও কবিতাকারে কাহিনী উপভোগ করার মত বহু পাঠক রয়েছেন। কবিতাকারে গল্প লেখার প্রয়াসের মূলে এ অভিজ্ঞতাও কবিকে যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছে। তারপর কবি আমাদের আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা ও সেই হেতু তার জনপ্রিয়তা হ্রাসের কথা উল্লেখ করে স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'কবিতাকে লোকপ্রিয় করিবার জন্য তাই গল্পকারে কবিতা লেখার প্রয়াস।' কবিতাকারে কাহিনী লেখার পক্ষে কবি প্রদত্ত এ সব

---

১. 'মা যে জননী কান্দে'—মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।

যুক্তির মূল্য যাই হোক না কেন এতে করে কবির মানস প্রবণতাটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। কাহিনীকাব্য লিখে কবিতাকে তিনি কতটা লোকপ্রিয় করতে পেরেছেন, সে প্রশ্ন না তুলেও আমরা স্বীকার করি যে, তিনি 'নকসী কাঁথার মাঠ' 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' এমন কি 'সকিনা'য় পল্লী নর-নারীর আশ্চর্য হৃদয়হারী প্রেমকাহিনী বর্ণনা করে আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিতে পেরেছিলেন। 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যেও তিনি ঐ পথে সার্থকতা খুঁজেছেন; কিন্তু সত্যের অনুরোধেই বলতে হয় সে সার্থকতা অর্জিত হয় নি। সহজ প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে উন্মেষিত সরল পল্লী নর-নারীর মৌল আবেগ ও অনুভূতিগুলোকে সহজ পল্লীর ভাষা ও সুরে রূপদান করা জসীমউদ্‌দীনের মত পল্লীপ্রাণ, লোকসাহিত্যের রসপুষ্ট কবির পক্ষে অনায়াস ছিল বলে 'নকসী কাঁথার মাঠ' 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' 'সকিনা' কাব্যের প্রেমগাঁথা রচনায় তাঁকে করেছিল বিপুল সার্থকতার অধিকারী। 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যে বর্ণিত আমিনার জীবন জটিলতার রূপায়নে কাব্যের ঐ সরল সোজা রাস্তাটা মানাবে কেন? আমিনা সরলা পল্লীবালা নয়। জীবনের বীপাকে পল্লীর ঘনিষ্ট আওতায় এলেও সে নগর প্রতিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাবপুষ্ট। তার মধ্যে পল্লীর নর-নারীর মৌল অনুভূতিগুলোর সহজ ও সরল অবস্থায় অবস্থান প্রায় অসম্ভব। স্বাভাবিক কারণেই তাঁকে আর একটি 'সাজু', আর একটি 'দুলি' বা 'সকিনার' পরিণত করা সম্ভব নয়।

'আমিনা' সমাজের যে স্তর থেকেই আসুক না কেন তার মধ্যে নাগরিক প্রতিবেশের জটিল জীবন ধারার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় অনিবার্যভাবেই ব্যক্তি-চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। আর তাই সে প্রশ্নহীন বিশ্বাসে সকল প্রাপ্তিকে সহজভাবে গ্রহণ করে তার জীবনকে সরল রেখায় প্রলম্বিত হতে দেয় নি। বৃদ্ধের সাথে নারীত্বের সার্থকতা বিরোধী অবাঞ্ছিত দাম্পত্য সম্পর্ক মানতে অস্বীকার করে সে যে মহাদুর্যোগ ডেকে এনেছিল জীবনে এবং তার সাথে সংগ্রাম করার যে ধৈর্য ও সাহস দেখিয়েছে, তা তাকে আধুনিক কালের আত্মবোধদীপ্তা নারীর পর্যায়েই উন্নীত করেছে। এ চরিত্রকে ধারণা করার ক্ষমতা পল্লীকাব্যের সরল কাঠামোর পক্ষে সম্ভব হবে কি করে? কবি অবশ্যই সে চেষ্টাই পেয়েছেন তাতে ফল সন্তোষজনক হয় নি। যে কোন মনোযোগী পাঠকই লক্ষ্য করবেন কবিত্ব এ কাব্যের বহু জায়গায় মুখ থুবরে পড়ে গেছে; যার যথার্থ প্রকাশ গদ্য লেখকের আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণী দৃষ্টির অপেক্ষা রাখে, তাকে কবি এক প্রকার জোর করে পদ্যের কাঠামোতে পুরে কাব্য বলে চালানোর প্রয়াস পেয়েছেন। এর ফলে কাব্যাকারে লিখিত এ কাহিনীতে সত্যিকার কাব্য-মাধুর্য তেমন সঞ্চারিত হয় নি। অবশ্য 'নকসী কাঁথার মাঠ' 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ও 'সকিনা'র রচনারীতির অনুবর্তন প্রচেষ্টা সর্বত্র ব্যর্থ হয় নি; কোথাও কোথাও ঐ সব কাব্যের ভাবাবহের সার্থক প্রতিধ্বনিও লক্ষ্য করা যায়। তবু সামগ্রিক বিচারে 'মা যে জননী কান্দে'র কাব্যিক সার্থকতা খুবই অল্প হয়েছে। এ কাব্যের মুখবন্ধে গ্রাম্যগাথা কবিতার ছন্দ প্রয়োগ করে এ পুস্তককে লোকপ্রিয় ও 'এক দল পাঠকের নিকটতম' করার প্রয়াসের ঘোষণা কবির প্রাগ্রসর জীবনাভিজ্ঞতার স্বরূপ অনুধাবনে অসামর্থেরই ইঙ্গিত বহন করে।

'মা যে জননী কান্দে'র পক্ষে কোন কাব্যিক সার্থকতার দাবি অবশ্য কবিও উত্থাপন করেন নি। 'আমিনা'র জটিল জীবনকাহিনীকে কাব্যরূপ দিতে গিয়ে ব্যর্থতা ভরে দ্বিধাগ্রস্ত কবি যে ভাবে মুখবন্ধে পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন, তা কবির প্রতি আমাদের অনেকটা করুণারই উদ্রেক করে। কবি বলেছেন, "ইহা কাহিনী কাব্য, ইহার প্রত্যেক লাইনে কেহ যেন কবিত্ব আশা না করেন। এই কাব্যে বর্ণিত চরিত্রগুলি যদি জীবন্ত

হইয়া পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে তবেই বুঝিব আমার লেখা সার্থক হইয়াছে।" সত্যি কথা বলতে কি, 'আমিনা' ও এ কাব্যের অন্যান্য চরিত্র বাস্তবানুগামী বলেই কম বেশী সজীব। কিন্তু কবির অনুরোধ মত লাইনে লাইনে কবিত্বের আশা না করেও, এর সামগ্রিক কাব্যিক সার্থকতা সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশে কোন কারণ দেখিনে। এ কাব্যের 'মা যে জননী কান্দে' নামকরণটিও খুব সুখকর মনে হয় না। আমিনার মাতৃহৃদয়ের দুঃসহ ব্যথা কাব্যের শেষ দিকে উন্মত্ত কান্নায় ফেটে পড়লেও এ শুধু এক অভাগী, দৈবাহত সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন জননীর করুণ ব্যথার গীতিকাব্য নয়। এ কাব্য সমাজ-শক্তি ও দৈব নিপীড়িত আমিনা নাম্নী একটি নারীর সংগ্রামমুখর জীবনের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের অশ্রুঘন করুণ কাহিনী। আমিনার ট্র্যাজিক কাহিনী সম্বলিত কাব্যটির নাম 'আমিনা' রাখলেই যথার্থ হতো বলে আমাদের ধারণা।

'মা যে জননী কান্দে' কাব্যটির শিল্পমূল্য যেমনই হোক, এর কাহিনীর মানবিক আবেদন কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। সমাজ-কলঙ্কিতা এক নারীর ব্যর্থ জীবন মাতৃত্বের গৌরবে যে মহিমা লাভ করেছে, তা বর্ণনে জসীমউদ্‌দীন যথার্থ শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছেন। আমিনাকে কবি সামাজিক নীতিবাগীশের দৃষ্টিতে দেখেন নি, দেখেছিলেন একজন জীবনদরদী শিল্পীর চোখে। তাই আমিনার চারিত্রিক স্খলন সত্ত্বেও তার মধ্যে মাতৃত্বের মহিমায় উজ্জ্বল বহ্নিশিখা রূপিনী নারীকে আবিষ্কার করতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। আমিনার দুর্ভাগ্যজনক জীবনকাহিনী উপস্থাপনায় জসীমউদ্‌দীন ঔপন্যাসিকের বাস্তব-দৃষ্টির সঙ্গে কবিসুলভ হৃদয়বোধের পরিচয় দিয়েছেন। তথাপি আমিনার উপন্যাসধর্মী জটিল জীবনধারার কাব্যরূপ দানে কবি তেমন সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি, বলতেই হয়। প্রেমভাবাশ্রয়ী জীবনের কাব্যিক রূপ দানে অন্যত্র কবি যে সহজ সার্থকতা লাভ করেছেন, এখানে উপজীব্য বিষয়ের জটিল প্রকৃতিই তার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতানুগতিক ছন্দোভঙ্গি ও বহু ব্যবহৃত শব্দ ও উপমার সমবায়ে নির্মিত এ জীবনচিত্র (কাহিনীটির মানবিক আবেদন ছাড়া) আমাদের তেমন কোন আকর্ষণ জাগায় না। এ কথা সত্য এ কাব্যেও তিনি পল্লীকাব্যের উপাদান কাজে লাগিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাম্য ছন্দোভঙ্গি আশ্রয় করে পল্লীকাব্যের একটা আমেজও সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে কাব্যদেহে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতে তেমন কোন সুষমই তিনি সঞ্চার করতে পারেন নি। ঘূর্ণি-বিধ্বস্ত প্রকৃতির ন্যায়ই আমিনার বিপর্যস্ত জীবনের কথা, কাব্যের চেয়ে উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরেই বেশী সার্থক ভাবে বলা সম্ভব। ভাব নয়, ভাবনাই আমিনার রাহুগ্রস্ত জীবনের তাৎপর্য অনুধাবনের জন্যে প্রয়োজন ছিল। কবি তা জেনেশুনেও যে কাব্যের পথ ধরেছেন, তার পক্ষে তিনি যে কৈফিয়তই দিন না কেন, সে পথে খুব বেশী সার্থকতা দেখা দেয় নি। তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তবে জসীমউদ্‌দীনের পক্ষে একটা কথা বলা যেতে পারে যে, তিনি পরিণত বয়সেও অবলীলাক্রমে পদ্যে কাহিনী গাঁথবার সহজাত নৈপুণ্যের অধিকারী। সকল জটিলতা পরিহার করে, সহজ ভাষায়, তিনি জীবনের কথা বলবার ক্ষমতা রাখেন। 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যের জটিল জীবন-কাহিনী সহজ ভাষায় ও ছন্দে রূপায়িত করে কবি সাধারণ পাঠকের রুচিকে যে অনেকটা তৃপ্তি দিতে পেরেছেন এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হয়। সাথে সাথে এ কথাও স্বীকার করতে হয়, এ কাব্যে তিনি কিছুটা স্বমহিমাচ্যুত।

হলুদ বরণী

'মা যে জননী কান্দে' কাব্যের তিন বছর পরে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 'হলুদ বরণী'র কবিতাগুচ্ছের মধ্য দিয়ে জসীমউদদীন আবার ফিরে গেলেন 'বালুচর' 'রূপবতী' এবং অংশত, 'ধান-খেত' কাব্যের অনেক পেছনে ফেলে আসা সৌন্দর্য ও প্রেমভাবনার জগতে। 'মাটির কান্না'র পর 'সকিনা' ও 'মা যে জননী কান্দে' নামক দুইটি কাব্যকাহিনীর ক্রমিক প্রকাশ দেখে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে দীর্ঘ কাব্যযাত্রার শেষে কবি বোধহয় পল্লীগাথার রাজ্যেই স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু আমাদের সে ধারণা যে যথার্থ ছিল না, তার প্রমাণ পেলাম 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যের পরে পরেই কবির রবীন্দ্র নজরুলানুসারী রোমান্টিক কবিদের ন্যায় প্রেম ও সৌন্দর্য-ভাবনার জগতে নতুন করে অভিসারের প্রচেষ্টায়। বস্তুতঃ 'হলুদ বরণী' কাব্যে কবি রোমান্টিক সৌন্দর্য ও প্রেমভাবনার পুরাতন জগতেই প্রত্যাবর্তন করেছেন। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও কবির চিন্তা-চেতনায় তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয় নি। একজন নিষ্ঠাবান কবি-কর্মীর পক্ষে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গৌরবের নয়। অথচ 'হলুদ বরণী' কাব্যে তাই ঘটেছে। কবি এখানে শুধু কবিতার ভাব ও আঙ্গিকেরই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে ক্ষান্ত হন নি, কবিতার বিষয়বস্তু, নামকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও পুরাতনের চূড়ান্ত অনুবৃত্তি ঘটিয়ে আপন কবিসত্তার বন্ধ্যাত্বকে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

'হলুদ বরণী' তাই জসীমউদদীনের কাব্যসাধনার ধারাবাহিকতা ও শিল্পীসত্তার বিবর্তনের ইতিহাসে কিছুটা গুরুত্ব দাবি করতে পারলেও, শিল্পসৃষ্টি হিসেবে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তু। লক্ষ্য করার বিষয়, রোমান্টিক প্রেম ও সৌন্দর্য ভাবনাশ্রয়ী এ কাব্য 'বালুচর' 'রূপবতী' ইত্যাদি থেকে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে রচিত হলেও, এর পশ্চাৎপটেও লোকজীবনের দীর্ঘায়িত ছায়া দেখতে পাই, অথচ কালধর্মে নাগরিক জীবনের যে প্রতিভাস এতে স্বাভাবিকভাবে ঘটতে পারত, তা ঘটে নি। মোট কথা 'হলুদ বরণী' জসীমউদদীনের কবিকৃতির পক্ষে নতুন কোন দাবি নিয়ে উপস্থিত নয়। কবি এখানে নিতান্ত পরিশ্রান্ত, অবসাদগ্রস্ত লোকের ন্যায় অভ্যাসের বসে কোনক্রমে পুরাতনের জের টেনে চলেছেন। আশ্চর্যের বিষয় কবি কোথাও এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, এমন আভাস কাব্যের কোথাও পাওয়া যায় না। তবে একথা স্বীকার্য, আলোচ্য কাব্যেও পদ্য রচনায় কবির সহজ পটুত্বের পরিচয় যেমন অক্ষুণ্ন রয়েছে, তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে পল্লী পারিপার্শ্বিকের বর্ণনায়ও ঐ পারিপার্শ্বিক থেকে গৃহীত উপমা, রূপকল্প ইত্যাদি প্রয়োগে কবির স্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয় বিধৃত রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলতে হয়, এ কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ, উপমা, রূপকল্প ইত্যাদি বহু-ব্যবহারে প্রায়শঃই ম্লান ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। 'হলুদ বরণীর রূপপ্রতিমা তাই কাব্য পাঠকের মনকে তেমন নাড়া দেয় না।

'হলুদ বরণী' কাব্যে সংকলিত কবিতার সংখ্যা সূচীপত্র দৃষ্টে পঁয়তাল্লিশ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সংকলিত কবিতার সংখ্যা হচ্ছে চুয়াল্লিশ। কারণ এ কাব্যে সংকলিত 'কথা' ও 'অমরতা' শীর্ষক দুটি কবিতা প্রকৃতপক্ষে একই কবিতার পংক্তিবিন্যাসের হেরফেরে সৃষ্ট দুটি রূপ। এছাড়া 'বালুচর' কাব্যের 'সফল সন্ধ্যা' কবিতাটিকে এ কাব্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছে নিতান্ত অনবধানতাবশতঃ। 'হলুদ বরণী'তে সংকলিত নতুন কবিতার সংখ্যা তাই তেতাল্লিশটি। আমরা ঐ তেতাল্লিশটি কবিতার কথাই সংক্ষেপে আলোচনা করব। আমরা আগেই বলেছি, 'হলুদ বরণী' কাব্যে কবি 'বালুচর ও' রূপবতী' কাব্যের সৌন্দর্য ও প্রেম ভাবনার জের টেনেছেন। এই পূর্বানুবৃত্তির প্রয়াস শুধু কবিতার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকেই নয়,

কবিতার নামকরণেও বহু ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'হলুদ বরণী'র 'হাসি', 'প্রতিদান', 'সফল সন্ধ্যা' আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বালুচরের ঐ নামের কবিতাগুলোর কথা। আবার 'হলুদ বরণী', 'অনুরোধ', 'উপহার', 'সুন্দর', 'শ্যামলী' ইত্যাদি কবিতার নাম স্বতঃই আমাদের মনে রূপবতী কাব্যের প্রায় ঐ একই ধরনের নামের কবিতাগুলোর স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। আবার হলুদ বরণীর অনেক কবিতায় 'বালুচর' ও রূপবতী' কাব্যের অনেক কবিতার ভাবনার স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। হলুদ বরণীর কবিতাগুলো তাই আমাদের মনে নতুন কোন কৌতূহল সৃষ্টি করে না।

'হলুদ বরণীতে' সংকলিত কবিতার অধিকাংশই সৌন্দর্য ভাবনামূলক; গুটি কয়েক কবিতায় প্রেম ও যৌবন-ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। বলা বাহুল্য সৌন্দর্য ভাবনামূলক কবিতার উদ্দীপন ভাব জুগিয়েছে নারীর কৈশোর ও যৌবন সন্ধিক্ষণের চিরচঞ্চল রূপমাধুরী। প্রায়শঃই কবি পল্লীপার্শ্বিকে স্থাপক করে নারীর এ রূপ-প্রতিমার আরতি করেছেন। হলুদ বরণী কাব্যে নারীর সৌন্দর্য বর্ণনায় মাঝে মাঝে ইন্দ্রিয়ঘনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে প্রকাশ তেমন কাব্যমাধুর্যপূর্ণ হয় নি বলেই, তেমন করে আমাদের আকর্ষণ করে না। উপমা, শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে গতানুগতিকতা আমাদের রুচিকে পীড়িত করে। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে জসীমউদদীন পল্লীগীতি গাথা রূপকথার স্বভাবের রাজ্য থেকে উপমা, শব্দ চয়ন করে পুরাতন কাব্য মাধুর্যের স্বাদ এনে দিয়েছেন, তাতে আমরা বেশ একটা আশ্বস্ত বোধ করি না। 'হলুদ বরণী'র প্রেমের কবিতা সম্পর্কেও আমাদের একই কথা। এতে বালুচরের প্রেমভাবনারই জের চলেছে; উপলব্ধির কোন নতুনতর সমৃদ্ধির লক্ষণ তাতে দেখা দেয় নি।

এবার আমরা হলুদ বরণী কাব্যের কবিতাগুলোর ভাববস্তু সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে এ কাব্য প্রসঙ্গে উপসংহার টানব। নাম-কবিতা 'হলুদ বরণী' গৃহকর্মরতা পল্লীনারীর রূপারতি মাত্র। এতে নারীর গার্হস্থ্য রূপটিই ফুটে উঠেছে। কবিতাটিতে কোন অপার্থিবতার ব্যঞ্জনা নেই বরং লক্ষ্য করার বিষয় কবি পল্লী নারীর দেহ-সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে কিছুটা কামনার কন্টক খোঁচা অনুভব করেছেন।

দ্বিতীয় কবিতা 'কৈশোর যৌবন দুহু মেলি গেল' বৈষ্ণবীয় নামাবলী ধারণ করলেও এতে কৈশোর ও যৌবন সন্ধিক্ষণের নারীরূপের এক অপার্থিব ব্যঞ্জনাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি এখানে নারীর দেহের 'দেবালয়ে' রূপের পূজারী রূপেই যেন আত্মপ্রকাশ করেছেন। এতদসত্ত্বেও এ কবিতায় কবি কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত প্রসারিত নারীর দেহ-সৌন্দর্যের তরঙ্গ-দোলা এবং মানব মনে তার প্রভাবের কথা বাস্তব-দৃষ্টি সহকারে বর্ণনা করেছেন। পার্থিব নারীরূপের অপার্থিব ব্যঞ্জনার আভাস সমৃদ্ধ এ কবিতায় 'ধানক্ষেত' কাব্যের 'ফুলের পূজারী' কবিতারই ছায়াপাত যেন লক্ষ্য করা যায়। 'সীবনরতা' কবিতায় ঐ একই নারীর সৌন্দর্যের রূপারতি করা হয়েছে একটু ভিন্নতর আধারে। বাস্তব গার্হস্থ্য পারিপার্শ্বিকে স্থাপিত নারী-প্রতিমা এখানে ও কবির মুগ্ধ দৃষ্টিতে অপরূপ বলে প্রতিভাত হয়েছে।

'বউ' কবিতায় লাজনম্রা কিশোরী পল্লীবধূর মমতা মাখানো রূপের প্রসস্তি রচিত হয়েছে। কবিতাটিতে রূপমুগ্ধ অথচ স্নেহস্নিগ্ধ কবিচিত্তের এক সহজ প্রকাশ ঘটেছে। 'লুবান কন্যা' কবিতায় সমগ্র পল্লীপারিপার্শ্বিকে বিধৃত পল্লীবালার 'শ্রম সৌন্দর্য সুষমার এক সঞ্জরণশীল রূপের আভাস দেওয়া হয়েছে। এ কবিতায় রূপকথার জগতের মৃদু বায়ু হিল্লোলে পল্লী পারিপার্শ্বিক যেন আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'কথা' কবিতাটিতে নারীরূপ বিহ্বল কবিচিত্তের একটি গীতিসুরই যেন সুঞ্জরিত হয়েছে। নারী হয়তো জানে না তার রূপের প্রভাব মনুষ্যচিত্তে কত সুকুমার কল্পনা, আবেগ ও

অনুভূতির সৃষ্টি করে। সে সব ক্ষণস্থায়ী হলেও কথার মধ্য দিয়েই অমরত্ব লাভ করে।

'অমরতা' কবিতায় ঐ একই বক্তব্য রাখা হয়েছে বলাই বাহুল্য। কারণ আমরা আগেই দেখিয়েছি পংক্তি বিন্যাসের ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য ও দু এক ক্ষেত্রে আলাদা কাব্যপংক্তির সন্নিবেশের কথা বাদ দিলে, দুটি কবিতা প্রকৃতপক্ষে একটি কবিতার দুই প্রতিরূপ মাত্র।

'স্বপনে' কবিতায় মূলতঃ কবির যৌবনস্বপ্নেরই প্রকাশ ঘটেছে। রোমান্টিক কবি এখানে তাঁর স্বপ্নালোকবাসিনীকে প্রত্যক্ষ করেছেন 'সন্ধ্যা মেঘের' আলো আঁধারির বুকে, বিজলী আলোর আভাসে চকিত চমকে। তবে তার 'শাড়ীতে জড়ান রূপের লাবণী তাকে মর্তের বুকে নামিয়ে এনেছে অনেকটা।

'একটি মেয়ে' কবিতায় কবি একটি কালো মেয়ের প্রীতি-স্নিগ্ধ রূপের কথা সহজ ভাষায় বলেছেন। বলাবাহুল্য 'সবুজ সুষমা' ছড়ান পল্লীবালার রূপচ্ছায়াই যেন এখানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

"বিপরীত, কবিতায় নারীর আপাত বিপরীতধর্মী আচরণের উল্লেখ করে কবি তার চরিত্রের রহস্যময়তার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সংসারে প্রেম-ভি ারী মানুষ নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করে স্বর্গ-মর্ত্যের যাবতীয় "সুষমা" অথচ নারী নিজে সে সবের সংবাদ রাখে বলে মনে হয় না। সে মর্তের মানবী, তাই জীবনের বাস্তব দিগন্তে সে মর্ত্য জীবনের সকল সীমাবদ্ধতা নিয়েই আবির্ভূত। নারীর এই আপাত বৈপরীত্যধর্মী অথচ সত্যরূপেরই ইঙ্গিত কবিতাটিতে ধরা দিয়েছে।

'ওগো বর শোন শোন' কবিতাটি সদ্য বিবাহিত এক তরুণ দম্পতির প্রতি শুভকামনা রূপে উৎসারিত হয়েছে। বরকে উদ্দেশ্য করে যা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য এই যে, যে বালিকা তার জীবনসঙ্গিনী হয়ে দেখা দিয়েছে তাকে নিয়ে এক প্রেমের অমরাবতী সৃজন করে সে যেন চির সুখী হয়।

'কথা কও' কবিতায় প্রেমার্ত কবিচিত্তের এক অতৃপ্তির সুর ফুটে উঠেছে। প্রিয়ার রূপ দেখে কবির জীবনের অনেক দিন কেটেছে। রূপের মোহ এখন অপগত। এবার কবি প্রিয়ার বুকের লুকানো কথা শুনতে চান, হোক না তা মধুময়, হোক না বিষময়। কবি নিজের কথা এখন বলতে চান না, চান শুধু প্রিয়মুখের কথা শুনতে। তাই বারবার প্রিয়াকে আহ্বান করছেন কথা বলতে।

'হাসি' কবিতায় রোমান্টিক কবি প্রিয়ামুখের রাঙা হাসির অপরূপ মাধুর্যে বিহ্বল হয়ে এক আশ্চর্য প্রেমব্যাকুলতা অনুভব করেছেন। শিবের তপস্যা তুষ্ট পার্বতীর মুখের হাসির ন্যায় প্রিয়ামুখের হাসি কবিকে বিশ্বের সকল প্রেম-পাগলদের মতই আত্মহারা করে তুলেছে। তাই তো তাঁর সাধ জাগে 'শিরীর কবরে ফরহাদের ন্যায় জেগে থাকার' নিজেকে মনে হয় কস্তুরীমৃগের মত আপন সুগন্ধে মত্ত।

'নব পরিণীতা' 'কবিতায় কবি' প্রীতিস্নিগ্ধ কৌতুকরস সিক্ত ভাষায় সদ্য বিবাহিতা সদ্য যৌবনপ্রাপ্তা তাঁর শ্যালিকার বিবাহিত জীবনের প্রেমের ছোঁয়া লাগা প্রথম দিনগুলোর একটি মাধুর্যের ছবি তুলে ধরেছেন।

'অনুরোধ' কবিতায় কবি প্রিয়ার অধরে ও কণ্ঠে চরাচরের যাবতীয় রঙ ও সুরের মাধুর্য প্রত্যক্ষ করার বাসনা প্রকাশ করে শেষ পর্যন্ত প্রিয়ার সহযোগিতায় গড়ে তোলা এক স্নেহনীড়ে মহাশান্তি লাভের কামনা ব্যক্ত করেছেন। প্রিয়ার প্রতি তাঁর অনুরোধ সে যেন স্নেহ-মমতার হস্ত প্রসারিত করে কবির কামনাকে সার্থক করে তুলতে এগিয়ে আসে।

'বাসনা' কবিতায় একটি নিতান্ত সুন্দর মানবিক কামনা ব্যক্ত হয়েছে। স্নেহ-ভালাবাসা

নিষিক্ত ক্ষুদ্র গৃহকোণের মানবী রূপিণী প্রেম-প্রদীপটিই যে কবির কামনার ধন, তা বুঝতে কারোই কষ্ট হয় না। স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত এ ছোট্ট কবিতাটি 'হলুদ বরণী' কাব্যের একটি উজ্জ্বল কবিতাকণ্ঠ। জসীমউদ্‌দীন এখানে ভাষা ছন্দ সব দিকেই স্বচ্ছন্দ।

'মিনতি' কবিতায় একটু ভিন্নতরভাবে পূর্বতন কবিতারই ভাবের অনুবৃত্তি ঘটেছে। জীবনের অভিজ্ঞতায় কবি বুঝেছেন মানুষের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সম্ভব নয় ; অতৃপ্তি সব সময়ই তাকে ঘিরে আছে। কবি তাই আজ সামান্যতেই পরিতৃপ্তি খুঁজছেন। প্রিয়ার কাছে আজ তাঁর কাম্য শুধু এতটুকু হাসি, এতটুকু ছোট্ট গান, এক ফোঁটা জল, একটু আলো, আর কিছুই নয়।

'উপহার' কবিতায় নারীর সর্বাতিশায়ী রূপেরই আরতি করা হয়েছে সহজ পল্লী পারিপার্শ্বিকে স্থাপন করে। নারী এখানে অধরা স্বপ্নলোকবাসিনী এক সত্তা রূপেই যেন প্রতিভাসিত হয়েছে। কবি জানেন, কথার কুসুমে তার মূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা বৃথা যেতে বাধ্য। তবু উপায়ন্তর নেই বলে কবি তাকে কথার উপহারেই তুষ্ট করার প্রয়াস পাচ্ছেন।

'হলুদ বরণী'তে এমনি করেই কবি প্রায় একই সঙ্গে সৌন্দর্য ও প্রেমের রূপারতি করে চলেছেন। 'প্রতিদান' ও 'দান' দুটি কবিতায় কবির প্রেমাকুল চিত্তের রূপটি অনেকটাই যেন আত্মনিবেদিত। 'প্রতিদান' কবিতায় কবি বলছেন প্রিয়ার কাছ থেকে পাওয়া এতটুকু হাসি, এতটুকু স্নেহধারাই তাঁকে একেবারে পূর্ণ করে রেখেছে। এর বেশি পেলে তাঁর পক্ষে ধারণ করাই সম্ভব হত না। কবি এর প্রতিদানে কিইবা দিতে পারেন। তিনি রাত জেগে 'চাঁদের সূতোয়' তারই জন্যে শাড়ী বুনে চল্‌ছেন। ঐ শাড়ী তাকে পরিয়ে দিয়েই তিনি তৃপ্তি পেতে চান।

'দান' কবিতায় কবি বলতে চান ভালবেসে প্রিয়ার জন্য জীবনের সব সাধ, আহলাদ, আরাম আয়াস বিসর্জন দিয়ে যে দুঃখ দহনের সহন সুখ তাই তিনি মাথা পেতে নিয়েছেন।

'একাকিয়া' কবিতায় বর্ষপ্রকৃতির পটভূমিতে নির্জন পল্লীপথে সঞ্চরণরত পল্লীবালিকাকে অভিসারিকা রাধার প্রতিরূপ কল্পনা করে কবি এক ধরনের রোমান্টিক স্বপ্ন বিলাসিতায় মেতে উঠেছেন। 'যাবি তুই উড়ে' কবিতাটির সুর এ কাব্যের অন্যান্য কবিতার থেকে একটু আলাদা। অনির্দেশ্য দিগন্তের উদ্দেশ্যে উড়ে চলার ইঙ্গিতে মনে হয় এখানে মৃত্যুচিন্তার ছায়াপাত ঘটেছে। 'ক্ষণিকা' ও 'বাসে' কবিতায় দুই ভিন্ন পারিপার্শ্বিকে নারী-সৌন্দর্যের ক্ষণ উদ্ভাসনের স্মৃতিকে নিত্যকালীন রূপ দানের চেষ্টা হয়েছে।

'রাতের রজনীগন্ধা' কবিতাটি রচিত হয়েছিল যুগোশ্লাভিয়া সফরকালে কোন তরুণীর অনুরোধে তাকেই লক্ষ্য করে। বাংলাদেশের কবি যুগোশ্লাভ তরুণীর 'মোহময় রূপের' বর্ণনাতে বাংলাদেশের রাত্রিকালীন পারিপার্শ্বিককেই যেন নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। নারী সৌন্দর্যের এক মনোজ্ঞ ছবি ফুটে উঠেছে কবিতাটিতে। 'মালতীর ঘুম' নিদ্রিতা নারীসৌন্দর্যের এক অপরূপ আলেখ্য। কবি যেন তাকে রূপকথার লোক থেকে তুলে এনে আমাদের পল্লীকুটিরে স্থাপন করেছেন। সজীব বাস্তব পারিপার্শ্বিক কবি-কল্পনার গুণে এখানে রূপকথার সৌন্দর্যলোকের মহিমা পেয়েছে। 'উমাকলি' কবিতায় জসীমউদ্‌দীন সৌন্দর্যের এক নব পুরান রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। বিধাতা যেন সন্ধ্যা, উষা, উর্বশী, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা ইত্যাদি সৌন্দর্যপ্রতিমা গড়ে, কোনটাই মনের মত না হওয়াতে সৃষ্টি করেছিলেন 'উমাকলিকে'। এমনি কথা বলেছেন কবি। উমাকলিকে সৃষ্টি করতে বসে বিধাতা আকাশের তারা, রামধনু, মেঘ, বিদ্যুৎ, চাঁদেরর জ্যোছনা কোন কিছুর সাহায্য নিলেন না।

তিনি উমাকলিকে সৃষ্টি করলেন, শ্যামল মৃত্তিকা থেকে ও প্রকৃতির শ্যামল রূপ থেকে নানা উপাদান নিয়ে এক কল্যাণী মূর্তি রূপে। অচিরেই সে সকল সৃষ্টি-বন্দিত দেবী রূপে স্বীকৃতি পেল। মনে হয় উমাকলি আসলে মর্ত্য মানবীরই এক কল্পরূপ।

'হলুদ বরণীতে' সৌন্দর্য কণিকার বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করা যায় অবশিষ্ট আরও কয়েকটি কবিতায়। 'শ্যামলী' কবিতায় নিদাঘ তাপে ক্লিষ্ট পৃথিবীর বুকে শ্যামল, সজল মেঘের আবির্ভাব রোমান্টিক কবির দৃষ্টিতে অপরূপ হয়ে ধরা দিয়েছে। দাহক্লিষ্ট পৃথিবীর বুকে রামধনু মালা গলে মেঘের আবির্ভাব নবজীবনের আশ্বাসে সমৃদ্ধ বলেই কবি করেছেন তার আগমণ প্রতিক্ষায় অপেক্ষমান। পৃথিবী নানা উপাচারে সেজে তার অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। বৃষ্টি রূপে তার পদপাতে পৃথিবী হয়ে উঠবে ফলশস্যে সুশোভিত রূপকথার রাজকুমারী পদাঘাতে পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের মত। এই শ্যামল মেঘকেই কবি আহ্বান করেছেন তাঁর তৃষিত জীবনের অঙ্গনে, যাতে করে তিনি নদীর ধারারই ন্যায় পৃথিবীতে সমৃদ্ধির বাণী বয়ে আনতে পারেন।

'যৌবন' কবিতায় নারীর যৌবন-সৌন্দর্যের বিকাশধারা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। কবির মনোবীণার তারে ঝঙ্কার তোলে এ সৌন্দর্য, কিন্তু যখন কবি দেখেন এ রূপযৌবন নারীকে শেষপর্যন্ত সংসারের অন্ধকার হেরেমে ঠেলে দেয়, তখন কবি সত্যই নিতান্ত ক্ষুণ্ বোধ করেন। 'দুই ফুল' কবিতায় নারী চাঁদের কিরণের মত স্নিগ্ধ, ফুলের মত সুবাসযুক্ত প্রেমকোমল রূপে পাশেই তার উগ্র মাদকতাময় ঘড়ভাঙা সর্বনাশী এলোকেশী রূপের অবস্থিতি কবি স্পষ্ট করে তুলেছেন।

'রূপে আলো তার রাঙা মুখখানি' কবিতায় মানবচিত্তে নারী-সৌন্দর্যের অপরিসীম প্রভাবের কথাই বর্ণিত হয়েছে। 'হলুদ মেয়ে' কবিতায় একটি পল্লীকিশোরীর সহজ রূপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। তাকে কবি পল্লীপ্রকৃতির অন্তর্গত করেই গড়ে তুলেছেন।

'রেণু' কবিতায় একটি পল্লীবালিকার স্নেহশীতল গার্হস্থ্যরূপকে কবি প্রীতিস্নিগ্ধ ভাষায় তুলে ধরেছেন। 'করুণা, কবিতায়' মমতার সহচরী জীবন্ত হাসি খুশী আর একটি পল্লীমেয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। 'এ বাড়ি ও বাড়ি' কবিতায় পরিহাসপ্রিয় কবি পাশাপাশি দুই বাড়ির পরীক্ষার্থিণী তরুণীর পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কৌতুকালাপনের যে ছবি তুলে ধরেছেন, তাও রূপমুগ্ধ অথচ প্রীতিস্নিগ্ধ কবিচিত্তের স্বাক্ষর বহন করে।

'শুভাশীষ' কবিতায় পল্লীপথিক কবি পল্লীর ছেলেমেয়েদের জন্য আপনার অন্তরের সকল প্রীতি ও শুভেচ্ছাই যেন উজার করে দিয়েছেন।

'সুন্দর' কবিতায় কবি ফুলের সাথে নারীর তুলনা টেনে উভয়েরই প্রকৃত সৌন্দর্য কোথায় তা নির্দেশ করেছেন। ফুল সুন্দর হয় শিল্পীর রেখায় ফুটে উঠে, প্রিয়ের গলের মালা হয়ে, দেবতার চরণে স্থান পেয়ে। আর নারী সুন্দর হয় ভালবাসার গুণে, সেবাময়ী রূপে জগতের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে। কল্পনাটি সুন্দর সন্দেহ নেই।

'গান, কবিতায় রোমান্টিক কবির মন ফুলের গন্ধের আখরে যে প্রকৃতিরাণীর প্রণয়বাণী শুনতে পেয়েছেন আকাশের মেঘের রঙে, বিহগের কাকলীতে সেই বাণীরই সমর্থন মিলছে। কবির চিত্ত কিশলয়ের অস্ফুট কামনাকোরক সেই সঙ্গীতে কি প্রস্ফুট হয়ে উঠবে? কবির হৃদয়-গহনে সে গান কি আলোর ইশারা নিয়ে আসবে এটাই হচ্ছে কবির জিজ্ঞাসা।

'তোমার তালাসে ঘুরিতাম', কবিতায়ও রোমান্টিক কবিমনের অপরূপ ভাবালুতার প্রকাশ ঘটেছে। কবি বলেছেন প্রিয়া যদি ফুলের সুগন্ধি হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াত তা হলে কবি হয়ত বাতাসে বাতাসে ঘুরে জোনাকির মত বাতি জ্বালিয়ে তার তালাশে ঘুরে

ফিরতেন। 'নিস্ফল কামনা' কবিতায় প্রেমিক কবির স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ব্যক্ত হয়েছে। কবি প্রিয়ার কাছ থেকে শুধু একটু হাসি, একটু ভালবাসা চেয়েছিলেন, কিন্তু তা পান্ নি। তাই আশাহত কবিচিত্ত বেদনায় গুমড়ে মরছে।

'হলুদ বরণীর' অবশিষ্ট তিনটি কবিতা হচ্ছে 'শেষ নিবেদন' 'সন্ধ্যায়' এবং 'শেষের কবিতা'। তিনটি কবিতায়ই আমরা 'বালুচর' কাব্যের প্রেমভাবনার জের টানা হয়েছে লক্ষ্য করি। 'শেষ নিবেদন' কবিতায় প্রেম-ভিখারী কবির অভিমানী ব্যথাহত চিত্তের জ্বালাই ব্যক্ত হয়েছে। প্রিয়ার প্রেম যাচঞ্চা করে কবি বারবার শুধু বঞ্চনার জ্বালাই বোধ করেছেন। প্রিয়া তাঁর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করে নি। কবি দুঃখ পেয়েছেন ; কিন্তু হতাশ হন নি। প্রেমের জন্য যুগ-যুগান্ত ধরে মানব-যাত্রী যে দুস্তর তপস্যায় রত রয়েছে, তার আদর্শ সামনে রেখেই মন মোমবাতি জ্বালিয়ে কবি জনম ভর প্রেমস্বরূপের ধেয়ান করে চলবেন, শুধু এই প্রত্যাশায় যে, হয়ত প্রিয়া একদিন এক টুক্‌রা হাসি ছড়িয়ে দিয়ে কবির সব ব্যথা ঘুচিয়ে দেবেন। প্রিয়ার কাছে কবির তাই শেষ নিবেদন এই যে, সে যেন দয়া করে তার অধরের হাসির একটু তাঁর দিকে গড়িয়ে দেয়। তাহলেই তাঁর সব সাধনা সার্থক হয়ে উঠ্‌বে।

'সন্ধ্যায়' কবিতায়ও ঐ একই ব্যথাহত সুরের অনুরণন লক্ষ্য করা যায়। প্রেমস্বপ্নে মগ্ন কবি যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে প্রিয়ার উদ্দেশ্যে নানা কথার জাল বুনে চলেছিলেন, তখন প্রিয়া এসে নীরবে তাঁর পাশটিতেই বসেছিল। ভাবাকুল কবি গভীর রাত পর্যন্ত কত কথাই না ভাবলেন। তারপর প্রিয়া এক সময়ে নীরবেই চলে গেল। স্বপ্ন ভাঙ্গতেই কবি যখন জেগে উঠ্‌লেন, তখন তাঁর মন এক বিষাদে ভরে গেল। প্রিয়াকে এত কাছে পেয়েও তিনি হারিয়েছেন, ভেবে ব্যথায় তাঁর চোখ জলে ভরে এলো। তারপর রাত জেগে তাকে তিনি কতই না খুঁজেছেন, কিন্তু বৃথা, সে যে তাঁর অধরা হয়ে গিয়েছে। বিরহী কবির ব্যথাহত চিত্তের একটি সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে কবিতাটিতে।

'শেষের কবিতা' নামাঙ্কিত শেষ কবিতায়ও প্রেমাশ্রুত বিগলিত বিরহ ব্যথাদীর্ণ কবিচিত্তের আর্তি বেজে উঠেছে। 'বালুচর' কাব্যের 'মুসাফির' কবিতার ন্যায় এ প্রেম পথিক কবিতায়ও কবি আপনার দুঃসহ হৃদয়-ব্যথা প্রকাশ করেছেন। প্রিয়-বিরহী কবির ব্যথাহত চিত্তের এক দুর্জয় অভিমানী রূপ ফুটে উঠেছে কবিতাটিতে। প্রিয়াকে নিয়ে কবির কত স্বপ্নসাধ ! সব কিছু পায়ে দলে প্রিয়া বিরহ নদীর ওপারে চলে গিয়েছে। কবি এপারে বসে স্মৃতির কন্টক খোঁচায় বিদ্ধ হয়ে শুধু স্মৃতি তর্পন করে চলেছেন। চিরন্তন বিরহ-সমুদ্র তীরে বসে ক্ষেপা প্রেমিক অমনি যুগ যুগ ধরে দুঃসহ তপশ্চর্যা চালিয়ে যায়।

'হলুদ বরণী' কাব্যের কবিতাগুলো সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পেলাম যে, এ কাব্যে কবি মুখ্যতঃ নারী-সৌন্দর্যের জয়গান করলেও প্রেমভাবনাও নিতান্ত গৌণ হয়ে দেখা দেয় নি। তবে কি সৌন্দর্য ভাবনামূলক কবিতায়, কি প্রেমের কবিতায়, কোথাও কবি নতুন কোন শিল্পসার্থকতার সন্ধান দিতে পারেন নি। 'বালুচর' ও 'রূপবতী'র সৌন্দর্য ও প্রেমভাবনার বৃত্তাবদ্ধ জগতেরই তিনি অনুবর্তন করেছেন। ভাষা-ছন্দের ক্ষেত্রেও কোন উৎকর্ষ এ কাব্যে দেখা দেয় নি। সব চেয়ে যে জিনিসটি আমাদের পীড়া দেয়, তা হল রূপ বর্ণনায় তিনি যেমন বিশেষ একটা প্যাটার্ণের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন, প্রেমভাবনা প্রকাশেও ভাব থেকে ভাবালুতার দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়েছেন। 'হলুদ বরণী' তাই কাব্য হিসেবে তেমন সমাদৃত হওয়ার দাবি রাখে না।

জলের লেখন

'হলুদ বরণী'র সৌন্দর্য ও প্রেমভাবনারই অনুবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় পবরর্তী 'জলের লেখন' কাব্যে। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। 'হলুদ বরণী'তে প্রেমভাবনার উপস্থিতি সত্ত্বেও কবির সৌন্দর্যচেতনাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল। 'জলের লেখন' কাব্যে কিন্তু প্রেমভাবনাই মুখ্য হয়ে উঠেছে, যদিচ সৌন্দর্য-চেতনা অনুপস্থিত নয়। বলাবাহুল্য 'হলুদ বরণী'র ন্যায় 'জলের লেখন' কাব্যেও জসীমউদ্‌দীন 'বালুচর', 'রূপবতী'র ভাবাকাশেই বিচরণ করেছেন। কাব্যকলার দিক থেকেও এতে তেমন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। তবে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কিছুটা ব্যাপকতর ব্যবহার এ কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা চলে। কারণ ইতিপূর্বে কোন কোন কাব্যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত দু একটি কবিতা স্থান পেলেও, 'জলের লেখন' কাব্যেই তিনি এর কিছুটা ব্যাপক প্রয়োগ নিরীক্ষা চালিয়েছেন। যদিও মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই যে তিনি অভ্যস্ত তার প্রমাণ এ কাব্যেও অপ্রতুল নয়। ৪৭টি কবিতার সংকলন 'জলের লেখন' কাব্যে সংকলিত কবিতার সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে ৪৪টি। কারণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি 'হলুদ বরণী' কাব্যের 'রূপে আলো তার রাঙা মুখখানি' এবং 'স্বপনে' কবিতা দুটিই আলোচ্য কাব্যে যথাক্রমে 'সোনার প্রদীপ খানি' এবং 'স্বপ্ন' নামে স্থান পেয়েছে। অবশ্য শেষোক্ত কবিতায় 'স্বপনে' কবিতার শেষ দুই পংক্তি বর্জিত হয়েছে। এ ছাড়া 'জলের লেখনের' 'শুভ কামনা' ও 'আশ্বাস' কবিতাদ্বয় প্রকৃতপক্ষে একই কবিতা। শুধু পংক্তি ও স্তবক বিনাসের হেরফেরে দুটি ভিন্ন কবিতা বলে প্রতিভাত।

আমরা এখানে সংক্ষেপে ঐ ৪৪টি কবিতার ভাববস্তু নির্দেশ করে 'জলের লেখন' কাব্যের চারিত্র্য পরিস্ফুট করে তোলার প্রয়াস পাব। 'জলের লেখন' মূলতঃ প্রেমের কবিতার সংকলন। 'জলের লেখন' কাব্যেই কবি প্রথম আত্মগত হয়ে একান্তভাবে প্রেমের সুরের আলাপন করেছেন। কবির মতে, মানুষ যুগে যুগে ভালবাসার বেদীমূলে আত্মসমর্পণ করেছে। ভালবাসার কথা বলেও যেমন শেষ করা যায় না, শুনেও তেমনি তৃপ্তি হয় না। একই কথা বারবার শোনতে ইচ্ছা করে। ভালবাসর জন্যে অশ্রুতর্পণ করেও সুখ। 'জলের লেখন' কাব্যে এই ভালবাসার কথাই কবি বারবার বলেছেন। তাতে সুরের একঘেয়েমি দেখা দিয়েছে জেনেও কবি নিবৃত্ত হন নি। আলোচ্য কাব্যে বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা রচনাই যে কবির লক্ষ্য, তা গুটিকয়েক সৌন্দর্য ভাবনামূলক কবিতা থেকেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে বিশুদ্ধ নারী-সৌন্দর্য নয়, যে সৌন্দর্য মনে প্রেমাকুলতা সৃষ্টি করে, তারই কথা যেন কবি বলতে চেয়েছেন। একটা কথা 'জলের লেখন' কাব্যে পরিবেশ নিরপেক্ষ প্রেমভাবনা প্রকাশের চেষ্টা আছে তা ঠিক। তবে যেখানেই কাব্যের প্রয়োজনে পারিপার্শ্বিকের আমদানি করতে হয়েছে, সেখানেই পল্লীপারিপার্শ্বিকের দীর্ঘায়িত ছায়া লক্ষ্য করি। ঐ পারিপার্শ্বিক তাঁকে সহজেই ভাষা যোগায়, তাই দেখি বিমানবালার রূপ বর্ণনা করতে গিয়েও তিনি শিমুল ফুল, সরষে ফুলের দেশে বেড়িয়ে আসেন। তাছাড়া কবির প্রেম-সীমা ঘেরা স্বর্গের ইন্দ্রাণীও যে পল্লীবালা তাও তাঁর আগমনী গানে স্পষ্ট করে তুলেছেন কবি। এঁদো ডোবা, কলমীলতার জালে ঘেরা পানি পুকুর। মটরশুটির ক্ষেত, আমা-কাঁঠালের ছায়াঘেরা কৃষাণ গৃহই যে কবি-প্রিয়ার ভবন তা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন। তবে একথা স্বীকার্য যে কবি প্রেমানুভূতির বৈচিত্র্যই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন প্রায় সকল কবিতায়। মাঝে মাঝে সে প্রচেষ্টা সৌন্দর্য মুগ্ধতার নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাও সত্য।

এবার কবিতাগুলোর ভাববস্তুর কথা সংক্ষেপে বলা যাক। নামকবিতা 'জলের লেখন' এ কাব্যের প্রেমভাবনামূলক কবিতাগুলোর একটি সুন্দর মুখবন্ধ রূপে বিবেচিত হতে পারে। এতে কবি আপন কাব্যভাবনার স্বপক্ষে কোন অমরত্বের দাবি নিয়ে হাজির হন নি। তিনি সহজভাবে নিজেকে প্রকাশ করার সামর্থে আস্থাবান হয়েই তৃপ্তি খুঁজেছেন। সংসারের সব কিছুই যখন ক্ষণস্থায়ী, তখন কবির কবিতাও জলের লেখনের মতই হয়তো অচিরে মুছে যাবে। তাতে কবির দুঃখ নেই। তিনি মানবীর দেহবাঁশরীতে প্রেমের যে সুর ঝংকৃত হতে শুনেছেন, রূপের যে ঝলক দেখেছেন, সব মিলিয়ে যে ভাললাগার এক রহস্যময় অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়েছেন, তাকে রূপায়িত করেই তৃপ্তি খুঁজেছেন। তা যদি সবার ভাল না লাগে, তা হলে তিনি কি-ই বা করতে পারেন। তবে তাঁর স্থির বিশ্বাস রয়েছে, জীবনের সার্বিক অনিত্যতা সত্ত্বেও, 'মিছে নয় মোর এই স্বপনের জাল'। পরবর্তী কবিতা 'অনুরোধ' একটি তরুণীর রূপহিল্লোলে উত্থিত কবির চিত্তসাগরের একটি ঢেউয়ের মত। তরুণীর রূপ দেখে উতল কবি প্রেমাকুলতাবশে দাবি করেছেন তার উপর নিজ হৃদয়ের অধিকার। যদিও কবি জানেন কথার খাঁচায় তাকে ধরতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবু যুগ যুগ ধরে কবি তারই চেষ্টা করে চল্‌ছেন ; কথার ফাঁসিতে প্রিয়ার মুখের একটুখানি হাসি ধরে রাখার কথা ভেবেছেন। সেই জন্যই চঞ্চলা অধরা সৌন্দর্য সুধারূপিণী নারীকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁর সামনে একটুখানি দাঁড়ানোর জন্যে। 'আগমনী' কবিতায় কবি তাঁর প্রেমস্বর্গের ইন্দ্রানী পল্লীবালাকে পল্লীর স্বাভাবিক পরিবেশেই আপন হৃদয় আঙ্গিনায় আহ্বান করেছেন। তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন 'আন কারো রূপ পশে না পরাণে আর।' এই পল্লীবালাকে ঘিরে কবি যে প্রেমস্বর্গ রচনা করেছেন, তা কিন্তু বাংলার আম-কাঁঠালের শীতল ছায়া ঘেরা পল্লীর বাইরে নয়। এ পল্লীবালা পল্লীকবির কাহিনীর নায়িকা হয়ে সুদূর অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যৎ কালের পথে অনাহত পদক্ষেপে প্রেমিকের বুকে দুঃখ ব্যথা ও আনন্দের ঢেউ তুলে এগিয়ে চলেছে। কবি তার প্রেমের ভিখারী। তাই তো তার রূপারতিতে কবির এত আনন্দ। পরবর্তী কবিতা 'উপহার' নারী-প্রেমের দহন জ্বালায় ক্লিষ্ট প্রেমপথিকের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ভারাক্রান্ত। নারীর কাছ থেকে প্রেমরূপ ফুল ভিক্ষা করে প্রেমিক সুখী হতে পারে নি, এ তার পক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছে এক বন্ধনস্বরূপ। একে বুকে করে রেখেও সুখ নেই, একে ছুড়ে ফেলে দিতে গেলেও স্মৃতির জ্বালা ভোগ করতে হয়। প্রেমের অনন্ত তৃষ্ণা, অতৃপ্তি ও জ্বালাই কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে।

'তোমারে যে নেবে' কবিতায় কবি নারীর সর্বাতিশায়ী রূপমহিমার অনুধ্যান করে এ কথাই বলতে চান, নারীদেহকে প্রেমের আধার রূপে বরণ করে নিয়ে যে ধন্য হতে চায়, তাকে মেঘের প্রশান্তি নিয়ে সকল দহন-জ্বালা সহ্য করার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। সকল কামনা-বাসনার কন্টক খোঁচা সহ্য করে যে অপ্রমত্ত ভাবে তার সৌন্দর্য-সুধা উপভোগ করার সামর্থ রাখে, সেই কেবল তাকে একান্ত করে পেতে পারে। প্রেমের জন্যে সকল সুখেচ্ছা, আরাম আয়াসকে যে তুচ্ছ করতে পারে, প্রেমের ধ্যানে যার দিবারাত্রি এক হয়ে ওঠে, কেবল সেই পায় নারীর রূপ-প্রতিমাকে হৃদয়ে ধারণ করার অধিকার। অন্য কেউ নয়। প্রেমের সাধন যে দুশ্চর, কঠোর, তারই ইঙ্গিত কবিতাটিতে স্ফুট হয়েছে।

প্রেমভাবনামূলক আর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'ছবি'। প্রেমের বিধিলিপি এই যে, প্রেমিক মাত্রকেই বিরহ -জ্বালায় দগ্ধ হতে হয়। প্রেমের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েও প্রতিদান আশা করা বাতুলতা মাত্র। আকাশের চাঁদের মত তা চির অধরাই থেকে যায়।

অথচ এ সত্য জেনেও মানুষ ভালবাসে, ভালবাসার পাত্রকে একান্ত করে পেতে চায়। তাই তো দেখি বিচ্ছেদ নিশ্চিত জেনেও মানুষ প্রেমে আত্মহারা হয়। প্রিয়ার কাছে জানায় তার একমাত্র কামনা 'হাসিখুশী ওই ছবিখানি তবে রেখে দিও মোর তরে।' প্রেমের জন্যে বিরহ-জ্বালা সকলকেই ভোগ করতে হয়। ঐখানেই কবির সান্ত্বনা। নতুবা জীবন যে দুঃসহ হয়ে উঠত। 'দান' কবিতায় কবি দাবি করেছেন 'যার কথা কেউ ভুলে লেখে নাই, আমি তার কবিকার।' সে দাবির সত্যতা প্রতিপন্ন করার জন্যেই যেন তিনি বস্তীবাসিনী দারিদ্র্যক্লিষ্টা একটি মেয়ের অভাব ও দৈন্যকে নিজের দেহের ভূষণ করে, তারই প্রেমের তপস্যায় ব্রতী হয়েছেন। কবির মতে ঐ কন্যাকে ভালবেসে প্রকৃত পক্ষে তিনি আর্তমানুষের হৃদয়ের নিকটবর্তী হতে পেরেছেন। তার প্রতি প্রেমের বলেই তিনি অর্জন করেছেন অভাবপীড়কের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শক্তি।

'আমি যা লইতে নারি' কবিতায় কবি তাঁর অনন্ত প্রেমতৃষাকেই ব্যক্ত করেছেন। প্রিয়ার দেহের দেউলে কবি প্রেমের ভিখারী হয়ে বারবার উপস্থিত হয়ে, তার সকল দান গ্রহণ করতে পারেন নি এই ভয়ে যে, একেবারে সকল প্রেমতৃষা মিটে গেলে তিনি কি নিয়ে বাঁচবেন? প্রিয়ার ছবি ধ্যান করেই তাঁর আনন্দ। তাকে সকল চাওয়া-পাওয়ার বাইরে রাখতে পারলেই যে কেবল সে আনন্দ পাওয়া যায়। তাই তো প্রিয়ার রূপের শিখায় অনন্তকাল নিজেকে জ্বালিয়ে রেখে কবি বেঁচে থাকতে চান। অন্য কিছুই তাঁর কাম্য নয়।

'আমার কবিতা' প্রেমেরই একটি ক্ষুদ্র সুর। কবি বলেছেন, তাঁর কবিতা যদি তাঁর প্রিয়ার ভাল লাগে, তা হলেই তিনি খুশী। অপরের প্রতিক্রিয়া যেমনই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। প্রিয়স্মৃতির মাধুর্যে কবির মন এতই ভরপুর যে, তাকে 'স্তবের কুসুম' করে তার অর্চনা করেই যেন তিনি সকল সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। পরবর্তী 'কবিতা' নামধেয় কবিতায়ও একই সুরের অনুরণন লক্ষ্য করা যায়। কবির মতে কবিতা হচ্ছে 'হৃদয়ের ফুল আপনি যে ফোটে কথার কলিকা ভরি।' ইচ্ছা করলেই তা লেখা যায় না। প্রেমের উত্তাপে হৃদয়ের দুঃখ-ব্যথার অতল গভীর থেকে বেরিয়ে আসে কবিতা। মানব জীবনের সুন্দরতম কথা এই কবিতা শুধু তারই, যার হৃদয় সে নাড়া দেয়। যে প্রেমের জন্য হাফিজ সমরকন্দ-বোখারা বিলিয়ে দিতে রাজী হয়েছিলেন, কবিতা মূলতঃ সেই প্রেমেরই প্রকাশ। তাই তো তার প্রভাব মানবচিত্তে অমোঘ। 'সার্থক জীবন' কবিতায় প্রেমোপলব্ধির পরিপূর্ণতা বোধজনিত ও কবিচিত্তের উল্লাস ব্যক্ত হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবসম্মেলন পদের ভাবগভীরতা এ কবিতায় অনপেক্ষিত নয়।

'শুভকামনা' ও 'আশ্বাস' নামক কবিতাদ্বয় যে একই কবিতার সামান্য রূপভেদ মাত্র, একথা আগেই বলেছি। এই কবিতা দুটিতে প্রেমের এক অপরূপ আত্মনিবেদনের সুরই যেন ধ্বনিত। এখানেও বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবচ্ছায়া প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রেমের ভিখারী কবি ভালবাসার জন্যে চিরকালই অশ্রু তর্পন করে আসছেন। ভালবেসে কেঁদেও সুখ, এই হচ্ছে কবির ধারণা—শুধু ধারণা নয়, বিশ্বাস। তাই প্রেমতৃষ্ণা তাঁর কোনদিনই মিটবে না, তাঁকে চিরকাল দুঃখ পেতে হবে, জেনেও কবি প্রিয়ার রূপের ধ্যান করে চলছেন। প্রতিদানের অপেক্ষা না রেখে প্রিয়ার জন্যে প্রেমের তপস্যায় জীবন কাটিয়ে দিয়েই কবি জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেতে চেয়েছেন। কবির কামনাটি ভারী সুন্দর।

'আলোক শয্যা' কবিতাও একই ভাবলোকের যাত্রী। দীর্ঘ অদর্শনের পর প্রিয়-সম্মিলনে প্রেমিকচিত্তে যে তরঙ্গ-দোলা দেখা দিয়েছে, তাই কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে। ব্যথাহত

অভিমানী কবিচিত্তের জ্বালা যেমন কবিতাটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি প্রিয়ার সাথে নব মিলন সম্ভাবনায় পুলকিত কবির হৃদয়ের উত্থান-পতনের দোলাটিও কবিতায় সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। 'যারে খুশী দিও তারে দান' কবিতায়ও কবিচিত্তের প্রেমাকুলতাই ফুটে উঠেছে ভিন্নতর ঢঙে। কবি বলছেন, প্রিয়ার দেহবল্লরী তাঁর কাম্য নয় ; তার সৌন্দর্যসুধা যাকে খুশী তাকে সে দিতে পারে ; কিন্তু প্রিয়ার কাছে যে একটি জিনিস তাঁর একান্ত কাম্য তা হচ্ছে, এই প্রিয়ার দেহবীণায় যে সুর গুঞ্জরিত হয়ে ফিরছে, প্রিয়ার চাহনিতে, চলনে, বলনে গতিভঙ্গিমায় যে অমর কাব্য প্রতিনিয়ত রচিত হচ্ছে, তা যেন একান্ত করেই কবির হৃদয়ের জিনিস হয়ে থাকে। প্রেমপাগল কবিচিত্তের আকুলতা কবিতাটিতে সুন্দরভাবে ধরা দিয়েছে।

'বিবাহের আগে' 'তন্বী' ইত্যাদি কবিতায় যৌবন-ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমোক্ত কবিতাটিতে কবি যৌবন-সন্ধিক্ষণে উপনীতা নারী-সৌন্দর্যের এক মোহকর বর্ণনা দিয়ে তার মনে যৌবন ভাবনা সঞ্চারের বাস্তবসম্মত একটি ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন।

'তন্বী' কবিতায় পুষ্প কোরক-সম তন্বী দেহের সম্ভাব্য যৌবনোচিত বিকাশধারা কল্পনা করে কবিচিত্তে যে রহস্যবোধ ও ব্যাকুলতা জেগেছে তা যদিও মনস্তত্ত্বসম্মত, কিন্তু তেমন কাব্যমাধুর্যপূর্ণ নয়।

'সবনাম' কবিতায় এক অপরিচিতা, অনামিকা মেয়ের স্ফুটোন্মুখ যৌবন-সৌন্দর্যের আরতি করেছেন কবি। রূপমুগ্ধ প্রীতিস্নিগ্ধ কবিচিত্তের এক নির্মল ছবি ফুটে উঠেছে কবিতাটিতে।

'পাওয়া' কবিতায় কবি আপন প্রেমাভিসারী চিত্তের ভাবনার দলগুলো একে একে যেন মেলে ধরেছেন। ভালবাসা বোধহয় সব সময়ই একটা অবগুণ্ঠন চায়। তা না হলে কবি কেন প্রিয়াকে সকলের চোখ এড়িয়ে গোপনে দেখতে চান? প্রিয়ার শাড়ী ঢাকা দেহবল্লরী নিয়ে কত কথার জাল বুনেন কবি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্ত পান না তিনি তার রূপসায়রের। তাই সব কিছু প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। বারবার দেখেও তিনি এ রহস্যের পার পান নি। প্রিয়ার কাছে তাই তাঁর অনুরোধ, প্রিয়া যেন অনুরাগভরে কবির অন্তরে তার রূপখানি চিরতরে এঁকে দেয়া প্রিয়ার যে বিদ্যুৎবহ্নি জ্বালাসঞ্চারী রূপকে অপ্রাপ্য, জেনে কবি বিরহভরে কেঁদে কাটান সেই রূপ নিয়ে প্রিয়া তাঁর অক্ষুব্ধ হৃদয়ে সারাটি রজনী ঘুমিয়ে কাটান। তাই প্রিয়ার কাছে কবির মিনতি সে যেন কবির হৃদয়পটে অনুপম রূপ ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়। তা না হলে তাকে পাওয়ার সৌভাগ্য কবির কোনদিন হবে না।

'আগমনী' নামাঙ্কিত দ্বিতীয় কবিতায় প্রৌঢ় কবি যৌবনের মহিমাই কীর্তন করেছেন। বৃদ্ধ মালীর শূন্যোদ্যানের মত শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল কবির জীবনাঙ্গন। বসন্তের আবির্ভাবের ন্যায় যৌবনের বাণী নিয়ে সেখানে দেখা দিল তরুণ-তরুণীরা। যৌবনহারা কবির জীবনে সঞ্চারিত হল যৌবনের সুষমা। এ যে সম্ভব হল তা ওদের জন্যেই। কবি তাই যৌবনকে স্বাগত জানিয়ে অপরিসীম তৃপ্তি পেয়েছেন। 'তোমার কবিতা' প্রেমাকুল চিত্তেরই একটা উচ্ছ্বাস। প্রেমিক কবি বলছেন তিনি তাঁর প্রিয়ার উপরে এমন কবিতা লিখবেন যা হবে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির যাবতীয় সুসমায় ভরা। কবির বাসনা তিনি 'প্রথম বাসরে সরম রঙিন' বধূর মুখের অনুরাগকম্পিত প্রণয় ভাষণের মত, একটি মধুর প্রিয়াকে শুনিয়ে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে দেখবেন। কবির আকাঙ্ক্ষাটি সুন্দর বলতে হয়।

'সমব্যথা' কবিতায় এক প্রেমবঞ্চিতা নারীর দুঃখে ব্যথিতচিত্ত এক প্রেমবঞ্চিত নারীকে পরস্পর ব্যথায় সমব্যথী হয়ে দুঃখ-জ্বালা অপমোদনের জন্যে আহ্বান জানিয়েছে। 'জলের লেখন' কাব্যের কবিতাগুচ্ছের মধ্যে চটুল পরিহাস, রসিকতাপূর্ণ 'হেলেনা' কবিতাটির স্বাদুতা বেশ উপভোগ্য। 'হেলেনা' নাম্নী নাতিনীকে নিয়ে কৌতুক করতে গিয়েও কিন্তু কবি তাঁর যৌবন সন্ধিক্ষণের দেহমাধুরীর কথা উল্লেখ করতে ভোলেন নি। 'হলুদ বরণীর' 'নব পরিণীতা' কবিতার অনুরূপ ভঙ্গিতে কবিতাটি রচিত। সেখানেও কবির পরিহাসপ্রিয় মনেরই পরিচয়টি ফুটে উঠেছে।

পরবর্তী কবিতা দুটি মেয়ে'তে দুটি তরুণীর বৈপরীত্যধর্মী সৌন্দর্যের এক অপরূপ প্রশস্তি রচিত হয়েছে। কবির মতে একজন যদি হয় মন্দিরের দেবী, অপর জন যেন আঙ্গিনার ফুল। দুইয়ের রূপমাধুরী যথার্থ মহিমা লাভ করেছে কবিতাটিতে। 'বিমানবালা' কবিতায় কবি বিমানবালার যে সৌন্দর্যপ্রতিমা তৈরী করেছেন তার উপকরণ জুগিয়েছে বাংলাদেশেরই পল্লীপ্রকৃতি। এই বিমানবালা দূরযাত্রী আরোহীদের নয়নে সৌন্দর্যের অলকালোকের অধিবাসিনী হয়েই যেন দেখা দেয়, প্রবাস-যাত্রা তার রূপমাধুর্যের কল্পনায় ডুবে যাত্রাপথের ক্লেশ ভুলে যায়। এই সংবাদই কবি আমাদের দিয়েছেন কবিতাটিতে।

'সুন্দর' কবিতায় রমণীর রূপমাধুরীর পূজা করেছেন কবি। কবির মতে, রমণীর চোখের কটাক্ষ, অধরের হাসি বড় মারাত্মক শক্তি। তা অনায়াসে সৌন্দর্যমুগ্ধ মানুষ-মৃগকে বিদ্ধ করতে পারে। নারী যেন সৌন্দর্যের অলকাপুরীরই বাসিন্দা, পারিজাত বৃক্ষচ্যুত কোন কোন দেব-পূজার সামগ্রী। সে যেন কোন সাধকের তপস্যায় সাড়া দিয়েই নেমে এসেছে ধরণীর বুকে লক্ষ্মী প্রতিমার ন্যায়। যুগ যুগ ধরে রূপের পূজারীরা তার রূপ-মহিমা ধ্যান করে আসছে। তার রূপ-মহিমা বর্ণনা প্রায় অসাধ্য। পৌরাণিক আবহের আমেজ সমৃদ্ধ কবিতাটি কবির পুরাণ সৃষ্টির দক্ষতারই যেন প্রমাণ করে। 'পথের দেখা' কবিতায় দৃষ্টি থেকে দ্রুত অপসৃয়মান একটি তরুণীর মুখের একঝলক হাসি কবিকে ভাবাকুল করে তুলেছে তার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও, তাঁর ঘরের সর্বত্র তার সৌন্দর্যমাধুরীর বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করে কবির মনে হল তাঁর ঘরে যেন স্বয়ং কবিতাই জীবন পেয়েছে। প্রীতিসিক্ত কবি-মনের ঝর্ণাধারা আশীষ রূপে ঝরে পড়েছে ঐ মেয়েটির উদ্দেশ্যে। 'পরিচয়' কবিতায় ব্যথা বেদনার কন্টক ঘেরা জীবনপথে যে নারীকে পেয়েছিলেন কবি জীবনসঙ্গী রূপে, নিজ জীবনে তার মহিমময় প্রভাবের কথাই অকপটে স্বীকার করেছেন।

'ওগো তুমি শোন' কবিতায় নারী-সৌন্দর্যের স্তুতি উপলক্ষ করে কবি নিজ হৃদয়ের প্রেমাকুলতাকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন। 'রূপান্তর' কবিতায় প্রেমভাবাকুল কবিচিত্তের এক অপরূপ আর্তি বেজে উঠেছে। কবির হৃদয় আজ প্রেমের সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ। তাই সুখে তিনি বাক্যহারা হয়ে পড়েছেন। তাঁর হৃদয় থেকে উদগত লাজ-ভীরু সুন্দর প্রেমের কথাগুলো 'হৃদয়ের গভীরেই আজ অবস্থান করুক'। এই তাঁর কামনা। সব কথা বলে নিজেকে নিঃশেষ করতে চান না কবি। কারণ জীবনের গহন গভীর রাতে ঐ কথাগুলোই তাঁর একাকীত্বের মুহূর্তগুলোকে সুসহ করে তুলতে সাহায্য করছে, এই কবির বিশ্বাস। 'ফুলের সুবাস' কবিতায় কবি এ কথাই বলতে চান যে ফুল ঝরে গেলেও তার সুবাস থাকে। তেমনি প্রেম বঞ্চিত হলেও, মানুষ প্রেমের কথার মধ্যে খুঁজে পায় জীবনের নতুন ভরসা। তাই তো কবি প্রিয়ার ছলনা অনিবার্য জেনেও প্রেম কথার ভিখারী হয়েছেন। অনিত্য পৃথিবীতে কিছুই তো থাকে না, থাকে শুধু কথার সুবাস।

প্রেমের আর এক ভাষ্য রচিত হয়েছে 'আসিবে বলিয়া' নামক কবিতায়। প্রিয়ার পদপ্রান্তে সকল অশুচি দূর হবে এ ভরসায় কবি ঘরের কোন কাজেই হাত দেন নি। প্রিয়ার আসন তিনি রচনা করেছেন নিজ নয়নে এবং হৃদয়ে। প্রিয়ার রূপমূর্তি গড়তে ভাঙতেই কবির দিন-রজনী গড়িয়ে যায়। কবির সাধ প্রিয়া যদি দেবী মূরতি ধরে তাঁর হৃদয়-আসনে এসে বসে তবে তিনি নানা উপচারে তাকে সাজিয়ে তার আরতি করে জীবনকে ধন্য করবেন। তাই প্রিয়ার জন্যে তাঁর প্রতীক্ষা। 'খোঁপার ফুল' কবিতায় কবির প্রেমের ভাষার অভিনবত্ব রয়েছে। প্রিয়া ভুল করে যে ভাবে খোঁপার ফুল ফেলে গিয়েছিল একদিন তেমনি ভুল করে যদি একটু খুশী, কাজল চোখের চাহনি, দু একটা রাঙা কথা, মনের মাঝের ভালবাসার ফুল ফেলে যায় কবির জন্যে, তা হলে সে ফুলের দান নিয়ে কবি রচনা করবেন অক্ষয় প্রেমের স্বর্গ। এমনি একটি সুন্দর কামনা ব্যক্ত হয়েছে কবিতাটিতে।

'কাল তুমি এসেছিলে' কবিতায় প্রেমের জন্যে ব্যর্থ প্রতীক্ষার বেদনা ব্যক্ত হয়েছে। প্রিয়ার আগমন প্রতীক্ষায় বরমাল্য হস্তে জেগে বসেছিলেন কবি সারাটি রাত। কিন্তু যখন রাত শেষ তখন হতাশ হয়ে নদীর জলে মালা ফেলে দিয়ে ঘরে ফিরে দেখলেন প্রিয়া শূন্য ঘর দেখে চলে গেছে, তখন বেদনায় হৃদয় তাঁর টনটন করে উঠল। প্রিয়ার আগমনচিহ্ন চারদিকে স্পষ্ট। কোথায় প্রিয়া তার চরণ রেখেছিল, কোথায় সে বসেছিল সবই কবি দেখতে পেলেন। ভ্রমরের গুঞ্জনে, পাখীর কলরবেও তার আগমনের বার্তা ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু প্রিয়া তাঁকে না পেয়ে ফিরে গিয়েছে। এ কত বড় বেদনার কথা তা শুধু কবিই জানেন। কবি প্রিয়ার রাঙা পদচিহ্ন ধ্যান করে বিহ্বল হয়েছেন। ঐ পদচিহ্ন যাতে মুছে না যায় তার জন্যে ঘর ঝাট দিতেই মালীকে নিষেধ করে দিয়েছেন। অপরূপ কবির এই প্রেমের স্মৃতিতর্পণ। 'স্মৃতি' কবিতায় কবি পূর্বোক্ত কবিতার বক্তব্যের জের টেনেছেন। প্রিয়ার সোনার অঙ্গের সুবাসে কবির গৃহ পরিপূর্ণ। প্রিয়া এসেছিল কবিগৃহে, ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে তার রূপের মাধুরী সর্বত্র। প্রিয়ার প্রেম-মধু মাখা কথাগুলো কবিকে আবিষ্ট করে ফেলেছে। কবি তাঁর ইহকাল, পরকাল বিস্মৃত হয়েছেন প্রিয়ার মুখের অকুণ্ঠ প্রেমের বাণী শুনে। ঐ প্রেমকথার স্মৃতির প্রদীপ জ্বালিয়ে কবির প্রেমিক সত্তা চির জাগরুক হয়ে রয়েছে। 'স্মৃতির মূল্য' কবিতায় কবি যা বলতে চেয়েছেন তার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, দেহের পাত্র ভরে প্রেমসুধা পান করে প্রেমের তৃষ্ণা মেটে না। কারণ পাত্র এক সময় শূন্য হয়ে অনাদৃত ভাবে পড়ে থাকে। অতএব প্রিয়ার দেহের রূপ-মহিমাকে স্মৃতিকোটরে ধরে রেখে তিনি প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবার সংকল্প নিয়েছেন। 'সান্ত্বনা' কবিতায় প্রেমের জন্যে সর্বস্ব বিলিয়ে যে প্রাথমিক শূন্যতাবোধে কবি আবিষ্ট হয়েছিলেন, পরে তাই কাটিয়ে উঠেছেন স্মৃতির সমৃদ্ধ জগতে জেগে উঠে। কারণ স্মৃতির জগতে সব কিছুই কবির অম্লান রয়েছে। ঐখানেই তো রয়েছে কবির জন্যে সান্ত্বনা। 'রিক্ত হস্তে' কবিতায় প্রেমের জন্যে সর্ব-রিক্ত কবি আপন বাসনার আসনে মানস-রাণীকে আসন গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রেমের জন্যে সবই তো তিনি দিয়ে দিয়েছেন। শুধু হৃদয় গহন মাঝে প্রিয়ার মূরতি ধারণ করে তিনি রিক্ততার বেদনা ভুলতে চান। প্রেমের এ প্রকাশ রোমান্টিক কবির মনের পরশে অনেকটাই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। 'পুতুল প্রতিমা হলে' কবিতায় কবি বলেছেন, প্রেমের চোখে সাধারণও অসাধারণ হয়ে ওঠে। তাই তো সাধারণ মানবী যে নাকি মাটির পুতুলের মত নির্জীব, স্পন্দনহীন, প্রেমের সঞ্জীবনী স্পর্শে সেই হয়ে ওঠে দেবী প্রতিমার মত। বস্তুতঃ প্রেমের প্রাণদায়িণী শক্তির মহিমা এখানে কীর্তিত হয়েছে।

'পূর্ণিমা' কবিতাটিতে পূর্ণিমা রজনীর যে সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে, তা রোমান্টিক

কবি কল্পনার সুন্দর ফসল। 'শেষ প্রদীপ' কবিতায় দারিদ্র্য-রাহুগ্রস্ত নারী-রূপের একটি ট্র্যাজিক মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে। 'চলেছি দেখিতে তারে' কবিতায় পূর্ব কবিতারই যেন জের টানা হয়েছে। যে সরলা পল্লীবালিকা একদিন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর হয়ে সমস্ত পল্লী পারিপার্শ্বিকে সজীব মূর্তি রূপে কবির চোখে ধরা দিয়েছিল, আজ তাকে বদ্ধ হারেমে নির্বাসিতা ম্লানমুখী নারী রূপে প্রত্যক্ষ করে কবিচিত্ত ব্যথা-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে যাকে দেখতে চলেছিলেন কবি, তার এই দৈন্যদশা কবিকে স্বভাবতঃই পীড়া দিয়েছে। 'তুমি চলে গেলে' কবিতায় প্রিয়া কর্তৃক প্রত্যাখানের বেদনায় ভারাক্রান্ত কবিচিত্তের ব্যথা গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। প্রিয়ার পুষ্পিত দেহখানির আকর্ষণ কবি কোন দিনই ভুলতে পারেন নি। প্রিয়বিচ্ছেদ বেদনার মধ্য দিয়ে তিনি বারবার মৃত্যুর স্বাদ পেয়েছেন ; কিন্তু তা থেকে রেহাই পাবার কোন পথই নেই তাঁর। 'আরো কিছু দিতে হবে' কবিতায় প্রেমের জন্যে কোন মূল্যই যে যথেষ্ট নয়, তারই ইঙ্গিত রয়েছে। অনেক দুঃখ-ত্যাগের, অনেক তপস্যার বিনিময়েই তবে প্রেমের পথে কিছু প্রতিদান মিলতে পারে। ব্যর্থতা এখানে সর্বদাই প্রত্যাশিত। এসব জেনেও কবি প্রিয় নাম ধ্যান করে চলবেন অনন্তকাল ধরে যতদিন না পুনরায় প্রিয়-সন্দর্শন ঘটে। সর্বশেষ কবিতা 'সর্বনাশের হার' প্রেম-পথিক মানুষের চিরন্তন সংকটকেই যেন আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। ভালবাসার অপরিতৃপ্তির বেদনা সমস্ত কবিতার দেহে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন কবি। প্রিয়ার প্রতি কবির প্রেম যেন অনেকটাই অহেতুকী। কবি কখন বুঝতেই পারলেন না কেন সে তাঁর হৃদয় জুড়ে রয়েছে ; বাইরের কোন আকর্ষণই তাঁকে প্রিয়ার ভাবনাবৃত্ত থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত করতে পারে নি। কবির অন্তরের সকল প্রদেশ জুড়ে প্রিয়ার অবস্থান। তাকে বার বার দেখেও তাঁর তৃপ্তি নেই। কত মনোহর কল্পনাই না মঞ্জুরিত হয়ে ওঠে কবিবক্ষে। কিন্তু প্রিয়াকে নিয়ে ভেবে ভেবেও তিনি তার রহস্যের অন্ত পান নি। কবির হৃদয় মুহূর্তে মুহূর্তে প্রিয়-বিচ্ছেদের জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছে, জীবন হয়ে উঠেছে বিড়ম্বনাময়। তবু কবি জেনেশুনে জীবন-তরণী ভাসিয়ে দিয়েছেন ভালবাসার পারাবারে, সর্বনাশের সমূহ সম্ভাবনা জেনেও। প্রেম-পথিক কবি তাই বলেছেন তিনি অবেলায় সর্বনাশের নায় চড়ে যাত্রা করছেন প্রিয়ার উদ্দেশ্যে, কোন সার্থকতা লাভের সম্ভাবনা নেই জেনেও। প্রেম যে একটা বিলাস নয়, ত্যাগ ও তিতিক্ষালব্ধ এক দুর্লভ বস্তু, তারই ইঙ্গিত কবিতাটিতে পরিস্ফুট হয়েছে।

আমরা 'জলের লেখন' কাব্যের আলোচনা এখানেই শেষ করছি। এ কাব্যে সংকলিত কবিতাগুলোর গুটি কতক বাদ দিলে, সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি প্রেমভাবনারই আধিপত্য। এই প্রেমভাবনায় 'বালুচর' কাব্যের প্রেমের কবিতায় যে একটা অতৃপ্তির সুর, একটা হতাশ্বাস, একটা জ্বালাবোধের প্রকাশ দেখা যায়, তারই অনুরণন শোনা যায়। বালুচরের প্রেমের সুরে যে একটা আন্তরিকতা, একটা আবেগ-বিহ্বলতা লক্ষ্য করা যায়, এখানে তা যেন অনুপস্থিত। কবি যেন অভ্যাসের জের টেনে চলেছেন, না টেনে পারেন না বলে। কি কাব্যকলার দিক থেকে, কি বক্তব্য পরিবেশনের দিক থেকে, কোথাও নতুনতর কোন সার্থকতার সন্ধান তিনি পান নি 'জলের লেখন' কাব্যে। স্বীকার্য যে, কবি এ কাব্যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করে, ক্ষেত্র বিশেষে, কাব্যের প্রকাশকলায় নতুনত্ব আমদানীর চেষ্টা পেয়েছেন ; কিন্তু তা তেমন শিল্পগুণমণ্ডিত হয়ে ওঠে নি। আসলে প্রৌঢ় কবি পুরাতন ভাববৃত্তে অবস্থান করে পুরানো সুরেরই আলাপন করেছেন ; ভঙ্গির সামান্য অদল-বদল সত্ত্বেও তা এতই স্পষ্ট যে কাউকে তা বলে দিতে হয় না। কিঞ্চিত পূর্বগামী 'হলুদ বরণী'র ন্যায় 'জলের লেখন' কাব্যও তাই আধুনিক কাব্যরুচিকে পরিতৃপ্ত করতে অসমর্থ।

কাব্যানুবাদ ঃ পদ্মা নদীর দেশে

'জলের লেখন' কাব্যের প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই প্রকাশিত হয় (১৯৬৯ সাল) পাঞ্জাবী কবি রিয়াজ আনোয়ারের উর্দু কাব্যগ্রন্থ 'আওয়াজো কা ভঁওয়ারে'র জসীমউদ্‌দীন কৃত অনুবাদ 'পদ্মা নদীর দেশে'। রিয়াজ আনোয়ার উর্দু সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি। তাঁর জন্ম ও নিবাস পশ্চিম পাঞ্জাবের মুলতানে। বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ এই কবি আজ উর্দু সাহিত্যে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত। রিয়াজ আনোয়ারের শিল্পীসত্তার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে কোনো সমালোচক বলেছেন, "যুগ যুগ ধরে যে রোমান্টিকতা উর্দু কবিদের দৃষ্টিতে নীলাঞ্জন ছায়া বিস্তার করেছে এবং যে গীতিঝঙ্কার তাঁদের কণ্ঠে মধু ঢেলেছে, সেই রোমান্টিকতা ও গীতিধর্ম রিয়াজ আনোয়ারের কবিতার প্রাণসম্পদ। কিন্তু এ ছাড়াও তাঁর আরো বিশেষ পরিচয় রয়েছে। মানুষকে এবং তার প্রতিবেশ ও প্রকৃতিকে, দেশ কাল ও ইতিহাসকে অবলোকন এবং পর্যবেক্ষণ করার বিশেষ ভঙ্গি রয়েছে তাঁর। এখানে তিনি নিদারুণ জীবনশিল্পী। বাস্তববোধের সঙ্গে পবিত্র আবেগের এখানে আশ্চর্য সাযুজ্য। এমনি আশ্চর্য সাসুজ্যের ফসল রিয়াজ আনোয়ারের 'আওয়াজো কা ভঁওয়ার'-ধ্বনির আবর্ত।" বাংলাদেশের পটভূমিতে লেখা এই কাব্যটি কবির দীর্ঘদিন এখানে অবস্থানের ফল। এখানকার মাটি, নদী, গাছ, শস্যক্ষেত্রের শ্যামলিমা, এর মানুষ এবং তার উদাস আলো ও ধ্বনির আবর্ত তাঁকে বারবার মুলতানের মরু অঞ্চল থেকে টেনে এনেছে। তিনি এ ভূ-খণ্ডকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন, তার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সফর করেছেন।

সমালোচকের মতে, 'রিয়াজ বাংলার পেলব দেহসুষমা বা নদীধৌত উত্তাল যৌবন শুধু নয়—তার ক্ষুধা, তার অভাব, তার চোখের পানিও দেখেছেন।' বস্তুতঃ বাংলার মানুষ ও মাটির প্রতি তাঁর অদম্য নিরভিমান ভালবাসাই আলোচ্য কাব্যে শিল্পরূপ লাভ করেছে।

বাংলাদেশের অন্তরঙ্গ জীবনের কবি জসীমউদ্‌দীন রিয়াজের কাব্যটি অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এক বিশেষ আন্তর প্রেরণায়। 'অপরের দৃষ্টির আয়নায় নিজেদের ছবি' কেমন দেখায়, তা জানবার আগ্রহ থেকেই যে জসীমউদ্‌দীন কাব্যটি অনুবাদ করেছেন, তার স্বীকৃতি রয়েছে আলোচ্য অনুবাদ গ্রন্থটির ভূমিকায় সন্নিবেশিত অনুবাদকের কথার মধ্যে। তবে উর্দু কাব্যের অনুবাদ কবির পক্ষে খুব সহজ কাজ ছিল না, কারণ কবি নিজে উর্দু তেমন জানেন না। এমতাবস্থায় কবিকে অপরের উপর নির্ভর করতে হয়েছে অনেকখানি। তিনি প্রথমে উর্দু ভাষাভিজ্ঞ বন্ধুদের সাহায্যে মূল কাব্যের ভাববস্তুর সাথে পরিচিত হয়েছেন, পরে সেই ভাববস্তু যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রেখে কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন। অনুবাদের এই পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ইতিপূর্বে আমার 'মাটির কান্না' বইখানা রুশভাষায় অনূদিত হয়। ওদেশের একজন লেখক প্রথমে বইখানা সরল গদ্যে অনুবাদ করেন, পরে একজন বিখ্যাত কবি তাহা কবিতাকারে রূপান্তরিত করেন। ....রিয়াজ আনোয়ারের বইখানা অনুবাদ করিতে আমিও সেই পন্থা অনুসরণ করিয়াছি।' কবির কাছ থেকেই আমরা জানতে পেরেছি যে, আফতাব পারভেজ ও মঈনুদ্দীন নামক দুই উর্দু ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমে 'আওয়াজো কা ভঁওয়ার' গ্রন্থের গদ্যানুবাদ করেন এবং পরে তিনি তাকেই কবিতায় রূপান্তরিত করেন। অনুবাদ গ্রন্থের নাম 'পদ্মা নদীর দেশে' তিনিই দিয়েছেন।

রিয়াজ আনোয়ারের তাঁর 'আয়াজো কা ভঁওয়ার' গ্রন্থের কবিতাগুলো রচনার যে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিয়েছেন, তা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, এ কাব্য কবিচিত্তের আবেগোদ্বেল কতগুলো মুহূর্তেরই প্রকাশ। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরের শেষ রাতের

নীরবতার মধ্যে বিখ্যাত বাঙালী অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে শহীদ মিনারের পাদদেশে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ ও বাঙালী জীবন সম্পর্কে যে প্রচণ্ড আবেগ-আকুলতা তিনি বোধ করেছিলেন, তাই যে আলোচ্য কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছিল, তার স্বীকৃতি পাই কবির কথায়, "আমার মনে হল, শহীদ মিনার আমাকে যেন ডাক দিচ্ছে, ডাক দিচ্ছে। হাস্যোচ্ছল ধান ভরা ক্ষেত, কুলকুলু রবে বয়ে যাওয়া নদী, ভাঙা নৌকার ছেঁড়া পাল, বাত্যাহত মাঝি, অনশনক্লিষ্ট চোখ, নৃত্যরতা মৃগনয়না মেয়ে, ভাটিয়ালির গন্ধ, সুগন্ধি বাতাসের আমেজ, যক্ষ্মাগ্রস্ত মানুষ এবং অন্ধকার গলি। তারা ডাক দিচ্ছে আর বলছে, হে পশ্চিম দেশের কবি, তুমি আমাদের সম্বন্ধেও কিছু লেখ। আমরাই জীবনের কঠোরতম সত্য।

ভাঙা ভাঙা গলায় আমি উত্তর করলাম, মা তোমার দুঃখ, তোমার সুন্দরতার কথাকে কাব্য করে বলব, তেমন শব্দ আর উপমা আমি কোথায় পাব? আমি যে নিঃস্ব।

ধরিত্রী মা আমাকে আশ্বাস দিলেন, 'তুমি পারবে, তুমি কলম ধরো। হারিয়ে যাওয়া আশাদের আমি আবার ফিরে ফেলাম! শহীদ মিনারের পাদদেশে চুপচাপ বসে বসে আমি সংকল্প নিলাম।'

রিয়াজ আনোয়ার আরও জানিয়েছেন, 'সেই রাত্রেই এই দীর্ঘ কবিতার প্রথম অংশ আমি লিখেছি। তারপর তিন বছর ধরে অবিরাম চেষ্টার পর আমার সংকল্প পূর্ণ হয়েছে।"

রিয়াজ আনোয়ার দাবি করেছেন ঃ "এই কবিতার বেশীর ভাগই আমি লিখেছি তন্ময়ভাবে। সিন্ধু আর পদ্মার প্রচণ্ড ঢেউয়ের মত শব্দেরা আছড়ে আছড়ে পড়েছে এবং তারা সুর ছন্দ হয়ে ধরা দিয়েছে। এর প্রতিটি চরণ আমার সাধনার সৃষ্টি। আমি যেন দেহের রক্ত দিয়ে শব্দগুলো গড়েছি আর অশ্রু দিয়ে সেগুলোকে সাজিয়েছি।" তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম 'আওয়াজোঁ কা ভঁওয়ার'—ধ্বনির আবর্ত রাখার সার্থকতা এখানেই নিহিত রয়েছে। অনুবাদক জসীমউদ্‌দীন 'অনুবাদকের কথা' হিসেবে যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে রিয়াজ আনোয়ারের এ দাবিকে মোটামুটি মেনে নিয়েছেন বলেই মনে হয়। তাই তিনি গ্রন্থটির অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হন নি, এতে যে উচ্চমানের কবিত্ব রয়েছে, তারও প্রশংসা করেছেন।

জসীমউদ্‌দীন তাঁর অনুবাদ-কর্মের নাম রেখেছেন 'পদ্মা নদীর দেশে'। এতে মূল কাব্য সুরের ব্যঞ্জনটি যেমন অক্ষুণ্ন রয়েছে, তেমনি কাব্যের ভাববস্তুর যথার্থ ইঙ্গিতটিও ধরা পড়েছে। পরিশিষ্টের কবিতাংশ ছাড়া সংকলিত মোট দশটি কবিতা যেন এক অবিচ্ছিন্ন ভাব প্রবাহেরই দশটি তরঙ্গ। পরস্পর থেকে পৃথক অথচ সুর-সাযুজ্যে অবিচ্ছিন্ন কবিতা তরঙ্গগুলোর নাম যথাক্রমে 'যারা দিল প্রাণ' 'খোয়াবের দেশ কক্‌স বাজার', 'মেঘনার বুকে', 'বাদল বরিষণে', 'আমি এক মুসাফির', 'কাফনের মিছিল', 'চায়ের বাগান', 'সুন্দর বনে' 'সোনার বাঙলা' ও 'অতীতের অন্ধকারে'।

প্রথম কবিতা 'যারা দিল প্রাণ' ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতি-স্মরণে উদ্বেলিত কবিচিত্তের এক আবেগঘন প্রকাশ। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও এর তরুণ-তরুণীদের অপরূপ জীবন-মাধুর্যের পটভূমিতে অন্যায়, অত্যাচার, উৎপীড়নের বৃশ্চিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তির ব্যাকুলতায় অধীর আত্মদানে, অকৃপণ সংগ্রামী বাঙালী চরিত্রের প্রতি অন্তরের অর্ঘ নিবেদিত হয়েছে কবিতাটিতে। দ্বিতীয় কবিতা 'খোয়াবের দেশ কক্‌স বাজার'। পাহাড় ঘেরা সমুদ্র মেখলা, বনানী কুন্তলা চট্টগ্রামের দক্ষিণ প্রান্তের ক্ষুদ্র শহর কক্‌স বাজার দর্শনের পর কবিচিত্তে যে আবেগ ঘনীভূত হয়েছিল তারই প্রকাশ। এই কক্‌স বাজারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বৌদ্ধ ও মুসলিম কৃষ্টির নানা নিদর্শন কবির সামনে এক স্বপ্নরাজ্যের ছবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। কবিতাটিতে সে অভিজ্ঞতার ছাপই বিধৃত। এ কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় কবিতা

হচ্ছে 'মেঘনার বুকে'। এতে উত্তাল মেঘনা নদীর বুকের বাঙালীর সংগ্রামী জীবননাট্যের যে দৃশ্যগুলো প্রতিদিন অভিনীত হচ্ছে, ভাঙা-গড়া ধ্বংস-সৃষ্টির বিস্ময়কর অথচ ভয়াবহ লীলা চলছে মেঘনার উদার, বিস্তৃত, বিশাল তরঙ্গপ্রবাহে বিধৃত আবহমান বাঙালী জীবনের সেই সুরটিই ফুটে উঠেছে। চতুর্থ কবিতা 'বাদল বরিষণে' বর্ষা প্রকৃতির পটে বিধৃত বাংলাদেশের এক সুরময় ছবি। নদীমাতৃক বাংলাদেশের বর্ষাকালীন জীবন-প্রবাহের এক জীবন্ত আলেখ্য তার সমগ্র বাস্তবতা নিয়েই ধরা দিয়েছে কবিতাটিতে। পঞ্চম কবিতা 'আমি এক মুসাফির'—যন্ত্রণাবিদ্ধ কবি মুসাফিরের জীবনান্বেষার একটি অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়েছে। পথহারা কবি অনেক বন প্রান্তর মাঠ ঘাট পরিক্রম করে সুবিশাল পদ্মাতীরে পৌঁছে কিভাবে আপনার বহু জিজ্ঞাসার জবাব পেয়েছেন, তাই বর্ণনা করেছেন। ভীষণ অশান্ত বক্ষা পদ্মার তীরেও ধ্বংস ও সৃষ্টির যে চিরন্তর লীলা চলছে, তার মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালীর জীবন বাস্তবকেই শুধু প্রত্যক্ষ করেন নি, সামগ্রিকভাবে মানব জীবনের পরিণামী রূপটিরও সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন। কবিতাটি কবির এক ধরনের আত্মদর্শনমূলক বক্তব্যই বটে।

'পদ্মা নদীর দেশে,' কাব্যের সর্বত্রই বাংলাদেশকে অন্তরঙ্গভাবে জানার একটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কবি শুধু বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এর নরনারীর জীবন বা এদেশের অতীত ঐতিহ্যের উজ্জ্বল আলোকে স্নাত হয়ে তৃপ্তি খোঁজেন নি। বাংলাদেশের দুঃখদৈন্যক্লিষ্ট মানুষের জীবন-বাস্তবকেও সমান সততা সহকারে তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন। এ কাব্যগ্রন্থের ষষ্ঠ কবিতা 'কাফনের মিছিল, তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের সত্যকার রূপ যে তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন তা আমরা বুঝতে পারি যখন তিনি কবিতাটির সূচনাতেই বলেন ঃ যেখানে তোমার ধানের ক্ষেতের কোমল পত্র দোলে সেখানেই বাজে দুঃখের কঠিন কাঁটা। 'রবীন্দ্র নজরুল নন্দিত সুন্দর দেশ এই বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় যে মৃত্যুর মিছিল চলেছিল, তারই ভয়াবহ, বেদনাদায়ক স্মৃতি এ কবিতার দেহে সঞ্চারিত হয়েছে। সপ্তম কবিতা 'চায়ের বাগান' কবিতায় বাংলাদেশে শ্বেতাঙ্গ শোষণের প্রতীক কবির দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে। চায়ের বাগানের নয়ন ভোলানো রূপও কবিকে এ সত্য দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করতে পারে নি। অষ্টম কবিতা 'সুন্দর বনে' বাংলাদেশ পরিক্রমার অভিজ্ঞতাবাহী আর একটি ফসল।

দ্রুত স্রোত বহা তটিনীর দুই পাশে অবস্থিত বৃক্ষের অন্তহীন মেলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কবির মনে সুন্দর বনের প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়াও এর অতীত ইতিহাসের যে ছায়াপাত ঘটেছে তা থেকেই বোঝা যায় এ কবি বাংলাদেশকে শুধু বর্তমানের চোখে দেখেই তৃপ্ত বোধ করেন নি ; ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন গতিপ্রবাহের মধ্যে তাকে স্থাপন করে, তার চিরকালীন জীবন-মহিমাকে অনুধাবন করার চেষ্টা পেয়েছেন। নবম কবিতা 'সোনার বাঙলা'কে প্রশস্তিমূলক কবিতা বলা চলে। প্রাচীন গৌরবের পটভূমিতে রচিত এ কবিতায় বাংলাদেশকে এক নতুন মহিমা দানের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কবির জীবনে বহু মহান সন্তানের জন্মভূমি এই বাংলার গৌরব-মহিমা অনুষ্ঠানের সুযোগ এসেছিল প্রাচীন কীর্তি বিজড়িত সোনার গাঁ শহর পরিদর্শন উপলক্ষে। সোনার গাঁ আজ ধ্বংসস্তূপ। কিন্তু একদিন তা ছিল 'বাংলার গৌরবের উজ্জ্বল প্রদীপ'। বাঙালী সেদিন বলবীর্য বত্তায় শুধু নয়, মানসঐশ্বর্যেও ধনী ছিল। এই বাংলার সন্তানরা দেশের জন্য প্রাণ দিতে কোন দিন কসুর করে নি। কবির বিশ্বাস এক কালের সোনার বাংলা আজ দুর্দশাগ্রস্ত হলেও একদিন সেখানে 'নব জীবনের প্রদীপ উঠিবে জ্বলি' এ কাব্যের দশম এবং প্রকৃত পক্ষে শেষ কবিতায় হচ্ছে 'অতীতের অন্ধকারে'। কবিতাটিতে শোষণ বঞ্চনা ক্ষুদ্র সমকাল-বাংলাদেশের মানুষেরই মনের মানচিত্র

দেখে কবিচিত্তে যে ভাবনার আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে, তারই প্রকাশ ঘটেছে। একসূত্র ইতিহাস চেতনার সাথে জড়িত বলেই কবিতাটি আশ্চর্যরূপ আবেদনশীল হয়ে ধরা দেয় আমাদের কাছে। বাংলাদেশের ইতিহাসেই আলো ও ছায়ার খেলা চলেছে চিরকাল। বাঙালীর জীবন একদিন আলোকিত হয়েছিল, কবি, ঋষি, দরবেশ, ফকীর, বাউল প্রভৃতি অধ্যাত্ম-জীবন সাধকদের প্রেমের আলোকে। কিন্তু বিদেশী শ্বেতাঙ্গ শাসন সে আলোকবর্তিকার সবগুলো নিভিয়ে দিয়েছিল নির্মম শোষণ চালিয়ে। তারপর বাঙালী সন্তান সেই অন্ধকারের মধ্যে যুগ যুগ ধরে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে, বহু আত্মদানের ফলে পেয়েছিল স্বাধীনতা। ঐ স্বাধীনতায় তাকে পৌছে দিয়েছিল নব-জীবনের দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু ঠিক তখনই তাকে আবার অন্ধকারে নিক্ষেপ করার কুটিল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল নতুন শোষক শ্রেণী। তার ফলে বাংলার বসন্তকালে সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করতে এসে কবি পথ হারিয়ে ফেলেছেন নির্জন মরুতে। বাংলাদেশের অতীতের অন্ধকার দিনগুলোর ছায়াপাত লক্ষ্য করে কবি অনুভব করেছেন এক ধরনের বিষণ্নতা।

পরিশিষ্টের কবিতাংশে কবি বাংলাদেশ থেকে নিজ বাসস্থান মরুময় মুলতানে ফিরে যে শূন্যতা বোধ করেছেন, তারই জন্য বেদনা ব্যক্ত করেছেন। বহু দূরে মরুভূমির কোলে বসে তিনি শ্যামল-শস্যভরা বাংলাদেশের বড় আকুল করা রূপের পাশে পারিপার্শ্বিক মরুভূমির শোষণ বিলাস ক্লেদময় জীবনের দৈন্য প্রত্যক্ষ করে দুঃখ বোধ করছেন এবং বাংলাদেশের শ্যামল রূপের স্মৃতি-তর্পন করে সে জ্বালা প্রকাশিত করার কথা ভাবছেন।

এবার আলোচনার উপসংহার টানা যাক। আমরা আনোয়ারের মূল কাব্য পড়ি নি কিন্তু মূল কাব্যের সাথে পরিচয়ের অভাব সত্ত্বেও যে আমরা 'পদ্মা নদীর দেশে'র কবিতাগুলো পাঠ করে এক প্রকার আত্ম আবিষ্কারের আনন্দ পাই, তা অকুণ্ঠভাবেই স্বীকার করতে হয়। আনোয়ারের কাব্য যে বিশিষ্ট শিল্পগুণে সমৃদ্ধ এবং জসীমউদদীন যে মূল কবিতার আমেজ অনুবাদে অনেকটা সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছেন, তা অনূদিত কবিতাগুলোর কলামণ্ডিত প্রকাশ ও পাঠক-মনে আবেদন সৃষ্টির ক্ষমতা থেকেও অনুভব করা যায়।

ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে

জসীমউদদীনের ক্ষুদ্রতম কাব্যগ্রন্থ 'ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে' প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। একাত্তরের বাংলাদেশে পাকিস্তানী দুঃশাসনের ভয়াবহতার পরিপ্রেক্ষিতে কবির মানস প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটেছে এই কাব্যটিতে। গ্রন্থের ভূমিকার বক্তব্য থেকে এটা পরিস্ফুট যে, কবি পাকিস্তানী হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের একজন শিল্পীসৈনিক হিসেবে পুরোপুরি অঙ্গীকৃত (Committed) হয়েই শত্রুর বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগের জন্যেই এ কাব্যের কবিতাগুলো রচনা করেছিলেন। কবিতাগুলোর মধ্যে তাই আমরা পাই চরম জাতীয় দুর্দিনে শিল্পী হিসেবে সামাজিক দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ এক সংগ্রামী চেতনাসম্পন্ন মানুষকে। শিল্পসৃষ্টি হিসেবে এ জাতীয় কবিতার বিচারের প্রশ্ন তাই অবান্তর না হলেও, অপ্রাসঙ্গিক। তথাপি কবিতাগুলো যেহেতু একজন সত্যিকার কবির রচনা, তাই যে বিষয় নিয়েই না সেগুলো লেখা হোক, তাতে কিছুটা কাব্যগুণ সঞ্চারিত হবেই, এমন একটা প্রত্যাশা পাঠক-মনে জাগলে তাকে অসঙ্গত বলা চলে না। আলোচ্য কাব্যে নিজস্ব কাব্যবৃত্ত

থেকে দূরে সরে এসেও কিন্তু কবি ভাষা, ছন্দে ও অন্যবিধ কাব্যকলা কৌশলে অনেকটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়েই উপস্থিত। আবেগে উত্তপ্ত কবি-হৃদয়ের স্পর্শ কাব্য বস্তুতেও যে কোথাও কোথাও সঞ্চারিত হয়েছে, তাও স্বীকার করতেই হয়। তবে বিশেষ উদ্দেশ্যমূলকতার দায় বহন করতে গিয়ে কবিতার প্রাণশক্তি এখানে যে দারুণভাবে পীড়িত হয়েছে তা না মেনে উপায় নেই।

এবার কাব্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাক। উৎসর্গপত্রের 'শহীদ সামাদ স্মরণে' শীর্ষক কবিতা এবং তিনটি গানসহ এ কাব্যে সংকলিত কবিতার সংখ্যা মোট আঠার। এর অধিকাংশই রচিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে জুলাই মাসের মধ্যে। এর আগের ও পরের দু চারটি তারিখ চিহ্ন-বিহীন কবিতাও গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। মুক্তিসংগ্রামের সময় এর কতগুলো কবিতা 'তুজম্বর আলি' ছদ্মনামে রাশিয়া, আমেরিকা ও ভারতে প্রকাশের জন্য পাঠান হয়েছিল এবং ঐগুলো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি বিশ্বের বিবেকবান মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল।[১]

সংকলিত কবিতাগুলোর বক্তব্য বিভিন্ন হলেও, লক্ষ্য যে এক তা বুঝতে কষ্ট হয় না। বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদারদের মানবতাবিরোধী ভয়াবহ বীভৎস, বর্বরতামূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে স্বদেশ ও বিশ্ববাসীর মনে ঘৃণা জাগিয়ে বাঙালী প্রতিরোধ আন্দোলনের ন্যায্যতা প্রতিপাদন এবং তাকে জয়যুক্ত করার জন্য মুক্তিসংগ্রামীদের অনুপ্রেরণা দানই ছিল কবিতাগুলোর লক্ষ্য। সে লক্ষ্য যে কিছুটা সাধিত হয়েছে তা কাব্যের ভূমিকায় কবির বক্তব্য থেকে পরিস্ফুট হয়েছে। উৎসর্গপত্রের 'শহীদ সামাদ স্মরণে' কবিতাটির মাধ্যমে কবি দেশের জন্য যাঁরা নিঃশেষে প্রাণ দান করেছেন সেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

.... তাদের স্মরণ পথে
ভাসালেম মোর মানসের ফুল আজিকে কালের স্রোতে।

এর থেকে এটি স্পষ্ট যে এ কাব্য লিখে কবি সামাদের ন্যায় সকল তরুণ শহীদের আত্মত্যাগের কাহিনীকে স্মরণের পথে তুলে ধরে জাতীয় কর্তব্য পালনের প্রয়াস পেয়েছেন।

'ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে' কাব্যের প্রথম কবিতা 'বঙ্গবন্ধু' নানা কারণেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অগ্রনায়ক শেখ মুজিবর রহমান চরম সাহসিকতা, আত্মত্যাগ ও দুঃখ বরণের ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে নিপীড়িত, শোষিত ও লাঞ্ছিত বাঙালী জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে বঙ্গবন্ধুর মর্যাদা লাভ করেছিলেন একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বেই। এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব এই বন্ধবন্ধু যার হুকুমে অচল হয়ে গিয়েছিল শাসকের সকল নিষ্পেষণ যন্ত্র, বাঙালী নর-নারী হাসিমুখে বুকে বুলেট পেতে নিয়েছিল শোষক সেনাবাহিনীর। যে অভয় মন্ত্র তিনি বাঙালীকে দিয়েছিলেন তারই বলে বলিয়ান হয়ে বাঙালী তাকে শাসকরূপ কংসের কারাগার থেকে বের করে এনেছে বারবার রক্তমূল্যে। কবি স্বপ্ন দেখেছেন তারই নেতৃত্বে একদিন 'আমার সোনার বাংলা' প্রাণ পাবে। বাঙালী হবে চির নির্ভিক একটি সংগ্রামী জাতি। যে জাতি জাতীয় স্বার্থবিরোধী নেতৃত্বকে বাধ্য করবে জবাবদিহি করতে। বস্তুতঃ বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের এই ব্যক্তিত্বই বাঙালীকে বল যুগিয়েছিল 'একাত্তরের সেই ভয়াবহ দিনগুলিতে' জিইয়ে রেখেছিল তার সংগ্রামী

১. 'ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে' কাব্যের 'লেখকের কথা দ্রষ্টব্য।

গেরণাকে। তাইতো 'ভয়াবহ সেই দিনগুলির' কথা বলতে গিয়ে কবি প্রথমেই সংগতভাবে 'বঙ্গবন্ধুর' প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

দ্বিতীয় কবিতা 'কবির নিবেদন' একাত্তরের পঁচিশে মার্চ বাংলাদেশের বুকে পাকিস্তানী শাসকরা যে ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা শুরু করেছিল, তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রূপে লিখিত। কবিতাটিতে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানান হয়েছে পাকিস্তানী বর্বরতার শিকার বাংলাদেশের আর্তমানবতার সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্যে।

'ইসলামী ভাই' শীর্ষক পরবর্তী কবিতায় সুতীব্র ব্যঙ্গের ঝাঁজ পাওয়া যায়। একদিন ইসলামী সৌভ্রাত্রের 'এক আল্লাহ্' এক কোরআন, এক রসুলের গালভরা বাণী নিয়ে পশ্চিম থেকে এসেছিল পাকিস্তানীরা বাংলাদেশের মানুষকে অনেক মনোহর আশ্বাসের কথা শুনিয়ে। বাঙালি ভেবেছিল, কত প্রেম ভালবাসার ঝরণাধারাই না তারা বইয়ে দিবে। কিন্তু হায়! আচরেই বাঙালি দেখতে পেল স্বধর্মীর বেশে তাদের দেশে প্রবেশ করেছে নরহন্তা শয়তানের দল। যারা ধর্মীয় সংহতি ও ইমানের নাম করে কোরানের অপব্যাখ্যা করে জনতার মধ্যে একদিকে বিভেদের বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে, অন্যদিকে লুণ্ঠন, ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে দেশকে শ্মশান করছে। ধর্মীয় সৌভ্রাত্রের নাম করে এ মানবতা বিরোধী আচরণ করছে কি না ইসলামী ভাইরা। কবিতাটিতে একদিকে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, অন্যদিকে ভণ্ড প্রতারকের প্রতি ব্যঙ্গমিশ্রিত ঘৃণার সুর তীব্রভাবে বেজে উঠেছে।

'তোমার কবিতায়' পাকিস্তানি হানাদারদের লালসা ও বর্বরতার শিকার বাঙালি নারীর চরম লাঞ্ছনা ও অপমানে বিক্ষুব্ধ চিত্ত কবির মর্মজ্বালা ব্যক্ত হয়েছে। নারীর যে রূপ কবিতা কুসুম হয়ে ফুটে ওঠে মানুষের হৃদয় সরোবরে, আজ তা পাশবিক শক্তির ক্ষুধার আহার হয়ে উঠেছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোন পথ দেখছেন না কবি। এ অবস্থায় কবি তাকে নিয়ে কি কবিতা লিখবেন। পারলে তিনি হয়ত এমন কবিতা লিখতেন, যা ঐ দস্যুর চরম দণ্ডবিধান করে ওদেরই রক্তে সিঞ্চিত করতো লাঞ্ছিত নারীর পদতল। 'কি কহিব আর' শীর্ষক পরবর্তী কবিতায় কিভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী একাত্তরের মার্চ মাসের শেষ দিনগুলোতে এবং সারা এপ্রিল মাস ধরে দুষ্কৃতিকারীদের দমনের নাম করে বাংলাদেশের সকল নগর, বন্দর ও পল্লীতে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংস চালিয়ে দেশকে শ্মশান করে ফেলেছিল, তার একটি তথ্যনির্ভর বর্ণনা স্থান পেয়েছে। বর্বর ঐ সেনারা মানবতাবিরোধী যাবতীয় অপকর্ম করেছিল কিন্তু ধর্মীয় সংহতির নামে। এ সব খবর বিশ্ববাসীর কানে যাতে না পৌঁছায়, তার সব ব্যবস্থাই তারা করেছিল। কবি কিন্তু কঠোর বিধিনিষেধের বেড়ীর মধ্যে অবস্থান করেও সে খবর তাঁর কবিতার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কি-ই বা আর তিনি করতে পারতেন। আপন অসহায়তার বেদনায় গুমরে মরেছেন কবি। 'খবর' কবিতায় পাকিস্তানি দুঃশাসনদের অত্যাচার-কবলিত বাংলাদেশের অসহায় মানুষের হৃদয়ের আর্তি তীব্র সুরে বেজে উঠেছে। চারিদিকে তখন হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ চলেছে ব্যাপকভাবে। কারো জীবনে সামান্যতম নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ছিল না। শহর, পল্লী সর্বত্রই লোক আতঙ্কে দিন গুনেছে; কখন কার ঘর পোড়ে, কখন কার রক্ত মাটিতে পড়ে, কোন্ অভাগিনীর নারীত্বের চরম লাঞ্ছনা ঘটে, তার ঠিক নেই। হানাদারের অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণের আশায় দল বেঁধে নর-নারী চলেছে আশ্রয়-সন্ধানে। কিন্তু নরঘাতী দস্যুদের কবল থেকে তারা নিস্তার পায় নি। পথের বুকেই শত্রুর নখর ঘায় লুটিয়ে পড়েছে তারা। কোথায় সামান্যতম দয়া মায়া নেই। মানবতার মৃত্যু হয়েছিল সেদিন বাংলাদেশে। ঐ 'খবর' বিশ্ববাসীকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টাই কবি করেছেন 'খবর' কবিতায়।

'দগ্ধগ্রাম' ও 'ধামরাই রথ' কবিতা দুটিতে কবি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অপকীর্তির দুটি চমৎকার নমুনা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। প্রথমোক্ত কবিতায় কবি হানাদার বাহিনীর তাণ্ডবাবিধ্বস্ত বাংলাদেশের একটি সমৃদ্ধ পল্লীর সর্বনাশের ছবি তুলে ধরেছেন, দ্বিতীয়টিতে বাংলাদেশের পল্লীজীবন ও সংস্কৃতির এক জীবন্ত স্বাক্ষর ধামরাইয়ের রথটি ধ্বংসের বেদনাদায়ক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। দুটি কবিতায়ই স্বদেশপ্রেমিক কবির অন্তর্বেদনা ভাষা পেয়েছে।

'গীতারা চলিয়া যাবে' 'গীতারা কোথায় যাবে' এবং 'গীতারা কোথায় গেল' এই তিনটি কবিতারই ভাববস্তু একসূত্রে গাঁথা। কবির সঙ্গে অন্তরঙ্গ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ একটি হিন্দু পরিবারের প্রাণের দায়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবার বেদনাদায়ক ঘটনার স্মৃতি এ তিনটি কবিতার ভাববস্তু যুগিয়েছে। তাদের চলে যাবার কথা কানে আসতেই কবির মন বেদনায় ভরে উঠেছে। তিনি ভাবছেন, নির্বান্ধব দেশ থেকে কোথায় গিয়ে যে তারা আশ্রয় পাবে তা অনিশ্চিত। কিন্তু উপায় নেই। মানুষ যেখানে পশু হয়ে গিয়েছে, সেখান থেকে যেতেই হবে। শেষ পর্যন্ত গীতারা কোথাও নিরাপদ আশ্রয় পেল কিনা, তাও কবি জানেন না। হয়তো পথে পশুর দল তাদের গ্রাম ঘিরে সব আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে, গীতার মত কচি মেয়েকে হত্যা করেছে নিষ্ঠুরভাবে। এই সব ভেবে কবির হৃদয় কেঁদে ওঠে। কবিহৃদয়ের এ সব তরঙ্গ-দোলাই ভাষা পেয়েছে কবিতাত্রয়ে।

'মুক্তিযোদ্ধা' কবিতাটি আত্মকথনের ভঙ্গিতে রচিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা বহুরূপী শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ে উৎসর্গিতপ্রাণ। সকল ভয়-বাধা, ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে সে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে, শত্রুকে ধ্বংস করার দুর্বার বাসনায়। দেশের মা-বোনের ইজ্জত রক্ষা করা, দেশ থেকে শত্রু সেনাকে উৎখাত করে দেশের সুখ-সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনার মহান সংকল্প নিয়ে সে চালিয়ে যাচ্ছে মরণপণ সংগ্রাম। এই মুক্তিযোদ্ধার মানস-মূর্তিটি রচিত হয়েছে নির্যাতিত নর-নারীরই বক্ষে।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের তিনটি গানেও কাব্যের মূল সুরের অনুরণন স্পষ্ট। প্রথম গানটি পল্লীগীতির সুরে রচিত হলেও এতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সমস্ত বাঙালির একাত্মতার অনুভূতিটি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। চারণকবি মুকুন্দ দাসের কোন গানের 'সাবধান। সাবধান। আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্রদীপ্ত মূর্তিমান' এই পংক্তিদ্বয় অবলম্বনে রচিত। দ্বিতীয় গানটিতেও শত্রুর মানবতা-বিরোধী কার্যের প্রতি সোচ্চার ধিক্কার ও সাবধান-বাণী উচ্চারিত হয়েছে। 'হবে হবে জয়' কবিতায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষের উদ্দেশ্যে বরাভয়-বাণী উচ্চারিত হয়েছে। 'স্বাধীনতার দিনে' কবিতাটিতে একটি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ করে প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে বাঙালি জীবনে যে সার্বিক বঞ্চনা-লাঞ্ছনার ক্ষোভ জমে উঠেছে তাই যেন রুদ্র রোষে ফেটে পড়েছে। সর্বশেষ কবিতা 'জাগায়ে তুলিব আশায়' রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষে বিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশকে সত্যিকারের সোনার বাংলা করে গড়ে তোলার সাধু সংকল্প ব্যক্ত হয়েছে। এই দেশ গড়ার কাজে কবি যা করতে পারেন, তা হল সকলের মনে আশা-ভরসা জাগিয়ে সবাইকে দেশগঠনের কাজে উদ্দীপ্ত করা। সে দায়িত্ব কবি এখানে সুন্দর ভাবেই পালন করেছেন। তিনি দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ, প্লাবন বন্যার কবল থেকে মুক্ত সোনালী ফসলে ঘেরা একটি দেশের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন সবার মনে আশা জাগায় বৈকি।

'ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে' কাব্যে আমরা যে জিনিসটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করি, তা হচ্ছে এই যে, এই কাব্যে তাঁর লেখনীকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সহায়ক এক হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তিনি একদিকে যেমন কবিতার মাধ্যমে জনতাকে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা যুগিয়েছেন, অন্যদিকে পাকিস্তানি বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্ব-বিবেককে জাগ্রত করার চেষ্টা পেয়েছেন। মানবতাবিরোধী পাকিস্তানি শাসকশক্তির কার্যকলাপের নিন্দা যেমন তিনি করেছেন, তেমনি প্রশংসা করেছেন দেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ মুক্তিযোদ্ধাদের। সর্বাত্মক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি মানবতার মহত্ত্বে একেবারে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন নি কখনও। তাই সর্বাত্মক অন্ধকারের সম্মুখীন হয়েও ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখতে কোন রকম মানসিক বাধা তিনি অনুভব করেন নি। বাংলাদেশ, বাংলার পল্লী, বাংলার সকল শ্রেণীর মানুষ, তাদের জীবন-বৈচিত্র্য সব কিছুই যে জসীমউদ্‌দীনের অতি প্রিয় এ সত্য আলোচ্য কাব্যেও ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে। 'একাত্তরের ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে' তিনি সেই সত্যকে আর একবার মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করেছেন।

মাগো জ্বালায়ে রাখিস্ আলো

জসীমউদ্‌দীনের সর্বশেষ খণ্ড কবিতার সংকলন 'মাগো জ্বালায়ে রাখিস্ আলো' তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থও বটে। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে তাঁর মৃত্যুর মাস খানেক আগে।

সর্বশেষ এই কাব্যগ্রন্থে কবি নতুন কোন কাব্যিক সিদ্ধি অর্জন করেছেন কিনা, তা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু জসীমউদ্‌দীনের সমগ্র কাব্যধারার পরিণতি নির্দেশক এ কাব্যের একটি ভিন্নতর তাৎপর্য রয়েছে, তা স্বীকার করতেই হয়। কাব্যের নামকরণে সেই বিশেষ তাৎপর্যের ইঙ্গিতটি পরিস্ফুট। পঞ্চাশ বছরেরও আগে পল্লীর সন্তান কবির কাব্যযাত্রা শুরু হয়েছিল; সেই যাত্রা পরিসমাপ্তি লাভ করেছে এ কাব্যে এসে। আমরা দেখেছি কবির কাব্যযাত্রা পল্লীপথ ধরেই শুরু হয়েছিল এবং সারাজীবন মুখতঃ পল্লীবৃত্তের মধ্যেই তা আপন অন্বিষ্টকে খুঁজে ফিরেছে। তবে এ কথাও সত্য, কবি সর্বদা পল্লীবৃত্তেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি। মাঝে মাঝে রোমান্টিক মনের স্বপ্ন-চারিতাবশে, কখনও কখনও বা যুগ-ঝঞ্ঝায় আলোড়িত হয়ে এ বৃত্তের বাইরেও চলে এসেছেন। কবির ভাবজীবনে যেমন, তাঁর বাস্তব-জীবনেও তেমনি এ ব্যাপার ঘটেছে। তবে এ কথা সত্য, কবির ভাবজীবনে প্রথমাবধি পল্লীরই একাধিপত্য ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাই তাঁর কাব্যের নিয়ামকশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। কবির বাস্তব-জীবন সম্পর্কে কিন্তু তা বলা চলে না, বাস্তব-জীবনে কবি শেষ পর্যন্ত শহর প্রবাসীই হয়ে পড়েছিলেন। জীবন-বাস্তবের দায় বহন করতে গিয়েই কবিকে শহরে বাসা বাঁধতে হয়েছিল ; শত ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি আর পল্লীতে ফিরে যেতে পারেন নি। এর ফলে কিছুটা মানস সংকটেরও সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন। তার চাপ তাঁর অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের কাব্যে দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে, জসীমউদ্‌দীনের কবিসত্তার মূল প্রোথিত রয়ে গিয়েছে পল্লীতেই। তাই দেখি শহরে বাস করেও পল্লীকে কিছুতেই ভুলতে পারেন নি তিনি। পল্লীর জন্যে একটা আর্তি শেষ পর্যন্ত বেজে ফিরেছে তাঁর কাব্যে। তাঁর সর্বশেষ কাব্য 'মাগো জ্বালায়ে রাখিস্ আলোতে' যে তীব্র হৃদয়াবেগের সঙ্গে তিনি পল্লীজননীকে প্রবাসী পল্লীসন্তানের ঘরে ফেরার অপেক্ষায় দোর গোড়ে আলো জ্বালিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন, তাতে তাঁর পল্লীপ্রাণ কবিসত্তার গভীরতম

স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। একে কবির Last testament বলে গ্রহণ করা চলে। তাই বলছিলাম, কবির এই শেষ কাব্যের একটা ভিন্নতর তাৎপর্য রয়েছে। বস্তুতঃ সর্বশেষ এই কাব্যে কবি আমাদের সকল সংশয় নিরসন করে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত বাংলা কাব্যে পল্লীজীবন ও সংস্কৃতিরই প্রবক্তা থেকে গিয়েছেন।

আলোচ্য 'মাগো জ্বালায়ে রাখিস্ আলো' কাব্যে সংকলিত কবিতার সংখ্যা তেইশ। কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছিল প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার নূরুল ইসলামকে। উৎসর্গপত্রে ঐ উপলক্ষে চিকিৎসকদের মহান সেবাব্রতের প্রশংসা করেছেন কবি। কাব্যে সংকলিত গুটি কয়েক কবিতায় সমকালীন জীবনভাবনার কিছুটা প্রকাশ লক্ষ্য করা গেলেও অধিকাংশ কবিতায়ই কবি পল্লীর কথাই বলেছেন। সেই পল্লীপ্রকৃতি, পল্লীর গৃহকোণ, কর্মরতা পল্লীনারী, পল্লীকিশোর-কিশোরী, সেই স্নেহময়ী পল্লীজননী, সেই দুঃখ-দৈন্যক্লিষ্ট পল্লী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা-হতাশার কথাই তিনি দরদ দিয়ে বলেছেন। কোন নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনার পরিচয় কবিতাগুলোতে উপস্থিত নয়। তবে শহর প্রবাসী কবি এখানে একাধিক বার স্পষ্ট করেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি মূলতঃ পল্লীসন্তান, দীর্ঘকাল শহরে প্রবাসী থেকেও তিনি পল্লীকে কোনমতেই বিস্মৃত হন নি। এখনও তিনি পল্লীগৃহে ফেরার স্বপ্ন দেখেন। কিছু কিছু কবিতায় রোমান্টিক কবিসুলভ প্রেম ও সৌন্দর্যভাবনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও, তাতে পল্লীপারিপার্শ্বের ছায়া অনুপস্থিত নয়। সে যাই হোক, সংকলিত তেইশটি কবিতার মধ্যে 'অন্বেষা-জননী', 'কোরবানী', 'গোরস্তান', 'মালদা জেলার মেয়ে', 'অপহৃতা', সেলাইরতা', 'খনেকের পরিচিত', 'এ হাসি কোথায় পেলে মেয়ে', 'আর একদিন আসিব কন্যা', 'সান্ত্বনা' এই এগারটি কবিতায় কবির সমকালীন জীবনভাবনা ও রোমান্টিকসুলভ প্রেম-সৌন্দর্যভাবনাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। তবে এসব কবিতায়ও গৌণভাবে পল্লীআবহের স্বীকৃতি রয়েছে, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। বাকি বারটি কবিতায় পল্লীভাবনাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। আমরা প্রথমে ঐ পল্লীভাবনার প্রকাশ ঘটেছে যে সব কবিতায়, সংক্ষেপে তাদেরই বস্তু-পরিচয় উদঘাটন করছি।

প্রথমেই ধরা যাক, নাম-কবিতা 'মাগো জ্বালায়ে রাখিস্ আলো'র কথা। কবিতাটিতে বাংলার আবহমান জীবনধারার প্রতীক পল্লীকে কবি তাঁর সমগ্রতায় আমাদের সামনে উপস্থাপিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। বাংলার পল্লীর বাস্তব-জীবনচর্যায় একদিন ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না ; সেই ঐশ্বর্যের অনেকটাই আজ কালধর্মে বিলীন হলেও, বাংলার পল্লীর অন্তর ঐশ্বর্যে এখনও ঘাটতি পড়ে নি বলেই কবির বিশ্বাস। পল্লীসন্তান আজ জীবন বাস্তবের পীড়নে শহরে পাড়ি জমাতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে জনপরিত্যক্ত পল্লী শ্রীহীন হয়ে পড়েছে সন্দেহ নেই। তবু আজও অনেক মাধুর্যের ডালি নিয়ে পল্লী আমাদের হাতছানি দিচ্ছে। সে এখনও ঐশ্বর্যরিক্ত নয়। কবির ধারণা, প্রবাসী পল্লীসন্তানদের অনেকেই হয়তো বা একদিন পল্লীমায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঘরে ফিরবে। পল্লীমায়ের প্রতি তাঁর অনুরোধ, মা যেন আঁধার গৃহকোণে আলো জ্বালিয়ে রেখে, সন্তানের প্রত্যাবর্তনের জন্যে অপেক্ষা করেন। মায়ের গৃহকোণের ঐ আলোই তো অন্ধকারে প্রবাসী পল্লীসন্তানকে পথের হদিস দিবে। কবি নিজেও পল্লীসন্তান হয়ে আজ শহরে প্রবাসীর জীবন যাপন করছেন। পল্লীর প্রতি তাই প্রাণের টান আজও প্রবল। তাইতো পল্লীমায়ের প্রতি তাঁর আকুল অনুরোধঃ 'মাগো জ্বালায়ে রাখিস্ আলো'। কারণ ঘরছাড়া সন্তান অন্ধকারে ঐ আলো অনুসরণ করেই হয়তো বা ঘরে ফেরার গরজ বোধ করবে।

'নির্বাসিতা' নামক দ্বিতীয় কবিতায় দারিদ্র্যের তাড়নায় পল্লীর ভিটেমাটিছাড়া পল্লীবালার দুঃখ-দীর্ণ মূর্তিটি ফুটে উঠেছে। দারিদ্র্যের তাড়নায় গ্রাম ছেড়ে চলে এসে পল্লীবালা শহরের বদ্ধ গলির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে প্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে ; অথচ তার দারিদ্র্য-দুঃখের কোন সমাধান হয় নি। শহরের গলির মধ্যে নির্বাসিতা পল্লীকন্যার জন্যে তাইতো কবির মনে সুতীব্র বেদনাবোধ জেগেছে! দেশের কোন কবিই তো এই নির্বাসিতা দুঃখিনী কন্যার দুঃখের কথা লিখেন নি। জসীমউদ্‌দীন তা করে এক পবিত্র সামাজিক দায়িত্বই পালন করেছেন এখানে।

'বন্দিনী' নামক তৃতীয় কবিতায় দারিদ্র-দুঃখের দুর্গে বন্দিনী পল্লীনারীর দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে কবি প্রকৃতপক্ষে বাংলার পল্লীর সামগ্রিক দৈন্যের ছবিই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কবিতাটিতে বাংলার পল্লীমানুষের দুঃখ-বেদনাদীর্ণ জীবনের আর্তিই যেন ভাষা পেয়েছে। এখানেও কবি শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে গভীর চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

'রাজার মেয়ে' কবিতায় রোমান্টিক স্বাপ্নিক কবি' বাস্তবের কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হয়েই যেন স্বপ্নভঙের বেদনা ব্যক্ত করেছেন। পল্লীর সুখ-স্বপ্নে বিভোর কবির ধারণা, এককালে পল্লীর স্বাভাবিক পরিবেশে রাজার দুলালীর মতই সুখে পল্লীবালার জীবন কাটত। সেই পল্লীর দুলালী আজ দারিদ্র্য-দুঃখের শিকার হয়ে দুঃখের দুঃসহ তপশ্চর্যা করে দিন কাটাচ্ছে। কারণ পল্লী যে আজ সর্ব ঐশ্বর্যরিক্ত। এই রিক্ততাবোধের বেদনায় কবিতাটি ভারাক্রান্ত।

'সোনামা' কবিতাটি পতি-পুত্র, কন্যাহারা এক দুঃখিনী পল্লীবৃদ্ধার অপরূপ স্নেহমমতা মাখান জীবনেরই একটি গাথা। সকল স্নেহের পাত্রকে হারিয়ে বৃদ্ধা আশ্রয় করেছিল স্নেহের শেষ সম্বল হিসেবে তার মৃতা কন্যারই সন্তান একমাত্র নাতিনীকে। এই নাতিনী, নাতজামাই ও তাদের শিশু সন্তানদের ঘিরেই বৃদ্ধা রচনা করে চলেছিল তার স্নেহজাল।

কবি অতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই স্নেহবুভুক্ষু নারীর অপরূপ স্নেহচর্যার অজস্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। হতভাগিনী এই বৃদ্ধার স্নেহের পাত্রপাত্রীদের সান্নিধ্যটুকু দীর্ঘদিন ভোগ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সংসারের দায় বহন করতে গিয়ে নাতজামাই ও নাতিনী তাকে পিছনে ফেলে রেখেই শহর কলকাতায় চলে যেতে বাধ্য হয় ; বৃদ্ধা তখন চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে স্নেহের সেই সূত্রটিকে প্রাণপণে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ ভাবে আর কতকাল চলে? সর্বস্নেহরিক্তা বৃদ্ধা একদিন সকল স্নেহের পাত্রের দৃষ্টির বাইরে জীবন-জ্বালা শেষ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। এমনি করেই নিদারুণ উপেক্ষার মধ্যে এক স্নেহবুভুক্ষু নারীর জীবননাট্যের অবসান হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার জগত থেকেই এ কবিতার উপাদান গৃহীত হয়েছে সন্দেহ নেই। বিষয়ের মানবিক আবেদনই কবিতাটিকে হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছে।

'পুত্রহারা' কবিতায় এক সন্তানহারা পল্লীজননীর স্নেহবুভুক্ষু হৃদয়ের অপরিসীম ব্যথা ও জ্বালা ব্যক্ত হয়েছে। কবরে শায়িত সন্তানের স্মৃতিচর্যায় রত মায়ের বেদনাদীর্ণ হৃদয়ের ছবিটিই উঁকি মেরেছে এ কবিতায়। পল্লীনারীর স্নেহার্দ্র করুণ এমন কত ছবিই না কবি প্রত্যক্ষ করেছেন বাস্তব-জীবনে। তারই দু'চারটি তিনি আমাদের কবিতার আকারে উপহার দিয়েছেন।

'সয়ালী' কবিতার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে নদীমাতৃক বাংলাদেশের চর অঞ্চলের জীবন থেকে। সূক্ষ্ম রূপালী সুতোর ন্যায় নদী এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে দুই চরের মধ্য দিয়ে। দুই তীরের জনপদ থেকে প্রতিদিন বিকেল বেলা মেয়েরা আসে নদীর ঘাটে জল ভরতে, কলসী কাঁখে ; আভাসে ইঙ্গিতে, হাসিতে, কথায় দুই পারের মেয়েদের মধ্যে কতই না সুখ-দুঃখ,

হাসি-কান্নার কথা বিনিময় হয়। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এলেই আবার তারা যার যার ঘরে ফিরে যায়। নিত্যকালের পল্লীজীবনের একটি সুরই গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে 'সয়ালী' কবিতায়।

'সয়ালী'র পরবর্তী 'ভাইটাল গাঙ', কবিতাটি ভাষা ও ভঙ্গিতে কিছুটা পরিমার্জনা সত্ত্বেও পল্লীকবিতার ভাষাভঙ্গি আশ্রয় করেই রূপলাভ করেছে। এতে ব্যবহৃত 'ভাইটাল', 'গাঙ', 'লিলুয়া', 'ধলোয়া', 'বগা', 'বিগান', 'দেশীয়া' ইত্যাদি শব্দে পল্লীগীতিকার আমেজ স্পষ্ট। কবিতাটিতে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের ভাটি অঞ্চলের নদীনালা, চর-সমাকীর্ণ অঞ্চলের বাস্তব প্রকৃতি ও জীবনের সুরটি চমৎকার ভাবে ধরা পড়েছে। জীবন ও নদীর নিরুদ্দেশ গতির ব্যঞ্জনা কবিতাটিতে একটি স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করেছে।

'বন্যাদস্যু' কবিতাটিতেও পল্লীজীবন-বাস্তবের আর একটি দিক উন্মোচিত হয়েছে। পল্লীর বুকে প্রাণপাত পরিশ্রমে চাষী ফসল ফলায়, স্বপ্ন দেখে সুন্দর জীবন রচনার, কিন্তু দেখা যায় কোথা থেকে হঠাৎ করে দস্যুর মতো বন্যা এসে হানা দিয়ে সবকিছু লুটপাট করে জনসাধারণকে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে যায়। পল্লীমানুষের জীবনে প্রকৃতির এই ক্রূর অভিশাপ যুগ যুগ ধরে অনর্থ সৃষ্টি করে আসছে। কবি জীবনভর পল্লীবাসীর জীবনের এই বঞ্চনাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। শহরবাসীদের পক্ষে পল্লীবাসীদের এই দুর্ভাগ্যের ছবি তত স্পষ্ট নয় বলেই কবি স্পষ্ট করে তুলেছেন সেই ছবি আপনার কবিতায়।

'সুন্দরবন' কবিতায় কবি বন্যপ্রকৃতির স্তুতি রচনাচ্ছলে প্রকৃত পক্ষে সুন্দরবনের বাস্তব-প্রকৃতির বর্ণনা যেমন দিয়েছেন, তেমনি এ অরণ্যাশ্রয়ী দক্ষিণ বঙ্গের মানুষের জীবনধারার বাস্তব ও ঐতিহ্যগত দিকেরও সুন্দর পরিচয় তুলে ধরেছেন। সুন্দরবনের আরণ্যক সংস্কৃতির পরিচয়টিও লেখক সহজভাবে এই কবিতার মাধ্যমে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

'আবার যাইব গাঁয়ে' নামক কবিতায় ঘরছাড়া প্রবাসী কবির মনের ঘরে ফেরার আকুলতাই যেন ব্যক্ত হয়েছে। পদ্মানদীর তীরে, ছোট্ট পল্লীকুটিরে, প্রাকৃতিক পরিবেশে শত সহস্র স্নেহবন্ধনের মধ্যেই কবির বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলো কেটেছিল। তার শত মাধুর্যের স্মৃতি আজও কবিকে আকুল করে। সেই একান্ত আপনার জায়গাটিতে ফিরে যাওয়ার এক স্বাভাবিক মানবিক কামনাই 'আবার যাইব গাঁয়ে' এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এ কাব্যের শেষ কবিতা 'শেষ সফরে' দেখতে পাচ্ছি, জীবন-পথের অভিযাত্রী কবি আপন জীবন-তরণীর মাঝিকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

এবারে ভিড়াও তরী এখানে নদীর ঘাটে
যেখানে গাঁয়ের মেয়ে চলেছে একেলা ঘাটে।

পল্লীর নদীর ঘাটে যেখানে গাঁয়ের মেয়ে একলা পথ চলছে, সেখানে নৌকা বেঁধে কবি তারই কাছে আপন সফরের বৃত্তান্ত বলতে সমুৎসুক। সব জায়গায় অবহেলা পেয়ে তিনি ফিরে এসেছেন তারই কাছে দুটো ভাল কথা, স্নেহমমতায় ভরা কথা শুনতে। পল্লীবালা যদি দয়া করে তাঁর অনুরোধ রাখে তাহলেই কবির সকল ব্যর্থতার বেদনা দূর হবে, কবির মন আবার ক্লান্তি অবসাদ কাটিয়ে আনন্দে ভরে উঠবে। পল্লীর নদীঘাটে কেয়াতরুর শাখাতলেই হয়তো বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন কবি। এ যেন বহুকাল পরে ঘরে ফেরা প্রবাসী পল্লীসন্তানেরই আকুতি। ভারী সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন জসীমউদ্‌দীন আলোচ্য কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের 'দিনশেষে' কবিতাটির দীর্ঘায়িত ছায়া প্রত্যক্ষ করা যায় এ কবিতাটিতে। দিনশেষে তিনি পল্লীর ঘাটেই নৌকা বেঁধে নিশ্চিত হতে চান। স্মরণ থাকতে পারে, কবি যখন

কাব্যযাত্রা শুরু করেছিলেন তখন পল্লীর ঘাট থেকেই শুরু করেছিলেন। জীবন সায়াহ্নে তিনি সফর শেষে সেই ঘাটে ফিরে নৌকা বাঁধলেন। বোধহয় এই ছিল তাঁর কাব্যসাধনার ভবিতব্য। বস্তুতঃ পল্লীপথেই জসীমউদ্‌দীনের কাব্যযাত্রা শুরু হয়েছিল, পল্লীপথেই সে যাত্রার সমাপ্তি ঘটেছে। কবি দীর্ঘ কাব্যসাধনার পথে কোথাও প্রায় দিকভ্রষ্ট হন নি।

'মাগো জ্বালায়ে রাখিস্ আলো' কাব্যের মুখ্যতঃ পল্লীভাবনামূলক কবিতাগুলোর আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করছি। এবার ভিন্ন মেজাজের কবিতাগুলোর আলোচনায় আসা যাক। এ পর্যায়ের প্রথম কবিতা হচ্ছে 'অন্বেষা-জননী'। পদ্যসংলাপে গ্রথিত এই কবিতায় জননী ও পথিকের প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে কবি এমন এক মায়ের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন, যে মা পৃথিবীর মানুষের ভীড়ে তার আদর্শ সন্তানকে খুঁজে ফিরছেন। মা পথিককে আপন স্নেহে, মমতায় গড়া সন্তানের পবিত্র, সুন্দর চেহারার বর্ণনা দিয়ে বারবার জানতে চেয়েছেন, সে কি তার বর্ণিত ঐ সন্তানকে কোথাও দেখেছে? পথিক তার অভিজ্ঞতা থেকে একে একে তার দেখা কয়েকটি ছেলের বর্ণনা দিল। তাদের মধ্যে একজন লেখাপড়া শিখে মস্ত পণ্ডিত হয়েছে। সারা পৃথিবীতে খ্যাতি কুড়িয়ে ফিরছে, তার সঙ্গে ফিরছে অনেক শিষ্য; আর একজন প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক, শ্রেষ্ঠসন্তান। অপর আর একজন সমর ক্ষেত্রের অমর সৈনিকসদৃশ বীর সন্তান। এদের কোনটিকেই জননী আপন সন্তান বলে চিনতে পারলেন না; কিন্তু যেমনি পথিকের মুখে জননী শুনলেন, এক মানবসন্তানের কথা, যে বসন্ত মহামারিতে আক্রান্ত মানুষের সেবায় রত হয়ে নিজের সকল সুখ বিসর্জন দিয়েছে, অমনি খুশিভরে জননী বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ ঐ তো তার ছেলে'। জননী পথিককে অনুরোধ জানালেন তাকে ঐ ছেলের কাছে নিয়ে যেতে ; তার সাধ তিনিও ঐ ছেলের সঙ্গে এক হয়ে মানুষের সেবায় আত্মদান করবেন। আসলে 'অন্বেষা-জননী'র মধ্য দিয়ে কবি নিজেই যেন দেশের আর্তব্যাধিগ্রস্ত মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সন্তানদের খুঁজে ফিরছেন। সমকালীন মানুষের জীবনভাবনার দোলা কবিতাটিতে অনুভব করা যায়।

'কোরবানী' কবিতায় কবি প্রেমহীন আচার-সর্বস্ব ধর্মাচরণের প্রতি গভীর অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। কোরবানী হল এক মহাত্যাগের আদর্শদীপ্ত অনুষ্ঠান। কিন্তু আজ নিছক আত্ম-সুখকাতর, স্বার্থপর কতকগুলো লোকের হাতে পড়ে ঐ পবিত্র অনুষ্ঠান পশুহত্যা ও পশুমাংস ভক্ষণের নিতান্ত তামসিক আচরণে পর্যবসিত হয়েছে। এসব দেখে কবি গভীর বেদনা বোধ করেছেন। কবি সবাইকে নতুন করে প্রেমের সাধনায় ব্রতী হতে আহ্বান জানিয়েছেন। এখানেও ধর্মভাবনার পিছনে কবির যুগজিজ্ঞাসা ক্রিয়াশীল রয়েছে।

'গোরস্থান' কবিতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার দিনে সংখ্যালঘু সমাজের লোকদের বাঁচাতে গিয়ে বরিশালে 'আলতাফ মিঞা' নামে এক মহাপ্রাণ ব্যক্তি স্বধর্মীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কবি। হিংসা-বিদ্বেষের এই পৃথিবীতে প্রেম ও মানবতার প্রতীক ছিলেন আলতাফ মিঞা। তাঁর জীবন মনুষ্যকল্যাণে আত্মত্যাগের এক মহান আদর্শ হয়ে রয়েছে। তাঁর আদর্শ সকলের আনুকরণীয়। এমন কথাই কবি প্রকারান্তরে বলতে চেয়েছেন। এখানেও কবি যুগোচিত আদর্শ-ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন।

'অপহৃতা' কবিতাটি একটি বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। শহরের ধনীগৃহে কর্মরতা 'আনোয়ারা' নামে এক গ্রাম্যচাষীর মেয়ের অপহরণসংক্রান্ত ঘটনাকে আশ্রয় করে কবির মনে যে আশঙ্কা ও বেদনা জমাট বেঁধেছিল, তাই কবি অকপটে এ কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। কবিতাটিতে মানবতার চরম অসম্মানের বেদনায় ব্যথিত কবির হৃদয়ের আর্তি বেজে উঠেছে।

'মালদা জেলার মেয়ে' কবিতায় কবি একটি পল্লীকিশোরীর রূপের প্রশস্তি রচনা করেছেন। মেয়েটির বাস্তব পরিচয়ের স্থানিকতা তার রূপ বর্ণনার উপকরণেও ছায়া বিস্তার করেছে। মালদার মেয়ের গায়ের বরণে স্বাভাবিক ভাবেই কবি আম গাছের শ্যামশোভার ছাপ প্রত্যক্ষ করেছেন। তার হাসি-খুশিতে 'গম্ভীরা গানে'র কলির প্রতিধ্বনি শুনেছেন, তার মুখের হাসিতে দেখেছেন কলমীফুলের শোভা এবং চোখে দেখেছেন দীঘির কালো জলের ছায়া। সব কিছু মিলে সে পল্লীবালা কবির চোখে এক স্বপ্নে দেখা 'মধুমালার মুখ' হয়েই যেন দেখা দিয়েছে। রোমান্টিক কবি-কল্পনায় সামান্য গ্রাম্যমেয়ে এখানে যেন রূপকথার দেশের বাসিন্দা হয়ে উঠেছে। 'খনেকের পরিচিতি' কবিতায় কবি ক্ষণিকের দেখা একটি পল্লীমেয়ের মমতা মাখানো মুখে স্নেহ-মায়া ভরা জীবনের যে ছায়া দেখেছেন, তাতেই মুগ্ধ হয়েছেন। গ্রামীণ প্রাকৃতিক আবেষ্টনীতে প্রীতিস্নিগ্ধ গার্হস্থ্য পরিমণ্ডলে এই মূর্তি উপস্থাপন করে কবি তাকে চিরন্তনতা দানের প্রয়াস পেয়েছেন। কবির রোমান্টিক মনের স্বপ্নমুগ্ধতার ছাপ এ কবিতায়ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'এ হাসি কোথায় পেলে মেয়ে' কবিতায় কিশোরী মেয়ের হাসি-মাধুর্যে বিহ্বল কবিচিত্ত কল্পনার রামধনু পাখা মেলে দিয়ে একান্তভাবে তার মাধুর্য আস্বাদনের প্রয়াস পেয়েছে। রোমান্টিক কল্পনায় অতি সাধারণ জিনিসও যে অপরূপ হয়ে উঠতে পারে, এ কবিতা তার দৃষ্টান্ত। 'মেয়ে' কবিতায় রোমান্টিক কবি নারীর অনন্ত বিভূতিকেই প্রত্যক্ষীভূত করার প্রয়াস পেয়েছেন। আপাতঃ কোমলা যে নারী ফুলের ঘায়ে মূরছা যায়, যে নিতান্ত ভীরু, তার মধ্যেই কবি পুরাণোক্ত দশমহাবিদ্যার শক্তি ও ঐশ্বর্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন ; আবার তাকেই গার্হস্থ্য পরিমণ্ডলে কল্যাণী নারী রূপেও আবিষ্কার করেছেন। নারীচরিত্র-মহিমা অনুধ্যানের প্রয়াসে কবি এখানে নবপুরাণ রচনার চেষ্টা করেছেন। 'সেলাইরতা' কবিতাটি 'হলুদ বরণী' কাব্যের 'সীবনরতা' কবিতাটিরই একটু পরিবর্তিত ভাষ্য যেন। কবিতাটিতে একটি পল্লীবধূর বিরহীচিত্তের উত্থান-পতনের দোলাটি ধরা পড়েছে। রাত জেগে বধূটি নানা রঙিন সূতোর আখরে কাঁথার বুকে এঁকে চলেছে কত বিচিত্র নকসাই না। প্রেমিক কবি এখানে পল্লীবধূর বিরহী চিত্তের স্পন্দনটিকে অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। 'আর একদিন আসিব কন্যা' কবিতায় রোমান্টিক স্বপ্নাচ্ছন্নতা সত্ত্বেও কবি বাস্তবের রূঢ়তার জগতে জেগে উঠেছেন। প্রিয়ার সৌন্দর্যবিভা কবিকে মুগ্ধ করলেও তিনি যখন তারই ছায়ার আড়ালে লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত, আশাহীন, ভাষাহীন, দুঃখীনী নারীর অশ্রুসিক্ত আঁখি দেখতে পান, তখন তাঁর প্রিয়ার সৌন্দর্যরতির ইচ্ছা থাকে না ; দুঃখে তিনি বিহ্বল বোধ করেন। তাই কবি সংকল্প করেছেন দেশের নিপীড়িত মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেই তবে তিনি তাঁর 'সোনার কন্যা'র দরজায় উপস্থিত হবেন ; তার আগে নয়। কারণ দুঃখ-দৈন্যের ঐ করুণ মূর্তিগুলোকে সামনে রেখে সত্যিকার রূপের অনুধ্যান যে সম্ভব নয়, একথা কবি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন।

'সান্ত্বনা' কবিতায় কবির প্রতিপাদ্য এই যে, জীবনের শত দুঃখ-বঞ্চনা ও নৈরাশ্যের মধ্যে জীবনে সান্ত্বনা ও ভরসা পাওয়ার মত অনেক জিনিস তিনি খুঁজে পেয়েছেন। তাই না মরুভূমির নয়ন ধাঁধানো উষর রূপের পাশেই তিনি শ্যামছায়া ঘেরা শীতল মরুদ্যান দেখতে পান, চারদিকে অনাহার, অনাবৃষ্টি, ক্ষুধিতের হাহুতাশ সত্ত্বেও তিনি সামনেই ফসলভরা মাঠ দেখে জীবনের আশ্বাস খুঁজে পান, আবার হিংসা-বিদ্বেষ, মিথ্যা প্রেম ও স্বার্থের হানাহানিতে বিধ্বস্ত সংসারেই তিনি সত্যিকার প্রেম-ভালবাসার স্নিগ্ধ পরশ খুঁজে পান। ঐ খানেই তো তাঁর বঞ্চনা বেদনাদীর্ণ জীবনে সান্ত্বনা। নতুবা জীবন যে দুঃসহ হয়ে উঠ রোমান্টিক মনোভঙ্গির অধিকারী কবি এভাবে বারবার স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় জীবনবাস্তবের

উপল ব্যথিত কূলে জেগে উঠেছেন, এ কাব্যে। বস্তুতঃ জসীমউদ্‌দীনের প্রায় সমগ্র কাব্যসাধনায় রোমান্টিক মনোভঙ্গির স্বপ্নাচ্ছন্নতা লক্ষ্য করা গেলেও, তিনি প্রায় সর্বথাই যুগোচিত জীবন-জিজ্ঞাসায় চকিত। এই জন্যেই পল্লীকাব্য লিখেও তিনি প্রায় কখনই আধুনিক জীবন-চেতনার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েন নি।

'মাগো জ্বালায়ে রাখিস্ আলো' কাব্যের আলোচনার উপসংহার আমরা এখানেই টানছি। এই সঙ্গে জসীমউদদীন রচিত ও গ্রন্থকারে প্রকাশিত যাবতীয় খণ্ড কবিতার ভাববস্তু বিশ্লেষণের কাজ শেষ হল। দীর্ঘ কাব্যযাত্রা শেষের ক্লান্তি এ কাব্যের দেহে পরিস্ফুট হলেও, সর্বশেষ এই কাব্যেও জসীমউদ্‌দীন আপনার বিশিষ্ট কবি-স্বভাবের প্রায় সকল লক্ষণ নিয়েই উপস্থিত রয়েছেন। তিনি এখানেও পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজীবনেরই রূপকার। রোমান্টিক মনোভঙ্গির অধিকারী বলে তিনি প্রেম ও সৌন্দর্য ভাবনায় পূর্বের ন্যায়ই উৎসাহী রয়েছেন। আবার আধুনিক মানুষসুলভ যুগ জীবন-জিজ্ঞাসার দোলা এখানেও বোধ করেছেন। তার ফলে সমকালীন জীবন-ভাবনার কিছু স্পষ্ট ছাপ এ কাব্যেও পড়েছে। কোন নবতর শৈল্পিক সিদ্ধির লক্ষণ এ কাব্যে অনুপস্থিত। তা সত্ত্বেও এতে কবির কাব্যসাধনার প্রত্যাশিত পরিণতি লক্ষণটি সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। কাব্যের পল্লীপথে যাত্রা শুরু করে সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমান্তে জসীমউদ্‌দীন পল্লীতেই শেষ আশ্রয়স্থল খুঁজে নিয়েছেন। আর তাই তো পাঠকসমাজ তাঁকে আখ্যায়িত করেছে পল্লীকবি নামে।

জসীমউদ্‌দীনের কবি-কর্ম ঃ শিল্প-প্রকরণ

'গ্রাম্যগীতি-গাথার ঢেউ'য়ে সওয়ার হয়ে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে কাব্যের আসরে দেখা দিয়েছিলেন জসীমউদ্‌দীন। নবোন্মেষিত নাগরিক চেতনার স্পর্ধী আত্মঘোষণায় উত্তপ্ত কাব্যের অঙ্গনে 'এক ঝলক শীতল হাওয়ার' মতোই সেদিন দেখা দিয়েছিল আপাতনিস্তরঙ্গ নিরুত্তাপ গ্রাম-বাঙলার জীবন ও প্রকৃতির রূপ-ঐশ্বর্যের বন্দনায় মুখর জসীমউদ্‌দীনের কাব্য। নাগরিক জীবনকে অস্বীকার করে নয়, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের স্পর্ধা নিয়ে নয়, নিতান্তই স্বভাবের তাগিদে, প্রাণের টানে, জসীমউদ্‌দীন পল্লীবাঙলার প্রাণস্পন্দনকে ব্যাকুল মাতৃ-হৃদয়ের মমত্ব দিয়েই যেন আপন কাব্যে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিলেন। বস্তুতঃ সে গ্রাম-বাঙলার সাথে তখনও নগর-বাঙলার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে নি। দুইয়ের মধ্যে আদান-প্রদানের পথ তখনও বন্ধ হয় নি। জীবনের শোভাযাত্রা তখন নগরমুখী হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সে শোভাযাত্রায় এমন অনেক লোক শরীক হয়েছিলেন, যাঁরা পিছনের টানকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি ঐ মিছিলে অপরের সাথে তাল রেখে চলার আবশ্যকতা স্মরণ রেখেও, তাঁরা শেষ পর্যন্ত ঐ পিছনের প্রবল টানে কিছুটা পিছিয়েই গিয়েছেন। তাঁরা গ্রাম-বাঙলার অপসীয়মান মাধুর্যের ছবিগুলোকেই প্রাণপণে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সার্থকতা অর্জন করেছিলেন জসীমউদ্‌দীন। তিনি আধুনিকের সন্ধানী দৃষ্টি, মানবদরদী মন ও এক সহজাত শিল্পবোধের অধিকারে পল্লীকাব্যকে এমন একটা স্বাদুতা দিতে পেরেছিলেন, যা শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই রস-চেতনাকে নাড়া দিতে পেরেছিল। তাই তো দেখি, নাগরিকতার জয়গানে মুখর কাব্যের অঙ্গনে একাপাশে জসীমউদ্‌দীন আপনার জন্যে একটা বিশিষ্ট স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। আমার বিশ্বাস, জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের আবেদন নিছক এর পল্লীমুখীন

বিষয়ের জন্যে নয়, তাকে স্বভাব-সুন্দর শিল্পসম্মত বাণীরূপ দানের ক্ষমতার জন্যেই এত ব্যাপক হতে পেরেছে।

এ যুগে পল্লীপ্রকৃতি ও জীবনকে উপজীব্য করে কাব্য রচনা অনেকেই করেছেন। তাঁদের বক্তব্য যেমনই হোক, প্রকাশকলায় একটা মৌল ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা পল্লীকাব্যে পল্লীর যথার্থ আবহটিকে প্রায়শঃই সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তদুপোযোগী ভাষাভঙ্গি ও ছন্দ আবিষ্কারে অপরাগতাই আমার মতে ঐ ব্যর্থতার কারণ। পল্লীকাব্যে পল্লীজীবনেরই ন্যায় যে একটা 'unstudied simplicity' প্রত্যাশা করা যায়, শিল্পসম্মত ভাষাভঙ্গিতে তাকে প্রতিফলিত করতে পারার ওপরেই নির্ভর করে তার সার্থকতা। এ বিশেষ দিকটির গুরুত্ব অধিকাংশ পল্লীপথিক আধুনিক কবিরই যে নজরে আসে নি, তা তাঁদের কাব্যপাঠেই অনুধাবন করা যায়। সত্য বটে, লোকগীতি-গাথার কবিদের প্রায়শঃ শিল্পশ্রী বর্জিত ভাষাভঙ্গি আধুনিক জনরুচির সমর্থন পেতে পারে না ; তবুও পল্লী নর-নারীর জীবনভঙ্গিমার সার্থক রূপায়ণের জন্যেই শিল্পীকে স্বভাবের রাজ্য থেকে বেশী দূরে সরে গেলে চল্‌বে না। পল্লীপ্রকৃতি ও জীবন তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্যে বিশেষ ভাষাভঙ্গি ব্যবহারের দাবি রাখে। এ সত্য বিস্মৃত হয়েছেন বলেই অনেক কবির রচনা পল্লীজীবনভিত্তিক হয়েও সার্থক পল্লীকাব্যের মর্যাদা পায় নি। আর জনচিত্তে আশানুরূপ সাড়া জাগাতেও ব্যর্থ হয়েছে। জসীমউদ্‌দীন সহজাত শিল্পবোধের বলেই যেন সে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া জীবনের বাস্তব প্রতিবেশের সমর্থন ও শিক্ষা-জীবনের আনুকূল্য তাঁকে লোকজীবন ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে এসে পল্লীআত্মর যথার্থ বাণীরূপটি আবিষ্কারের সাহায্য করেছিল। আর এ জন্যে জসীমউদ্‌দীন যে নিষ্ঠার সাথে সাধনা চালিয়েছেন, তাও অন্য কবিদের মধ্যে বিরল। জসীমউদদীন আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার লব্ধ সুযোগেরও পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন এক্ষেত্রে। কাব্যে গ্রামীণ প্রকৃতি ও জীবনধারার সম্যক মর্যাদা রক্ষা করে, তাকে যথাসম্ভব শিল্পসুষমামণ্ডিত করেছেন জসীমউদ্‌দীন। এজন্যে তিনি আমাদের মধ্যযুগের মূলতঃ পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্যের, বিশেষতঃ লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যের যেমন ব্যাপক ব্যবহার করেছেন, তারই সাথে যুগোচিত জীবনভাবনা ও রুচিবোধের তাগিদে কাব্যের অঙ্গ-পরিচর্যায়ও বিশেষ মনোযোগ দেখিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে স্বভাবশিল্পীর পরিমিতিবোধ তাঁকে সার্থকতা অর্জনে সাহায্য করেছে অনেক পরিমাণে। ফলে জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে একদিকে গ্রাম্য আবহ যেমন মূর্ত হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তা অনেক পরিমাণেই গ্রাম্যতা থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। পল্লীকাব্য লিখেও তিনি ঐ কারণেই পরিপূর্ণভাবে 'পল্লীকবি' নন। মোট কথা, পল্লীকাব্যের মূল-স্বভাবকে মোটামুটি অবিকৃত রেখে তাকে বিশেষ কলাকৌশলে অনেকটা আধুনিক যুগরুচির উপযুক্ত করে তুলতে পেরেছেন বলেই এক্ষেত্রে জসীমউদ্‌দীন প্রায় একক সার্থকতার দাবিদার।

জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের মনোযোগী পাঠকমাত্রেরই নজরে পড়বে যে, জসীমউদ্‌দীন তাঁর কাব্যের বিষয় প্রায় বরাবরই পল্লী থেকে সংগ্রহ করেছেন। পল্লীবাঙলার সরস শ্যামলপ্রকৃতি ও পল্লীনর-নারীর জীবনের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহের চিরন্তন গাথাই তাঁর কবিকল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে। আর সে অভিজ্ঞতা শিল্পরূপ দানে তিনি মধ্যযুগের বৈষ্ণব কাব্য, মঙ্গল কাব্য থেকে যেমন উপাদান কাজে লাগিয়েছেন, তার চেয়েও ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছেন পল্লীগীতি-গাথা, ছড়া, প্রবাদ, কিংবদন্তীর অজস্র সম্পদকে। শুধু শব্দ, উপমা চয়ন করেই ক্ষান্ত হন নি, পল্লীকবিদের বহু তাৎপর্যপূর্ণ কাব্য পংক্তি অবলীলাক্রমে আপন কাব্যদেহে সন্নিবেশিত করেছেন। পল্লীকাব্যের বহু উদ্ধৃতি তাঁর

বহু কাব্যের পরিচ্ছেদ শীর্ষে সংযোজিত হয়ে তাঁর কবিকল্পনাকে পুষ্ট করতে সাহায্য করেছে। শুধু শব্দ, উপমা চয়নেই নয়, জসীমউদ্‌দীন কাব্যের ছন্দ-প্রকরণেও মধ্যযুগের কাব্যের পয়ার, ত্রিপদীছন্দ এবং গ্রাম্যগীতি-গাথার ও ছড়ায় ছন্দের দ্বারা অনেক পরিমাণেই প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তথাপি জসীমউদ্‌দীন পল্লীকবিদের থেকে যে অনেকটাই স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। প্রথমতঃ ব্যাপকভাবে পল্লীজীবন কেন্দ্রিক কাব্যসাধনা করলেও জসীমউদ্‌দীন পল্লীবৃত্তের মধ্যেই সব সময় সীমিত থাকেন নি। সে কথা কবিতার ভাব ও বিষয় সম্পর্কে যেমন, রচনাভঙ্গি সম্পর্কেও তেমনি সত্য। তাঁর 'বালুচর', 'রূপবতী' ও 'মাটির কান্না' কাব্যের প্রেম, সৌন্দর্য ও আধুনিক নাগরিক-জীবন সম্পর্কিত ভাবনা প্রকাশমূলক কবিতাগুলো তার সাক্ষ্য বহন করছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি কাব্যপ্রকরণ হিসেবে পল্লীকাব্যের শব্দ, উপমা, ছন্দ যথেষ্ট গ্রহণ করলেও, কখনই গ্রাম্যকবিদের মত অমার্জিত ভাষাভঙ্গি ও অপূর্ণাঙ্গ ছন্দের আশ্রয় নেন নি। শব্দ চয়ন, উপমা, রূপক ইত্যাদির প্রয়োগে তিনি আধুনিক শিল্পীসুলভ যথেষ্ট অনুশীলনের পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যের ছন্দ সম্পর্কেও সেই কথা। এ কথা ঠিক, তিনি মাঝে মাঝে গ্রাম্যগীতি-ছন্দকে কাজে লাগিয়েছেন। আবার পয়ার, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ছন্দ ও তাদেরই নানা রূপভেদকে সে সুরের সাথে সমন্বিত করে ব্যবহার করেছেন। এখানে তিনি মনোযোগী শিল্পীর ন্যায়ই কাজ করেছেন। পল্লীকবিদের রচনায় ছন্দের অপূর্ণতা সুরাশ্রয়ে অনেকটা ঢাকা পড়েছে, তবুও তার অপূর্ণতা দৃষ্টি এড়ায় না। জসীমউদ্‌দীন তাকে আধুনিক শিল্পবোধের বলে অনেকটাই পূর্ণতা দিতে পেরেছেন। তাতে সুরের যথেষ্ট ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে অথচ ভাবের হৃদয়-স্পন্দনটি ঠিক মতই অনুভূত হয়। মোট কথা, পল্লীকবির কাছ থেকে গৃহীত ঋণের পুঁজিকেই একমাত্র সার করে না বসে তিনি প্রচুর প্রচলিত-অপ্রচলিত গ্রাম্যশব্দ, আধুনিক বাঙলা ভাষার অনেক নবলব্ধ শব্দ-সম্পদ, এমন কি বিভিন্ন সামাজিক পরিমণ্ডলে ব্যবহৃত ভিন্ন ভাষার শব্দাদিও কাজে লাগিয়েছেন। গ্রাম্য পরিবেশের সমর্থনপুষ্ট অসাধারণ কাব্য-মাধুর্যপূর্ণ নতুন সতেজ ও সজীব উপমা উদ্ভাবনেও জসীমউদ্‌দীন অসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে তাঁর কাব্য অনেক ক্ষেত্রে যথার্থই যেন 'ভাষার নক্‌সী কাঁথার মাঠ' হয়ে উঠেছে। নানা রঙের সূতোয় বোনা নক্‌সী কাঁথার মতো করে জসীমউদ্‌দীন নানা প্রকৃতি ও বর্ণের শব্দের সমন্বয়ে তাঁর ভাষার 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' রচনা করেছেন। অথচ বিভিন্ন প্রকৃতির শব্দের সংমিশ্রণজনিত কোন প্রকার অসংগতি কোথাও বিশেষ দৃষ্ট হয় না। নানা ফুল দিয়ে গাঁথা একটি মালিকার ন্যায় সবকিছুই একটা সামঞ্জস্যে বিধৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন, কালিদাস রায় থেকে সৈয়দ আলী আহ্‌সান, শামসুর রাহমান পর্যন্ত অনেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করেছে জসীমউদ্‌দীনের এ শিল্পী-উচিত ক্ষমতা। এ কথা প্রায় সবাই স্বীকার করবেন যে, গ্রাম্য জীবনকে কাব্যে আধুনিক রুচিসম্মতভাবে তুলে ধরার জন্যে যে poetic diction জসীমউদ্‌দীন গড়ে তুলেছেন, সেখানে তিনি একক, অনন্য ও প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। পল্লীকাব্যের কাছে তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য ; কিন্তু সে ঋণের জালে আষ্টে-পৃষ্ঠে বদ্ধ না হয়ে তিনি যে সহজাত শিল্পবোধের বলে তাকে নতুন মহিমায় উদ্ভাসিত করতে পেরেছেন, এটা তাঁর সৃষ্টিধর্মী প্রতিভারই পরিচয় বহন করে। আধুনিক কাব্যের নিরিখে তাঁর ভাব, ভাষা ও ছন্দের সীমাবদ্ধতা অবশ্যই খুব বেশী বলে মনে হবে। কিন্তু পল্লীকাব্যে নব দিগন্ত উন্মোচনে তা অসাধারণ রকমেই সার্থক।

পল্লীকাব্য লিখে জসীমউদ্‌দীন আর এক দিক থেকেও পল্লীকবিদের থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হয়েছেন। তিনি কাব্যকাহিনী নির্মাণে আধুনিক উপন্যাসের গঠনপ্রকৃতিকে

অনেকটাই কাজে লাগিয়েছেন। নকসী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, সকিনা ও সর্বশেষ মা যে জননী কান্দে কাব্যবিশ্লেষণে এ সত্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। নর-নারীর চরিত্রমহিমা উদঘাটনে, জীবনবাস্তবের রূপায়ণে, কিছুটা বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নৈপুণ্যে ও কাহিনীগ্রন্থন চেষ্টায় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে এ সব রচনায়। হৃদয়াবেগ-স্বর্বস্ব পল্লীকবির ভাবনালোকে এসব কখনই ধরা দেয় নি। জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে যে ধরা দিয়েছে, তার কারণ, তিনি আধুনিক যুগধর্মে আধুনিক হতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত পল্লীজীবনের ক্যানভাসটা পল্লীকবিদের তুলনায় বেশ বড়ই মনে হবে। তাঁরা পল্লীনর-নারীর মৌল আবেগগুলোকেই কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন ; জীবনের সুখদুঃখের একটি সরল সহজ বিবৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। ব্যক্তি ও সমাজের বৃহত্তর পটভূমিতে জীবন-জটিলতা অনুধাবনের কোন চেষ্টাই সেখানে লক্ষ্য করা যায় না। জসীমউদ্‌দীনের কাহিনী-কাব্য ঐখানেই বিশিষ্টতা লাভ করেছে। আর ঐ কারণেই পল্লীকবির অনুবর্তনেই জসীমউদ্‌দীনের কলাকুশলতা সীমাবদ্ধ থাকে নি। গ্রহণ ও বর্জনের শিল্পসম্মত রীতি অনুসারেই তিনি তাঁর মুখ্যতঃ পল্লীবৃত্তাশ্রয়ী কাব্যসাধনাকে যুগোপযোগী কলাবৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে প্রকাশ করতে পেরেছেন বলে, জসীমউদ্‌দীন নাগরিকতার সর্বাত্মক প্রভাবের যুগেও কাব্যে পল্লীর জন্যে একটা শ্রদ্ধার আসন জুটিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

এবার জসীমউদীনের কবি-কর্মের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্যেই আমরা এর বাণীরূপের কিছুটা সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের চেষ্টা করব। যে কোন মনোযোগী পাঠকেরই নজরে প্রথমে যে জিনিসটি ধরা দিবে, তা হচ্ছে এই যে, জসীমউদ্‌দীনের কবিতার ভাষা পল্লীকবিদের ভাষার ন্যায় প্রায়শঃই আঞ্চলিকতাদুষ্ট নয়। অথচ পল্লীকাব্যের Local colour টি ফুটিয়ে তুল্‌তে হলে ভাষার আঞ্চলিকতাকে একেবারে আগ্রাহ্য করলেও চলে না। জসীমউদ্‌দীন ভাষা-দেহের পরিমার্জনকালে এ সমস্যার কথা বিস্মৃত হন নি। শিক্ষিত রুচির তৃপ্তির জন্যে ভাষার সর্বাত্মক আঞ্চলিকতা দূর করে তাকে সর্ব সাধারণের গ্রহণযোগ্য করতে গিয়ে তিনি পল্লী অনুষঙ্গ দ্যোতক অত্যাবশ্যক শব্দগুলোকে বাদ না দিয়ে মার্জিত ভাষা-দেহে সুকৌশলে সন্নিবিষ্ট করেছেন। সর্বত্রই অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত শব্দটিকে বেছে নিতে ভুল করেন নি। স্বাভাবিক কবিত্বরসে জারিত করে ভাষাকে স্বাদুতা দানের সহজ ক্ষমতা তাঁর আয়ত্ত ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, জসীমউদ্‌দীনের কবিতার ভাষা আধুনিক শিল্পীর হস্তাবলেপ সত্ত্বেও আশ্চর্যরূপে পল্লীপ্রকৃতি ও জীবন-ঘনিষ্ঠ হয়েছে। জীবনের সাথে কবি-আত্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ফলেই এ দুর্লভ সার্থকতা দেখা দিয়েছে জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষাজনিত নাগরিক সংস্কার জসীমউদ্‌দীনের পল্লীকাব্যের সার্থকতা-পরিপন্থী না হয়ে, পোষকতাই যে করেছে, জসীমউদ্‌দীনের কাব্যই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কবির নাগরিকশিক্ষা তাঁকে পল্লীজীবনের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারকে শিক্ষিত সমাজের সামনে খুলে দেওয়ারই প্রেরণা দিয়েছিল। সে কাজ তিনি উত্তমরূপেই পালন করেছেন বলে আজও বাংলা কাব্যাকাশে পল্লী উজ্জ্বল শুকতারার ন্যায় দীপ্তি পাচ্ছে। জসীমউদ্‌দীন তাঁর কাব্যসাধনার ক্ষেত্র বিশেষে, যেমন পল্লীগীতি রচনায়, পল্লীকাব্যের বাক্‌ভঙ্গিকে মুখ্যতঃ আশ্রয় করেছেন। আবার কোথাও প্রেমভাবনা ও সৌন্দর্যভাবনা এবং কোথাও বা বাস্তবজীবন-ভাবনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রানুসারীদের ভাষাভঙ্গিকে কিছুটা অনুসরণ করেছেন। সে সব ক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্ট নন। কিন্তু যেখানে তিনি অনুকরণ বা অনুসরণের পথ না ধরে অনায়াসে কবিত্বের পরিচয় দিয়ে আপন কাব্যের উপযুক্ত বাক্-প্রতিমা নির্মাণের চেষ্টা পেয়েছেন, সেখানেই তিনি বিশিষ্ট ভাষাশিল্পী। আমরা নিদর্শন

স্বরূপ তাঁর বিভিন্ন কাব্য থেকে কিছু কাব্যপংক্তি উদ্ধৃত করছি:

ক। এই গাঁয়েতে একটি মেয়ে চুলগুলি তার কালো কালো,
মাঝে সোনার মুখটি হাসে আঁধারেতে চাঁদের আলো।

* * *

কেমন যেন গাল দুখানি মাঝে রাঙা ঠোঁটটি তাহার,
মাঠে ফোটা কল্‌মী ফুলে কতকটা তার খেলে বাহার।

(রাখালী, নাম-কবিতা)

খ। ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে
সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।

* * *

সরষে বালা নুইয়ে গলা হল্‌দে হাওয়ার সুখে
মটর বোনের ঘোমটা খুলে চুম দিয়ে যায় মুখে। ('রাখাল ছেলে', রাখালী)

গ। জোড়ামানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরুচ্ছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে পড়েছে গায়।
জোনাকী মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো,
ঝিঁঝিঁরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো। ('কবর' রাখালী)

ঘ। রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা,
সম্মুখে ঘোর কুজ্ঝটি মহাকাল রাত পাতা।
পার্শ্বে জাগিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল,
আঁধারের সাথে বুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল।

('পল্লীজননী', রাখালী)

ঙ। লোহু লয়ে আজ সিনান করেছি রক্তে ভেসেছে নদী,
বুকের মালা যে ভেসে যাবে তাতে আগে জানিতাম যদি।
আঁচলের সোনা খসে যাবে পথে আগে যদি জানিতাম,
হায় হায় সখি, নারিনু বলিতে কি যে তবে করিতাম।

(নকসী কাঁথার মাঠ)

চ। শিশির তাহারে মতির মালায় সাজায় সারাটি রাতি,
জোনাকীরা তার পাতায় পাতায় দোলায় তারার বাতি। (ধানক্ষেত)

ছ। ফোটা সরিষার পাঁপড়ির ভরে
চরো মাঠখানি কাঁপে থরে থরে
সাঁঝের শিশির দুচরণ ধরে
কাঁদিয়া ঝরে ('বাঁশরী আমার', বালুচর)

জ। ধানের আগায় ধানের ছড়া তাহার পরে টিয়া,
নমুর মেয়ের গায়ের ঝলক সেই না রঙ নিয়া।
দুর্বা বনে রাখলে তারে দুর্বাতে যায় মিশে,
মেঘের খাটে শুইয়ে দিলে খুঁজে না পাই দিশে।

(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

ঝ। দূর গগনের সাত-ভাই-তারা শিয়রে বিছায়ে ছায়া,
পারুল বোনের নিশীথ শয়নে জ্বালাতে আলোর মায়া।

(গৌরী গিরির মেয়ে', রূপবতী)

ঞ। রজনী-গন্ধা ঘুমায় অলসে শিথিল দেহটি তার
লুটাইয়া পড়ে বৃন্তশয়নে স্বপন-নদীর পার।

('রজনীগন্ধার বিদায়', মাটির কান্না)

ট। আঙ্গিনার ফুল কুড়াইয়া কেউ যতনে গাঁথে না মালা,
ভোরের শিশিরে কাঁদিছে পূজার দূর্বাশীষের থালা।

('বস্তুত্যাগী', মাটির কান্না)

ঠ। উতল বাতাস কাশবনে পশি আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদে,
রাতেরে করিছে খণ্ডিত কোন বিরহী পাখির নাদে।
ডিঙার তলে পদ্মার পানি দাপায়ে দাপায়ে ধায়,
সুদূরের চরে রাতের উল্কা আগুন জ্বালায়ে যায়। (সকিনা)

ড। চাঁদের মতন মুখখানি নয়, তবু মনে হয় চাঁদ,
একাদশী রাতে আকাশে সে ওঠে, তারেই করিয়া সাধ।

(মা যে জননী কান্দে)

এ রকম সুন্দর অনেক কাব্যপঙ্‌ক্তি ছড়িয়ে রয়েছে জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের অঙ্গনে। অনায়াস কবিত্বের ছোঁয়াচ পাওয়া এ কাব্যপঙ্‌ক্তিগুলো উজ্জ্বল শিল্পির বিন্দুর স্নিগ্ধতায় আমাদের নয়ন-মন ভরে দেয়। পল্লীজীবন ও প্রকৃতির সহস্র বিকাশকে এক মমত্বময় স্বপ্নালু মন নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন কবি। অতি সাধারণ তুচ্ছ দৃশ্যও তাই স্বপ্নরঙীন মনের ছোঁয়া পেয়ে রঙীন হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যে। আপন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে রূপদানের জন্যে জসীমউদ্‌দীনকে কখনই শব্দের জন্যে হাতড়িয়ে ফিরতে হয় নি। বর্ণিতব্য দৃশ্য ও বস্তু যেন নিজেদের হয়েই কবির কণ্ঠে যথার্থ ভাষা যুগিয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, পল্লী-প্রচলিত নানা শব্দ, তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব ও নানা বিদেশী শব্দ অনায়াসে হাত মিলিয়েছে এসব কবিতায়। প্রায় সর্বত্রই কবি মিষ্টি কথায় ঘুমঘুমি বাজিয়ে চলেছেন যেন। তিনি শুধু শ্রুতিবিনোদনের দিকে লক্ষ্য রেখেই শব্দ চয়ন করেন নি, নয়নের তৃপ্তি বিধানের প্রয়োজনীয়তার কথাও স্মরণে রেখেছেন। তাই তাঁর কাব্যে শব্দ সুর-ঝংকার তুলে আমাদের শ্রুতিকে যেমন তৃপ্তি দান করে, আবার বর্ণালীসমৃদ্ধ চিত্র চাক্ষুষ করিয়ে তেমনি আমাদের অপার আনন্দ দান করে। এবারক্রম্বে (Abercrombe) যাকে বলেছেন 'শব্দের যাদু সৃষ্টির ক্ষমতা', তার রহস্যের অনেকটাই যে জসীমউদ্‌দীনের আয়ত্তে ছিল, তার প্রমাণ তাঁর কাব্যে যথেষ্টই রয়েছে। আর ঐ গুণেই তো মূক পল্লীপ্রকৃতি জীমউদ্‌দীনের কাব্যে যুগযুগান্তের ঘুমের শেষে এক মাধুর্যলোকে জাগরণের বিস্ময়ে যেন মুখর হয়ে উঠেছে। যে কবিকল্পনাগুণে 'গাছের শাখারা' 'জোনাকী মেয়েরা' 'ঝিঁঝিঁরা' 'বক কনেরা' চারিত্র লাভ করেছে, সে কবিত্বশক্তি কখনই সামান্য হতে পারে না। অপরিণত বাসনা, অপরিণত বাক্ পল্লীকবিরা গীতি-গাথায় হৃদয়ের সকল দরদ উজার করে দিয়ে পল্লীর প্রাণের স্পন্দনটিকে ঠিক ঠিক তাঁদের কাব্যে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন বটে; কিন্তু তার ঐশ্বর্যের পূর্ণরূপটিকে অনুধাবন করতে পারেন নি। তাই পল্লীকবিদের কাব্যে প্রাণের স্পন্দন সত্ত্বেও, পল্লীজীবন ও প্রকৃতির মহিমার স্বীকৃতি তেমন নেই। পল্লীর গতানুগতিক জীবনের খুঁটিতে বাঁধা পড়ে থাকায় জীবনের পরিব্যাপ্ত রূপমহিমার অনেকটাই তাদের অগোচর থেকে গেছে।

জসীমউদ্‌দীন পল্লীসন্তান হয়েও যুগ-পরিবেশের আনুকূল্যে সে সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন বলেই পল্লীকে অনেক গভীরভাবে, অনেক ব্যাপকভাবে জানবার ও বুঝবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর 'গভীরভাবে এবং ব্যাপকভাবে' জানবার জন্যে যে অতন্দ্র সাধনা তিনি দীর্ঘজীবন ধরে করেছেন, তা কোন পল্লীকবিও কোনদিন করেন নি, আধুনিক কালেও কেউ করেছেন কিনা, সন্দেহ। তাই পল্লী নিয়ে আধুনিক কালে কাব্যসাধনায় জসীমউদ্‌দীনের প্রাপ্তি উল্লেখযোগ্য রকমেই বেশী হয়েছে। একটা খাঁটি কবিহৃদয় ও পরিণত শিল্পীমানসের অধিকারী ছিলেন বলেই যে জসীমউদ্‌দীন পল্লীকাব্যের সাধনায় দুর্লভ সার্থকতার অধিকারী হয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের বাণীমূর্তি নানা কারণেই আমাদের আকর্ষণ জাগায়। কখনও বিচিত্রধ্বনি মাধুর্যপূর্ণ শব্দের সুর ঝংকারে চারিদিক মুখরিত করে, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি নানা অলংকারের ছটায় চারিদিক আলোকিত করে ; কখনও ছড়ার ছন্দের নৃত্যের তালে, কখনও মাত্রাবৃত্তের মন্থর দোলায় দোল খেতে খেতে চলেছে তার শোভাযাত্রা। চলার তালটাতে সব সময় মাধুর্য অনুভব না করা গেলেও তার শব্দের সুমধুর ঝংকার ও অলংকারের ঐশ্বর্যচ্ছটা যথাক্রমে কান ও চোখের তৃপ্তি ঘটায় ; তাই মনটাকেও খুশী করে নিশ্চিন্তরূপেই। সবচেয়ে ভাল লাগে এই ভেবে যে, তাঁর কাব্যের শব্দগুলো শুধু 'ঝুমুর ঝুমুর' বাজেই না, কথাও বলে। আর অলংকারগুলো কাব্যের দেহে স্বর্ণপিণ্ডের মত অবস্থান করছে না, তা দেহের সৌন্দর্য তো বাড়াচ্ছেই, প্রাণেও সতেজ ভাব সঞ্চার করছে। অনেক ক্ষেত্রে দুয়ের মণিকাঞ্চন সংযোগ কাব্যকে দুর্লভ গৌরবও দান করেছে। জসীমউদ্‌দীনের কবিকর্মের শৈল্পিক মাধুর্য অনুধাবনের জন্যে এবার আমরা যথাক্রমে তাঁর কাব্যের ভাষা, অলংকার ও ছন্দ ব্যবহার পারিপাট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

প্রথমে জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে ভাষার ঐশ্বর্যের কথাই ধরা যাক। ভাষার ঐশ্বর্য বলতেই মনে আসে এর শব্দ-সম্পদের পরিমাণ ও প্রয়োগ-বৈচিত্রের কথা। সত্যের অনুরোধেই বলতে হয়, শব্দ সম্পদের বৈচিত্র্যই জসীমউদ্‌দীনের পল্লী-বৃত্তাশ্রয়ী কাব্যের আকর্ষণ বাড়াতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। নিরক্ষর পল্লীকবিদের ন্যায় জসীমউদ্‌দীনের শব্দ ভাণ্ডারে সম্পদের দৈন্য লক্ষিত হয় না। বরং তাঁর সম্পদপ্রাচুর্য রীতিমত বিস্ময়কর বলেই মনে হয়। কাব্যের প্রকৃতি অনুসারেই তাঁর রচনায় বহু প্রচলিত-অপ্রচলিত দেশী ও গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শব্দচয়নে কোন ছুঁৎমার্গের আশ্রয় তিনি কখনও নেন নি। পল্লীপ্রচলিত শব্দের সাথে অবলীলাক্রমে তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব শব্দের ফোড়ন দিয়ে তিনি কাব্য রচনা করে চলেছেন। পল্লীকাব্যের ছন্দে যে নৃত্যের দোলা, সুরের অনুরণন লক্ষ্য করা যায়, তাকে যথাসম্ভব বজায় রাখার জন্যে জসীমউদ্‌দীন ধ্বনাত্মক শব্দের অসাধারণ প্রয়োগনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। শব্দপ্রয়োগে তিনি শিল্পীর ঔচিত্যবোধ দ্বারাই সর্বত্র নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। তাই লক্ষ্য করা যায়, সমাজ-পারিপার্শ্বিক ও জীবনধারার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী তাঁর কাব্যের ভাষা বিচিত্র পথের পথিক হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, তাঁর কাব্যের যেখানেই মুসলিম সমাজ ও ধর্মীয় জীবনের প্রক্ষেপ ঘটেছে, সেখানে তিনি শিল্পীসুলভ ঐচিত্যবোধে সায় দিয়ে অবলীলাক্রমে আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ করেছেন। আবার প্রয়োজন বিধায় অন্যত্র তা বর্জন করেছেন। বস্তুতঃ জসীমউদ্‌দীন শব্দচয়ন ও প্রয়োগনৈপুণ্যে অনেক ক্ষেত্রে উচ্চস্তরের শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তবে শব্দ-প্রয়োগে তিনি সর্বত্রই সার্থক, এমন কথা অবশ্যই বলা চলে না। ব্যর্থতার দৃষ্টান্তও যথেষ্টই রয়েছে। বিশেষতঃ নাগরিক-জীবনের প্রতি আকর্ষণ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে গিয়ে

তিনি মাঝে মাঝে কবিতার দেহে ইংরেজী শব্দের প্রয়োগে তেমন শিল্পবোধের পরিচয় দিতে পারেন নি। এ ক্ষেত্রে কাব্যের সার্বিক সৌকর্যবিধানের জন্যে কবিতার রূপরীতিতে যে মৌল পরিবর্তন দরকার ছিল, তা অনুধাবন করতে না পেরে জসীমউদ্‌দীন জোরড়া রঙের প্রলেপের মতো কিছু ইংরেজী শব্দ (আধুনিক জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে তা হয়তো প্রয়োজনীয়) প্রয়োগ করেছেন। তাতে কাব্যের মাধুর্য বড় বাড়ে নি। উদাহরণস্বরূপ আমরা রূপবতী কাব্যের 'উষাবতী সেন' কবিতাটিতে ব্যবহৃত ট্রাম, অফিস, ভায়োলেট, হ্যাঙ্গলিং, ড্রইংরুম, বেথুন, বি এ পাশ, ভায়োলীন ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগের কথা উল্লেখ করতে পারি। অন্যত্রও কালে-ভদ্রে ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করি। কিন্তু সে প্রয়োগ সুষ্ঠু বলে মনে হয় না। 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যে কবি ইংরেজী 'ড্রাইভার' শব্দটিকে উপসর্গের মত ব্যবহার করে ড্রাইভার'-পতি নামে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দটি শ্রুতিকটু তো বটেই, কাব্যের ছন্দোধ্বনির সাথে একেবারেই সমঞ্জসিত হয় নি। তৎসম শব্দের কাব্য-মাধুর্যহীন প্রয়োগও দুর্লভ নয়। 'রূপবতী' কাব্যের নাম কবিতায়ই তার দৃষ্টান্ত মিলবে, অন্যত্রও অপ্রতুল হবে না। তবু জসীমউদ্‌দীন আপন কাব্যে শব্দচয়নে ও প্রয়োগে যথেষ্ট অনুশীলনের পরিচয় দিয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই সার্থকতার অধিকারী হয়েছেন বলতে দ্বিধা নেই।

আমরা এবার জসীমউদ্‌দীনের রচনা থেকে বিভিন্ন ধরনের শব্দের প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের উদাহরণ তুলে ধরছি ঃ জসীমউদ্‌দীনের অনেক কবিতায় তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ যেখানেই রোমান্টিক মনোভাবের তাগিদে কবি আপন অন্তরে সৌন্দর্যানুভূতি প্রকাশের চেষ্টা পেয়েছেন, সেখানেই তাঁর কাব্যের ভাষা সর্বাধিক মার্জিত রূপ লাভ করেছে।

ক। ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবীরের রাগে। ('কবর', রাখালী)

খ। মাধবী হারায় বুকের সুরভি নিদাঘের নিঃশ্বাসে।
('তরুণ কিশোর', রাখালী)

গ। সন্ধ্যার পরে দাবায় বসিয়া রূপাই বাজায় বাঁশী,
মহাশূন্যের পথে সে ভাসায় শূন্যের সুর রাশি। (নকসী কাঁথার মাঠ)

ঘ। মধ্যে লুটায় দিগন্ত জোড়া নকসী কাঁথার মাঠ,
সারা বুক ভরি কি ব্যথা সে লিখি নীরবে করিছে পাঠ।
(নকসী কাঁথার মাঠ)

ঙ। শীতের তাপসী কারে বা স্মরিছে আভরণ গা'র খুলি?
('কাল সে আসিবে', বালুচর)

চ। মহাসাগরের দিগন্ত জোড়া ফেন লহরীর পরে
প্রদীপ-তরুণী ভেসে এসেছিল বুঝি এ ব্যথার ঝড়ে।
('কাল সে আসিয়াছিল', বালুচর)

ছ। যে পুষ্প ঝরে নিদাঘের শ্বাসে, বরষ দৈত্য আসি,
রূপের দেউল কঠিন চরণে ভেঙে যায় ত্রূঢ় হাসি।
('ফুলের পূজারী', ধান-ক্ষেত)

জ। শোকে কৃশ তনু, বিহ্বল মন, মৃণাল বাহুরে ছাড়ি
বার বার করে ভ্রষ্ট হইছে স্বর্ণ বলয় তারি।
বাণীর কুঞ্জে ময়ূর ময়ূরী ভিরায়েছে পাখা তরী

দর্ভকুমারী নিবারের বনে তৃণ আছে বিস্মরি।

('গৌরীগিরির মেয়ে', রূপবতী)

ঝ। তপস্যা-রত জল-ভরা মেঘ গগনে গগনে ঘোরে,
কামনা-যজ্ঞে লেলিহা-বহ্নি মহা-বিদ্যুতে পোড়ে।

('কল্যাণী', রূপবতী)

ঞ। সহসা অঙ্গে হিল্লোলি ওঠে উধাও গতির ধারা

('জলের কন্যা', মাটির কান্না)

ট। নয়ন ভরিয়া আনে সে মদিরা, সুদূর সাগর পারে
ধবল-দ্বীপের বালু-বেলাতটে শঙ্খ ছড়ায় ভারে।

('রাতের পরী', মাটির কান্না)

ঠ। মহামরণের প্রতীক্ষাতুর রোগীদের মাঝখানে
মহীয়সী তুমি জননী মূরতি আসিলে কি সন্ধানে!

('এ লেডী উইথ এ ল্যাম্প', মাটির কান্না)

ড। শেষ রাত্রের পাণ্ডুর চাঁদ নামিছে চক্রবালে
রজনী-গন্ধা রূপসীর আঁখি জড়াইছে ঘুম জালে।

('রজনী-গন্ধার বিদায়', মাটির কান্না)

তদ্ভব শব্দের মিশ্রণ-যুক্ত তৎসম শব্দ-সমন্বয়ে রচিত এরূপ কাব্যাংশের উদাহরণ জসীমউদদীনের কাব্যে আরো মিলবে। তবে তদ্ভব শব্দ প্রয়োগের দিকেই জসীমউদদীনের প্রবণতা। তাঁর কাব্যে এরূপ অজস্র কাব্যপঙ্‌ক্তি মিলবে, যেখানে জসীমউদদীন তৎসম শব্দ প্রায় একরূপ বর্জন করেছেন। জসীমউদদীনের সহজ কবিত্বের স্ফূর্তি ঐসব ক্ষেত্রেই বেশী লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি গ্রাম্য বাক্‌ভঙ্গি অনুসরণ করেছেন, তাছাড়া সর্বত্রই জসীমউদদীন সুপ্রচুর তদ্ভব শব্দযোগে বিশুদ্ধ মৌখিক বাঙলা বুলি ঘেঁষা কাব্য রচনা করেছেন। এ পথেই জসীমউদদীন সর্বাধিক কাব্যিক সিদ্ধি অর্জন করেছেন। উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ

ক। 'মা বলিত, বড়ুরে তুই মিছেমিছি হাসিস্ বড়,
এ শুনেও সারা গা তার হাসির চোটে নড় নড়।'

(রাখালী', নাম-কবিতা)

খ। রাখাল ভাবে কলসখানি না থাকলে তার সরু কাঁখে
রূপের ভারেই হয়ত বালা পড়ত ভেঙে পথের বাঁকে।

('রাখালী', নাম-কবিতা)

গ। সেথায় আছে ছোট্ট কুটির সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ আকাশের ছড়িয়ে-পড়া আবির-রঙে নাওয়া।

('রাখাল ছেলে', রাখালী)

ঘ। হেস না—হেস না—শোন দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে
দাদী যে তোমার কত খুশি হত দেখিতিস্ যদি চেয়ে।

('কবর', রাখালী)

ঙ। এক কোঁচ ভরা বেথুল তাহার ঝামুর ঝুমুর বাজে,
ওরে মুখপোড়া, কোথা গিয়াছিলি এমনি এ কালি সাঁঝে?

('পল্লীজননী', রাখালী)

চ। পচা ডোবা হতে বিরহিনী ডাক ডাকিতেছে ঝুরি ঝুরি,
কৃষাণ ছেলেরা কালকে তাহার বাচ্চা করেছে চুরি।
('পল্লীজননী', রাখালী)

ছ। এ পারে মোদের ভরের গেরাম, আমরা দোকানদার,
বাটখারা লয়ে মাপিতে শিখেছি কতটা ওজন কার।
('তরুণ কিশোর', রাখালী)

জ। পাঁচটি মেয়ের মাঝের মেয়ে লাজে যে যায় মরি
বদনা হতে ছলাৎ ছলাৎ জল যেতে চায় পড়ি। (নকসী কাঁথার মাঠ)

ঝ। নতুন চাষা ও নতুন চাষাণী পাতিল নতুন ঘর
বাবুই পাখিরা নীড় বাঁধে যথা তালের গাছের পর। (নকসী কাঁথার মাঠ)

ঞ। কৃষাণী কি বসি সাঁঝের বেলায়
মিহি চাল ঝাড়ে মেঘের কুলায়
ফাগের মতন কুঁড়া উড়ে যায়
আলোক ধারে ;
কচি ঘাসে তারা জড়াজড়ি করে
গাঙের পাড়ে। ('উড়ানীর চর', বালুচর)

ট। ছড়ায় ছড়ায় জড়াজড়ি করি বাতাসে ঢলিয়া পড়ে,
ঝাঁকে আর ঝাঁকে টিয়ে পাখীগুলি শুয়েছে মাঠের পরে।
(ধানখেত', নাম কবিতা)

ঠ। মনে পড়ে ঘর ছোনের ছাউনি, বেড়িয়া চালের বাতা
কৃষাণ-বধূর বুকখানি যেন লাউএর লতায় পাতা।
('রাখালের রাজগী' ধান-ক্ষেত)

ড। সোনা-রূপার গয়না তাহার পরিয়ে দিলে গায়
বাড়ত না রূপ, অপমানই করতে হত তায়।
ছিপ্‌ছিপে তার পাতলা গঠন, হাত চোখ মুখ কান
দুলছে হেলছে মেলছে গায়ে গয়না শতখান। (সোজন বাদিয়ার ঘাট)

ঢ। ওরে ধাড়ী মেয়ে, সাপে বাঘে কেন খায় না ধরিয়া তোরে,
এতকাল আমি ডাইনি পুষেছি আপন জঠর ধরে।
(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

ণ। দোল-মঞ্চ যে ফাটলে ফাটিছে, ঝুলনের দোলাখানি।
ইঁদুরে কেটেছে, নাটমঞ্চের উড়েছে চালের ছানি।
('বাস্তুত্যাগী', মাটির কান্না)

লক্ষ্য করার বিষয়, জসীমউদ্‌দীন মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই কবিতার মধ্যে গ্রাম্য শব্দের চুমকি বসাতেও দ্বিধা করেন নি। গ্রাম্য শব্দের ব্যবহারে বিশেষ আঞ্চলিকতা দোষ অনিবার্য হয়ে উঠলেও জসীমউদ্‌দীন কাব্যে পল্লীর আবহ সৃষ্টির খাতিরে তার সার্থক ব্যবহার করেছেন অনেক ক্ষেত্রেই। উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ক। রাখিও 'ট্যাপের মোয়া' বেঁধে তুমি সাতনরি শিকা ভরে
খেজুরে গুড়ের নয়া পাটালিতে 'হুড়ুমের কোলা' ভরে।
('পল্লীজননী', রাখালী)

গ। জেলে মাকের 'নগদিল' । তার মন দিয়েছে কেড়ে।
('জেলে পাড়ে মাছ ধরিতে যায়', রাখালী)

গ। খেজুর গাছের 'সাপড়া' যেমন পুল ভাঙয়াতে দুলছে কেশ।
('পেরাণী আর বোইমী গায়', রাখালী)

ঘ। আরও ফুটিক 'ঝলক' দিলে 'চীনা'র ভাত খাই। (নকশী কাঁথার মাঠ)

ঙ। দশ 'নাদা' জমি রুপায়, চিনটা গরু চালে,
ধানের 'বেড়ী' ঠেকে 'ভাতার বড় পরের চালে। (নকশী কাঁথার মাঠ)

চ। 'দাবাড়ে'র গরু চালের খেতে সে জোয়াল বহিয়া মরে।
('রাখালের রাজপী', ধান-খেত)

ছ। শেয়াল চলে শশুর বাড়ী 'খাপুড়' মাথায় দিয়ে।
(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

জ। নিজ ছায়া যে 'ছুল' ধরে কার সাথে সাথে তার ধায়। (সকিনা)

মাঝে মাঝে জসীমউদদীন কাব্যের বাক্‌ভঙ্গিতে পল্লীকবিদের আঞ্চলিক বাক্‌ভঙ্গিকে গ্রহণ করেছেন। সে সব ক্ষেত্রে উচ্চারণ-বিকৃতি হেতু অনেক তৎসম তদ্ভব শব্দ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। কাব্যের এ পরিমণ্ডলে পল্লীকবিদের কাছে জসীমউদদীনের ঋণ অনেক। বলাবাহুল্য, কাব্যের অন্যত্রও পল্লীকাব্যের কাছে কবির ঋণ গভীর। পল্লীকাব্যে ব্যবহৃত বহু শব্দ, উপমা, বাক্য তিনি আপন কাব্যে ব্যবহার করেছেন। পল্লীগীতি রচনার ক্ষেত্রেই জসীমউদদীন আঞ্চলিক বাক্‌ভঙ্গিকে বেশী করে আশ্রয় করেছেন। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময়ই তাঁর রচনাকে পল্লীগীতিকারদের রচনার প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। তবু জসীমউদদীন এক্ষেত্রেও স্বচ্ছন্দ। আমরা জসীমউদদীনের রচনায় ব্যবহৃত গ্রাম্য বাক্‌ভঙ্গির উদাহরণ তুলে ধরছি।

ক। তাইও তোমার মায়ে যে যতন করে,
তেমনি যতন কাদে বৈদেশ নগরে।
তাপনার ভাইএ বইনে যে আদর করে
তেমনি আছে আছে বেগানারাও ঘরে। ('বৈদেশী বন্ধু', রাখালী)

খ। ঢাকাই শাড়ী কিনা দিছে, হুঁসলী দিছে নাকি
এত করে এখন কেন শাদীর রাখিস বাকী? (নকশী কাঁথার মাঠ)

গ। 'ভাটির দ্যাশের কাজল মায়ায়,
পরাবড়া মোর কাহিলা বেড়ায় রে' (রঙিলা নায়ের মাঝি)

ঘ। চালের উপর বসাইয়ারে মেরা গড়ছে চালের বাসা,
আজ দীঘিতে সাপলা ফুটে তারির লয়ে আশারে।
(রঙিলা নায়ের মাঝি)

ঙ। 'ও বাবু সেলাম বারে বার
আমার নাম গয়া বাইদ্যা বাবু
বাড়ী পদ্মাপার।
মোরা পক্ষিত মারি পক্ষিত ধরি মোরা
পক্ষিত বেচ্চা খাই
মোদের সুখের সীমা নাই।
(পদ্মাপার)

এ গ্রামের বাকভঙ্গির 'সকরুণ' ও 'মা গো' জাতীয় কাব্যে কাব্যিকতার সৃষ্টিতে মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে তারও উদাহরণ দেওয়া যাক—

ক। কন্যা না কন্যা গো তুমি পথের মাঝে শুয়ে
আসমানের চন্দ্র যেমন পটের মাঝে ছুয়ে।
কোথায় সাধের বন্ধুক তুমি কইরা আইছ দূর,
কোথায় মায়ের বন্ধুক তোমার কান্দে ভূঁইয়া। (সকরুণ)

খ। এক লহমা যাই কন্যা আর লহমে লহ,
তোমকারে আমিনার বদল সাধের বান্ধু হয়।
সকল শুনিয়া বাপে পোরাই ছুইটা উঠে,
দুই চক্ষু হইতে যেমন বৃষ্টি পানির ছোটে। (মা গো জননী কান্দে)

পল্লীকাব্যের প্রভাবে জসীমউদদীনের কোন কোন কবিতা, বিশেষতঃ পল্লীগীতিধর্মিতায় আঞ্চলিকতা দোষ দেখা দিলেও জসীমউদদীন পল্লীকাব্যের একটি সার্থক কবিতাকে রূপদান করেছেন। এই জন্যে তিনি প্রাচীন পল্লীগীতি-গান থেকে এমন কিছু শব্দকে গ্রহণ করেছেন যেগুলো বাঙলা দেশের বিশেষ কোন অঞ্চলের সম্পদ নয়। ঐগুলো মোটামুটি বাঙলার সর্বত্রই গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের বোধগম্য—ঐ ধরনের শব্দ হচ্ছে, যেমন,—উজান, কাঙ্খা, পন্থ, দীঘল, বসুয়া সিলুয়া, মন পবন, বাইয়া, পশিল, মজা ইত্যাদি। মোট কথা, যেখানে জসীমউদদীন পুরোপুরি গ্রাম্য বাকভঙ্গির অনুগত, সেখানেও তিনি শিল্পী হিসেবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরিচয়। তাই পল্লীগীতি তাঁর হাতে কিছুটা সজীবতা লাভ করেছে সন্দেহ নেই।

কাব্যের বাক-প্রতিমা রচনায় জসীমউদদীনের আর একটি কৃতিত্ব আরবী-ফার্সী শব্দের সুপ্রয়োগ ও বহুল ব্যবহার। বাঙলার মুসলমান সমাজের মৌখিক ভাষায় ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে আরবী, ফার্সী শব্দের মধ্যেই ব্যবহার দেখা যায়। ঐ সব শব্দ বাদ দিয়ে কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে তাদের চিন্তা-ভাবনাকে প্রকাশ করা যায় না। হিন্দুর ধর্মীয় ও সামাজিক পরিমণ্ডলকে ফুটিয়ে তুলতে তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের প্রয়োগ যেমন অনেক সময় অনিবার্য হয়ে ওঠে, মুসলমান সমাজ সম্পর্কিত ধারণা ও বক্তব্য প্রকাশে তেমনি আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ অপরিহার্য। জসীমউদদীন যথার্থ শিল্পীর ন্যায় জীবন-বাস্তবের দিকে লক্ষ রেখেই বিভিন্ন ভাষার শব্দ আপন কাব্যে ব্যবহার করেছেন। আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগে তাঁর কৃতিত্ব এইখানে যে, ঐ শব্দগুলো তাঁর কাব্যের দূষণ না হয়ে ভূষণই হয়ে দাঁড়িয়েছে। শব্দগুলো বাঙলা ভাষার দেহে চমৎকার মানিয়ে গিয়েছে। এগুলো তাঁর কাব্যের অর্থ যথেষ্ট পরিমাণেই বাড়িয়ে দিয়েছে। আরবী-ফার্সী শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগের প্রচুর দৃষ্টান্ত জসীমউদদীনের কাব্য থেকে দেওয়া চলে। বাহুল্য ভয়ে আমরা কিছুসংখ্যক উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছি :

ক। হাত জোড় করে গোরা মাঙ দাদু, রহমান খোদা। আর
ভেস্ত নাজেল করিও আমিকে আমার বাপ ও মায়।

• • •

মসজিদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজ কেয়ামত আসিতেছি কতদূর।

(কবর, রূপালী)

খ। নামাজের ঘরে মোমবাতি জ্বালে, দরগার মাঝে দান,
ছেলেরে আমার ভাল কোরে দাও, কাঁদে জননীর প্রাণ।

ভাল করে দাও আল্লা রছুল ! ভাল করে দাও পীর !
কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর।

('পল্লীজননী', রাখালী)

গ। ভয় করিনে হাঙর কুমীর দেবতা আছেন আছেন খোয়াজখিজির,
বনের বাঘে ভয় করিনে গাজী মাদার হাঁকছে জিকীর।

('মেনা শেখ', রাখালী)

ঘ। দরগাতলা দুগ্ধে ভাসে, সিন্নী আসে ভারে
নৈলা গানের ঝঙ্কারে গাও কান্‌ছে বারে বারে।

(নক্‌সী কাঁথার মাঠ)

ঙ। মোল্লা তখন কলমা পড়ায় সাক্ষী-উকিল ডাকি,
বিয়ে রূপার হয়ে গেল, ক্ষীর ভোজনী বাকী।

(নক্‌সী কাঁথার মাঠ)

চ। এ সব লোকের জানাই আছে, একটু হলে এদিক ওদিক
মুন্সী সাহেব ফতোয়া দেন কেতাব দেখে কসুর মাফিক।

* * *

কেঁদে কেঁদে বলবে খোদা, মোর উম্মতের সকল গুনা
মাফ করে দাও,—মাফ করে দাও,মোর পুণ্যের লইয়ে দুনা।

('মুন্সী সাহেব', ধান-খেত)

ছ। সামনে লইয়া কেরান শরীফ সুরে-ফাতেহার চরণ পড়ি
সারে জাহানের ক্রন্দনে যে চোখ দুটো তার আসিছে ভরি।

* * *

দীনের রসুল কেয়ামত দিনে খোদাতাল্লার আরশ ধরি
যেমন করিয়া কাঁদি উঠিবেন নিখিল নরের ভাগ্য স্মরি।

(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

জ। পুল ছুরাতের পুলের পরে
নিবেন নবী হাতটি ধরে
হবেন উম্মতের তরে
কাঁদিয়া আকুল।

(পদ্মাপার)

ঝ। ভোরের আজান হইতে না হতে তসবী লইয়া করে
খোদার আরশে পড়ে মোনাজাত ছেলেরে তাহার স্মরে ;
রেহেলের পর কোরান রাখিয়া পড়ে সুরা ফাতেহায়,
গ্রন্থের পাতা নয়ন পাতার পানি পড়ে ভিজে যায়।

('নাজীর', মাটির কান্না)

ঞ। মেরহাজে সেই চলেছেন নবী, জুমজুমে করি স্নান,
অঙ্গে পরেছে জোছনা নিছনি আদমের পিরহান।
নুহু আলায়হুছালামের টুপি পরেছেন নবী শিরে,
ইব্‌রাহিমের জরির পাগড়ি রহিয়াছে তাহা ঘিরে।

* * *

বুরহাকে চড়ে চলেছেন নবী কণ্ঠে কলেমা পড়ি
দুগ্ধ ধবল দূর আকাশের ছায়া পথ রেখা ধরি।

('তারাবি', মাটির কান্না)

ট। খোদার নিকট পঞ্চ রেকাত নামাজ আদায় করি,
সাতবার সে যে মনে মনে নিল দরুদ সালাম পড়ি। (সকিনা)

আরবী, ফার্সী শব্দের প্রয়োগ মুসলিম ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবনা প্রকাশেই সীমাবদ্ধ নয়। বাঙলা ভাষায় সার্বিক চিন্তা ও ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে গৃহীত স্বাভাবিক শব্দ রূপেও বহু আরবী-ফার্সী শব্দ জসীমউদ্‌দীন সহজভাবেই কাব্যে প্রয়োগ করেছেন। সেগুলো জসীমউদ্‌দীনের জন্যে কোন নতুন কৃতিত্বের দাবি নিয়ে উপস্থিত নয় বলেই বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে না।

কাব্যের শব্দচয়নে জসীমউদ্‌দীনের আর একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় ঃ সে হচ্ছে ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রতি কবির পক্ষপাতিত্ব। ধ্বন্যাত্মক শব্দের নূপুর বাজিয়ে ছড়ার ছন্দে দোল খেয়ে চলতে কবি যে ভালবাসেন, তার প্রচুর প্রমাণ কবির কাব্যে রয়েছে। এ ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো বাঙলা বুলিকে যে ধ্বনি-মাধুর্য দান করেছে তাই নয়, তার প্রকাশ ক্ষমতাকেও অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা যেতে পারে যে, কবি ধ্বন্যাত্মক শব্দ ছাড়াও, বাক্যমধ্যে এক বা একাধিক শব্দের বা বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েও কাব্যকে ধ্বনি-মাধুর্য দান করেছেন। এগুলো অনেক ক্ষেত্রে নীরস বর্ণনাকে সরস করে কাব্যকে কিছুটা গতিদান করতেও সাহায্য করেছে।

এবার জসীমউদ্‌দীনের কাব্য থেকে ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক ঃ

ক। 'গাঙের জল ছল ছল বাহুর বাঁধন সে কি মানে'।
'ব্যথায় ব্যথায় আমার চোখে জল যে ঝরে ছল ছল।

('রাখালী', নাম-কবিতা)

খ। 'বনের ঘুঘুরা উহু উহু করি কেঁদে মরে রাতদিন' ('কবর', রাখালী)

গ। 'করুণ চাহনি ঘুম্ ঘুম্ যেন তুলিছে চোখের পাতা।'
'শিয়রের কাছে নিবু নিবু দীপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলে।'
'ভন্ ভন্ ভন্ জমাট বেঁধেছে বুনো মশকের গান।'
'বাহিরেতে নাচে জোনাকী আলোর থম্ থম্ কাল-রাত'।

('পল্লীজননী', রাখালী)

ঘ। 'বদনা হতে ছলাৎ ছলাৎ জল যেতে চায় পড়ি'।
'কান-কানা-কান্ ছুটল কথা গুণ-গুণা-গুণ তানে,
শোন-শোন-শোন সবাই শোনে কিন্তু কানে কানে'।
'চল-চলা-চল্ চল্‌ল দুখাই পথ বরাবর ধরি,
তাগ্ ধিনা ধিন্ নাচে যেন গুণ্‌গুণা গান ধরি।'
'ঘটকালির টাকা যেন ঝন ঝনা ঝন বাজে,
হন্-হনা হন্ চল্‌ল ঘটক একলা পথের মাঝে।'
'কাছারী ঘর গুম্-গুমা-গুম্ লোক হয়েছে ভারী।'

'আগে আগে ছুট্‌ল রূপা-বৌ বৌ বৌ সড়কি ঘোরে।'

(নক্‌সী কাথার মাঠ)

ঙ। 'উড়ানীর চর চিক্ চিক্ করে, বালুর হারে।'

('উড়ানীর চর', বালুচর)

চ। 'কড় কড় কড় ঝঞ্ঝা হাঁকিছে, ঢল ঢল ঝরে জল',

('বাপের বাড়ীর কথা' ধান-খেত)

—ধূ ধূ বালু ওড়ে জীবনের সাহারায়'।

('পলাতক', ধান-খেত)

ছ। 'ইতল বেতল ফুলের বনে ফুল ঝুর ঝুর করেরে ভাই,
ফুল ঝুর ঝুর করে।'
'আম-কাঁঠালের পিঁড়িখানি ভরি সরু সরু করে
লতাফুল আঁকা, ঘি মউ মউ করে।'
'ধূল্ ধুলা ধূল মুঠার ধূলা আলীর নামে ফুক ছাড়িয়া
জোর পবনে উড়িয়ে দিলাম মরণ খেলায় যাও ছুটিয়া।

(সোজন বাদিয়ার ঘাটে)

জ। 'তারও দূরে সোঁ সোঁ নদী, মধ্যে বালুচর।' ('সকিনা)

ঝ। 'বাক্স-ভরে টাকা-পয়সা ঝন ঝন ঝন ঝরে,
মণি-মাণিক সোনার গৃহ ঝল মল মল করে'। ('মা যে জননী কান্দে')

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ছাড়া শব্দদ্বৈতের প্রয়োগও জসীমউদ্‌দীনে কাব্যে দেখা যায়। এগুলোও কাব্যের ধ্বনি-মাধুর্য বৃদ্ধিতে কিছুটা সাহায্য করেছে বৈকি! এখানে শব্দদ্বৈতের প্রয়োগের কিছু কিছু উদাহরণ দিচ্ছিঃ

ক। 'মুখখানি তার কাঁচা কাঁচা, না সে সোনার না সে আবীর'
'মেয়ে-জামাই মিলছে যেন চাঁদে চাঁদে চাঁদের মেলা'
'ছেলের বাপের বিত্তি বেসাৎ আছে কি ভাই তেমন তেমন?

('রাখালী', নাম-কবিতা)

'রহিয়া রহিয়া চমকে বিজলী ভাঙিয়া মেঘের গেহ'

('কিশোরী', রাখালী)

'কার দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝ্‌ঝুম নিরালায়'

('কবর', রাখালী)

'চেকন চোকন বোষ্টমী তার ঝাট্‌রা মাথায় দীঘল কেশ'

('বৈরাগী আর বোষ্টমী যায়', রাখালী)

খ। 'এ গাঁও যেন ফাঁকা ফাঁকা হেথায় হোথায় গাছ'।
'কচি কচি হাত পা সাজুর সোনায় সোনায় খেলা'।
'টলিতে টলিতে চলিল রূপাই একা গাঁর পথ ধরি।'
'হাসি হাসি মুখ গলিয়া গলিয়া হাসি যায় যেন পড়ে।'
'মুঠি মুঠি ধানে গহনা তাহার পড়িয়াছে বুঝি ঝরে।'

(নক্‌সী কাঁথার মাঠ)

গ। 'আর আছে তার জোয়ান জোয়ান সাতটি ভাজন পোলা'
'ধ্যোৎ-তা হলে সে কেমনে বাঁচিবে লজ্জা সরম নিয়ে'

'চাঁদ জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে গেল ভরি গগনের থালা'
'ঘড়ি ঘড়ি বাজছে টাকা, সামনে দিয়ে পিছন দিয়ে
কানে কানে কান-কথাতে চোখ-টেপাতে ঝনঝনিয়ে।'

(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

এ ধরনের সুপ্রচুর প্রয়োগ জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে মিলবে। আমরা বাহুল্য ভয়ে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হলাম। কাব্যের ধ্বনি-মাধুর্য বাড়ানোর জন্যে হয়তো বা কাব্যের দেহে গতি সঞ্চারের জন্যেও বটে, জসীমউদ্‌দীন একাধিক শব্দ, বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েও ধ্বনির বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন। এখানে তারও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে ঃ

ক। 'নাচে রূপা—নাচে রূপা-লোহুর গাঙে সিনান করি।'

(নকসী কাঁথার মাঠ)

খ। 'শোধ নেবে সে—শোধ নেবে তার—যে করেছে বক্ষ খালি'
'ডিগ্রিজারী-ডিগ্রিজারী—হকুম তামিল করবে না কে?
ভিটেয় তাহার চরাও ঘুঘু চড়ক-পাকে ঘুরাও তাকে।
ডিগ্রিজারী-ডিগ্রিজারী—ঘটি-বাটি আন ছিনিয়ে
বধূর নাকের নথ কেড়ে আন, লাথিতে তার মুখ ভাঙিয়ে।'
'হুকুম চাহিস্—হুকুম চাহিস্' গর্জে বলে নায়েব মশায়,
হুকুম তবে আসুক নেমে কাল বোশেখির ঘুর্ণি দোলায়।'

* * *

'কিসের খবর—কিসের খবর—চল্‌তি খবর—বলতি খবর
উড়ো খবর উঠছে বায়ে, শব্দ তাহার হচ্ছে জবর।'

(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

গ। 'কতক শুনিল মাতা দুই কর্ণ দিয়া
কতক শুনিল কথা বুক প্রসারিয়া
কতক শুনিল কথা চক্ষের না জলে
কতক শুনিল কথা দুখে জ্বালায় জ্বলে' (মা যে জননী কান্দে)

শব্দের ধ্বনি-মাধুর্যকে এইভাবে নানা পন্থায় কাজে লাগিয়েছেন জসীমউদদীন। এতে তাঁর কাব্য-মাধুর্য যে যথেষ্ট বেড়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগবাহুল্যে তাঁর কাব্যের অনেক জায়গায়ই নৃত্যের চাপল্য দেখা দিয়েছে। বর্ণনামূলক কাব্যে এ নৃত্যের দোলা কাব্যের গতিকে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং অনেকটা সরসতা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

কাব্য-প্রকরণের আলোচনায় শব্দচয়নের তরেই পাশে অলংকার ব্যবহারের কথা। সংস্কৃত আলংকারিকগণ তো অলংকার ব্যবহারের উপরই কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করেছে একথা স্পষ্ট করেই বলেছেন। অলংকারের সুযোগ ব্যতীত শুধু শব্দের সমাবেশে কাব্য সৃষ্টি যে সম্ভবপর নয়, একথা শিল্পরসিক মাত্রই জানেন এবং বোঝেন। বস্তুতঃ অলংকার কাব্যের বাহ্যিক ভূষা মাত্র নয়, কাব্যের প্রাণই বটে। অবশ্য অলংকার যখন আপন অধিকারে কাব্যে স্থান পায়, তখনই তার সঞ্জীবনী শক্তি দেখা দিয়ে থাকে। সকল সুকবির রচনা-বিশ্লেষণেই এ সত্য পরিস্ফুট হয়। জসীমউদ্‌দীনও তাঁর কাব্যের অলংকরণে শিল্পীসুলভ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। শব্দালংকার ও অর্থালংকার—এ দু'প্রকার অলংকারের সুষ্ঠু প্রয়োগ তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। শব্দালংকারের মধ্যে অনুপ্রাস ও ধ্বন্যুক্তি অলংকারের ব্যবহারই জসীমউদ্‌দীন বেশী করেছেন। অনুপ্রাস-অলংকারের প্রায়

সকল প্রয়োগবৈচিত্রই তাঁর রচনায় দেখা যায়। যমক, শ্লেষ ইত্যাদি অন্যবিধ শব্দালংকারের প্রয়োগ জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে বড় একটা দেখা যায় না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিরা অর্থালংকারের চেয়ে শব্দালংকারের দিকেই যেন বেশি মনোযোগী ছিলেন; তাই তাঁদের কাব্যে ধ্বনির মাধুর্য যথেষ্ট থাকলেও, অনেক ক্ষেত্রেই অর্থের চমৎকারিত্ব তথা ভাব-মাধুর্য তেমন দেখা দেয় নি। জসীমউদ্‌দীন কিন্তু আধুনিক কবিদের ন্যায় শব্দালংকারের চেয়ে অর্থালংকার প্রয়োগেই বেশী পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। অর্থালংকারের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক অলংকার, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি এবং গূঢ়ার্থমূলক অলংকার স্বভাবোক্তির প্রয়োগে জসীমদ্‌দীন যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন স্বীকার করতেই হয়। অন্যান্য অলংকারের প্রয়োগও অল্প বিস্তর লক্ষ্য করা যায়। এই সবই তাঁর কাব্যকে অনেকটা স্বাদুতা দান করেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

এখানে প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা যেতে পারে যে, জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের সকল সমালোচকই তাঁর কাব্যের এক প্রধানতম আকর্ষণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাঁর সতেজ ও সহজ উপমাউৎপ্রেক্ষা সৃষ্টির ক্ষমতাকে। এ উপমা ও উৎপ্রেক্ষার উদ্ভাবন ও প্রয়োগে তিনি বিস্ময়কর মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। পল্লী-পরিবেশ থেকে উপাদান নিয়ে এসব উপমা ও উৎপ্রেক্ষা উদ্ভাবন করে জসীমউদদীন তাঁর কাব্যদেহে সংযোজিত করেছেন। এগুলো একদিকে কাব্যে সৌন্দর্যও যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে। কোন অসাধারণত্ব এসব নব উদ্ভাবিত উপমা-উৎপ্রেক্ষাগুলোকে চিহ্নিত করে না ; স্বভাবের সমর্থনপুষ্ট বলেই এগুলো সুন্দর মনে হয় এবং স্বভাবের রাজ্যেই এদের গতিবিধি বজায় রয়েছে বলে এগুলো কাব্যের ভূষণ হয়েই দাঁড়িয়েছে। পল্লীজীবন ও প্রকৃতির একনিষ্ঠ চিত্রকর জসীমউদ্‌দীন বাংলার 'অবারিত মাঠ', 'গগন ললাট' সমন্বিত পল্লীর তরুছায়া-সমাচ্ছন্ন পথেই খুঁজে পেয়েছেন উপমা-উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টির অজস্র উপকরণ। অনেকে যাকে তুচ্ছ বলে হেলায় ত্যাগ করেছে, জসীমউদ্‌দীন পরম সমাদরে তাকেই যেন গ্রহণ করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। আকাশ, চাঁদ, সূর্য, রামধুন, মেঘ, কুয়াশা, নদীর রূপালী স্রোত যেমন তাঁর সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে কাজে এসেছে, তেমনি এসেছে গাঁদাফুল, চাঁপা, বউটুবানী, কল্‌মীফুল, পদ্ম প্রভৃতি নাম-জানা ও নাম-না জানা কত ফুল। আবার এসেছে কচি ধান, লাউয়ের ডগা, কাউনের অথৈ মেলা, সরষে ক্ষেত, মটর লতা, দুর্বাঘাস, সুপারি গাছ, নারিকেল তরুর সমারোহের সাথে বনের পাখী—বক, ঘুঘু, বাবুই, টিয়া, কোড়া-কুড়ি, ডাহুক, কানাকুয়া, ভূতুম, পেঁচা, ঘরোয়া মোরগ, জোনকী পোকাটি পর্যন্ত ! এদের সাথেই চলেছে নদী, খাল, এঁদো-পুকুর, ডোবা, সবুজ ধান খেত, নদীর চর, পল্লীর ধূলি ধূসরিত পথঘাট, বট, শিমূল, আম-কাঁঠালের গাছের শোভাযাত্রা। সে শোভাযাত্রার নিত্যদর্শক পল্লীরকিশোর-কিশোরী, কৃষাণ-কৃষাণীরা ও তাদের ঘনকন্যার নানা খণ্ড ক্ষুদ্র দৃশ্যও কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। এরা সবাই মিলে যে চিত্র রচনার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে, তার চেয়ে জীবন্ত চিত্র পল্লীবাঙলার আর কি হতে পারে? বস্তুতঃ উপমা-উৎপ্রেক্ষার অপূর্ব সড়ক দিয়েই জসীমউদ্‌দীনের পল্লী আপন মহিমায় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে বল্‌লেও অত্যুক্তি হবে না। যথাস্থানে উদ্ধৃত উদাহরণ থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমরা এবার সাধারণভাবে জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে ব্যবহৃত শব্দালংকারের কিছু কিছু সুন্দর প্রয়োগ নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরছি।

ক। আগেই বলা হয়েছে, শব্দালংকারের মধ্যে জসীমউদ্‌দীন অনুপ্রাস ও ধ্বন্যুক্তি অলংকারের প্রয়োগে যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন ; অন্যবিধ শব্দালংকারের প্রয়োগ

তাঁর কাব্যে বড় একটা দেখা যায় না। এখানে আমরা প্রথমে অনুপ্রাস ও পরে ধ্বন্যুক্তি অলংকারের কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি ঃ

১। **অনুপ্রাস ঃ**

'কলমী ফুলের নোলক দেব, হিজল ফুলের দেব মালা
মেয়ে জামাই মিল্‌ছে যেন চাঁদে চাঁদে চাঁদের মেলা।'

('রাখলী', নাম-কবিতা)

'গয়লা বাড়ীর ময়লা বাছুর রোদ মেখেছে সকল গায়।'

('বৈরাগী আর বোষ্টমী যায়', রাখালী)

'এক তারারি তারে তারে সুরের পর সুর মুরছায়'

('কৃষাণ দুলালী', রাখালী)

'বধূর কোলেতে বধূয়া ঘুমায় খোলে না বাহুর বাঁধ'

('তরুণ কিশোর', রাখালী)

'মাঠে মাঠে জমি মোদের খোদ জমিদার খোদার লেখায়'

('মেনা শেখ', রাখালী)

'নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে দরগায় মানে দান'

('পল্লীজননী', রাখালী)

'লাঙল জোয়াল ধূলায় লোটায় মরচা ধরে ফালে'

(নক্‌সী কাঁথার মাঠ)

'সাদা মেঘ তব সোনার অঙ্গে মাখাবে মোমের মায়া

('আর একদিন আসিও বন্ধু', বালুচর)

'চক্রবালের ললাটে দেখেছি রেখা-রঙ-রোশনাই'

('ফুলের পূজারী', ধান-খেত)

'মুসলমানের যেথায় বসতি সেখা মসজিদ আপনি হবে,
মানুষ মরিলে মসজিদে বসি আল্লার নাম কাহারা লবে?'

('সোজন বাদিয়ার ঘাট')

'রজনীগন্ধা রাতের রূপসী শ্রান্তি ভরে'

('রজনীগন্ধার বিদায়', মাটির কান্না)

'সে কথার আমি পাব সন্ধান, দুঃখ দাহন মাঝে
হয়ত বেদন-নাশন কথন গোপনে সেখানে রাজে।'

(সকিনা)

২। **ধ্বন্যুক্তি ঃ**

'কানায় কানায় ছল ছল জল করিতেছে কানাকানি'

('কিশোরী', রাখালী)

'রাত থম্ থম্ স্তব্ধ নিঝুম, ঘোর ঘোর অন্ধকার'

('পল্লীজননী', রাখালী)

'ভন্ ভন্ ভন্ জমাট বেঁধেছে বুনো মশকের গান' ('পল্লীজননী', রাখালী)

'হাতে তাহার ঘুম্ ঘুমা ঘুম্ বাজে রঙের একতারা

('বৈরাগী আর বোষ্টমী যায়', রাখালী)

'কান-কানা-কান্ ছুটল কথা গুণ্-গুণাগুণ্ তানে' (নক্‌সী কাঁথার মাঠ)

'ঘটকালিরই টাকা যেন ঝন্-ঝন্-ঝনা-ঝন্ বাজে
হন্ হনা-হন্ চলল ঘটক একলা পথের মাঝে।' (নক্সী কাঁথার মাঠ)
'আগে আগে ছুটল রূপা বৌ বৌ সড়কি ঘোরে।' (নক্সী কাঁথার মাঠ)
'পাতায় পাতায় খস্ খস্ খস্ শুনে কান খাড়া করে।' (নক্সী কাঁথার মাঠ)
ইতল বেতল ফুলের বনে ফুল ঝুর ঝুর করেরে ভাই, (নক্সী কাঁথার মাঠ)
ফুল ঝুর ঝুর করে ' (সোজন বাদিয়ার ঘাট)
'দাউ দাউ আগুন ছোটে, কুন্ডলী যে পাকিয়ে ওঠে'
('মা ও খোকন', এক পয়সার বাঁশী)

'তেপান্তরের মাঠেরে ভাই, রোদ ঝিম্ ঝিম্ করে
রে ভাই, রোদ ঝিম্ ঝিম্ করে',
(খোসমানী', এক পয়সার বাঁশী)

খ। অর্থালংকারের প্রয়োগ-বৈচিত্র্যে জসীমউদ্‌দীনের কাব্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ। আগেই বলেছি, অর্থালংকারের মধ্যে বিশেষ করে সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার-উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক ও সমাসোক্তির ব্যবহারে জসীমউদ্‌দীন বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষতঃ উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অলংকার উদ্ভাবন ও প্রয়োগে তাঁর অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যবিধ অর্থালংকারের মধ্যে গূঢ়ার্থমূলক অলংকার স্বল্পতা হেতু বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। এবার জসীমউদ্‌দীনের কাব্য থেকে উপমা, উৎপেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি ও স্বভাবোক্তি অলংকারের কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি ঃ

১। উপমা ঃ

'এমনি করে কত কথাই কত জনের মনে আসে'
'আশ্বিনেতে যেমনিতর পানার বহর গাঙে ভাসে।'
('রাখালী', নাম-কবিতা)

'শুক্‌নো চেলা কাঠের মত শুক্‌নো মাঠে ঢেলা'
(নক্সী কাঁথার মাঠ)

'কাঁচা ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া (নক্সী কাঁথার মাঠ)
'জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু' (নক্সী কাঁথার মাঠ)
'লাল মোরগের পাখার মত ওড়ে তাহার শাড়ী' (নক্সী কাঁথার মাঠ)
'কাল সাপের ফণার মত বাবরী মাথায় চুল যে উড়ে' (নক্সী কাঁথার মাঠ)
'কাল সে আসিবে মুখখানি তার নতুন চরের মত,
('কাল সে আসিবে', বালুচর)

'পউষ রবির হাসির মত আর একজনের হাসি'
(কৃষাণী দুই মেয়ে', ধান-খেত)

'নানান সুরের ছড়ার নূপুর জড়িয়ে দুটি পায়,
গেরাম ভরি নাচে তারা গাঙ-শালিকের প্রায়।' (সোজন বাদিয়ার ঘাট)
'সামনে দাঁড়ায়ে মণির মুন্সী, বয়স তাহার আশির কাছে
ঘন সাদা দাড়ি প্রশান্তমুখে মমতার মত জড়ায়ে আছে।'
(সোজন বাদিয়ার ঘাট)
'বাঘের ছেলে আজকে মোরা মেষের মত চরছি মাঠে।'
(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

'সামনে তাহার ছোট ঘরখানি ময়ূর পাখির মত,
চালার দুখানা পাখনা মেলিয়া তারি ধ্যানে আছে রত।'

(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

'সে কি শিখিয়াছে, বাসক শয়নে ওই তনুদীপ জ্বালি
পতঙ্গ-সম প্রতি পলে পলে আপনারে দিতে ঢালি!'

('কল্যাণী', রূপবতী)

'.... .... পণ্যের মত তারে,
বিয়ে দিল বাপ দুই মুঠি ভরি টাকা-আধুলির ভারে।' (সকিনা)
'মেঘমুক্ত সে আকাশের মত দাঁড়াল যখন এসে,
রূপ যেন তারে করিতেছে স্তব সারাটি অঙ্গে ভেসে।' (সকিনা)
'এ লতা বাঁধন জনমের মত কখনো যেন না টুটে
যত ভালবাসা ফুলের মতন রহে যেন এতে ফুটে। (সকিনা)

২। উৎপ্রেক্ষা ঃ

'সারা বাড়ী খুশীর তুফান কেউ ভাবে না তাহার লাগি,
মুখটি তাহার সাদা যেন খুনী মকদ্দমায় দাগী'।

('রাখালী', নাম-কবিতা)

'হেথায় ঘুমায় তোর ছোট ফুফু সাত বছরের মেয়ে,
রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তের দ্বার বেয়ে।' ('কবর', রাখালী)
'এ-বাড়ী যায়, ও-বাড়ী যায়, গানে মুখর গাঁ,
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে যেন রামশালিকের ছা' (নক্‌সী কাঁথার মাঠ)
দুখাই ঘটক নেচে চলে, নাচে তাহার দাঁড়ি (নক্‌সী কাঁথার মাঠ)
বুড়ো বটের শিকড় যেন চল্‌ছে নাড়ি নাড়ি।' (নক্‌সী কাঁথার মাঠ)
'কৌতূহলী গাঁয়ের লোকে শুন্‌ছে পেতে কান,
জুমজুমেরি পানি যেন করছে তারা পান।' (নক্‌সী কাঁথার মাঠ)
'সব গাঁর লোক এক হল আজ রূপার ছোট ওঠান পরে
নাগনাগিনী আসল যেন সাপ খেলানো বাঁশীর স্বরে।' (নক্‌সী কাঁথার মাঠ)
ঝাঁকরা মাথায় কোঁকড়া চুলে লেগেছে খড়-কুটো
তাহার নীচে মুখ দুখানি যেন আপেল দুটো।

* * *

'একটি মেয়ে লাজুক বড়, মুখর আরেক জন
লজ্জাবতীর লতা যেন জড়িয়ে গোলাপ বন।'

('কৃষাণী দুই মেয়ে', ধান-খেত)

'রামনগরের নায়েব মশাই সেই চাকারে হস্তে ধরে
স্বয়ং শূলচক্রপাণি বিরাজ করেন গ্রামের পরে।' (সোজন বাদিয়ার ঘাট)
'মাথার পরে কালো কালো মেঘরা এসে ভেড়ে
বুনো হাতীর দল এসেছে আকাশখানি ছেড়ে।' ('দেশ', মাটির কান্না)

৩। রূপকঃ

'চলে বুনোপথে জোনাকী মেয়েরা কুয়াসা-কাফন ধরি,

দূর ছাই ! কিবা শঙ্কায় মার পরাণ উঠিছে ভরি।'
('পল্লীজননী', রাখালী)

'আকাশে বাঁধিয়া পাখাসেতু বাঁধ ছুটিবে সুদূর পার।'
('তরুণ কিশোর', রাখালী)

'ও গো কল্যাণি ! কহ কহ তুমি কেবা সেই দরবেশ
তোমার লাগিয়া মন-মোমবাতি পুড়ায়ে করিল শেষ।' ('কল্যাণী', রূপবতী)
'বিহগকুসুম সহস্র সুরে ফুটিল বনের ছায়। ('বানরযূথ', মাটির কান্না)
'বন তার শাখা-বাহু বাড়াইয়া দিনেরে আড়াল করে'
('বানরযূথ', মাটির কান্না)

'এ রূপ মহিমা সহিতে পারে না ভোরের রূপসী ঊষা
রজনীফুলের অঙ্গ হইতে হরিয়া লইছে ভূষা।'
('রজনীগন্ধার বিদায়', মাটির কান্না)

'হাতে বাঁধা তার কোরান-তাবিজ জৈতুন হার গলে'
('তারাবি', মাটির কান্না)

'কত না বিপদ সায়র হইতে তুমি মোরে দেছ কূল' (সকিনা)
'কোন অদম্য হিংসা-পশু যে নড়িতেছে অনিবার।' (সকিনা)

৪। সমাসোক্তিঃ

'ডাকছাড়া তার কান্না শুনি একলা নিশা সইতে নারে
আঁধার দিয়ে জড়ায় তারে, হাওয়ায় দোলায় ব্যথার ভারে।'
('রাখালী', নাম কবিতা)

'আমার সাথে করতে খেলা প্রভাত হাওয়া ভাই'
সরষে ফুলের পাঁপড়ি নাড়ি ডাকছে মোরে তাই,
('রাখাল ছেলে', রাখালী)

'সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুঃখে'
('কবর', রাখালী)

'এখনো বসিয়া সেঁউতীর মালা গাঁথিছে ভোরের তারা
ভোরের রঙিন শাড়ীখানি তার বুনান হয়নি সারা।'
('তরুণ কিশোর', রাখালী)

'ডাকে কেয়াবনে ফুলমঞ্জরি ঘন-দেয়া সম্পাতে,
মাটির বুকেতে তমাল তাহার ফুল বাহুখানি পাতে।'
('তরুণ কিশোর', রাখালী)

'হেমন্তের চাঁদ অর্ধেক হেলি জ্যোৎস্নার জাল পাতি,
টেনে টেনে তবে হয়রান হয়ে ডুবে যায় সারারাতি।'
(নক্‌সী কাঁথার মাঠ)

'মাঠে মাঠে কাঁদে কলমীর লতা, কাঁদে মটরের ফুল
এই একা মাঠে কি করিয়া তারা রাখিবে গো জাতিকুল।'
(নক্‌সী কাঁথার মাঠ)

'দীঘির মুকুরে হেরে মুখ রাতি চাঁদের প্রদীপ জ্বালি'
('মুসাফির', বালুচর')

'এ রূপ মহিমা সহিতে পারে না ভোরের রূপসী উষা'

*　　*　　*

'শিয়রে চাঁদের মণিদীপ-খানি থাপড়ে নিবায়ে দিল,
অঙ্গ হইতে শিশির ফোঁটার গহনা কাড়িয়া নিল।'

('রজনীগন্ধার বিদায়', মাটির কান্না)

'সুপারীর বন শূন্যে ছিঁড়িছে দীঘল মাথার কেশ'
নারকেল তরু উর্ধ্ব খুঁজিছে তোমাদের উদ্দেশ।'

('বাস্তুত্যাগী', মাটির কান্না)

সাদৃশ্যমূলক অন্যান্য অলংকারের নিদর্শনও জসীমউদদীনের কাব্যে দুর্লভ নয়। আমরা এখানে অন্যবিধ অলংকারের দু' একটি উদাহরণ তুলে ধরছি ঃ

১। প্রতিবস্তূপমা ঃ

'যে মেঘেরে জড়িয়ে ধরে হাসে রামের ধনু,
রঙীন শাড়ী হাসে যে তার জড়িয়ে সেই তনু।'

(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

২। সন্দেহ অলংকার ঃ

'কোথা হতে এলো রসের বৈরাগী আর বোষ্টমী
আকাশ হতে নাম্‌ল কি চান হাস্‌লীপরা অষ্টমী?'

('বৈরাগী আর বোষ্টমী যায়', রাখালী)

৩। প্রতীপ ঃ

'তোমার কাল কেশের মত রাতের আঁধার এল ছেয়ে' (রাখালী)

৪। অপহ্নুতি ঃ

'মেয়ে ত নয়, হল্‌দে পাখীর ছা' (নক্‌সী কাঁথার মাঠ)

৫। নিশ্চয় ঃ

'মন সে ত নহে কুমড়ার ফালি, যাহারে তাহারে কাটিয়া বিলান যায়'

(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

সাদৃশ্যমূলক অলংকার ছাড়া গূঢ়র্থমূলক অলংকার স্বভাবোক্তির যথেষ্ট প্রয়োগ জসীমউদদীনের কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। স্বভাবোক্তি অলংকার সৃষ্টিতেও জসীমউদদীন যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নিম্নে স্বভাবোক্তি অলংকারের কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল ঃ

১।　ভন্ ভন্ ভন্ জমাট বেঁধেছে বনো মশকের গান,
এঁদো ডোবা হতে বহিছে কঠোর পচান পাতার ঘ্রাণ।
ছোট কুড়ে ঘর, বেড়ার ফাঁকেতে আসিছে শীতের বায়ু
শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু।

*　　*　　*

বাঁশ বনে বসি ডাকে কানা কুয়ো, রাতের আঁধার ঠেলি,
বাদুড় পাখার বাতাসেতে পড়ে সুপারীর বন হেলি।　('পল্লীজননী', রাখালী)

২।　এই এক গাঁও, ওই এক গাঁও—মধ্যে ধূ ধূ মাঠ,

ধান কাউনের লিখন লিখি করছে নিতুই পাঠ।
এ-গাঁও যেন ফাঁক ফাঁকা, হেথায় হোথায় গাছ,
গেঁয়োচাষীর ঘরগুলি সব দাঁড়ায় তারি পাছ।
ও-গাঁয়ে যেন জমাট বেঁধে বনের কাজল মায়া।
ঘরগুলিরে জড়িয়ে ধরে বাড়ায় ঘরের মায়া। (নকসী কাঁথার মাঠ)

৩। উড়ানীর চর ধূলায় ধূসর
যোজন জুড়ি,
জলের উপরে ভাসিছে ধবল
বালুর পুরী।
ঝাঁকে বসে পাখি ঝাঁকে উড়ে যায়
শিথিল শেফালি উড়াইয়া বায় ;
কিসের মায়ায় বাতাসের গায়
পালক পাতি ;
মহা কলতানে বালুয়ার গানে
বেড়ায় মাতি। ('উড়ানীর চর', বালুচর)

৪। ছোট গেঁয়োনদী, দুইধারে লিখি নতুন ধানের লেখা,
কাল-ঢেউ সনে পড়িয়া চলেছে বুকে আঁকি তারি রেখা,
চখা আর চখী গলাগলি ধরি ফিরিছে বালুর চরে
বাতাস দুলিছে তারি সাথে সাথে ধূলায় বসন ধরে।
দূর পশ্চিমে হেলিয়া পড়েছে অলস দিনের বেলা,
মেঘে আর রঙে, রঙে আর মেঘে করে মেঘ-রঙ খেলা।
কুন্দ ফুলের মালাগাছি আজ উড়ায়ে গগন গায়,
চরের পাখিরা ফিরিয়া চলেছে সুদূর নীড়ের ছায়। ('বিদায়', বালুচর)

৫। আজি পুষ্পের জনমের তিথি, ভোরের পূবাল বায়
অফুট রবির কিরণ ফুটিছে অফুট কুঁড়ির গায়।
জাগে বন পথে কানন কুমারী ফুলের কৌটা খুলি,
বাতাসে বাতাসে ছড়াইয়া দেছে গন্ধের মিহি ধূলি।
বন অপ্সীর খেলিতেছে দোল কাননের শাখে শাখে,
বরনে বরণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া গায়েতে গন্ধ মাখে।
('আজি পুষ্পের জনমের তিথি', ধান-ক্ষেত)

৬। মাচানের পর সীম-লতা আর লাউ কুমড়ার ঝাড়
আড়া আড়ি করি দোলায় দোলায় ফুল ফল যত যার।
তল দিয়ে তার লাল নটে শাক মেলিছে রঙের ঢেউ,
লাল শাড়ী খানি রোদে দিয়ে গেছে এ বাড়ীর বধূ কেউ
মাঝে মাঝে সেথা এঁদো ডোবা হতে ছোট ছোট ছানা লয়ে,
ডাহুক মেয়েরা বেড়াইতে আসে গানে গানে কথা কয়ে। (সোজন বাদিয়ার ঘাট)

৭। জলের কন্যা চলেছে জলের পরে,
মাছেরা চলেছে দলে দলে আজ পথটি তাহার ধরে।
রুহিত লাফায় চিতল ফালায় ভাটা মাছ সারি সারি ;

সাথে সাথে যায় আগে পিছে ধায় খুশী যেন ওরা ভারি
শোল মাছ তার শিশু পোনাগুলি ছড়ায়ে লেজের ঘায়,
টুব টুব করে আদরিয়া পুন জড়াইছে বুক ছায় ;

* * *

জল ঘাসগুলি ঈষৎ কাঁপিছে তাদের চলার দোলে
মৃদুল বাতাসে ঝুমিতেছে বন জলের দুনিয়া কোলে। ('জলের কন্যা', মাটির কান্না)

জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে অলংকার প্রয়োগের বৈচিত্র্য ও নৈপুণ্য সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে উপরে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হল, তা থেকে জসীমউদ্‌দীনের শিল্পচেতনার উৎকর্ষ সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু ধারণা করা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। উপরে উদ্ধৃত কাব্যপঙক্তিগুলো থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অলংকারের সুষ্ঠু প্রয়োগ তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য ও মাধুর্য অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে।

কাব্য-প্রকরণের আলোচনায় ভাষা ও অলংকারের সাথে সাথে ছন্দের কথাটাও এসে যায়। কাব্যে যে অন্তরাবেগের প্রকাশ, তাকে বিচিত্র শব্দ-বিন্যাসের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলার পদ্ধতিকেই বলে ছন্দ রচনা। ছন্দ কথাকে বাইরের দিক থেকে একটা নিয়মের মধ্যে বাঁধে, কিন্তু তাকে অন্তরের দিক থেকে দেয় মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ'। কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের হৃদয়ের সামগ্রী করে তোলার জন্যেই ছন্দের দরকার। তাই শ্রেষ্ঠ কবিকে একজন শ্রেষ্ঠ ছান্দসিকও হতে হয়। জসীমউদ্‌দীন তাঁর কাব্যের প্রকৃতির সাথে সমঞ্জসিত ছন্দরূপের সাধনাই করেছেন সারাজীবন। তাঁর কাব্যে বিষয়ের ন্যায় ছন্দেও দেখি লোকজীবনের সহজ ছন্দ-স্রোতেরই স্বীকৃতি রয়েছে। তিনি তাঁকে আপন প্রয়োজনানুসারে গড়েপিটে নিয়েছেন, তবে কোন অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন নি। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর কাব্যে পল্লীকবিদের গীতিচ্ছন্দকে কাজে লাগিয়েছেন, তা ঠিক। কিন্তু পল্লীকাব্যের ছন্দোকলাকে তিনি কখনই মনেপ্রাণে বরণ করে নেন নি। তাঁর কিছু কিছু পল্লীসঙ্গীতে 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' 'সকিনা' ও 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যত্রয়ের পরিচ্ছেদ বিশেষে তিনি পল্লীকাব্যের গীতিচ্ছন্দকে কাজে লাগিয়েছেন তা ঠিক ; কিন্তু পল্লীকবিদের সুরাশ্রয়ী অপূর্ণাঙ্গ গীতিচ্ছন্দ তাঁর আধুনিক উপন্যাসধর্মী কাহিনীকাব্যের প্রকৃতির সাথে তেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেই অনেকটা বেখাপ্পাই ঠেকে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, পল্লীকবিদের ন্যায় ঐ ছন্দের প্রয়োগে তিনিও সহজ পটুত্বের পরিচয় দিতে পেরেছেন।

জসীমউদ্‌দীন ভাষায়, ছন্দে পল্লীকবিদের কাছে কিছুটা ঋণী সন্দেহ নেই, তবে তিনি যেমন ভাষার ব্যাপার, তেমনি ছন্দের ক্ষেত্রেও পল্লীকাব্যের উপর নির্ভরশীল থাকেন নি। বাংলা কবিতার মৌলিক ছন্দ পয়ার ও তার মাত্রাভেদ ত্রিপদী এবং লোকসাহিত্যের গীতিচ্ছন্দ তাঁকে ছন্দ-নির্মাণ কার্যে সহায়তা করেছে। বাঙলা পয়ারের ধ্বনিবৈচিত্র্য কম, আর গীতিচ্ছন্দও পয়ারেরই দোসর—'পার্থক্য এই যে, লোককবিরা ইচ্ছেমত বিচিত্র শব্দের ফোড়ন দিয়ে তাতে কিছুটা ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন।' একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এতে মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও ত্রিপদীর সুর বেজে উঠেছিল অনেক জায়গাতেই। জসীমউদ্‌দীনও বিশেষ কৌশলে তাঁর কাব্যে এ সব সুর আমদানী করেছেন। তবু জসীমউদ্‌দীন পুরাতন কাব্যের ছন্দোরীতির প্রভাবকেই একমাত্র সার করে নেন নি। কাব্যের সর্বত্রই অন্ত্যমিল বজায় রেখে তিনি পুরাতনের প্রতি কিছুটা আনুগত্য প্রকাশ করেছেন তা ঠিক। কিন্তু তিনি স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে আধুনিক

কবিদেরই দোসর। শুধু তাই নয়, তিনি কালেভদ্রে পয়ার, ত্রিপদীভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারেরও চেষ্টা পেয়েছেন। মাঝে মাঝে পব সমাবেশের বৈচিত্র্য ঘটিয়ে তিনি কিছু কিছু কবিতায় রূপবৈচিত্র ঘটিয়েছেন বটে, কিন্তু সেখানেও তিনি মূলতঃ কোন নতুন ছন্দ সৃষ্টি করেন নি। তাঁর ছন্দোকলায় ত্রুটি আছে যথেষ্ট, অনেক জায়গায়ই তিনি নিয়ম ভঙ্গের অপরাধ করেছেন। কোথাও মাত্রার অসমতার, কোথাও বা অন্ত্যমিলে ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য মাত্রার অসমতার ফাঁককে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে গীতিচ্ছন্দের সুর দ্বারা পূরণ করে দেওয়ার চেষ্টা পেয়েছেন; কিন্তু সে চেষ্টা সর্বত্র সার্থক হয় নি।

মোট কথা, জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে ছন্দের বৈচিত্র তেমন নেই। 'স্বরবৃত্ত' ও 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দের যুগল বাহনকেই তিনি প্রায়শঃ কাজে লাগিয়েছেন। এক আধ ক্ষেত্রে 'অক্ষরবৃত্তের' প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় মাত্র। আর ক্ষেত্র বিশেষে তিনি যে নিছক গ্রাম্য গীতিচ্ছন্দের প্রয়োগ করেছেন, তাও স্মরণ রাখতে হবে। এখন আমরা জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ নিদেশক কিছু কিছু কবিতা পংক্তি উদ্ধৃত করছি ঃ

ক। মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ঃ

[১] এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে ('কবর', রাখালী)

[২] রাত থম্ থম্ স্তব্ধ নিঝুম ঘোর-ঘোর আন্ধার
নিঃশ্বাস ফেলি তাও শোনা যায় নাই কোথা সাড়া কার ('পল্লীজননী', রাখালী)

[৩] আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর
আপনা করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিবাগী
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি ;
দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর ;
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর। ('প্রতিদান', বালুচর)

[৪] দীঘিতে তখনো সাপলা ফুলেরা হাসছিল আনমনে
টের পায়নিক পাণ্ডুর চাঁদ ঝুমিছে গগণ কোণে। (সোজন বাদিয়ার ঘাট)

[৫] তুমি কি আমার গানের সুরের
পূবালী বাতাস হবে,
তুমি কি আমার মনের বনের
বাঁশীটি হইয়া রবে !
রাঙা অধরের রামধনুটিরে,
ছড়াবে কি তুমি মোর মেঘ-নীড়ে। ('অনুরোধ', রূপবতী)

খ। স্বরবৃত্ত ছন্দ ঃ

[১] ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে,
সারারাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে। ('রাখাল ছেলে', রাখালী)

[২] কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দতের কালি দিয়েই কিতাব কোরান লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবন ময় ;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়। (নকসী কাঁথার মাঠ)

[৩] তাগ্ ধুমাধুম্ বাদ্যি বাজে কাল শেয়ালের বিয়ে,
শিয়াল চলে শ্বশুর বাড়ী খালুই মাথায় দিয়ে।
পদ্মাবতীর বরের বাড়ী সাতসাগরের পার,
নীল হলুদে সাঁতার খেলে ধরি তাহার ধার। (সোজন বাদিয়ার ঘাট)

[৪] এ খুকীটি আমায় যদি একটু আদর করে
একটি ছোট কথা শোনায় ভালবাসায় ভরে ;
তবে আমি বেগুন গাছের টুনটুনীদের ঘরে
যত নাচন ছড়িয়ে আছে আনব হরণ করে ; ('আলাপ', হাসু)

[৫] গরুর গাড়ী চলে সেথায়,
পদ্মানদীর পারে,
পুটি মাছের ধাক্কা লেগে
চাকা নড়চড় করে ('আবল তাবল', এক পয়সার বাঁশী)

মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দই জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের মূল অবলম্বন একথা আমরা আগেই বলেছি। তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনাই প্রায় এ দুই ছন্দে ভর করে চলেছে। তবু ক্ষেত্র বিশেষে তিনি যে অন্যত্রও দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন, তার প্রমাণ মিলে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, 'রূপবতী' ও 'জলের লেখন' কাব্যদ্বয়ের কয়েকটি কবিতায় তিনি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন। আমরা এখানে কাব্য দুটি থেকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উদাহরণ তুলে ধরছি ঃ

[১] তুমি কি জাননা রূপ দেহের ধূপের পাত্র ভরি
তোমা লাগি হোমমন্ত্র ধ্বনিছে দিবস বিভাবরী
('রূপবতী' কাব্যের মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য)

[২] প্রখর রবির কর নাচিছে ধরণীভর
চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম,
দূর দিগলয় কোলে আকাশ উঠিছে জ্বলে
বাতাস উড়ায় ধূলি ধূম। ('শ্যামলিয়া' রূপবতী)

[৩] কথার লতিকা বেয়ে
কত যে কুসুম ফোটে
তাহারি সুবাস পেতে পরান আকুলি ওঠে। ('ফুলের সুবাস', জলের লেখন)

এ ছাড়া জসীমউদ্‌দীন পল্লীকবির গীতিছন্দের আশ্রয়ও নিয়েছেন কাব্যের কোন কোন ক্ষেত্রে। এ গীতিছন্দ সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীন নিজেই বলেছেন যে, এ ছন্দ পয়ার ছন্দেরই দোসর। তবে পল্লীকবিরা স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছায় শব্দ প্রয়োগ করে এতে নানা রকমের ধ্বনি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করায় পয়ার ছন্দের চেয়ে এ ছন্দ অনেক বেশী ধ্বনি-মাধুর্যপূর্ণ। সুরাশ্রয়ী এ ছন্দে মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ছন্দের দোলা ও যে অনেকটাই অনুভব করা যায়, তাতে সন্দেহ নেই। তবু সুরাশ্রয়ী এ ছন্দকে আমরা আধুনিক বিশেষ কোন ছন্দের কাঠামোতে ফেলতে পারি না। জসীমউদ্‌দীন কাব্যে পল্লীর আবহ সৃষ্টির অনুরোধেও পল্লীবাসী সাধারণ মানুষের মনে তাঁর কাব্যের আবেদনকে কিছুটা পৌঁছে দেওয়ার মানসে এ ছন্দকে মাঝে মাঝে আশ্রয় করেছেন। যেখানে যেখানে তিনি এ ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন, সেখানে তাঁর কাব্যও পল্লীকবিদের রচিত কাব্যের ন্যায়ই সুরেলা হয়ে উঠেছে। এবার আমরা তাঁর কাব্য থেকে গ্রাম্যগীতিচ্ছন্দের প্রয়োগের কিছু কিছু উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

[১] ঢাকার নবাব, দিলেন জবাব, হাজার মুসলমান
পদ্মা নদী পার হইয়া ঘিরিল আসমান।
এলো কাজেম খুনী, শব্দে শুনি বন্দুকেরি গুলি
আলীর নামে ডাক ছাড়িয়া মুখেই নিত তুলি।
এলো ছদন মাল, জুতির কাল বিধত না যার চামে,
সাত আটদিন লড়াই করে গা নাহি তার ঘামে।
এলো বচন মিঞা কোরান দিয়া এছেম আজম পড়ি,
ফুক ছাড়িলে হাজার লেঠেল পড়ত গড়াগড়ি। (সোজন বাদিয়ার ঘাট)

[২] 'এই না পন্থে গেছে ফকির ধলেশ্বরী বায়,
গাঙের ঘাটে ঘাটে সারিন্দা বাজাইয়া।
কতক দূরে যায়া পাবা গোদা-গাড়ীর ঘাট
তারও পরে দেখতে পাবা নেতা ধুপনীর ঘাট। (সকিনা)

[৩] বট বিরিক্ষি জাইনা মাগো, আইল ছায়ার তরে,
সেও বিরিক্ষি ভাঙিয়া পইল তোরই গায়ের পরে।
তিন জনে বইসা কান্দে বেইড়া কুঁড়ার থালা,
অন্তরীক্ষে কি করে জানি আপে বারিতালা ('মা যে জননী কান্দে')

অন্যত্র পল্লীগীতি রচনায়ও জসীমউদ্‌দীন এ গ্রাম্যগীতি ছন্দের প্রয়োগ করেছেন।

আমরা জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের প্রকরণগত আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

এ আলোচনা যে কোন কবির কাব্য-বিচারেই এক প্রকার অপরিহার্য। বস্তুতঃ শিল্প-প্রকরণের আলোচনা কবির শিল্পীসত্তার মহিমাকে অনুধাবনের জন্যে একটা অত্যাবশ্যক কাজ। জসীমউদ্‌দীনের পল্লীবৃত্তাশ্রয়ী কাব্যসাধনার সার্থকতা অনেকটাই সম্ভব হয়েছে প্রকরণের সার্থক সংস্থানের জন্যে। তিনি উপযুক্ত শব্দ, অলংকার ও ছন্দ-সমবায়ে তাঁর কাব্যের জন্যে এক বিশিষ্ট বাক্-প্রতিমা নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন বলেই তাঁর পল্লীজীবন ও প্রকৃতি-নির্ভর সাহিত্য অতি আধুনিক নাগরিক চেতনার অধিকারী মানুষকেও আকর্ষণ করতে পেরেছে। জসীমউদ্‌দীনের কবি-কর্মের যথার্থ উপমা 'নকসী কাঁথা'ই বটে। উপকরণের সামান্যতা সত্ত্বেও পল্লীর গৃহস্থবধূর হাতে আঁকা, নানারঙের সুতোয় বোনা ফুল, ফল, লতা, পাতার নকসায় সজ্জিত হয়ে নকসী কাঁথাটি যেমন অপরূপ হয়ে ওঠে, জসীমউদ্‌দীনের কাব্যও সাধারণ পল্লীপ্রকৃতি ও জীবনের উপকরণকে সম্বল করে উপযুক্ত শিল্প-সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়ে তেমনি একটা অনন্যত্ব লাভ করেছে। আর তা সম্ভব হয়েছে জসীমউদ্‌দীনের সহজাত কবি-প্রতিভার গৃহিণীপনার জন্যেই। তিনি তাঁর কাব্যের উপযুক্ত বাণীরূপ দানের জন্যে সম্পদের প্রত্যাশায় মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্য, বৈষ্ণবকবিতা , লৌকিক প্রণয় কাহিনীকাব্যের যেমন দ্বারস্থ হয়েছেন, তেমনি লোকসাহিত্যের গীতি, গাথা, ছড়া, প্রবাদ, রূপকথার ভাণ্ডারেও অনুসন্ধান চালিয়েছেন। আবার পুঁথিসাহিত্যের রাজ্যেও পরিক্রমা অব্যাহত রেখেছেন। যেখান থেকে যা কিছু সুন্দর সংগ্রহ করেছেন—তাকেই কাজে লাগিয়েছেন আপন কাব্যের সার্থক বাণী রূপদানের জন্যে। তাতে তিনি যে যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

জসীমউদ্‌দীন ঃ নাট্য পরিক্রমা

জসীমউদদীনের লোকজীবনাশ্রয়ী সাহিত্য-সাধনা যে শুধু কাব্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, নাটকের মধ্যেও আপন প্রকাশ খুঁজে পেয়েছে, এ সংবাদ আজকের অনেক সাহিত্য-পাঠকই হয়তো রাখেন না। অথচ বাঙলা সাহিত্যে লোকজীবনশিল্পী হিসেবে জসীমউদদীনের যে প্রতিষ্ঠা তার অনেকটাই দাঁড়িয়ে আছে তাঁর রচিত লোকজীবনাশ্রয়ী নাটকগুলোর উপর। 'রাখালী', 'নকসী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র কবির শিল্পী-পরিচয়কে যথার্থই পূর্ণতা দিয়েছে তাঁর 'পদ্মাপার', 'মধুমালা', 'বেদের মেয়ে', 'পল্লীবধূ', ইত্যাদি লোকজীবনাশ্রয়ী নাটকগুলো। এসব নাটক রচনার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন আমাদের লোকসাহিত্যেরই অন্যতম সম্পদ লোকনাট্যগুলো থেকে। সংস্কৃত ও ইউরোপীয় নাট্যাদর্শে আধুনিককালে বাঙলা নাটক সৃষ্টির পূর্বে যুগ যুগ ধরে এই লোকনাট্যগুলোই বাঙলার পল্লীর, এমন কি শহরের, সাধারণ মানুষের চিত্ত বিনোদনে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে এসেছে। লোকসাহিত্যের অন্যান্য রচনার মতো এদেরও কোন লিখিত রূপ হয়তো ছিল না; কিন্তু পালাগানের আকারে লোকের মুখে মুখে নাট্যকাহিনী প্রচারিত ছিল। গানে গানে সে কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হতো, অভিনেতারা ফাঁকে ফাঁকে কথার সূত্র জুড়ে দিতেন। যাত্রাগান ও বিভিন্ন পালাগানের মধ্যে দিয়ে লোকনাট্যের এ ধারাটি যুগ থেকে যুগান্তরে উত্তরিত হয়ে আমাদের কালে এসে পৌঁছেছে। যদিও পূর্বপূর্ব যুগের তুলনায় এ প্রবাহ আজ খুবই ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তবু এর আবেদন একালেও যে একেবারে ফুরিয়ে যায় নি, তার প্রমাণ মেলে যাত্রা ও পালাগানের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে। মুক্তাঙ্গনে, আসরে অভিনীত হয়ে এসব নাটক এখনও সাধারণ মানুষকে আনন্দে মাতিয়ে তোলে। শাস্ত্রীয় নাটক ও চলচ্চিত্রের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের দিনেও কোনক্রমেই এ সত্যতে অস্বীকার করা চলে না।

বাঙলার এই লোকনাট্যের ইতিহাস আজও রচিত হয় নি। এর উৎস ও বিকাশধারা সম্পর্কে নিষ্ঠা সহকারে গবেষণা করার জন্যে কোন লোকসংস্কৃতি-প্রেমিকও এখন পর্যন্ত এগিয়ে আসেন নি। এ ক্ষেত্রে যা কিছু সামান্য কাজ হয়েছে, তার সবটারই কৃতিত্ব প্রাপ্য লোকজীবনশিল্পী কবি জসীমউদদীনের। কবিতার ন্যায় নাটকেও লোকজীবনকে রূপায়িত করতে গিয়ে তিনি শৈল্পিক তাগিদ থেকেই লোকনাট্যের প্রকৃতি, উৎস ও বিকাশধারা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। তাঁর এই অন্বেষার ফলে বাঙলা লোকনাট্যের অজ্ঞাতপ্রায় বিকাশধারার ইতিহাসটি আজ আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে এবং আমরা লোকনাট্যের সরণি আশ্রয় করে লোকজীবনে প্রবেশের আর একটি পথ আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছি।

লোকজীবনের ঘনিষ্ঠ স্পর্শে এসে লোকসাহিত্যের মাল-মসলা সংগ্রহ করতে করতেই জসীমউদদীন লোকনাট্যের জন্মসূত্রটি নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাঙলার বিভিন্ন জেলার মেয়েলি গানে, রাখালী গানে, ছেলে ভোলানো ছড়ায় কথোপকথনের ছলে মাঝে মাঝে নাটকীয় সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনদৃশ্যের যে সব অংশ চিত্রিত হয়ে উঠতে দেখা যায়, তার মাধ্যেই তিনি বাঙলার বড় বড় লোকনাট্যগুলোর উন্মেষণ লক্ষ্য করেছেন। তিনি বহু লোকসঙ্গীত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এদের মধ্যে আমাদের পল্লীজীবনের বহু অংশ নাটকাকারে গ্রথিত হয়ে রয়েছে। নিপুণ লোক-অভিনেতারা লোকনাট্যের স্থান বিশেষে এই খণ্ডিত জীবনদৃশ্যগুলো বেশ মুনসিয়ানার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাকে একটা সহজ শিল্পসম্মত রূপ দিয়ে ফেলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ জসীমউদদীন রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত 'বাইদ্যার তামাসা'

নামক লোকনাট্যের 'জল ভর সুন্দরী মেয়ে জলে দিছাও ঢেউ' সঙ্গীতাংশটির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ অংশটি বহু রাখালী গান ও বারমাসী গানে পাওয়া যায়। এমন কি যে সব অঞ্চলে 'বাইদ্যার তামাসা' প্রচলিত নেই, সে সব জায়গায়ও গানটি গাওয়া হয়। এর থেকে অনেকটা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এ অংশটি প্রচলিত গ্রাম্যগান থেকেই 'ব্যাইদ্যার তামাসা' রচনাকার তাঁর নাটকে গ্রহণ করেছেন। অন্যত্র তিনি বাঙলাদেশের গাজীর গানের দলগুলো কেমন করে লোকনাট্য সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে, তারও উল্লেখ করেছেন। এই দলগুলো গ্রামবাংলায় রূপকথা বলে ঘুরে বেড়ায়। গল্পের যথাযথ আবহটির পরিস্ফুটনের জন্যে এরা যেমন গানের সাহায্য নেয়, তেমনি গল্পের চরিত্রগুলোর মাধ্যমে মাঝে মাঝে কথোপকথনের অবতারণা করে একটা নাটকীয়তা আমদানির চেষ্টা করে। পরে ক্ষেত্রান্তরে এই কথোপকথনই ক্রমপরিণতি লাভ করে লোকনাট্যে পরিণত হয়। বস্তুতঃ লোকশিল্পীরা এভাবেই বিচিত্রাস্বাদী লোকনাট্য যুগ যুগ ধরে রচনা করে এসেছেন। আমাদের শিক্ষিত সমাজ সে সব খবর রাখার গরজ বোধ করেন নি বলে, আমাদের সাহিত্যে তাঁদের স্থান না হতে পারে ; কিন্তু জনসাধারণের রসপিপাসা মিটানোর ব্যাপারে এঁদের গৌরব তাতে একটু লাঘব হয় না।

জসীমউদ্‌দীন লোকজীবন ও লোকসাহিত্যের মর্মমূলে পৌঁছে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সত্যিকার লোকসংস্কৃতি-প্রেমিক ও শিল্পীর মন নিয়ে লোকনাট্যের সম্পদকে তথাকথিত ভদ্রসমাজের গোচরীভূত করার প্রয়াস পেয়েছেন। বিশ ও তিরিশের দশকে লোকসাহিত্য সংগ্রহের অভিযানে শরিক হয়ে বাঙলার লোকজীবনের গভীরে প্রোথিত এই রস-সাহিত্যের ঐশ্বর্যভাণ্ডার আবিষ্কারের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। ঐ উপলক্ষে লোকজীবনের সাথে লোকনাট্যের নিগূঢ় আত্মীয়তা উপলব্ধি করে তিনি এদের মানবিক আবেদন ও শিল্পমূল্য সম্পর্কে নিঃসংশয়িত হয়েছিলেন। এই উপলব্ধিই যেমন একদিকে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল বাঙলা লোকনাট্যের প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে, অন্যদিকে অবশ্য অনেক কাল পরে, লোকজীবনভিত্তিক নাটক রচনায় ব্রতী হতে।

জসীমউদ্‌দীন তাঁর লোকনাট্য সম্পর্কিত অন্বেষার ফলাফল বিবৃত করেছেন 'আমাদের লোকনাট্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু যথেষ্ট মূল্যবান তথ্য-সম্বলিত। অসম্পূর্ণভাবে হলেও আমরা এই প্রবন্ধে পরিবেশিত তথ্যের সাহায্যে বাংলা লোকনাট্যের বিকাশধারার একটি নির্ভরযোগ্য মানচিত্র নির্মাণ করতে পারি। বাঙলাদেশে সাধারণত তিন রকমের লোকনাট্যের প্রচলন দেখা যায়—মালদহ জেলার 'আলকাফ', রংপুর, কুচবিহার ও ময়মনসিংহ জেলার 'তামাসা' এবং ফরিদপুর, যশোহর, বরিশাল ও ঢাকা জেলার 'যাত্রাগান'। এসব গীতিধর্মী লোকনাট্যের বিষয়বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। মালদহ জেলায় প্রচলিত আলকাফগুলোর অধিকাংশই ক্ষুদ্র একাঙ্কিকা নাটিকার মতো। বিষয়-বস্তু গ্রাম-জীবনের ঘটনা আশ্রয়েই গড়ে ওঠে, এতে পৌরাণিক কাহিনীর উপাদান গ্রহণ করা হয় না। নিত্যনৈমিত্তিক জীবনপ্রবাহ থেকে নাটকের ঘটনা নির্বাচন করা হয়। নাটকগুলোতে সাধারণতঃ জুয়াখেলা, সুদখুরি, অপব্যায়ের কুফল ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার অবতারণা করা হয়। হাস্যরসের ভিতর দিয়ে নীতি শিক্ষাদানের একটি সজ্ঞান প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এ নাটকগুলোতে। হাসির মোড়কে পুরে অনেক নিষ্ঠুর জীবনসমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার এই প্রচেষ্টার মধ্যে লোকজীবনশিল্পীর সুস্থ জীবনচেতনার পরিচয় যেমন পাই, তেমনি পাই সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয়।

রংপুর, কুচবিহার ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত 'তামাসা' ও ফরিদপুর, যশোহর, ঢাকা অঞ্চলের 'যাত্রাগানে'র তারতম্য সামন্যই। রংপুর তথা উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যগুলোতে গদ্য কথোপকথন সামান্য থাকে, গানে গানেই প্রধানতঃ কথোপকথন চলে। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যগুলোর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে—এগুলো প্রায়শই হাস্যরস প্রধান। এমন কি করুণ রসাত্মক বিষয়ও এসব অঞ্চলে হাস্যরসে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। রংপুর জেলার 'মোনাই যাত্রা' 'বলাইগান', 'বোষ্টম-বাদিয়া', 'হুমুর বাইদ্যা' 'ময়নামতির গান' প্রভৃতি লোকনাট্য ব্যাপকভাবে সমগ্র উত্তরবঙ্গে অভিনীত হয়। এ সকল লোকনাট্যের অভিনয় প্রত্যক্ষ করেই জসীমউদ্‌দীন এদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে লোকজীবনভিত্তিক নাটক রচনায় সার্থকতা লাভের জন্যে তিনি যে এসব লোকনাট্যের কাছে যথেষ্ট ঋণী রয়ে গিয়েছেন তার স্বীকৃতি তাঁর নিজের উক্তিতেই পাই। "আমার 'পদ্মারপার' নামক লোকনাট্যখানিতে কতকটা মোনাই যাত্রা লোকনাট্যের অনুসরণ করিয়াছি। 'হুমরা বাইদ্যা' নাটকের মোড়লের চরিত্রের কিছুটা আভাস আমার রচিত 'বেদের মেয়ে' নাটকের মোড়লের চরিত্রে পাওয়া যাইবে।"

আগেই উল্লেখ করেছি, উত্তরবঙ্গের 'তামাসা' জাতীয় লোকনাট্যের সাথে পূর্ববঙ্গের যাত্রাগানের মূলগত পার্থক্য খুব বেশী নয়। তবে উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যের মতো পূর্ববঙ্গের লোকনাট্যে গানের প্রাচুর্য থাকলেও, তাতে গদ্য কথোপকথনের স্থানও উল্লেখযোগ্য। হাস্যরসের অপ্রতুলতা না ঘটলেও করুণ-রসের একটি বাস্তব আবহ সৃষ্টিতেও পূর্ববঙ্গের লোকনাট্যকাররা যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রত্যেক লোকনাট্যে একটি বিশেষ সুরই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। এর রস-সার্থকতা সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীন বলেছেনঃ 'সেই সুরে মাদকতায় নাট্যবর্ণিত সমস্ত কাহিনী যেন মধুময় হইয়া দলের পর দল মেলিয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকে।' বলাবাহুল্য যেহেতু 'our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts" সেই হেতুই করুণ-রসের সৃজনেই পূর্ববঙ্গের লোকনাট্যগুলোও সার্থকতা অর্জন করেছে বেশি। সেই জন্যেই দেখি করুণ-রসের দিকেই শিল্পীদের পক্ষপাত বেশি। এর ফলে লক্ষ্য করি কোনো কোনো লোকনাট্যের প্রথম দিকে হাস্যরসের সমাবেশ ঘটলেও শেষের দিকে ঘটনা প্রবাহ করুণ হয়ে চারদিকে একটা অপূর্ব নীরবতা সৃষ্টি করে।

ফরিদপুর, বরিশাল, কুষ্টিয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলায় প্রচলিত 'ভাসমান যাত্রা' 'আসমান সিংহ যাত্রা', জামাল যাত্রা' ইত্যাদি এই জাতীয় লোকনাট্যের সার্থক উদাহরণ। এই লোকনাট্যগুলোতে একটি উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। তাই দেখা যায় হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর মানুষ একত্র হয়ে এসব নাটক অভিনয় করে এবং সমবেত হিন্দু-মুসলমান শ্রোতা একত্রে বসে সে অভিনয় উপভোগ করে। নীতিশিক্ষা বা আদর্শ প্রচারের একটি সজ্ঞান-প্রবণতা এ জাতীয় নাট্যসৃষ্টি ও অভিনয়ের পিছনে কাজ করলেও, কেউ যদি মনে করে নীতিশিক্ষা-দান বা নীতিকথা প্রচরণাই এগুলোর একমাত্র লক্ষ্য, তা হলে কিন্তু তিনি খুবই ভুল করবেন। কারণ এগুলোতে লোকজীবনশিল্পীরা নর-নারীর জীবন-বাস্তবকে পূর্ণ মূল্যদানের চেষ্টা করেছেন। এবং সে চেষ্টা প্রায়শই শিল্প-সার্থকতামণ্ডিত হয়েছে।

এই লোকনাট্যেগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে, ভাসমান যাত্রা ও পালাকীর্তনের প্রাচীন রসধারার সঙ্গে আমাদের বর্তমান কালের জীবনধারার সংযোগ ঘটায়, এদের আকর্ষণ আজও অনেকটা বজায় রয়েছে। নাটকগুলোর কথোপকথনে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ কথাবার্তার ভঙ্গিটিই রক্ষিত হয়েছে। অথচ তা অবলম্বন করেই নাটকের চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং ঘটনার নানা ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে অপূর্ব রসতরঙ্গ সৃষ্টি

করেছে। লোকনাট্যের কথোপকথনের এই স্বাভাবিকতাই এদের অনায়াস অভিনয়োপযোগী করে তুলেছে। এতে আর একটি সুফল হয়েছে এই যে, অভিনেতারা বিভিন্ন চরিত্রের পাঠ বলতে অনেকটা স্বাধীনতা পায় বলে, অভিনয় কালে বেশ স্বাচ্ছন্দ বোধ করে এবং আপন আপন অভিনয়নৈপুণ্য দেখানোর পূর্ণ সুযোগ লাভ করে। আবার ঐ কারণেই একদলের অভিনীত নাটকের সঙ্গে অন্যদলের নাটকের গুণগত পার্থক্যও দেখা দেয়। ভাল দলপতির হাতে পড়লে নাটকের উৎকর্ষ সাধিত হয়, অক্ষম দলপতির হাতে পড়লে অপকর্ষ ঘটে। এ ছাড়াও এই লোকনাট্যগুলো সম্বন্ধে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করার আছে, তা হচ্ছে এই যে, অভিনেতার অভিনয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট স্বাধীনতা নেয়ার সুযোগ থাকায় এ নাটকগুলো নানা কণ্ঠের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ক্রমেই খোলস বদলিয়ে চলে। বিভিন্ন অঞ্চলের রুচির বিভিন্নতার জন্যে এদের অংশবিশেষ প্রলম্বিত হয়, কোন অংশ বা খসে পড়ে। দলবিশেষে কোন অভিনেতা অভিনয়দক্ষতা দেখানোর জন্যে অনেক সময় অভিনয়ের অংশটি ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করেন, আবার দক্ষতার অভাবে অপর অভিনেতা সে অংশ সংক্ষিপ্ত করেন। এই ভাবে লোকচর্চার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে বলেই তো লোকরঞ্জনের জন্যে সৃষ্ট এ নাটকগুলোকে লোকনাট্য বলে। জসীমউদ্‌দীনের ভাষায়, "কোন বিশেষ ব্যক্তির রচনায় নয়, দেশের সকল লোকের রচনায় রূপায়িত হয় বলিয়াই এগুলি লোকনাট্য।"

শুধু যে পূর্ববঙ্গের 'যাত্রাগান' সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য তা নয়, মালদহের 'আলকাফ' এবং উত্তরবঙ্গের 'তামাসা' জাতীয় লোকনাট্যগুলো সম্পর্কেও শেষের এই বক্তব্য প্রযোজ্য। এই লোকনাট্যগুলোর সাহিত্যিক-মূল্য ছাড়াও এক গভীর সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে। জসীমউদ্‌দীনের মতেঃ "এই নাটকের ভিতরেই আমাদের গ্রাম্যজীবনের আসা-আকাঙ্ক্ষার কথা, কি তাহারা হইতে যাইয়া কি তাহারা হইতে পারে না, সেই সুখদুঃখের জীবন্ত আলেখ্য রচিত হইয়া আছে। দেশকে যাঁহারা ভালবাসেন, দেশের জনগণের অন্তরের সঙ্গে যাঁহারা আত্মার আত্মীয়তা স্থাপন করতে প্রয়াস পাইবেন, তাঁহারা এই লোকনাট্যগুলির মধ্যে অনেক কিছু খুঁজিয়া পাইবেন।' বস্তুতঃ লোকনাট্যগুলো লোকজীবন ও লোকমানসের অন্তরঙ্গ পরিচয়ে সমৃদ্ধ বলেই, এগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা গ্রামবাঙলাকে, গ্রামবাঙলার মানুষকে যথার্থরূপে জানতে ও বুঝতে পারি। লোককাব্যের বাতায়ন পথে প্রথম এই গ্রাম বাঙলার মানুষের জীবনে প্রবেশের সুযোগ ঘটেছিল জসীমউদ্‌দীনের ; লোকনাট্যের সদর রাস্তায় তাঁর সাথে ঘটেছে তার নিবিড়তর পরিচয়। আমার মনে হয়, এই আলোতে বিচার করলেই তাঁর লোকনাট্য সৃষ্টিপ্রয়াসটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে। রবীন্দ্রনাথ মন দিয়ে যার নাগাল পান নি, গান দিয়ে তাকে স্পর্শ করার কথা ভেবেছিলেন ; জসীমউদ্‌দীন লোককাব্যের বাতায়ন পথে যাকে শুধু স্পর্শই করতে পেরেছেন, লোকনাট্যের সদর রাস্তায় নেমে তার সাথে কোলাকুলি করে তার অপরূপ মিলনপিপাসা মিটিয়েছেন। তাই জসীমউদ্‌দীনের লোকনাট্য সৃষ্টির প্রয়াসকে বিশেষ মূল্য দিতে হয়।

জসীমউদ্‌দীনের হাতে বাংলা লোকনাট্যের পুনরুজ্জীবনই শুধু ঘটে নি, জন্মান্তরও ঘটেছে। আধুনিক শিল্পচেতনার পোষকতা থাকায় তাঁর রচিত লোকনাট্যের ভাষাদেহে যুগোচিত পরিমার্জন ছাড়াও অবলম্বিত কাহিনীতে যে সুসংবদ্ধতা দেখা যায় এবং ঘটনাবিন্যাসে যে চাতুর্য ও চরিত্র-চিত্রণে যে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে একে এক প্রকার নতুন সৃষ্টি বললেও চলে। তবু জসীমউদ্‌দীন তাঁর লোকজীবনের সুরাশ্রিত কবি-কর্মের ন্যায় তাঁর লোকনাট্যের ক্ষেত্রেও সর্বদা এর বিশেষ স্বভাবটিকে অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। ঐ উদ্দেশ্যেই তিনি সর্বত্র লোকজীবন থেকেই নাট্যবস্তু সংগ্রহ করেছেন

আর তার শিল্পরূপ দানে লোকসঙ্গীত, রূপকথা, কেচ্ছা, লোকগীতিকা, ছড়া, প্রবাদের রাজ্য থেকে অবাধে উপকরণ সংগ্রহ করে কাজে লাগিয়েছেন। সংলাপ রচনা কালে তিনি পল্লী নর-নারীর স্বাভাবিক বাচনভঙ্গির প্রতি যথাসম্ভব আনুগত্য রক্ষা করে চলেছেন। মোট কথা লোকজীবন থেকে মাল-মশলা নিয়ে, লোকজীবন ভঙ্গিমাকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে জসীমউদ্‌দীন লোকনাট্যের যে নবদিগন্ত উন্মোচন করেছেন, তা তাঁর লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যাশ্রয়ী সাহিত্য-সাধনারই ব্যাপ্তি ও গভীরতা সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কাব্য-প্রচেষ্টার ন্যায় তাঁর নাট্যচেষ্টাও সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। তাঁর লোকনাট্যগুলোর জনচিত্ত জয়ের ক্ষমতা ইতিমধ্যেই প্রতিপন্ন হয়েছে। সৌখীন অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রচেষ্টায় বেতারে, রঙ্গমঞ্চে ও আসরে নানাভাবে অভিনীত হয়ে এগুলো সর্বস্তরের লোকের মধ্যে অসাধরণ প্রিয়তা অর্জন করেছে। বলাবাহুল্য লোকনাট্যের এই নতুন দিগন্তে জসীমউদ্‌দীনের সার্থকতার মূলে কাজ করেছে লোকচরিত্রে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, লোকজীবন ও লোকমানস সম্পর্কে তাঁর সমৃদ্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতার অধিকার এবং সব কিছুকে সমঞ্জসিত করে শিল্পরূপ দানের সহজাত ক্ষমতা।

লোকনাট্য জসীমউদ্‌দীন খুব বেশী লেখেন নি। কারণ, সম্ভবতঃ লোকসাহিত্যের এই দিকটির প্রতি তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল সাহিত্যিক-প্রৌঢ়ত্ব লাভের পরে। লোকনাট্যের যে সব উপাদান পল্লীসাহিত্যে ছড়িয়ে ছিল, তার সাথে তাঁর পরিচয় অবশ্য ঘটেছিল অনেক আগেই। এ পরিচয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখালী'র অন্তর্ভুক্ত 'সিঁদূরের বেসাতি' নামক গীতিনাট্যংশটির উল্লেখ করতে পারি। তাঁর 'রঙিলা নায়ের মাঝি'র কিছু কিছু গানে, অন্যত্র সংকলিত বহুগানেও লোকনাট্যের উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে দেখতে পাই। তাঁর রচিত পল্লীজীবন-গাথা 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে'র উচ্চ নাটকীয় বৈশিষ্ট্যও সহজেই নজর কাড়ে। এতৎসত্ত্বেও লোকনাট্য রচনার প্রেরণা তিনি অনুভব করেছেন অনেক কাল পরে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ ও উৎসাহ প্রাপ্তির ফলে। সে প্রেরণা কার্যকরী হয়েছে আরও পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর নয় বছর পরে মাত্র এই সেই দিন ১৯৫০ সালে। অথচ জসীমউদ্‌দীনের কাব্যসাধনা শুরু হয়েছিল ১৯২৭ সালেরও আগে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, তাঁর কাব্যসাধনায় যখন ভাটার টান এসে গিয়েছে, তখনই জসীমউদ্‌দীন লোকনাট্যের নতুন খাতে চলার গরজ বোধ করেছেন। মোট পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ লোকনাট্য তিনি রচনা করেছেন ; এগুলো হচ্ছে 'পদ্মারপার', 'মধুমালা', 'বেদের মেয়ে', 'পল্লীবধূ' ও 'গ্রামের মায়া'। এ ছাড়া 'বদল বাঁশী', 'করিম খাঁর বাড়ী', 'জীবনের পণ্য' ও 'গাজন চরের কাইজ্যা' শীর্ষক চারটি ক্ষুদ্র একাঙ্কিকাও জসীমউদ্‌দীন রচনা করেছেন। এগুলো মোটামুটি লোকনাট্যের লক্ষণাক্রান্ত। 'বদল বাঁশী' ও 'করিম খাঁর বাড়ী', পল্লীবধূ' নাট্যগ্রন্থের শেষে সংযোজিত হয়েছে এবং 'জীবনের পণ্য' ও 'গাজন চরের কাইজ্যা' জসীমউদ্‌দীনের সর্বশেষ নাটক (কাব্যনাট্য) 'ওগো পুষ্পাধনু'র কলেরব পুষ্ট করেছে। এসব লোকনাট্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ বর্তমান প্রবন্ধে নেই বলেই আমরা সংক্ষেপে এদের বিষয় ও শিল্পকৌশলগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে প্রসঙ্গটির ইতি টানব।

জসীমউদ্‌দীনের প্রথম লোকনাট্য অভিধেয় রচনা 'পদ্মাপার' ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়। এটি মূলতঃ একটি অধ্যাত্মরূপক-জাতীয় লোকনাট্য। শৈব, শাক্ত, সহজিয়া সাধনার ধারায়, বাউল মুর্শিদা, মারফতী প্রভৃতি গানের সুরে বাঙালির অধ্যাত্মবোধের যে সহজ প্রকাশ ঘটেছে যুগে যুগে, কথার সূত্রে গানের মালা গেঁথে তাকেই জসীমউদ্‌দীন নাট্যরূপ দিয়েছেন 'পদ্মাপারে'। এ নাটক রচনার সূত্র তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত 'মোনাই

যাত্রা' লোকনাট্য থেকে। 'পদ্মাপার' নাটক রচনায় 'মোনাই যাত্রার' অনুসরণ সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীনের স্পষ্ট স্বীকৃতি পাওয়া যায়, লোকনাট্য সম্পর্কিত তাঁর প্রবন্ধে। লক্ষ্য করার বিষয় মোনাই যাত্রার ন্যায় এ নাটকের নায়কের নাম মোনাই। নাটকটিতে ভবপথের কথিক মানুষের পরমকে জানা ও পাওয়ার অপরূপ উৎকণ্ঠাই মোনাই সওদাগর ও সুজন মাঝির অনির্দেশ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। মোনাই এখানে ভবপথের যাত্রী, পরমের উদ্দেশ্যসন্ধানী মানুষের প্রতীক, আর সুজন মাঝি ভবপথযাত্রী, মানুষের পথপ্রদর্শক গুরু বা মুর্শিদেরই প্রতীক। পরমকে জানা ও পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন ; কিন্তু সে সাধ বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ সুদুঃসহ ত্যাগ ও সাধনাসাপেক্ষ। সে সাধনার পথে সংসারী মানুষের বাধা অনেক। লোভ, মোহ-মাৎসর্য, বিষয়-বুদ্ধি সব সময়ই মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তাই পথের দিশা হারিয়ে ফেলার ভয় রয়েছে প্রতি পদে। বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তি এ পথের পথিকের বড় সম্বল। কিন্তু শুধু এসবের উপর ভরসা করেই ভবপথিক চলতে পারে না। কারণ পদে পদে সংশয় এসে তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাকে ভুল পথে ঠেলে দিতে চায়। এ অবস্থায় সদগুরুর উপদেশ বা নির্দেশের প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি। তিনিই কেবল তাকে সকল মোহজাল ছিন্ন করে, সংশয় কাটিয়ে উঠে যথার্থ পথে চলবার উপযুক্ত শক্তি ও প্রেরণা জোগাতে পারেন। নতুবা ভবপথযাত্রীর ভরাডুবি অনিবার্য। মোটামুটিভাবে আমাদের বাউল, মুর্শিদীপন্থার সাধকরা অনন্তের সঙ্গলাভপ্রয়াসী ভবপথিক মানুষের সমস্যাটাকে এইভাবেই তুলে ধরেছেন এবং তার সমাধান নির্দেশ করেছেন। আলোচ্য 'পদ্মাপার' লোকনাট্যে রূপকচ্ছলে এই অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার স্বরূপটিই ব্যক্ত হয়েছে।

নাটকটিতে দেহতত্ত্বের সুপ্রচুর উল্লেখ দৃষ্টে অনায়াসে অনুমান করা চলে যে, বাঙলার বাউলপন্থী লোকসাধকের অধ্যাত্মভাবনাই যেন এতে কৌশলে রূপায়িত করা হয়েছে। বাউলরা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর বা পরমাত্মা মানব দেহেই স্থিতি করেন। তাঁকে দেহাধারেই যথার্থ উপলব্ধি করা সম্ভব ; তবে সে জন্যে সুকঠিন যোগমার্গের আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন। তাঁরা বলেন, যোগবলে দেহস্থ মূলাধারে স্থিত কুলকুণ্ডালিনী শক্তিকে জাগ্রত করে সহস্র দলপদ্মে স্থির পরমাত্মার যোগে যুক্ত হতে পারলেই ঈশ্বরের উপলব্ধি সম্ভব। এ মার্গ স্বভাবতই দুরধিগম্য। পথ চলতে উপযুক্ত গুরুর সাহায্য, উপদেশ ও নির্দেশনা সর্বদা প্রয়োজন। নানা ভ্রান্তি, প্রলোভন পথিকের বিপদ ডেকে আনতে পারে। তবে সত্যকে জানার আন্তরিক আগ্রহ ও ত্যাগবরণের সামর্থ থাকলে শেষ পর্যন্ত সকল বাধা উত্তীর্ণ হয়ে অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব। আলোচ্য নাটকে মোনাই সওদাগরের বিচিত্র জটিল অভিজ্ঞতা ভবপথিকের সাধনার কঠোরতারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। জসীমউদ্‌দীন সহজ রূপকের আবরণে রূপকথার মতো সুন্দর করেই ভবপথিক অনন্ত সঙ্গলিপ্সু মানুষের এই সংকট ও সাধনার কথা 'পদ্মাপার' নাটকে প্রকাশ করেছেন। তাত্ত্বিক জটিলতা সত্ত্বেও যে এ নাটকের বক্তব্য সহজ ও হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে উঠতে পেরেছে, তার জন্যে কৃতিত্বের দাবি অবশ্যই জসীমউদ্‌দীন করতে পারেন। তবে এ কঠোর পরীক্ষার বৈতরণী পার হতে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে বাঙলার লোকায়ত জীবনভাবনা সমৃদ্ধ পল্লীগীতিগুলো। অধ্যাত্ম-ভাবনার তাত্ত্বিকরূপ যত জটিলই হোক না কেন, লোককবিরা লোকজীবন থেকে রূপক তৈরী করে তাকে অতি সাধারণ মানুষেরও বোধগম্য করে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়েছেন। জসীমউদ্‌দীন ঐ গানের সরণি অবলম্বন করেই অনায়াসে দুস্তর বাধা অতিক্রম করেছেন। আর একটি কারণেও অধ্যাত্মজীবন-ভাবনার জটিলতায় পূর্ণ এ

লোকনাট্যটি লোকচিত্ত জয় করতে পেরেছে। তা হচ্ছে এই যে, এই লোকনাট্যে ভাববাদী বাঙালি স্বভাবের মজ্জাগত মধ্যাত্মবোধের সাড়া রয়েছে। যুগ যুগ ধরে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সহজিয়া, আউল-বাউল, মারফতী সাধকদের অধ্যাত্মসাধনার রসনিষেকে উর্ব্ব সাধারণ বাঙালি চিত্তে লোককবিরা এমন সুকৌশলে এইসব অধ্যাত্মভাবনার বীজ বুনে দিয়েছেন একটু ভক্তি বা আবেগের বর্ষণেই তাতে ভাবনার মুকুল ফুটতে শুরু করে। তাই অনায়াসেই তারা তত্ত্বের বেড়ি অতিক্রম করে যে কোনো ভাবনার মর্মমূলে পৌঁছে যায়। এই জন্যেই তো তত্ত্ব সর্বস্ব হয়েও 'পদ্মাপার' লোকনাট্য হিসেবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়েছে।

'পদ্মাপার' লোকনাট্যের একটি শিল্পগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এতে ঘন ঘন গানের সমাবেশে একটি অবিচ্ছিন্ন গীতিপ্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে। গানগুলো সবই পল্লী থেকে সংগৃহীত; তবে জসীমউদদীন এগুলোকে কিছুটা পরিমার্জিত, ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তিত করে তাঁর নাটকে ব্যাবহার করেছেন। যে ভাষার সূত্রে এগুলোকে গেঁথে একটি অখণ্ড সুরসঙ্গতি দানের প্রয়াস পেয়েছেন, তাও যথাসম্ভব পল্লীর প্রাত্যহিক কথাবার্তারই ভাষা। ফলে পল্লীপ্রাণের যথার্থ স্পন্দনটি অনুভব করা যায় এ নাটকে। তবে একথা ঠিক যে, এ নাটকের চরিত্রগুলোর কথোপকথন ও গানের ভাষায় কিছুটা হেঁয়ালির ভাব লক্ষ্য করা যায়।

'পদ্মাপার' নাটকের ভাববস্তুর নৈর্ব্যক্তিকতাই যে এর জন্যে অনেক পরিমাণে দায়ী তা না বললেও চলে। জসীমউদ্‌দীনের কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি লোকজীবন থেকে রূপকের উপাদান নিয়ে লোকভাষায় রূপকথার আদল সৃষ্টি করে দুরূহ তত্ত্বভাবনাকেও একটা স্বাদুতা দান করতে পেরেছেন। 'পদ্মাপার' নামকরণটিও তাঁর সহজাত শিল্পবোধের সুন্দর পরিচয় বহন করে। তরঙ্গসংকুল খরস্রোতা পদ্মাপ্রবাহের চেয়ে অনন্ত সঙ্গলিপ্সু ভবপথিকের দুরূহ সাধন পথের শ্রেষ্ঠ উপমা আর কিইবা হতে পারে।

রূপকথাশ্রয়ী লোকনাট্য 'মধুমালা' জসীমউদ্‌দীনের দ্বিতীয় নাট্যগ্রন্থ। বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে লোকমুখে প্রচলিত মদনকুমার ও মধুমালার রূপকথা অথবা 'মধুমালার কেচ্ছা' অবলম্বনে এইটি রচিত হয়েছে। বহুকাল নিঃসন্তান এক রাজা ও রাণীর অনেক তপস্যা ও সাধনার ফল একমাত্র পুত্রের যৌবন-স্বপ্নমত্ততার এক আকুল করা কাহিনী হচ্ছে 'মধুমালা' লোকনাট্যের বিষয়। সঙ্গীদের সাথে বনে শিকার করতে গিয়ে সারাদিন ছুটাছুটির পর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল রাজপুত্র মদনকুমার। দৈবক্রমে ঐ বনের উপর দিয়ে যাচ্ছিল কালপরী ও নিদ্রাপরী। রাজপুত্রের রূপে মুগ্ধ হয়ে ওরা তারই উপযুক্ত পাত্রী মনে করে ভিনদেশের এক রাজকন্যা মধুমালার সঙ্গে স্বপ্নযোগে ঘটিয়ে দেয় তার মিলন। স্বপ্ন ভঙ্গ হতেই রাজপুত্র আকুল হয়ে ওঠে স্বপ্নে দেখা সেই রাজাকন্যাকে পাবার জন্যে। এদিকে রাজকন্যা মধুমালাও ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থাকে তার জন্যে। তারপর কেমন করে বহু দুস্তর বাধার সমুদ্র অতিক্রম করে, বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে রাজপুত্র পেলো সেই মধুমালার দেখা।, তাই বিবৃত হয়েছে এই নাটকটিতে। বলা বাহুল্য মদনকুমার ও মধুমালার মিলনের মধ্যেই পরিসমাপ্তি লাভ করেছে নাটকটি।

তেরটি বিভিন্ন দৃশ্যে বিন্যস্ত করে এ জনপ্রিয় রূপকাহিনীটিকে লোকনাট্য রূপে গড়ে তুলেছেন জসীমউদ্‌দীন। দৃশ্যগুলোর মধ্যে সঙ্গীতের প্রবাহ সঞ্চার করে দিয়ে তিনি সুকৌশলে তাদের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করেছেন। বস্তুতঃ এই নাটকে গানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে গানে সুরে ভর করেই নাটকের কাহিনী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে চলেছে। এ সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীনের নিজের উক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেনঃ " প্রাচীন গানের আলোক প্রদীপ জ্বালাইয়া এ কাহিনী রূপলোকের দিকে

চালতেছে।" এই যাত্রাপথে কথোপকথন যেন কাহিনীর অগ্রগতির পরিমাণটা নির্ণয়ের মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ থেকে হিসেব নেয়ার কৌশল মাত্র। নাটকের নর-নারীদের স্বপ্নকামনা, ভাবাবেগ, কৌতুকপ্রিয়তা—তাদের চরিত্রের যাবতীয় ক্রিয়াশীলতা ভাষা পেয়েছে ঐ গানের মধ্যেই। পদ্মাপার লোকনাট্যের মতো এখানেও আমরা তাই লক্ষ্য করি গানের সুরেরই প্রাধান্য। অবশ্য লোকনাট্যে সুর-প্রাধান্যই স্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ লোককবিরা মন দিয়ে নয় গান দিয়েই সব জিনিসের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং তার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন আপন সৃষ্টিধর্মের সাথকতা। জসীমউদ্‌দীন লোকনাট্যের এ ট্র্যাডিশন রক্ষা করে চলেছেন সযত্নে।

জসীমউদ্‌দীন এ লোকনাট্যটি সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলেন "গ্রাম্যরূপকথা ও কথন কথার ভাণ্ডার' তাঁর অন্ধ দাদার (পিতার চাচার) কাছ থেকে। তিনি নিজেই বলেছেন যে শুধু কাহিনী নির্বাচনেই নয়, এর প্রকাশভঙ্গিতেও তিনি তাঁর দাদার অপরূপ কথন ভঙ্গিটিকে যথাসাধ্য অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। এ নাটক রচনায় তাঁর দাদার কাছে তাঁর অপরিসীম ঋণের কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করে তিনি বলেছেন "এই নাটকের মধ্যে মধুমালার কেচ্ছার পুরাতন গানগুলি যথাসম্ভব রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেই গানগুলি সব একই সুরের। সেই পুরাতন সুরের পাখা বিস্তার করিয়া অতীত যুগের ভাবধারা টানিয়া আনিতে প্রয়াস পাইয়াছি।" কারণ তাঁর বিশ্বাস "আমাদের অবচেতন মনে সেই সুর হয়ত আজও বাসা বাঁধিয়া আছে।" আমার মনে হয় পুরাতন গল্পকথার আবহটি যথাযথ সৃষ্টি করতে হলে এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোনো পন্থা আর থাকতে পারে না। পুরাতন গানগুলো নির্বাচনে জসীমউদ্‌দীন নির্ভুল রসচেতনার স্বাক্ষর রেখে দিয়েছেন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে তিনি কিছুটা স্বাধীনতাও নিয়েছেন। গানগুলোর মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্যসঞ্চারের জন্যে তিনি কয়েকটি নতুন গানও এ নাটকে জুড়ে দিয়েছেন। বরিশাল অঞ্চলে প্রচলিত 'আসমান সিংহ' লোকনাট্যের কয়েকটি গানের সুর তিনি নাটকের দুই তিনটি গানে প্রয়োগ করেছেন। তদুপরি নাটকের ঘটনা বিন্যাসেও কিছুটা নতুনত্ব এনেছেন ঐ 'আসমান সিংহ' লোকনাট্য থেকে কালপরী ও নিদ্রাপরী কথাবার্তার প্রসঙ্গটি আমদানি করে।

লোকনাট্য 'মধুমালা'য় অনুসৃত ভাষাভঙ্গিটি কিন্তু লোকনাট্যের স্বভাবধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। লোকনাট্যের ভাষায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষার আবশ্যকতার প্রশ্নটিকে এই অজুহাতে তিনি এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন যে, কোন বিশেষ অঞ্চলের গ্রাম্যভাষা ব্যবহার করলে তা অন্য অঞ্চলের লোকেরা বুঝতে পারবে না। এতএব সর্বজনবোধগম্য কলকাতা অঞ্চলের ভাষাভঙ্গিকে তিনি শ্রেয়ঃ মনে করেছেন। কিন্তু লোকনাট্যের ভাষায় আঞ্চলিকতা বর্জনের পক্ষে এ যুক্তি যথেষ্ট জোরাল নয় বুঝতে পেরেই তিনি বিনীতভাবে নিজ অসামর্থ স্বীকার করে অন্যত্র বলেছেন, "যে সহজ কথাবার্তায় আমাদের লোকনাট্যগুলি রচিত, আমার রচনায় তাহা সম্যক ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই। কারণ অতি সাধারণ কথায় রস সৃষ্টি করার অপূর্ব ক্ষমতা আমার নাই।" কবির আত্মসমালোচনাপূর্বক এই উক্তি বিনা প্রতিবাদে আমাদের পক্ষে গ্রহণ সম্ভব নয়। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে রূপকথার রস পরিবেশনটি মুখ্য মনে করায় এবং রূপকাহিনী বর্ণিত চরিত্রগুলোর স্থানিক ও ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটনের অবকাশ না থাকায়, জসীমউদ্‌দীন ভাষায় আঞ্চলিক রীতি পরিহার করে খুব একটা অন্যায় করেন নি বলেই আমরা মনে করি।

'মধুমালা'র পরে প্রকাশিত হয় জসীমউদ্‌দীনের বিখ্যাত লোকনাট্য 'বেদের মেয়ে'। এটি নানা কারণে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। বলতে গেলে এ নাটকেই জসীমউদ্‌দীন প্রথম বাঙলা

দেশের লোকজীবনের বাস্তবকে আশ্রয় করেছেন। 'পদ্মাপার' নাটকে বাস্তবজীবনের প্রতিভাস থাকলেও, লোকজীবন নয়, লোকমানসেরই একটা অধ্যাত্ম-বিশ্বাস শাসিত রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। 'মধুমালা' তো নিছক রূপকথা-রাজ্যেরই বাসিন্দা। রূপকথার রসলোকের সিঁড়ি বেয়ে সে অবশ্য নেমে এসেছে লোকজীবনের আঙিনায়। 'বেদের মেয়ে'তেই আমরা সর্ব প্রথম প্রত্যক্ষ করি আমাদের পল্লীবাঙলার নর-নারীর স্নেহ-ভালবাসা সিক্ত অথচ বিয়োগব্যথা কণ্টকিত জীবনকে ; আমাদের বেদে সমাজের একটি বলিষ্ঠ চিত্র হিসেবে এই লোকনাট্যটি বিশেষ মূল্য বহন করছে বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। যদিও এ নাটকে 'চম্পা' নাম্নী এক বেদের মেয়ের ট্র্যাজেডিই মুখ্য বিষয়, তবু ঐ ট্র্যাজেডিকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে নাট্যকার আমাদের বেদে সমাজের একটি বাস্তবানুগ ছবিও উপহার দিয়েছেন। ঐ উপলক্ষে আমাদের সামনে বৃহত্তর বাঙলার কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজের চেহারার সুস্পষ্ট আভাসও উপস্থাপিত করেছেন লেখক। 'বেদের মেয়ে' নাটকে কোনো বিশেষ ঘটনা নয়, বেদের মেয়ে চম্পার নারী-আত্মার ক্রন্দনধ্বনিই যেন প্রথম থেকে বেজে ফিরেছে। গয়া বেদেকে নিয়ে সে ঘর বেঁধেছিল, স্বপ্ন দেখেছিল এক সুন্দর প্রেমস্নিগ্ধ জীবনের। কিন্তু হতভাগিনী নারী তার অপরূপ সৌন্দর্যের জন্যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বাধ্য হয়েছিল এক গ্রাম্যমোড়লের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। বেদে সমাজের মঙ্গলকে সবচেয়ে কাম্য মনে করে সে ঐ লাঞ্ছনাকে মাথা পেতে নিয়েছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে মোড়ল কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে সে ফিরে আসে তার পূর্বপ্রণয়ী, স্বামী গয়া বেদের কাছে। গয়া বেদে তখন নতুন বেদেনী নিয়ে নতুন ঘর বেঁধেছে। তাই চম্পাকে গ্রহণ করতে রাজী হলো না স্ত্রীর মর্যাদায়। প্রত্যাখ্যাতা চম্পা এ অবস্থায় বেঁচে থাকার কোনো অর্থই খুঁজে পায় নি। তাই সে অভিমানে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। বিদায়ের আগে সর্পদষ্ট গয়া বেদেকে নিজের জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়ে গিয়ে সে তার প্রেমের মহিমাকেই স্পষ্ট করে তুলে গিয়েছে।

চম্পার ব্যথাহত প্রেমের কান্না গোটা নাটকটিতে একটা চূড়ান্ত লিরিক্যাল আবেগ সৃষ্টি করে সকল চরিত্র ও ঘটনাকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে। সঙ্গত কারণেই তাই সমালোচক বলেছেন, 'বেদের মেয়ে' নাট্যাকারে রচিত হলেও প্রকৃত পক্ষে একটি অনুপম গীতি সৌন্দর্যে চিহ্নিত প্রেমের কাব্য।'

অন্যত্র যেমন, এ লোকনাট্যেও তেমনি, লোকনাট্যের স্বভাবধর্ম পুরো বজায় রাখার জন্যে জসীমউদ্‌দীন সংলাপে আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গিকে পূর্ণ মূল্য দিয়েছেন এবং লোকসঙ্গীতের সম্পদও ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। আগেই প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করেছি যে, এ নাটক রচনার ব্যাপারে তিনি উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত 'হুমরা বাইদ্যা' নামক লোকনাট্যের কাছে অনেকটা ঋণী । বিশেষত 'হুমরা বাইদ্যা' নাটকের মোড়ল চরিত্রের আদলেই যে তিনি বেদের মেয়ে নাটকের মোড়ল চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, এমন আভাস জসীমউদ্‌দীন স্বয়ং লোকনাট্য সম্পর্কিত স্বরচিত একটি প্রবন্ধে দিয়েছেন। 'বেদের মেয়ে' নাটক রচনার ব্যাপারে জসীমউদ্‌দীন যে লোকনাট্য ও গ্রাম্যগানের কাছে বিশেষভাবে ঋণী তা তিনি নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় অকপটে ব্যক্ত করেছেন। তিনি যে এটিকে সচেতনভাবে গ্রাম্য তথা লোকনাট্যে পরিণত করার প্রায়াস পেয়েছেন, তাও স্বীকার করেছেন। প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করছিঃ "এই নাটককে গ্রাম্য নাটকে রূপান্তরিত করিতে যাইয়া আমি কোন কোন স্থানে প্রচলিত লোকনাট্যের অংশ বিশেষ গ্রহণ করিয়া এই নাটকের পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কয়েকটি

গ্রাম্যগানেরও প্রথম পদ লইয়া তাহার সঙ্গে নতুন পদ জুড়িয়া দিয়াছি।" মোট কথা, একজন সচেতন শিল্পীর মন নিয়েই জসীমউদ্‌দীন লোকনাট্য ও গ্রাম্যগানের উপাদান সমীকৃত করে, গ্রহণ, বর্জন, পরিমার্জন ও সংযোজন ব্যাপারে ব্যাপক স্বাধীনতা গ্রহণ করে, 'বেদের মেয়ে' লোকনাট্যটি রচনা করেছেন। 'বেদের মেয়ে' নাটকে সংলাপ রচনায় ও চরিত্রচিত্রণে জসীমউদ্‌দীনের সফলতা নিতান্ত সামান্য নয়। জনচিত্তজয়ী ঐ লোকনাট্য লোকজীবনশিল্পী হিসেবে জসীমউদ্‌দীনকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে অনেকখানি।

'বেদের মেয়ে'র পর প্রকাশিত 'পল্লীবধূ' নাটকটি জসীমউদ্‌দীনের এই পর্যায়ের চতুর্থ এবং বোধহয় শ্রেষ্ঠ রচনা। 'পল্লীবধূ' পল্লীজীবনের একটি বাস্তব আলেখ্য। পাড়াগাঁয়ে বিবাহাদির ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে যে বিভ্রাট দেখা দেয়, দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে কি সামান্য কারণে হানাহানি বেঁধে যায় এবং আবার গাঁয়েরই দু'চারজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের প্রচেষ্টায় অতি সহজেই কেমন করে তার মীমাংসা হয়ে যায়, তারই একটি বাস্তব দৃশ্য 'পল্লীবধূ' নাটকে রূপায়িত হয়েছে। পল্লীর আঞ্চলিক ভাষার সংলাপে গ্রথিত এ নাটকটির কাহিনীর গতিশীলতা , এর ঘটনাপ্রবাহের আকস্মিক মোড় পরিবর্তন এর নাট্যগুণ অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। 'পল্লীবধূ' নাটকের প্লটটি প্রায় জসীমউদ্‌দীন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। তবে নানা কারণে কবির জীবিতকালে নাটকটি রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি ; এমনকি পরবর্তীকালে যখন তিনি লোকনাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখনও এটিকে প্রথম সৃষ্টির মর্যাদা দিতে পারেন নি। সে যাই হোক, বিলম্বিত হলেও 'পল্লীবধূ' নাটক রচনায় জসীমউদ্‌দীন কবিপ্রদত্ত প্লটটি প্রায় হুবহু গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্লটটি বলে দিয়ে এর ট্র্যাজিক ও কমিক দুই পরিণতির সম্ভাব্যতা সম্পর্কেও বলেছিলেন। ট্র্যাজিক পরিণতিটিই স্বাভাবিক হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কবি। তবে জসীমউদ্‌দীন সে ইঙ্গিত গ্রহণ না করে সুকৌশলে ঘটনাপ্রবাহের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে একে শেষ পর্যন্ত কমেডিতেই পরিণত করেছেন। যদিচ ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির সম্ভাবনাগুলো দেখাতেও তিনি পশ্চাদ্‌পদ হন নি।

'পল্লীবধূ' নাটকে বর্ণিত কাহিনীটি হচ্ছে এইরূপ ঃ গ্রামের ছদন মোড়লের ছেলে আজিম উচ্চশিক্ষা গ্রহণান্তে বহুদিন পর কলকাতা থেকে গ্রামে ফিরেছে। গ্রাম্যরীতিতেই গ্রামের লোকেরা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। যদিও উচ্চ শিক্ষিত আজিমের কাছে ব্যাপারটা স্থূলরুচির পরিচয় বলেই মনে হয়েছে। সে যাই হোক, দুদিন যেতেই পিতামাতার কাছ থেকে আজিম জানতে পারল, পাশের গ্রামের আলিম মাতব্বরের মেয়ে হাসিনার সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা বহুদিন আগেই স্থির হয়ে আছে ; এবার আজিম রাজী হলেই তারা কাজে এগিয়ে যেতে পারেন।

নতুন শিক্ষাভিমানী আজিম প্রথমটা গ্রাম্য মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাবটাকে উষ্মাভরে প্রত্যাখান করে। তখন মেয়ের বাবা আলিম মোড়ল অন্যত্র মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। ইতিমধ্যে দৈবক্রমে হাসিনার সাথে আজিমের একদিন দেখা হয়ে যায়। যৌবনবতী রূপসী হাসিনাকে দেখে আজিম মুগ্ধ হয়ে যায় এবং তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে ভুল করেছে বুঝে মন খারাপ করে বাড়ি ফেরে। ব্যাপারটা ছদন মোড়লের কানে যায়, তিনি দৌড়ে চলে যান আলিম মোড়লের বাড়িতে এবং তাকে অনুরোধ জানান পূর্ব প্রস্তাব মত আজিমের সঙ্গে হাসিনার বিয়ে দিতে। কিন্তু আলিম মোড়ল তাতে রাজী হন না, কারণ হাসিনার বিয়ে তিনি অন্যত্র ঠিক করে ফেলেছেন। এই নিয়ে দুই মোড়লের মধ্যে নানা কথা কাটাকাটি হয় এবং শেষ পর্যন্ত নিদারুণ রেষারেষিতে পরিণত হয়। ফলে হাসিনার বিয়ে

উপলক্ষে দুই গ্রামের মানুষের মধ্যে দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়। শেষ পর্যন্ত সরলপ্রাণ হাজী গৈজদ্দি ভূঞার সময়োচিত হস্তক্ষেপে ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যায়। তিনি তার ছেলেকে বিয়ের আসর থেকে তুলে নিয়ে আজিমের সাথে হাসিনার বিয়ে দেওয়ার জন্যে আলিম মোড়লকে আহ্বান জানান। হাজী সাহেবের মর্যাদার প্রশ্ন ভেবে আলিম মোড়ল তাতে সহসা রাজী হন না ; কিন্তু ছদন মোড়ল নিজ কন্যাকে হাজী সাহেবের ছেলের সাথে বিয়ে দেবার প্রস্তাব করে সমস্ত ব্যাপারটার একটা সুন্দর ফয়সলার ব্যবস্থা করেন। ফলে আজিম ও হাসিনার বিয়ের মধ্যে দিয়ে নাটকটি বাঞ্ছিত মিলনান্তক পরিণতি লাভ করে। 'পল্লীবধূ' নাটকটির সার্থকতা এইখানে যে, এতে গ্রাম্যজীবন-বাস্তবের চমৎকার স্বীকৃতি রয়েছে এবং তাকে শিল্পরূপদানে জসীমউদদীন অনায়াস ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

'পল্লীবধূ' নাটক সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা বোধহয় এই যে, জসীমউদদীনের যাবতীয় লোকনাট্যের মধ্যে এ নাটকেই যথার্থ নাটকীয় গুণের সমাবেশ বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। বিন্যাস-চাতুর্যে নাটকের ঘটনাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে climax-এর চড়া তারে বেঁধে, তারপর সুকৌশলে তাকে প্রসন্ন সমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, নাটক সৃষ্টির চাবিকাঠিটি তাঁর ভালোভাবেই হস্তগত হয়েছে। 'পল্লীবধূ' নাটক সৃষ্টি-কলাকৌশলগত বৈশিষ্ট্যেই অন্যান্য লোকনাট্য থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। অন্যান্য লোকনাট্যে জসীমউদদীন মুখ্যত গ্রাম্যগানের সুরে ভর করে মাঝে মাঝে কথোপকথনের আশ্রয় নিয়ে লোকচিত্র জয়ের চেষ্টা পেয়েছেন। সেখানে তিনি গ্রাম্য নাট্যকারদেরই পথানুসারী। 'পল্লীবধূ' নাটকে পারত পক্ষে জসীমউদদীন গানের আশ্রয় নেন নি। এখানে বিশেষ বিশেষ অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে আঞ্চলিক ভাষায় বলিষ্ঠ সংলাপ রচনা করেই আগাগোড়া কাজ চালিয়েছেন। পল্লী নর-নারীর সুখ, দুঃখ আনন্দ, বেদনা, ক্রোধের অনুভূতি প্রকাশে তিনি পল্লীর নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গিটিকে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন বলেই তা আশ্চর্যরূপে বাস্তবধর্মী ও চিত্তস্পর্শী হয়েছে। সরল মৌল আবেগের অধিকারী পল্লী নর-নারীর প্রতিটি চরিত্র স্বল্পাক্ষরে জীবন্ত হয়ে উঠেছে নাটকটিতে। দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হতে উদ্যত দুইদল লোকের প্রাথমিক কথার লড়াইয়ের ভাষা নির্বাচনে জসীমউদদীন 'গ্রাম্য কাইজ্যার' ভাষার রূপটিকে যথাযথ গ্রহণ করায় ঐ দৃশ্যে আমরা গ্রাম্যজীবনের সাথে প্রকৃতপক্ষে একেবারে মুখোমুখি হতে পেরেছি। বস্তুতঃ বাস্তব গ্রাম্যজীবনের অভিজ্ঞতার স্বাদ-সমৃদ্ধ এই 'পল্লীবধূ' নাটকটি জসীমউদদীনের একটি মৌলিক লোকনাট্য সৃষ্টি হিসেবে সমাদৃত হওয়ার দাবি রাখে।

'পল্লীবধূ' লোকনাট্যের শেষে সংযোজিত 'বদল বাঁশী' ও 'করিম খাঁর বাড়ী' শীর্ষক লোকনাট্যের লক্ষণাক্রান্ত ক্ষুদ্র একাঙ্কিকা দুইটির কথা এখানেই বলে নেয়া যেতে পারে। 'বদল বাঁশী' প্রেমেরই একটি সুর। সরলপ্রাণ পল্লীর ছেলে বছির ও পল্লীর মেয়ে বড়ু পরস্পরকে ভালোবেসেও পায় নি মিলনের সুযোগ। সমাজ-বিধানে বড়ু বাধ্য হয়েছে পরের ঘর করতে। যদিও বছিরকে ভুলতে পারে নি সে কোনোদিন। আর বড়ুকে হারিয়ে রিক্তপ্রাণ বছির রাতভর বাঁশীর সুরে প্রাণের বেদন নিবেদন করে স্বস্তি খুঁজে ফিরেছে। অবশেষে বড়ুর দাবিতে বাঁশীটি তার হাতে তুলে দিয়ে প্রেমের ভিখারী বছির নিজেকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছে।

জসীমউদদীনের রচনার মনোযোগী পাঠকই লক্ষ্য করে থাকবেন যে 'বদল বাঁশীতে' তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখালী'র নাম-কবিতার বক্তব্য ও বিষয়েরই প্রতিধ্বনি করেছেন। 'রাখালী' কবিতার প্রেমের সুরটিকেই তিনি এখানে গান ও

কথোপকথনের সূত্রে লোকনাট্য হিসেবে রূপ দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে এ লোকনাট্যে বর্ণিত ঘটনায় তেমন নাটকীয়তা নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ কবি এখানে কোনো বাস্তব ঘটনা নয়, ঘটনার শরে বিদ্ধ দুইটি কিশোর-কিশোরীর বেদনাক্লিষ্ট প্রাণের সুরটির প্রতিই মনকে নিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। কান পেতে বুঝতে চেষ্টা করেছেন তার ভাষা। তবু প্রেমের এই সুর জীবনাশ্রিতই বটে। জসীমউদদীনের কৃতিত্ব এইখানে যে, সীমাবদ্ধ সুযোগ সত্ত্বেও তিনি গ্রাম্য বাক্‌ভঙ্গি ও গ্রাম্যগানের সুর সংযোগে আলোচ্য একাঙ্কিকায় বাস্তব গ্রাম্যপ্রতিবেশের একটা আভাস এনে দিতে পেরেছেন।

'বদল বাঁশী'র পাশে 'করিম খাঁর বাড়ী' সম্পূর্ণ বিসদৃশ সৃষ্টি। এটি নাটক নয় একটি জীবনদৃশ্যেরই অতি সংক্ষিপ্ত নাট্যরূপ মাত্র। এতে লোকজীবনে উত্থিত অনতিলক্ষ্য ক্ষুদ্র তরঙ্গেরই যেন একটি ছবি ধরা পড়েছে। একটি মহৎ জীবন-ভাবনার অনুষঙ্গ নিয়ে উপস্থিত বলেই এটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধর্মপ্রাণ মুসলিম সমাজের সকল স্তরের মানুষের জীবনের সবচেয়ে কাম্যবস্তু হচ্ছে অন্তত একবার মক্কাশরীফে হজ্জ করার সুযোগ পাওয়া। সেই সুযোগ পেয়েও কেমন করে এ গ্রামের মাতব্বর শুধু তার গরিব প্রতিবেশী করিম খাঁর দুঃস্থ পরিবারের সর্বনাশের কাহিনী শুনে হজ্জাযাত্রা বন্ধ রেখে হজ্জের খরচের জন্যে নির্দিষ্ট টাকা দিয়ে সেই দুঃখী পরিবারের দুঃখ মোচনে ব্রতী হলেন, তারই কাহিনী অত্যন্ত দরদ দিয়ে জসীমউদ্‌দীন তুলে ধরেছেন আলোচ্য নাট্যকণিকাতে। ক্ষুদ্রপরিসরে স্বল্পাক্ষরে গ্রাম্য মাতব্বর, মৌলবী সাহেব ও করিম খাঁর মেয়ে এই তিনটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন জসীমউদ্‌দীন সহজ নৈপুণ্যে ; মূর্ত করে তুলেছেন একটি গ্রাম্য আবহ। দৃশ্যটি রূপায়ণে জসীমউদদীন 'মধুমালা' লোকনাট্যের ন্যায় এখানেও আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গির আশ্রয় না নিয়ে কলকাতার কথ্য ভাষা প্রয়োগ করেছেন। লোকনাট্যের মূলগত বৈশিষ্ট্য এতে যে ক্ষুণ্ন হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে লোকজীবনের পটেই যে এ নাট্যদৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

পূর্ণাঙ্গ লোকনাট্য সৃষ্টির সর্বশেষ প্রয়াস হিসেবে গণ্য হবে জসীমউদদীনের 'গ্রামের মায়া' নামক নাটকটি। সাহিত্য-সৃষ্টির কোন তাগিদ থেকে এটি সৃষ্টি হয় নি ; সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ একটি রাজনৈতিক আদর্শের প্রচার-কার্যের বাহন হিসেবে। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার লোককল্যাণকর দিকটিকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন কবি এই নাটকে। দেশের সৎ ও কর্মী যবুকদের তিনি আহ্বান জানিয়েছেন দেশগঠনের কাজে এগিয়ে আসতে। দেশ থেকে সকল দুর্নীতি, চোরাবাজারী, কালোবাজারীর পাপ উচ্ছেদ করতে এগিয়ে আসে গ্রামের ছেলে নইম, গ্রামের কবিয়াল হানিফ ও তার সঙ্গীরা। তাদের সাথে হাত মিলায় শহরের ছেলে আসলাম ও তার বোন রাজিয়া। তাদের আন্দোলনে বিপদাপন্ন বোধ করে চোরাকারবারী আরজান, পাচারকারী আসাদ প্রভৃতি সমাজের দুশমনরা আর তাদেরই তল্পিবাহক গ্রাম্য মৌলবী কলিমউদদীন। তারা চক্রান্তে মেতে ওঠে এদের জব্দ করার জন্যে। কিন্তু পারে না। মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন উপলক্ষ করে ম্যাজিস্ট্রেট আসেন গ্রামে গণতন্ত্রের আদর্শ ব্যাখ্যা করতে। আরজান, আসাদ গ্রামবাসীদের প্রতিনিধি সেজে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং ঐ সভায় আসলাম দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসাধরণকে রুখে দাঁড়ানোর আহব্বান জানালে, আরজান মুখোস খুলে পড়ার ভয়ে নইম ও আসলামের মতো যুবকদের নিন্দা করে এবং বিদেশীর দালাল বলে তাদের আখ্যা দেয়। কিন্তু তার অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অতঃপর সুযোগ বুঝে হানিফ বয়াতি সেই আসরেই কবিগান বেঁধে চোরাকারবারী আরজান ও আসাদের

কীর্তি ফাঁস করে দেয়। ফলে আরজান ও আসাদ ধরা পড়ে এবং তল্পিবাহক মোলবী কমিউদ্দীন সহ সাজা পায়। এই হচ্ছে মোটামুটি নাটকটির বিষয়বস্তু।

নাটকটির পরিকল্পনায় মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত 'আলকাফ' লোকনাট্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আলকাফ নাটকের ন্যায় কতগুলো সামাজিক সমস্যার কুফলের কথা এ নাটকেও তুলে ধরা হয়েছে। বয়াতির গানের সুরে তার তাৎপর্য অনায়াসেই সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে লোকমানসে। সংলাপের ভাষায় আঞ্চলিকতার স্বীকৃতি নাটকটিকে লোকজীবন ঘনিষ্ঠ রচনা করে তুলেছে তাতেও সন্দেহ নেই। তবে কবি এই নাটকটিকে নিছক প্রচারকার্যের একটি হাতিয়ার করে গড়ে তোলার সজ্ঞান প্রচেষ্টায় এর শিল্পমূল্য অনেক পরিমাণেই নষ্ট করে ফেলেছেন। নাটকে বর্ণিত কোনো কোনো চরিত্রে একটু প্রাণের আভাস এলেও অধিকাংশ চরিত্রই হয়ে দাঁড়িয়েছে যান্ত্রিক, টাইপ ধরনের। মোট কথা, নাট্যসৃষ্টি হিসেবে 'গ্রামের মায়া' নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সৃষ্টি বলেই মনে হবে।

'গ্রামের মায়া'র পরেও জসীমউদদীনের আর একটি নাটক প্রকাশিত হয়েছে। এটির নাম 'ওগো পুষ্পধনু'। এটি কাব্য-সংলাপে গ্রথিত একটি প্রেমের আখ্যায়িকা মাত্র। 'পুষ্পধনু'র বিচিত্র আকর্ষণে হৃদয়ে প্রেমের যে তরঙ্গ-দোলা উঠে নর-নারীকে কিভাবে বিড়ম্বিত করে এই সংসারে, সে বিড়ম্বনা থেকে মুক্তির পথই বা কি তারই ইঙ্গিত দিয়ে কবি এই নাটকটি রচনা করেছেন। লোকনাট্যের প্রধান লক্ষণগুলো এতে উপস্থিত নয়। কিন্তু এই নাট্যগ্রন্থের শেষে সংযোজিত 'জীবনের পণ্য' ও 'গাজন চরের কাইজ্যা, নামক ক্ষুদ্র একাঙ্কিকাদ্বয় নিঃসন্দেহে লোকনাট্য-লক্ষণাক্রান্ত। প্রথমটিতে তথাকথিত ভদ্র ও বিত্তবান সমাজের মানুষের হৃদয়হীনতার পটভূমিতে গ্রাম্য সরল, দরিদ্র মানুষের আর্ত অসহায়তার ছবিটিই ফুটে উঠেছে। রুগ্ন ছেলের ঔষধ জোটাতে পারে নি দরিদ্র পিতা। তার শেষ সম্বল দিয়ে সে ডাক্তারকে বাড়িতে আনার চেষ্টা পেয়েছে। তবু হৃদয়হীন ডাক্তার সময় মতো আসে নি। ফলে প্রকৃতপক্ষে বিনা চিকিৎসায় ছেলেটি তার মারা গেল। এই মর্মান্তিক জীবন-দৃশ্যের অভিনয় পল্লীর ঘরে ঘরে কতই না চলছে। জীবন এখানে বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে। শুধু অর্থমূল্যেই চলছে তার বেচাকেনা। এই অতি নির্মম সমাজ-সত্যটিই লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। বিষয়ের সার্বজনীন সামাজিক আবেদন একাঙ্কিকাটিকে লোকনাট্যের গণ্ডী থেকে একটু দূরেই সরিয়ে এনেছে। তবু এতে আমাদের দেশের লোকজীবন-বাস্তবই মার্যদা পেয়েছে স্বীকার করেত হয়।

দ্বিতীয় একাঙ্কিকার 'গাজন চরের কাইজ্যা' 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যের চরে জমির ফসল-কাটা নিয়ে দাঙ্গার দৃশ্য অবলম্বনে রচিত হয়েছে। নায়ক রূপা নায়িকা সাজু ছাড়াও অনেক ক্ষুদ্র চরিত্র এতে ভিড় করেছে। গ্রাম্য বাকভঙ্গি সর্বত্র অনুসৃত হওয়ায় লোকনাট্যের স্বভাবটি এতে বেশি করে ধরা পড়েছে। 'গ্রাম্য কাইজ্যা' ঝগড়া ফ্যাসাদের ভাষা দাঙ্গারত দুইপক্ষের মুখে অপূর্ব স্ফূর্তি লাভ করেছে। গ্রাম্য মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, তাদের প্রাত্যহিক জীবনধারা, সহজ জীবনপ্রীতি, গ্রাম্য রসিকতা সব কিছু নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসর একাঙ্কিকাটি লোকজীবনের একটি উজ্জ্বল আলেখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জসীমউদ্‌দীনের লোকনাট্য-সাধনা আপাতত এখানেই এসে থেমেছে। অতঃপর জসীমউদ্‌দীন এ পথে আর এগোবেন কিনা জানি না। তবে লোকনাট্যের নতুন ধারাশ্রয়ে লোকজীবনকে নিবিড়তর করে জানা, চেনা ও বোঝার যে চেষ্টা তিনি করেছেন তা যে বহুল পরিমাণেই সার্থক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর কাব্যের ন্যায় তাঁর লোকনাট্যেগুলোর জনপ্রিয়তা এ সত্যেরই ইঙ্গিত দেয়।

জসীমউদ্‌দীন ঃ বিবিধ গদ্য রচনা

কাব্যসাধনাই জসীমউদ্‌দীনের জীবন-সাধনা হলেও তিনি পরিণত বয়সে প্রথমে লোকনাট্য ও পরে অন্যবিধ গদ্য রচনার মাধ্যমে আপন সাহিত্য-সাধনার দিগন্তকে যথেষ্ট প্রসারিত করেছেন। লোকনাট্য রচনায় যথেষ্টই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে জসীমউদ্‌দীন তাঁর শিল্পী সত্তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অনেকটাই বাড়িয়ে তুলতে পেরেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর গদ্য রচনা সম্পর্কেও আমাদের মনে যথেষ্ট কৌতূহল দেখা দেয়। গদ্যের নতুন ক্ষেত্রে কোন সার্থকতার পরিচয় তাঁর রচনায় উপস্থিত কিনা জানতে হলে, সেগুলোর সাথে আমাদের একটু নিবিড়তর পরিচয় দরকার। জীবন-স্মৃতিচারণা উপলক্ষ করেই প্রধানতঃ জসীমউদ্‌দীনের গদ্য রচনার সূত্রপাত হয়। পরে তা অন্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর গদ্য রচনাগুলোকে প্রধানতঃ তিনটি খাতে প্রবাহিত হতে দেখা যাচ্ছেঃ এক, জীবন স্মৃতিচারণ ও ভ্রমণাভিজ্ঞতামূলক রচনা ; দুই, বাঙলা লোকগল্পের সংগ্রহ ও সংকলন ; তিন, লোকজীবনভিত্তিক উপন্যাস। প্রসঙ্গতঃ এ কথা বলে রাখা বোধহয় অসমীচীন হবে না যে, প্রথমোক্ত ধারার রচনাই পরিমাণে বেশী এবং তাই জসীমউদ্‌দীনের গদ্য রচনার সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক অংশ। জসীমউদ্‌দীনের গদ্য রচনা বিশিষ্ট শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এমন দাবি কেউ করবেন না। তবে তাঁর কাব্য ও লোকনাট্যের মতো তাঁর গদ্য রচনায়ও আপন সহজ-সরল ব্যক্তিত্বের ছাপটি স্পষ্ট। সরলতা যদি একটি গুণ বলে বিবেচিত হয় তবে জসীমউদ্‌দীনের গদ্য রচনায় তা একটি লক্ষণ হিসেবেই উপস্থিত বলা যেতে পারে। মনোযোগী পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করবেন অনায়াসে হৃদয়ের কথাগুলো বলে যাওয়ার একটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ তাঁর গদ্যে রয়েছে। কোন অসাধারণ বক্তব্য তাঁর রচনায় নেই, নেই তা প্রকাশের অপ্রতিম কলাকৌশল। কোন সুগভীর অনুভূতির প্রকাশে বা মননশীলতার স্পর্শে এ গদ্য সমৃদ্ধ নয়। তবে সহজ কথাকে প্রকাশ করার স্বভাবপটুতা এতে রয়েছে। জসীমউদ্‌দীনের ব্যক্তিস্বভাবের সরলতা, আবেগময়তা, ভাবালুতা ও উচ্ছ্বাস-প্রবণতা গদ্যের দেহে প্রতিফলিত হয়ে তাঁর গদ্য রচনাকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে। এ গদ্যের মধ্যে জসীমউদ্‌দীন প্রাণ ঢেলে কথা বলার প্রয়াস পেয়েছেন। আপনাকে জাহির করার প্রচেষ্টা নয়, শ্রোতাদের ও পাঠকদের সাথে অন্তরঙ্গ হওয়ার আকুলতা তাঁর বক্তব্যের ভঙ্গিতে সুপরিস্ফুট। কথা যত সামান্য বিষয় নিয়েই হোক জসীমউদ্‌দীন তা এমন হৃদয়ের দরদ মিশিয়ে বলেন, তা শুনতে বা পড়তে ভাল লাগে।

কাব্যের বাতায়ন-পথে জসীমউদ্‌দীন আপন কীবমন ও শিল্পী-আত্মার প্রকাশ ঘটিয়েছেন ; কবির ব্যক্তিত্ব সেখানে কিছুটা প্রচ্ছন্ন। গদ্যে কিন্তু তাঁর ব্যক্তিস্বভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে। বস্তুতঃ কাব্যে নয়, গদ্য রচনায়ই জসীমউদ্‌দীনের ভিতরকার মানুষটিকে যথার্থ আবিষ্কার করা সম্ভব। বুদ্ধি, মনন ও চিন্তার জটিল পথে ভ্রমণে অনীহা জসীমউদ্‌দীনের ব্যক্তি-স্বভাবের একটি প্রধান বেশিষ্ট্য। তাই লক্ষ্য করি, উচ্চ শিক্ষার অধিকারী হয়েও জসীমউদ্‌দীন কোথাও বিশেষ কোন গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনায় উৎসাহী নন। তার চেয়ে জীবনের সহস্র ছোটখাট অভিজ্ঞতার গল্প বলতেই তিনি ভালোবাসেন বেশী। আর আন্তরিকতা গুণে যে সামান্য বক্তব্য মনকে অনেকটা টানে তাও ঠিক। তবে অনেক সময় অতি উৎসাহী গল্প বলিয়ের মতো জসীমউদ্‌দীন যেখানে বিশেষ বক্তব্য নেই সেখানেও তুচ্ছ বক্তব্যকেই টেনে হিঁচড়ে বড় করে কথার স্রোত জিইয়ে রাখতে চেষ্টা পান। ঐ প্রয়াসের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই স্মৃতির পক্ষে ভর করে তুচ্ছাতিতুচ্ছ সংবাদও এসে জড়ো হয় তাঁর রচনার দেহে।

শাহ... ঢাকা।

বলা বাহুল্য এতে কথার স্রোত দীর্ঘায়িত হলেও বক্তব্যের আকর্ষণ সব সময় বজায় থাকে না। জসীমউদ্‌দীন তাঁর গদ্য রচনার এ ত্রুটি সম্পর্কে মোটেই সচেতন নন। ফলে তাঁর গদ্য রচনার কলেবর যে পরিমাণে বেড়েছে, সে পরিমাণে তাঁর শৈল্পিক সার্থকতা দেখা দেয় নি।

জসীমউদ্‌দীনের গদ্য রচনা সম্পর্কে আমাদের সাধারণ বক্তব্য শেষ করার আগে একটা কথা এখানেই বলে রাখি। সাধারণভাবে জসীমউদ্‌দীনের রচনায় চিন্তা ও মননের দাঢ্য অনুপস্থিত হলেও, তিনি নানা উপলক্ষে বিভিন্ন সুধী সম্মেলনে লোকসাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে যে সব ভাষণ দিয়েছেন বা নিবন্ধ পাঠ করেছেন, সেগুলোতে ঐ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় যথেষ্টই পাওয়া যাবে। তবে সেখানেও আবেগময়তা বক্তব্যকে যে পরিমাণে স্বাদু করে তুলেছে, সে পরিমাণে বক্তব্যের মূল্য বাড়ায় নি। তা ছাড়া এগুলো সাময়িক কোন ব্যাপার উপলক্ষ করেই রচিত কিছুটা মানসিক প্রয়াস মাত্র। কোন সাহিত্যিক প্রয়াসের নিষ্ঠা এ সব রচনায় উপস্থিত নয়। তবু জসীমউদ্‌দীনের রচনায় চিন্তা মননশীলতার স্বাক্ষর যদি থেকে থাকে তবে ঐ সব ভাষণ ও নিবন্ধেই কিছুটা রয়েছে।

সম্ভবতঃ গদ্যের ক্ষেত্রে উচ্চতর সাহিত্যের ফসল ফলানোর আগ্রহ জসীমউদ্‌দীনের তেমন ছিল না। 'বোবা কাহিনী' নামে লোকজীবনভিত্তিক একটি উপন্যাস লিখে তিনি নতুন পথের পথিক হওয়ার প্রয়াস পেলেও বড় রকমের কোন সার্থকতার দাবি নিয়ে উপস্থিত হতে পারেন নি। 'বোবা কাহিনী'র জগত ইতিপূর্বের কাহিনীকাব্যের জগত থেকে বড় বেশী অগ্রসর নয়। কাব্য-গাথায় পল্লীনর-নারীর প্রেম-ভালবাসার যে ছবি তিনি এঁকেছিলেন, তাদেরই কথা একটু বিস্তৃততর পটভূমিতে এবং একটু আধুনিকের ভঙ্গিতে গদ্যে বলতে চেষ্টা করেছেন 'বোবা কাহিনী'তে। এখানেও পল্লীজীবন-বাস্তবের অভিজ্ঞতার স্মৃতি রোমন্থনে জসীমউদ্‌দীন ব্যাপৃত রয়েছেন। বিলীয়মান পল্লীজীবনধারার বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্যের স্মৃতি কেমন করে তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে 'বোবা কাহিনী' গ্রন্থে তার সাক্ষ্য মিলবে। পল্লীর মূক মানুষের বেদনা, বঞ্চনা ও আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দানের একটা সজ্ঞান প্রয়াস সত্ত্বেও 'বোবা কাহিনী' আধুনিক উপন্যাসের সুসংবদ্ধ শিল্পসংহত রূপ লাভ করতে পারে নি। বইটিতে ঔপন্যাসিকসুলভ বাস্তব জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতার পরিবর্তে কবিসুলভ ভাবালুতা ও মমত্বময় দৃষ্টির ছাপই বেশী লক্ষ্য করা যায়। পল্লী-গাথার সহজ সুরের আলাপন এ উপন্যাসেও একটু কান পাতলেই শোনা যায়। তবু বাস্তব জীবনের অনেক কথাই অতি সহজভাবে এ উপন্যাসে জায়গা করে নিয়েছে। তবে বক্তব্য প্রকাশে লেখক ঔপন্যাসিকের শিল্পপন্থার চেয়ে জীবন-স্মৃতিচারণকারীর সহজ পথটাকেই আশ্রয় করেছেন। পল্লীর জীবনের আবহকে ফুটিয়ে তোলার তাগিদে তিনি ভাষাভঙ্গিকে আঞ্চলিকতার প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং পল্লীগীতি, রূপকথা ইত্যাদির প্রয়োজনীয় সাহায্য গ্রহণ করেছন। তাই 'বোবা-কাহিনী' স্বাভাবিকভাবেই জসীমউদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যগুলোর সুরেরই যেন অনেকটা প্রতিধ্বনি করে। মোট কথা 'বোবা-কাহিনী'তে উপন্যাসের আদল থাকলেও, তা মৌলস্বাদে পল্লীগাথারই গদ্যায়িত রূপমাত্র। জসীমউদ্‌দীনের গদ্য রচনা যে সামান্য সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে, তা জীবন-স্মৃতিচারণার ক্ষেত্রেই। গল্পকথনে তাঁর কৃতিত্ব লোকমুখে প্রচলিত গল্পকে শিশুবোধ্য করে সহজভাবে বলার ক্ষমতার মধ্যে সীমিত। সেখানেও তাঁর বিশিষ্ট শক্তির কোন প্রকাশ নেই। স্মৃতিচারণার ক্ষেত্রে জসীমউদ্‌দীন আপন মনের জানালা কিছুটা খুলে দিতে পেরেছেন বলেই তা আমাদের কিছুটা আকর্ষণ করে। সেখানে বক্তব্য অনেক সময় তুচ্ছতা সত্ত্বেও মনের অনুভূতি ও কল্পনার রসে জারিত বলে,

মনে অনেকটা সাড়া জাগাতে সমর্থ। আমরা এখন সংক্ষেপে জসীমউদ্‌দীনের গদ্য রচনা নিয়মের পরিচয় দানের চেষ্টা করব।

প্রথমে ধরা যাক, জীবন-স্মৃতিচারণমূলক রচনাগুলোর কথা। ভ্রমণাভিজ্ঞতার স্মৃতি বর্ণনামূলক গ্রন্থকেও এই পর্যায়ভুক্ত রচনা মনে করলে অন্যায় হবে না বোধ হয়। কালানুক্রমে প্রকাশিত এই পর্যায়ের রচনা হচ্ছে ঃ যাঁদের দেখেছি (১৯৫২), চলে মুসাফির (১৯৫৭) ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায় (বাং ১৩৬৮), জীবনকথা (প্রথম খণ্ড) (১৯৬৪), হলদে পরীর দেশে (১৯৬৫), যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮) স্মৃতির পট (১৯৬৮), জার্মানীর শহরে বন্দরে (১৯৭৫) এবং স্মরণের সরণী বাহি, (১৯৭৮)।

যাঁদের দেখেছি' গ্রন্থে জসীমউদ্‌দীন জীবনের যাত্রাপথে সাহিত্যসাধনা উপলক্ষে যে সব মনীষী ও সাহিত্যকের স্পর্শে বা সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, সেই 'রবীন্দ্রনাথ, 'দীনেশচন্দ্র সেন' 'শরৎচন্দ্র', ইসমাইল হোসেন সিরাজী', 'কাজী নজরুল ইসলাম' প্রমূখ মনীষীদের বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত স্নেহস্মৃতির কথা চমৎকার আবেগপূর্ণ সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। জসীমউদ্‌দীন একটু কবিত্ব করেই এ স্নেহস্মৃতির মূল্য সম্পর্কে বলেছেন, 'আতরে সুবাসের মত এই সব মনীষীবৃন্দের সাহচর্যের স্মৃতি আজও আমার জীবনকেও সুবাসিত করিয়া তুলিয়াছে।"[১] বস্তুত জসীমউদ্‌দীনের জীবন ও সাহিত্যকর্মের অনেক মূল্যবান তথ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ এ গ্রন্থটিতে জসীমউদ্‌দীনের মানসলোকের সন্ধান যতটা পাওয়া যায় এমন আর কোথাও নয়। পরবর্তীকালে 'ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায়' নামক গ্রন্থে জসীমউদ্‌দীন মনীষী সান্নিধ্যের এ স্মৃতিরই কিছুটা বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন মাত্র। এ গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'নজরুল' ছাড়া তিনি বিশেষভাবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে আপন জীবন-স্মৃতির মন্থন করেছেন। এ গ্রন্থটিও জসীমউদ্‌দীনের জীবন ও সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বাড়াতে যথেষ্ট সাহায্য করে। ভাষাভঙ্গির সরলতা ও প্রাঞ্জলতার গুণে এটিও একটি সুপাঠ্য গ্রন্থ। ১৯৫০ সালে আমেরিকার ব্লুমিংটনে আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীতের আসরে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়ে কবি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গা সফর করেছিলেন। মূলতঃ সে সফরেরই অনেক টুকরো স্মৃতি তিনি 'চলে মুসাফির' গ্রন্থটিতে বিবৃত করেছেন। প্রসঙ্গতঃ যাত্রাপথের কথা হিসেবেই 'জাজিরাতুল আরবের কথা, লণ্ডনের স্মৃতির কথাও উল্লেখ করেছেন। এ ভ্রমণস্মৃতি বর্ণনায় জসীমউদ্‌দীনের মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গিটিই প্রকট হয়ে উঠেছে। তিনি আমেরিকা ভ্রমণের বর্ণনায় আমেরিকার ধন-ঐশ্বর্যের কথার চেয়ে সেখানকার নানা স্তরের মানুষের কথাই বেশী করে বলেছেন। মনীষী সাহচর্যের স্মৃতির কথা ছেড়ে দিলে সাধারণ স্তরের লোকের সম্পর্কেই তাঁর আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে বেশী। প্রসঙ্গতঃ তিনি বিদেশে তৎকালীন পাকিস্তান সম্পর্কিত লোকের মনোভাব সম্পর্কেও কিছু খবর দিয়েছেন। এবং ঐ সম্পর্কে নিজের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথাও বর্ণনা করেছেন 'জীবনকথা' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে জসীমউদ্‌দীন আপন সুদীর্ঘ জীবনের বিচিত্র স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার কথা খণ্ডে খণ্ডে পাঠকের সামনে উপস্থিত করার মানসে হাজির হয়েছেন। আলোচ্য খণ্ডে তিনি বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রথম দিনগুলোর অসংখ্য স্মৃতির টুকরো আমাদের উপহার দিয়েছেন। 'জীবনের সুদীর্ঘ পথবাঁকে কতজনের সঙ্গে পরিচয় উপলক্ষে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছেন জসীমউদ্‌দীন, তার অনেক কথাই পাওয়া যাবে এ গ্রন্থে। জসীমউদ্‌দীনের জীবনভঙ্গি ও শিল্পীমানসের গঠন রহস্য অনুধাবনে এ গ্রন্থ আমাদের

১. জসীমউদ্‌দীন—'যাঁদের বলছি' ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

যথেষ্ট সাহায্য করে। পল্লীজীবন ও লোকসংস্কৃতির সাথে যে নিবিড় পরিচয়ের চিহ্ন তাঁর সাহিত্যকর্মে বিধৃত, তার উপযুক্ত পটভূমি তৈরী হয়েছিল জসীমউদদীনের বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলোতেই। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্পর্শই না ঘটেছিল কবির জীবনে, সেই তরুণ বয়সেই। ভাবতে গেলে রীতিমতো বিস্ময় লাগে। কিভাবে লোকজীবন ও ঐতিহ্যের মর্মমূলে প্রবেশের সুযোগ তাঁর হয়েছিল, তার ইঙ্গিত এ গ্রন্থে বর্ণিত বহু স্মৃতির টুকরোর মধ্যে পাওয়া যায়। পরিণত বয়সে তাঁর সৃষ্টির উপাদান যুগিয়েছে যে সব বিচিত্র চরিত্রের মানুষ তাঁরা যে নিছক কল্পনারাজ্যের অধিবাসী নন, তাঁরাই চোখের দেখা মানুষ, তা এ গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। হিন্দু-মুসলমান সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবন সম্পর্কে যে সহজ ও স্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকার জসীমউদদীনের সাহিত্যকর্মকে একটা বিশিষ্টতা দান করেছে তা তাঁর এই বাল্যের উদার শিক্ষা ও বহু মানব সংস্পর্শের ফল। 'জীবনকথা' জসীমউদদীনের জীবন সম্পর্কে একটি আকর গ্রন্থই বটে। কৌতূহলী পাঠক গ্রন্থ পাঠে জসীমউদদীনের কবি-ব্যক্তিত্বের উৎসটি আবিষ্কারে সক্ষম হবেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 'জীবনকথা' 'চিত্রালী' পত্রিকায় প্রথম যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই তা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বড় দরদ দিয়ে লেখা বলেই শত তুচ্ছ স্মৃতির কথা পড়েও আমরা ক্লান্তি বোধ করি না, পড়তে ভাল লাগে। যে পারিবারিক গণ্ডীতে জসীমউদদীন লালিত, পালিত ও বর্ধিত হয়েছেন ও যে সামাজিক পারিপার্শ্বিকে তিনি বাল্য কৈশোর ও যৌবনের প্রথম দিনগুলো কাটিয়ে মূল্যবান মানবিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন, 'জীবনকথা'তে তা মুটামুটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে বলা যেতে পারে। জসীমউদদীনের মনোরাজ্যের রহস্যানুসন্ধানে 'জীবনকথা' আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে বলতে আপত্তি নেই।

'হলদে পরীর দেশে' বইটিতে কবির ইতালী, বিশেষতঃ যুগোশ্লাভিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফল বিবৃত হয়েছে। উপলক্ষ ছিল আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত সম্মেলনে যোগদান। যুগোশ্লাভিয়ার প্রাণোচ্ছল শিশু, তরুণ-তরুণীদের স্মৃতির টুকরোয় ভরা এ গ্রন্থটি ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেছে। 'হলদে পরীর দেশে'র তিন বছর পর প্রকাশিত হয় জসীমউদদীনের রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফসল 'যে দেশে মানুষ বড়' গ্রন্থটি। জীবনকথার ন্যায় এরও অংশবিশেষ প্রথমে 'চিত্রালী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রাশিয়ার বিজ্ঞান একাডেমীর আমন্ত্রণক্রমে জসীমউদদীন সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণের যে সুযোগ পেয়েছিলেন, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন সে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের জীবনের গভীর স্পর্শে এসে। রাশিয়ার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনেক কথা যেমন এ বইয়ে স্থান পেয়েছে, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সাথে কবির অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলও এ বইতে বিধৃত হয়েছে। রুশ দেশ ও রুশ জাতিকে অন্তরঙ্গভাবে জানার একটা প্রয়াস এ বইয়ের সর্বত্র পরিস্ফুট। বইটির একটি আকর্ষণীয় দিক, এর সহজ সরল ভাষা। জীবন-সায়াহ্নে রচিত 'জার্মানীর শহরে বন্দরে' পুস্তকেও দেখি সেই একই সহজ, সরল, গতিময় ভাষা। কবির লেখনীর মাধ্যমে বোঝা যায় জার্মান দেশও তাঁকে মোটামুটি আকৃষ্ট করেছিল। স্বল্পকাল ভ্রমণের ফলে এই দেশটি সম্বন্ধে যেটুকু তিনি জানতে পেরেছিলেন তার সবই তিনি আমাদের কাছে উজাড় করে দিয়েছেন।

'স্মৃতির পট' জসীমউদদীনের জীবন-স্মৃতিমূলক রচনা হিসেবে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন ঃ 'স্মৃতির পট' শুধু মাত্র স্মৃতিকাহিনী নয়। ইহা ইতিহাস। ...জীবনের নানা পথে আসিয়া যাহারা মনের পটে দাগ কাটিয়া গিয়াছেন এ তাহাদেরই কাহিনী।' এ কাহিনী কবি লিখেছেন অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে। তাই বলে

তিনি সত্য ভাষণে বিরত হন নি। তাই ক্ষেত্রবিশেষে তিক্ত সত্য কথাও বলে ফেলেছেন। বইটিতে আব্বাসউদ্‌দীন, গোলাম মোস্তফা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ছাত্র নাজীরের স্মৃতিকথা যেমন আছে, তেমনি আছে বৈষ্ণবী ঠাকরুণ, আইজদ্দীর বউ, আনন্দ, হাজেরা বিবি প্রভৃতি গ্রাম্য নর-নারীর সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গ পরিচয়ের কথা। লেখক জসীমউদ্‌দীনের শিল্পীসত্তার পরিপুষ্টিতে গ্রামবাংলার মানুষের প্রেম, ভালবাসা ও দুঃখ-বেদনার সহস্র স্মৃতি যে অনেকখানি ক্রিয়াশীল ছিল, 'স্মৃতির পট' পাঠ করলে সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়। গল্প উপন্যাসের মত মিষ্টি করে বলা এ বইয়ের কাহিনীগুলো সত্যই উপভোগ্য।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের কাছে জসীমউদ্‌দীন নানাভাবে ঋণী। আজ জসীমউদ্‌দীনের যে এত কবিখ্যাতি তার পিছনে দীনেশবাবুর দান অপরিসীম। দীনেশবাবু শুধু কবিকে পাদপ্রদীপের আলোয়ই এনে হাজির করেন নি, বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁকে স্থায়ী আসন করে দেওয়ার জন্যও সর্ববিধ চেষ্টা করেছেন। জসীমউদ্‌দীনের কবিকীর্তির সবচেয়ে অকুণ্ঠ প্রশংসা তিনি করেছেন। তাঁর ভাষায় 'আমি হিন্দু, বেদ আমার নিকট পবিত্র। কিন্তু জসীমউদ্‌দীনের কবিতা বেদের চাইতেও আমার নিকট পবিত্র। কারণ জসীমউদ্‌দীন আমার স্বর্গাদপি গরিয়সী পল্লী গ্রামের কথা তাঁর কাব্যে লিখেছেন।'

এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির প্রতি কবিরও শ্রদ্ধা ছিল অসীম। দীনেশবাবু শেষ জীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা, সহমর্মিতা পান নি, পেয়েছিলেন শুধু বিদ্রুপ। এই ঘটনায় জসীমউদ্‌দীনও হয়েছিলেন মর্মাহত। 'স্মৃতির সরণী বাহি' নামক বইতে কবি দীনেশবাবুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। আর আশ্চর্য মমতার সাথে দীনেশবাবুর কর্মমুখর জীবনের দুঃখজনক শেষ পরিণামের কথা বর্ণনা করেছেন। ফলে এই ছোট স্মৃতিকথাটি আমাদের কাছে এক বেদনাদায়ক মাধুর্য বহন করে এনেছে। সেই সাথে সাথে কবি-জীবনেরও আরো কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমাদের সামনে উদঘাটিত হয়েছে।'

'স্মরণের সরণী বাহি' জসীমউদ্‌দীনের বৃদ্ধ বয়সের রচনা। ফলে প্রতিভার ক্লান্তির ছাপ বইটিতে সুস্পষ্ট। কিছু প্রসঙ্গের অবাঞ্ছিত পুনরাবৃত্তি এবং দু-চারটি স্ববিরোধী উক্তি এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে দৃশ্যমান। তবুও বর্ণনার আন্তরিকতায় ও ভাষার গতিশীলতায় বইটি সুসাহিত্যে পরিণত হয়েছে। তদুপরি সমস্ত বইটির মধ্যেই ছড়িয়ে আছে এক ধরনের 'প্যাথোস' বা বিষাদান্তক সুর যা আমাদের মনকে দোলা দেয়। সবশেষে বলতে হয়, শুধুমাত্র জসীমউদ্‌দীন বা দীনেশচন্দ্র সেনের জীবনের বহু অজানা তথ্য সন্নিবিষ্ট হওয়ার জন্যেই 'স্মরণের সরণী বাহি' মূল্যবান নয়। বইটি একটি যুগ ও সেই যুগের জীবনচেতনাকেও অনেকখানি ধারণ করেছে। তাই বর্তমান কালের পাঠকের কাছে বইটির ঐতিহাসিক মূল্যও যথেষ্ট।

জসীমউদ্‌দীনের গদ্য রচনার আর একটি দিকের প্রকাশ ঘটেছে ছোটদের জন্যে গল্পসংগ্রহ ও সংকলন প্রচেষ্টায়। এই পর্যায়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, 'ডালিমকুমার' (১৯৬৩), 'বাঙালীর হাসির গল্প' ১ম খণ্ড (১৯৬০) এবং 'বাঙালীর হাসির গল্প' ২য় খণ্ড (১৩৭১ বাংলা)। এ সব রচনার বিষয়ে কোন মৌলিকত্ব নেই। জসীমউদ্‌দীন বাঙলা দেশেরই বিভিন্ন অঞ্চলে লোক মুখে প্রচলিত অজস্র মজার গল্প সংগ্রহ করে, সেগুলোকে আপন সহজ ভাষাভঙ্গিতে শিশুদের উপযোগী করে বলেছেন মাত্র। জসীমউদ্‌দীনের যদি কিছু কৃতিত্ব থাকে তা ঐ গল্প পরিবেশনার ভঙ্গিতে, বিষয়ে নয়। প্রথমেই 'ডালিমকুমার' নামক ক্ষুদ্র গল্পগ্রন্থটির কথা আলোচনা করা যাক। 'ডালিমকুমারের' গল্পটি জসীমউদ্‌দীন রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত গাজীর গানের ঢঙে পরিবেশন করেছেন। গল্পটি খুবই জনপ্রিয়। নিঃসন্তান এক রাজার দুই রাণী—সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী। অনেক কাল পরে এক ফকীরের প্রদত্ত

ঔষধ সেবন করে সুয়োরাণী লাভ করে একটি পুত্রসন্তান। তার নাম রাখা হল ডালিমকুমার। ডালিমকুমার রাজা ও সুয়োরাণীর নয়নের মণি ; কিন্তু নিঃসন্তান দুয়োরানীর দু'চক্ষের শূল হয়ে দাঁড়াল। দুয়োরাণী কৌশলে জেনে নেয় ডালিমকুমারের মৃত্যু-রহস্য। রাজার তালপুকুরে রয়েছে এক রাঘব বোয়াল। তার পেটে রয়েছে এক ছড়া হার। তা গলায় পরতে পারলেই হবে ডালিমকুমারের মৃত্যু।

অসুখের ভান করে পড়ে থেকে ঔষধের নাম করে দুয়োরাণী জেলে দিয়ে ঐ রাঘব বোয়লটা ধরে তার পেট কেটে ঐ হার ছড়া সংগ্রহ করে। ঐ হার ছড়া গলায় পরতেই রাজপুত্র ডালিমকুমারের মৃত্যু ঘটল। দুয়োরাণীও মনে মনে খুশী হল। কিন্তু রাজপুত্রের একেবারে মৃত্যু হল না। ঐ হার গলা থেকে যখন খুলে রাখা হত তখন রাজপুত্র বেঁচে উঠত। রাজপুত্রের বন্ধু কোটালপুত্র রূপকুমার সে রহস্য জানত বলেই রাজপুত্রের মৃত্যুর পর তার দেহটি নিয়ে বনের মধ্যে এক জোড়-মন্দিরে রেখে দিল। দুয়োরাণী যখন গলার হার খুলে রাখত, তখন রাজপুত্র বেঁচে উঠত, আর যখন পরত তখন রাজপুত্র মৃত্যুর ঘুমে ঢলে পড়ত। বহুকাল পরে অন্য দেশের এক অভিশপ্তা রাজকন্যা দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে এক মরা রাজপুত্রকে বিয়ে করার জন্যে বহু অনুসন্ধানের পর সেখানে উপস্থিত হলে ডালিমকুমারের সাথে রাজকন্যার বিয়ে হয় এবং কিছুকাল পরে রাজকন্যা ডালিমকুমারের কাছে সব কথা শুনে নাচওয়ালীর ছদ্মবেশে দুয়োরাণীর কাছ থেকে কৌশলে হার ছড়া উদ্ধার করে স্বামীকে বিপদমুক্ত করে। ডালিমকুমার রাজকন্যাকে নিয়ে রাজপুরীতে ফিরে আসে। ডালিমকুমারের জন্যে শোকে-দুঃখে অন্ধ রাজা-রাণী আবার চোখ ফিরে পায়। রাজ্যময় আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। এই হচ্ছে সংক্ষেপে ডালিমকুমারের গল্প। এটিকে জসীমউদ্‌দীন গাজীর গানের ঢঙে নতুন করে বলেছেন 'ডালিমকুমার' বইটিতে। বইটি শিশুচিত্ত বিনোদনে যে যথেষ্ট সার্থক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

এরপর আসে 'বাঙালীর হাসির গল্পে'র কথা। দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'বাঙালীর হাসির গল্প' গ্রন্থে জসীমউদ্‌দীন মোট একান্নটি গল্প সংকলিত করেছেন। প্রথম খণ্ডে সাতটি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে চব্বিটি গল্প স্থান পেয়েছে। গল্পগুলো সবই বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মোপলক্ষে ভ্রমণকালে বিভিন্ন গল্পকথকের মুখ থেকে জসীমউদ্‌দীন সংগ্রহ করেছেন। 'বাঙালীর হাসির গল্প' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থটির পরিশিষ্টি হিসেবে সংযোজিত আলোচনায় এ সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীন বিস্তৃত তথ্য সরবরাহ করেছেন। জসীমউদ্‌দীন বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত এ গল্পগুলোকে শিশুদের মনের মতো করে বলার চেষ্টা পেয়েছেন ; সেখানেই যা কিছু তাঁর নিজস্ব। লোকসাহিত্য-রসিক জসীমউদ্‌দীন এ গল্পগুলোর মধ্য দিয়ে বাঙালীর গল্পপ্রিয় ও কৌতুকপ্রবণ মনটির রহস্যই যেন খুঁজে পেয়েছেন। বাঙালী যে অত্যন্ত হাস্য-কৌতুকপ্রিয়, দুঃখ-দারিদ্র যে তার প্রাণরস কোনদিনই একেবারে শুষে নিতে পারে নি, এ হাসির গল্পগুলো তার প্রমাণ। এসব গল্পে মানুষ, পশু-পাখী অবলীলাক্রমে সখ্য স্থাপন করেছে। কোথাও নীতিকথা বলার চেষ্টা রয়েছে, কোথাও বা লোকচরিত্র উদঘাটনের প্রয়াস রয়েছে। কিন্তু সব গল্পেই রয়েছে কৌতুকরসের যোগান। শ্রোতাদের আনন্দ দান করা, তাদের মুখে হাসি ফোটানোই এসব গল্পের উদ্দেশ্য। জসীমউদ্‌দীন তাই তাঁর সংগৃহীত গল্পগুলোকে 'বাঙালীর হাসির গল্প' নাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বস্তুত ঃ এ গল্পগুলো আমাদের জাতীয় সম্পদ। পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে এ গল্পের ধারা প্রবাহিত হতে হতে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। লোকমুখে বিবৃত বলেই এদের রূপ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন

হলেও, গল্পগুলোর মূলসূত্র প্রায় অবিকৃতই থেকে গেছে। এ গল্পগুলো শিশুদের উপভোগ্য করে প্রকাশ করা হলেও গ্রামাঞ্চলে বড় ছোট সকলেই এগুলো সমান উপভোগ করে।

জসীমউদ্‌দীন এ গল্প সংগ্রহ করে দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। এক, তিনি লোকসাহিত্যের সম্পদ সংরক্ষণের মহান দায়িত্ব পালন করে আমাদের লোকসংস্কৃতির ঐশ্বর্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন দেশের সহস্র সহস্র শিশুর উদ্দেশ্যে। তাদের কচিকাঁচা প্রাণগুলোকে গল্পরস-সিঞ্চনে সরস করে তোলার চেষ্টা পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভাল, জসীমউদ্‌দীন যে সব গল্প 'বাঙালীর হাসির গল্প' নামে সংকলিত করেছেন তা পুস্তকাকারে এই প্রথম প্রকাশিত হল মনে করলে ভুল করা হবে। এই বইয়ের বহু গল্প ভিন্ন লেখকের হাতে কিছুটা ভিন্ন রূপে বহু পূর্বেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'টুনটুনীর বই'য়ের কথা উল্লেখ করতে পারি। তবে একথা ঠিক, লিখিতরূপে এসব গল্পের প্রচার অতি আধুনিক কালের নতুন গল্পচেতনার প্রভাবে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জসীমউদ্‌দীন দুই খণ্ডে অনেকগুলো গল্প সংকলন করে, এগুলোকে নতুন করে আমাদের সামনে উপস্থিত করে এদের অবলুপ্তির হাত থেকে আর একবার উদ্ধার করলেন, বলা যেতে পারে। গল্পগুলো যে রসিক মহলে নতুন করে কিছুটা সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছে, তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই মিলতে শুরু করেছে। মিসেস্ বারবারা পেইন্টার নাম্নী একজন বিদুষী মহিলা এর অনেকগুলো গল্প ইংরেজীতে অনুবাদ করে Folk Tales of East Pakistan' নাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া চেকোশ্লোভাকিয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর দুশনা জবাভিতেল এ পুস্তকের কিছু কিছু গল্প চেক ভাষায় অনুবাদ করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

অতি সাম্প্রতিককালে লোকজীবনভিত্তিক উপন্যাস লিখে জসীমউদ্‌দীন গদ্য সাহিত্য রচনায় তাঁর ক্রমবর্ধমান মনোযোগেরই পরিচয় দিয়েছেন। 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'সকিনা' ও 'মা যে জননী কান্দে' এ চারটি কাহিনীকাব্যে ইতিপূর্বেই জসীমউদ্‌দীন আপন ঔপন্যাসিক মনোভঙ্গির যে পরিচয় উপস্থিত করেছিলেন, গদ্যে লিখিত সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত 'বোবা কাহিনীতে' তাই যেন প্রথম স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজেছে। পঁয়ত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ উপন্যাসটিতে জসীমউদ্‌দীন বাংলার চাষী মুসলমানেরই জীবনগাথা রচনা করছেন। কাহিনীর নায়ক আজাহের এক ছিন্নমূল চাষী সন্তান। দুর্ভাগ্যের পসরা মাথায় করে পৃথিবীতে এসেছে আজাহের ; লাঞ্ছনা-বঞ্চনা বাল্যকাল থেকে তার জীবনে স্বাভাবিক প্রাপ্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতাকে জয় করে সেও দেখেছে স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখের নীড় গড়ার স্বপ্ন, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে। দিনরাত নীরবে সংগ্রাম করে দুঃখ জয়ের গাথা রচনা করে চলেছে সে। জীবনের যাত্রাপথে সমাজ পারিপার্শ্বিকের শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আজাহের বহু মানুষের শুভেচ্ছা-সহানুভূতিও কুড়িয়ে পেয়েছিল। নিষ্ঠুর সুদখোর মহাজনের শোষণ, ধর্মধ্বজী কপট মৌলভীদের বঞ্চনা, ব্যবসারীদের প্রতারণা ও হৃদয়হীনতা তাকে যেমন বারবার বিড়ম্বিত করেছে, আবার মেনাজদ্দী মাতবর, গরীবুল্লাহ মাতবর, রহিমদ্দী কারিকর ইত্যাদি বহু গ্রাম্য সহৃদয় মানুষের সক্রিয় স্নেহ ও সহানুভূতি জীবনের দুঃখ-ব্যথাকে অনেকটাই সহানীয় করে তুলেছে। নিরক্ষর চাষী আজাহের মার খেয়ে খেয়ে বুঝেছে, এ পৃথিবীতে সরলতা, সাধুতার বিশেষ মূল্য নেই। সে নিজের জীবনের সকল ব্যথা-বেদনার অভিজ্ঞতা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে গিয়েই পুত্র বছিরকে মানুষ করার স্বপ্ন দেখেছে। শত দারিদ্র্য-দুঃখের মধ্যেও তাই চেষ্টা পেয়েছে ছেলেটিকে উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ করতে। সে পথে দুস্তর বাধা। তবু

তার একার পক্ষে যা ছিল অসম্ভব অনেকের সহায়তা ও সাহায্যে তাই শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছিল। ছেলে তার ডাক্তারী পাশ করে সাগর-পারে পাড়ি জমিয়েছে জীবনের নতুন স্বপ্ন নিয়ে। পুত্র বছিরের জীবনে পিতার স্বপ্নকে স্বার্থক করে তুলতে যে অকথ্য দুঃখ বরণ করতে হয়েছিল, তারও বিস্তৃত বিবরণ লেখক দিয়েছেন। মোট কথা গ্রাম্য চাষীর সন্তান আজাহের ও তার ছেলে বছির এই দুই পুরুষের কাহিনীর মাধ্যমে জসীমউদ্‌দীন পল্লীজীবনের ছন্দটিকে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলেছেন। সে জীবন আপাতঃ নিস্তরঙ্গ হলেও যে বৈচিত্র্যহীন নয়, জসীমউদ্‌দীন খুব ভালভাবেই আমাদের তা দেখিয়েছেন। কৃষিভিত্তিক আমাদের পল্লীসমাজে জীবন কিছুটা মন্দগতি সন্দেহ নেই। তবু সুন্দরের স্বপ্ন সবাই দেখে, তবে তা প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় উদ্ভাসিত নয়। জমিদার, মহাজন, ধর্মধ্বজী মোল্লা-মৌলভী, ব্যবসায়ী ও নানা শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী সেখানে শোষণের জাল বিস্তার করে রয়েছে। মানুষকে তারা শান্তিতে থাকতে দেয় না। কেউটের ন্যায় ছোবলে ছোবলে বিষাক্ত করে তোলে তাদের জীবন। অদৃষ্টের মার মনে করেই গরীব মানুষ এসব নীরবে মাথা পেতে মেনে নেয়। তবুও জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই তারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারায় না। শোষণরিক্ত মূক পল্লীমানুষ মাঝে মাঝে হৃদয়বোধের তাগিদেই বিপদের দিনে সৌভ্রাত্রের পরিচয় দিয়ে পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়ায়, প্রাণপণে পরস্পরকে সাহায্য করে মাথা তুলে দাঁড়াতে। গৃহে গৃহে স্নেহ-প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে মনে তাদের ভরসা যুগিয়ে চলে লক্ষ্মীরূপিণী নারীরা। একঘেঁয়ে তাদের জীবনকে রসনিষিক্ত করে বাঁচিয়ে রাখে রহিমদ্দী কারিকরের মতো গীতি-গাথার ভাণ্ডারী, আরজান ফকিরের মত সর্বত্যাগী প্রেমিক মানুষেরা। এরা সমাজের কাছ থেকে পুরস্কারের প্রত্যাশা না রেখেই করে যায় তাদের কাজ। সরল-স্বভাব মূক পল্লীর মানুষদের প্রতি তথাকথিত শহুরে সমাজের সভ্য লোকেরা তাকায় অবজ্ঞার দৃষ্টিতে। পল্লীবাসীর অজ্ঞতা ও সরলতার সুযোগ নিয়ে নানা স্বার্থের মুখোস এঁটে তারা গ্রামে এসে কখনও সমাজ সংস্কারের নামে, কোথাও বা জাতীয় স্বার্থের ধূয়া তুলে লোককে বিভ্রান্ত করে এবং গ্রাম্যবাসীরা অসহায়ের মতো শুধু আর্তনাদ করে, খুঁজে পায় না এর প্রতিকারের পথ। সর্বব্যাপী প্রাচুর্যের সম্ভাবনা সত্ত্বেও পল্লীবাসী কেমন করে চির দারিদ্র্যের শিকারে পরিণত হয়েছে তারও ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন গ্রন্থে। মোট কথা বোবা কাহিনী আশ্চর্যরূপে বাস্তব জীবন রস-সমৃদ্ধ কাহিনী। বোবা কাহিনীর নর-নারীরা রক্তমাংসেরই সজীব মূর্তি। তাদের ভাবনা, কামনা, স্বপ্ন, বেদনার কথা অতি দরদ দিয়ে জসীমউদ্‌দীন বলতে চেষ্টা করেছেন। তাই এ কাহিনী মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। তবুও কি বোবা কাহিনী উপন্যাসের উপযুক্ত শিল্পমহিমা লাভ করেছে? তা যে পারে নি, তা উপন্যাসের মনোযোগী পাঠকের বুঝতে বিলম্ব হয় না।

জসীমউদ্‌দীন আপন কবি-স্বভাবের তাগিদেই 'আজাহেরের কাহিনী' শোনাতে গিয়ে যে ভাবে ভাবাবেগের বশীভূত হয়েছেন তাতে ঔপন্যাসিকের বাস্তব দৃষ্টি ও বিশ্লেষণী মন অনেকটাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দুঃখ-দৈন্যে পূর্ণ জীবনের বাস্তব ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি অনেক সময় বাস্তববাদীর ন্যায় সকল সমস্যা খতিয়ে না দেখে ভাবালু মানুষের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। চিত্র আঁকতে গিয়ে তুলি ছেড়ে বাঁশীর সুরে প্রাণের বেদন নিবেদন করেছেন। দুঃখ-দারিদ্র্যের ক্ষতচিহ্ন থেকে দৃষ্টি তাঁর সরে গিয়ে নিবদ্ধ হয়েছে প্রেম-স্নেহের নিত্য উৎসের দিকে। কাজল মেঘের সজল ছায়ার আশ্বাসে তিনি পৃথিবীর চৈত্ররোদের দাহকে ভুলে যাওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। তদুপরি পল্লীপ্রকৃতির মমত্বময় রূপের হাতছানি এখানেও বাস্তব জীবন-দৃষ্টিকে প্রতারিত করেছে। প্রকৃতির রূপমহিমা তাঁর কবিসত্তাকে নাড়া দিয়েছে বারবার। শুধু কি তাই? যুগ যুগ ধরে বাউল-বৈষ্ণবের রসাশ্রয়ী অধ্যাত্মসাধনার

ধারা বাঙালীর হৃদয়ে যে ঢেউ তুলে এসেছে তা আজও পল্লীসমাজকে কিভাবে দোলা দিচ্ছে, তাও জসীমউদদীন আবেগ ভরে লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়েছেন। এ ভাবাকুলতা উপন্যাসের বক্তব্যকে কিছুটা স্বাদুতা দান করলেও উপন্যাসের লক্ষ্যকে অনেকটাই বিচলিত করেছে। আজাহেরের জীবন ও সেই সূত্রে পল্লীর বিভিন্ন স্তরে মানুষের জীবনের যে আভাস জসীমউদ্‌দীন আমাদের দিয়েছেন, তাতে বাস্তবের স্বীকৃতি সত্ত্বেও, তা কোন নতুন জিজ্ঞাসায় আমাদের উচ্চকিত করে তোলে না ঐ কারণেই।

কবি পল্লীজীবন বাস্তবের গভীরে সুতীক্ষ্ম সমালোচনামূলক দৃষ্টি না চালিয়ে, অনেক ক্ষেত্রেই ভাবালুতার আশ্রয় নিয়ে এর ঔপন্যাসিক সংহতি বিধানের পরিপন্থী কাজ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি আজাহেরের দুঃখ-বেদনা বঞ্চনাপূর্ণ অথচ আশা-আকাঙ্ক্ষা স্পন্দিত জীবনকে ফুটিয়ে তোলার উপন্যাসিক দায়িত্বের কঠোরতা সম্পর্কে একেবারেই সচেতন নন। তিনি যেন মনের আবেগে কথা বলে যেতে পারলেই খুশী। উপন্যাসের প্রয়োজনে তাঁকে যে ভাবাতিশয্য বর্জন করে বাস্তববাদীর ন্যায় বিশ্লেষণী মন নিয়ে, গ্রহণ বর্জনের নীতি প্রয়োগ করে, জীবন থেকে উপযুক্ত ঘটনা ও চরিত্র নির্বাচন করে, ভাষা ও ভাবের ক্ষেত্রে সুমিতি বজায় রেখে অগ্রসর হতে হবে, এ কথাই যেন তিনি বিস্মৃতি হয়েছেন। তাই তো বোবা কাহিনীতে উপন্যাস সৃষ্টির পোষকতা করে এমন উপাদানের প্রাচুর্য সত্ত্বেও তা উপযুক্ত শিল্পসুষমা লাভ করতে পারে নি। গদ্যে উপন্যাস লিখতে গিয়েও জসীমউদ্‌দীন গীতি-গাথার ভাবলোকেই যেন বারবার ফিরে গিয়েছেন। গীতি-গাথায় পল্লীজীবনের যে music টি শোনা যায়, জসীমউদদীনের 'বোবা কাহিনী'ও যেন তাতেই সুর মিলিয়েছে। তাই তো 'বোবা কাহিনী'তে মূক মানুষের অন্তরের কথা বারবার সুরের সারিন্দাতেই বেজে উঠেছে। পল্লীবাসীর দুঃখ-বেদনা, আনন্দ, প্রেমানুভূতি বারবার সুরের পক্ষেই ভর করেছে। তবু 'বোবা কাহিনীর' লেখক জসীমউদ্‌দীন পল্লীর জীবনাবর্তের অনেকটা বাস্তবধর্মী চিত্রাঙ্কনে যথেষ্টই সার্থকতা অর্জন করেছেন বলতে দ্বিধা নেই! পল্লীবাসী মানুষের নানা সমস্যা, তাদের মর্মান্তিক জীবনাভিজ্ঞতার রূপায়ণ মানসে জসীমউদ্‌দীন যে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে উপস্থিত, তা একজন যথার্থ ঔপন্যাসিকের হাতে পড়লে মহত্তর শিল্পসৃষ্টিতে সার্থক হয়ে উঠতে পারত বলেই আমাদের ধারণা। অবশ্য এতে করে জসীমউদ্‌দীনের প্রচেষ্টার মূল্য কমে যায় না। 'বোবা কাহিনী' পল্লীর জীবনবাস্তবের সাথে আমাদের পরিচয়কে নিবিড়তর করে তুলেছে এবং আমাদের উপন্যাসে নতুন দিগন্ত সৃষ্টির সম্ভাবনাকে পরিস্ফুট করে তুলেছে।

'বোবা কাহিনীর' ভাষা সরল ও আবেগময়। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের মুখে আঞ্চলিক ভাষার সংলাপ জুড়ে দিয়ে, এদের জসীমউদদীন একটা স্থানিকতা (local colour) দিতে পেরেছেন। তা ছাড়া উপন্যাসে মাঝে মাঝে পল্লীগীতি-গাথার ব্যাপক উদ্ধৃতি ও প্রয়োগ এতে পল্লীর যথার্থ আবহ সৃষ্টিতেও সাহায্য করেছে। কিছু কিছু চরিত্রে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নৈপূণ্যেরও ছাপ লক্ষ্য করা যায়। আজাহের ও বছির চরিত্রই এ উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করলেও, রহিমদ্দী কারিকর, মেনাজদ্দী মাতবর, গরীবুল্লা মাতবর, আরজন ফকীর ইত্যাদির চরিত্র প্রধান চরিত্র দুটির পুষ্টিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। উপনাসের অন্যান্য চরিত্রও প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছে। উপন্যাসটিতে সমাজের প্রায় সর্ব শ্রেণীর মানুষেরই উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এতে করে উপন্যাসটিতে বর্ণিত জীবনের ক্যানভাসটিও বেশ বড় হয়েছে। তবে তাতে রঙের সমাবেশ বড় বেশী নয়। পল্লীজীবন সম্পর্কে যাদের জ্ঞান রয়েছে, তারাই স্বীকার করবেন, ওটাই স্বাভাবিক হয়েছে। কারণ জীবনে যেখানে রঙের অভাব, বৈচিত্র্যের অভাব, উপন্যাসেই বা তা প্রত্যাশা করি কেমন করে?

জসীমউদ্‌দীনের গদ্য রচনাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। এবার জসীমউদ্‌দীনের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্যে তাঁর গদ্য রচনার কিছু নিদর্শন তুলে ধরা যাক ঃ

[১] ফুলের বাগান করিতে হইলে উপযুক্ত মালির প্রয়োজন। সেই ফুলগাছের তদ্বির-তালাসী করিবার প্রয়োজন। তাহার নিকট হইতে আগাছা নষ্ট করিয়া দিতে হয় ; গোড়ায় পানি ঢালিতে হয়। তবে ফুলের গাছে ফুল ফোটে, সেই ফুলের গন্ধে সমস্ত দুনিয়া মাতোয়ারা হয়। (নজরুল প্রসঙ্গ/যাঁদের দেখেছি)

[২] গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য পদ্ম ফুলে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই বলিয়া পদ্ম ফুলের মূল্য কমিয়া যায় না। .....ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া সাহিত্যের অভিনবত্ব দেখিয়াই সাহিত্য বিচার চলে না। তাহা যদি চলিত তবে ঈশ্বর গুপ্তও যুগ-প্রবর্তক সাহিত্য স্রষ্টা হইয়া রবীন্দ্রনাথের সমান আদর পাইতেন। (শরৎ সন্নিধানে/যাঁদের দেখেছি)

[৩] সে কি বক্তৃতা শুনিলাম না মহাসমুদ্রের কল গর্জন শুনিলাম! সেই মহাসমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে চুতর্দিকের সমবেত জনতা যেন কি মহান ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। (সিরাজী স্মৃতি/যাঁদের দেখেছি)

[৪] কিন্তু স্রোতে পড়া লোক তৃণ খণ্ডের আশ্রয়ও ছাড়িতে চাহে না। আশার ক্ষীণ সূত্রটি কিছুতেই যেন টুটিতে চাহে না। কে যেন আমাকে ঠেলিয়া শান্তিনিকেতনে লইয়া চলিল। (রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ/যাঁদের দেখেছি)

[৫] দুই চোখ ভরিয়া কোথাকার অশ্রু-সাগরে আজ বান ডাকিয়াছে। পাইয়াছি, আজ যেন আমি পাইয়াছি আমার জীবনের চরম এবং পরম পাওয়াকে ; কিন্তু আমার স্বপ্ন বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। (রসুলের দেশে/চলে মুসাফির)

[৬] উপরে অনন্ত সুনীল আকাশ, এখানে ওখানে দুই এক খণ্ড সাদা মেঘ আর নিম্নে অথই অনন্ত সুনীল সাগর। এ আমি কোথায় চলিয়াছি, কোথা হইতে আসিয়াছি। উর্ধ্বে নিম্নে দুই অনন্ত নীলের মধ্যে যেন তাহার মহাজিজ্ঞাসা লুকাইয়া আছে। (আমেরিকার পথে/চলে মুসাফির)

[৭] আকাশে পূর্ণ চাঁদের পাত্র হইতে জ্যোৎস্না কুসুম ছড়াইয়া পড়িয়া সেই প্রস্রবণের পানিতে ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। চারিদিকে পাহাড়। তাহার উপরে গাছপালা লতাগুল্ম হইতে ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। (বন্ধুদের সঙ্গে/চলে মুসাফির)

[৮] চারিদিকে স্তব্ধ প্রকৃতি। রহিয়া রহিয়া এক একটা রাতজাগা পাখী ডাকিয়া উঠিয়া আমার বুকের ভিতরে আলোড়ন জাগাইতেছিল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম, এমন যার কণ্ঠস্বর না জানি সে দেখিতে কেমন। গাছের পাতা খস্ খস্ করিলে অথবা কোথাও একটু শব্দ হইলে আমার বুকের ভিতরে এক স্পন্দন জাগিতেছিল, এই বুঝি মেয়েটি আসে। কিন্তু পরক্ষণেই আমার ভুল ভাঙ্গিতেছিল!

(গায়ক দুখাই খন্দকার ও তার মেয়ে/চলে মুসাফির)

[৯] চাষার বাড়িতে আসিলাম শহর হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে। রাস্তার দুইধারে শুধু শস্যের ক্ষেত, কিন্তু চাষী কোথায়? কত রকমের শস্য ফলিয়াছে। কত তাহাদের রং কিন্তু কাহারা এই সব জমিতে চাষ করে, তাহাদের হাল-লাঙ্গল, লাঙ্গল টানিবার বলদ কোথায়, মানুষ কোথায়? (টমসন গৃহিনী/চলে মুসাফির)

[১০] তোমাদের অসংখ্য কলকব্জা, মোটর। উড়োজাহাজের দেশে বসিয়া যদি কোন দিন কোন সুন্দর স্বপ্নের জন্য তোমার মন লালায়িত হইয়া ওঠে, তখন তুমি আমাদের দেশে একবার চলিয়া আসিও। সেখানে হলুদ বর্ণ সরষে ক্ষেতের মাঝ দিয়া আঁকাবাঁকা পথখানি

কয়াণের পণ কুটীর হইতে নামিয়া আসিয়া অদূরে নদীতে যাইয়া মিশিয়াছে।
(টমসন গৃহিণী/চলে মুসাফির)

[১১] 'পরদিন রাজা রাজসভায় বসিয়াছেন। কাশী-কাঞ্চি, কনোজ নানান দেশ হইতে পণ্ডিতেরা আসিয়াছেন রাজদ্রোহী টুনটুনা আর টুনটুনী পাখির বিচার করিতে। রাজসভায় পাখিদের ডাক পড়িল।' শামুকের কৌটা হইতে নস্য নাকে পুরিয়া বড় বড় কেতাব উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পণ্ডিতেরা রাজদ্রোহী-পাখির কি শাস্তি হইতে পারে তাই বাহির করিতে ব্যস্ত ; কিন্তু টুনটুনা আর টুনটুনী পাখি আসে না।
(টুনটুনী আর টুনটুনা/বাঙালীর হাসির গল্প—১ম খণ্ড)

[১২] নজরুলের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক আত্মীয়তা থাকিলেও আমরা দুই জগতের লোক। নজরুল ছিলেন বিদ্রোহী—ভাঙার প্রতীক। তিনি বলিতেন, আমি আগে ভাঙিয়া যাইব। তারপর সেখানে নব-নবীনরা আসিয়া নতুন সৃষ্টির উল্লাসে মাতিবে। আমি বলিতাম আমাদের যা আছে তারই উপর নতুন সৃষ্টি করিতে হইবে। (জীবনকথা, ১ম খণ্ড)

[১৩] দুপুরে খর রৌদ্র মাথার উপরে অগ্নি বর্ষণ করিতেছে—পথের শ্রান্তিতে পা দুখানা হয়ত আর চলিতে চাহে না। এ-গাছের তলায় ও গাছের তলায় জিড়াইয়া বৃদ্ধা চলিয়াছেন সেই বাঘ-ডাকা, বিষাক্ত সাপের খোড়লে ভরা তাম্বুলখানা গ্রামের এক পাশে আমকাঁঠালের শাখায় ঘেরা একখানা কুঁড়ে ঘরের আশ্রয়ের আশায়। (জীবনকথা)

[১৪] আজও আপদে বিপদে সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের সৌম্য মূর্তিখানি ভাবিতে আমার বেশ লাগে। অনেক সময় ধ্যান-নয়নে দেখিতে পাই, সুদূর বন্ধুর হিমালয় পথ--সেই বদরিনারায়ণ লছমন ঝোলা পার হইয়া আজানুলম্বিত বাহু গৌরমূর্তি সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর হাঁটিয়া চলিয়াছেন মাসন সরোবরের পথে। (জীবনকথা)

[১৫] লোকে বলে দুঃখ সুন্দর মুখে বড়ই শোভা বিস্তার করে। সেই শোভাই যেন এই বধূটিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। অযত্ন বিন্যস্ত মাথার চুল রুক্ষসূক্ষ্ম, পরণে আটপৌরে একখানা শাড়ী। সেই শাড়ীর রাঙাপাড় বধূর অলক্তকবিহীন পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। চারি-দিকে রজনীর নিস্তব্ধতা। এককোণে একটি মাটির প্রদীপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলিতেছে। তারই সামনে এই মৃত্যু-পথ যাত্রী রোগী দারুণ রোগ যন্ত্রণার সঙ্গে ধুঁকিতেছে। ওধারে বধূটি বসিয়া। এ যেন মৃত্যু আর সুন্দর পাশাপাশি বসিয়া আছে। দুঃখের তুহিন সাগরে যেন রক্ত মৃণালটি শোভা পাইতেছে। (জীবনকথা)

[১৬] তেহের ফকিরের মৃত্যুর পর আর আমাদের ধামাইল হয় না। লোকে বলে তেহের ফকির মন্ত্র জানিতেন। সেই মন্ত্রের বলে তিনি আগুনের তেজ নষ্ট করিয়া দিতেন। অবিশ্বাসীরা বলে, মন্ত্রতন্ত্র কিছুই না আগুনের উপর নাচিবার আগে, নাচের দলের লোকেরা নদীতে স্নান করিয়া আসিত। (জীবনকথা)

[১৭] এবার বড়ুর চেহারা আরও সুন্দর হইয়াছে। সারাগায়ে যেন তার রূপ ধরে না। এত যে অভাব, এত যে অনটন, বড়ুর মনে আর দেহে তার এতটুকুও দাগ কাটে নাই। দীঘির পদ্ম ফুলটির গায়ে যেমন কোন জলের দাগ লাগে না, দু'এক ফোঁটা জল তার এখানে সেখানে শোভা পায়, তেমনি তার ছিন্ন শাড়ীতে অবিন্যস্ত কেশপাশে অভাব যেন মুক্তাবিন্দু হইয়া শোভা পাইতেছে। বড়ুকে কোনদিন এমন সুন্দর দেখি নাই। (জীবনকথা)

[১৮] তার জীবনের অতীতের দিকে যতদূর সে চাহে, শুধুই অন্ধকার আর অন্ধকার, সেই অন্ধকারের এক কোণে আধো আলো আধো ছায়া এক নারীমূর্তি তার নয়নে উদয় হয়। তার সঙ্গে আজাহেরের কি সম্পর্ক তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না ; কিন্তু সেই

নারীমূর্তিটি বড়ই করুণ, তার কথা ভাবিতে আজাহেরের বড়ই ভাল লাগে। (বোবা কাহিনী)

[১৯] এক জায়গায় যাইয়া আজাহের দেখিল, একটা গাছের ডালে চার-পাঁচ জায়গায় মৌমাছিরা চাক্ করিয়াছে। বড় বড় চাক্। চাক্ হইতে ফোঁটায় ফোঁটায় মধু ঝরিয়া পড়িতেছে। অন্য জায়াগায় আজাহের দেখিল, একটা গাছের খোড়লে কটায় বাসা করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া কটা পালাইয়া দূরে যাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। (বোবা কাহিনী)

[২০] সাহা পাড়া ছাড়িয়া আদুর ভিটা। তারপর মাঠ। সেই মাঠের ওপারে শোভারামপুরের জঙ্গল। জঙ্গলের মাঝ দিয়া সরু একখানা পথ। সেই পথের উপরে দুই পাশের গাছের ডাল হইতে লতাপাতা আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কোথাও বেতের শিষা আসিয়া পথ আটকাইয়াছে। অতি সন্তর্পণে তাহা সরাইয়া গণ্শা বছির আর নেহাজদ্দীনকে আরও গভীর জঙ্গলের মধ্যে লইয়া গেল। দুই পাশ হইতে কুব্ কুব্ করিয়া কানা কুয়া ডাকিতেছিল। সামনের জলো-ডুবায় বাচ্চা লইয়া ডাহুক ডাহুকী ডাকিতেছিল। তাহাদের শব্দ শুনিয়া উহারা ঘন বেত ঝাড়ের মধ্যে লুকাইল। (বোবা কাহিনী)

[২১] সে শাড়ীর আড়াল হইতে তাহার হলুদ রঙ্গের বাহু দুইখানা যেন আকর্ষণের যুগল দুইখানা ধনু তাহার দিকে উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। মুগ্ধ হইয়া বছির অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এই চাঁদ হয়ত আকাশ ছাড়িয়া আজ তাহার আঙ্গিনায় খেলা করিতেছে। হাত বাড়াইলে তাহাকে ধরা যায়। তাহাকে বুকের অন্ধকার ঘরের প্রদীপ করা যায় ; কিন্তু বিলম্ব করিলে এই চাঁদ যখন আকাশে চলিয়া যাইবে, তখন শত ডাকিলেও আর ফিরিয়া আসিবে না। (বোবা কাহিনী)

[২২] আজকের মত তেমনি সেদিন ছিল গাছের পাতায় পাতায় রোদের নাচন, আর ডালে ডালে পাখীর গান। ছেলেটির কোলে মাথা রাখিয়া মাচা তার অনগত জীবনের ছবি আঁকিত। (হলদে পরীর দেশে)

[২৩] ভোরবেলা ঘুম হইতে জাগিয়া আমার ঘরের জানালা দিয়া চক্ষু মেলিয়া ধরিলাম। দূরে বহু দূরে যতদূর দৃষ্টি যায় অনন্ত নীলাম্বরের সুস্নিগ্ধ একটি স্নেহময় কাজল রেখায় আমার নয়ন ভরিয়া দিল। (হলদে পরীর দেশে)

[২৪] পথের দুই পাশে কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য; কিন্তু সেদিকে আমার দৃষ্টি ছিল না। আমার কেবলই মনে হইতেছিল এই বর্ষায় আমাদের পুরাতন প্রজা ছনু সেখের পুত্র, ছেলে-মেয়ে বউকে খাইতে দিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। (যে দেশে মানুষ বড়)

[২৫] আমাদের দেশের মেয়েরা হইলে বৃষ্টির জন্য পাড়ায় পাড়ায় গান গাহিয়া ফিরত না। আপনার দেশের পুরুষদের কাছে যাইয়া বলিত, তোমরা শিগ্গীর দেশে জল বিদ্যুত তৈরী কর। (যে দেশে মানুষ বড়)

[২৬] আইজদ্দীর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এবার আইজদ্দী আমাকে বাহিরের উঠানে বসিতে দিল না। টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। ছেঁড়া একটি লুংগি বিছানা, তাহারই উপর আমাকে বসিতে দিল। (স্মৃতির পট)

[২৭] আমি পথের বাহির হইলাম ; মা আমার সঙ্গে কিছুদূর আসিয়া একটি আম গাছের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুদূর পর্যন্ত যাইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, মা তেমনি আমার পথের দিকে চাহিয়া আম গাছটির তলায় দাঁড়াইয়া আছেন। (স্মৃতির পট)

[২৮] এর আগে ময়মনসিংহের গ্রামগুলিতে যখন আমি ঘুরিতাম তখন দেখিতে পাইতাম; দূরে গাছপালা কাজলরেখা পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে সদ্য-পাকা ধানক্ষেত।

হলদি কোটার শাড়ী গায়ে জড়াইয়া বাতাসের সঙ্গে হেলিতেছে দুলিতেছে।
(স্মরণের সরণী বাহি)

[২৯] এই মহামহীরুহ এতদিন ছায়া দিয়া, ফুল-পুষ্প দিয়া কত শত-সহস্র লোককে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। আজ হৃতসর্বস্ব হইয়াও তাঁহার সেই দানের স্পৃহা যায় নাই ; ভগ্ন শাখার শেষ দলটি দান করিয়া আমাকে ধন্য করিয়া যাইতেছেন।
(স্মরণের সরণী বাহি)

[৩০] তিনি আমার আত্মীয় নন, পরিজন নন। তাঁর জন্য আমার সেই ক্রন্দনে কে আর সমব্যথী হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র জনাকীর্ণ প্রান্তর হইতে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। আজ যে আমার পিতৃবিয়োগ হইল তাহা কে বুঝিবে? (স্মরণের সরণী বাহি)

উদ্ধৃতিগুলো থেকে জসীমউদদীনের গদ্যরীতির কয়েকটি বেশিষ্ট্য বিশেষভাবে ধরা পড়ে। প্রথমতঃ এ গদ্যে একটি সহজ কবিত্বের স্পর্শ লেগে আছে প্রায় সর্বত্র। ভাষায় আছে এমন এক ধরনের গতিশীলতা যা আমাদের শরৎচন্দ্রের লেখার কথা মনে করিয়ে দেয়। তৎসম শব্দের প্রয়োগ সত্ত্বেও জসীমউদদীনের গদ্যের প্রবণতা কথ্য ভাষারীতির দিকেই। সাধু ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের রূপ ব্যবহৃত হলেও ভাষা হৃদয়াবেগ নিষিক্ত বলে অনেকটাই মৌখিক বাকরীতির সরসতা লাভ করেছে। শব্দ চয়নের ব্যাপারে লক্ষ্য করা যায় যে তৎসম শব্দের ব্যবহারে কোন অনীহা না থাকলেও তদ্ভব, দেশী শব্দের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব যথেষ্ট। প্রকৃতি ও নারী-রূপের বর্ণনায় এ গদ্য অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এ গদ্য রোমান্টিক কবিচিত্তের আবেগ-স্পন্দিত বলে এতে কবিসুলভ উপমা, রূপকল্পের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এসব জসীমউদদীনের গদ্যকে অনেকটাই স্বাদুতা দান করেছে। মোট কথা কাব্যের ন্যায় গদ্যের মধ্যেও জসীমউদদীনের সহজ সরল আবেগপ্রবণ কবিমনের প্রকাশটি লক্ষ্য করা যায়। সে আবেগের প্রকাশে কবি কোন কোন সময় সাধু ভাষার শব্দ সম্পদকে প্রয়োগ করলেও তাতে সাধু ভাষার কাঠিন্য সঞ্চারিত হয় নি ; তাও আবেগের ঢেউয়ে সওয়ার হয়ে ঠিক ঠিক আমাদের মনে এসে নাড়া দেয়। এ গদ্যে মাঝে মাঝে সুরের স্পন্দন অনুভূত হলেও এতে স্বল্প রেখায় সুন্দর ছবিও ফুটে ওঠে অতি সহজেই।

কাব্যসাধক জসীমউদদীন গদ্যেও আপন কবি স্বভাবকেই জয়যুক্ত করেছেন। যে আন্তরিকতা, সরলতা, আবেগময়তা ও স্নিগ্ধ কল্পনার স্পর্শ জসীমউদদীনের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়, গদ্যেরও তা কমবেশী উপস্থিত স্বীকার করতে বাধা দেখি না। জসীমউদদীনের গদ্য তাঁর কাব্যের পরিপূরক হিসেবেই আমাদের সামনে উপস্থিত।

জসীমউদদীন ঃ লোকগীতি সংগ্রহ ও সম্পাদনা

জসীমউদদীনের সাহিত্যিক প্রতিভার সংগঠনে বাংলাদেশের লোকগীতি-গাথার অবদান যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এ কথা সকল সাহিত্য-রসিকই স্বীকার করবেন। কলেজের ছাত্রাবস্থায়ই বিশ শতকের তৃতীয় দশকে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সুপারিশে পল্লীগীতি সংগ্রাহক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তারপর

থেকে বছরের পর বছর বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি যে লোকসাহিত্যের রত্নভাণ্ডার খুঁজে পেয়েছিলেন, তা একদিকে আমাদের লোকসাহিত্যে ঐতিহ্য সংরক্ষণে যেমন সহায়ক হয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে জসীমউদ্‌দীনের পল্লীলালিত কবি-মানসকেও পষ্ট করেছিল। জসীমউদ্‌দীন যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও কাব্যে পল্লীপথেরই অনুসারী হয়ে পড়েছিলেন, তার মূলে কাজ করেছিল লোকজীবন ও লোকসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় ও অন্তরঙ্গ পরিচয়। এ পরিচয়সাধনে পল্লীগীতি সংগ্রাহক হিসেবে যে ভূমিকা একদিন তিনি পালন করেছিলেন, তা বিশেষ রূপেই সহায়ক হয়েছিল। তাই জসীমউদ্‌দীনের সাহিত্যিক-সত্তার মূলগত প্রবৃত্তি অনুধাবন করতে হলে, লোকগীতি সংগ্রাহক হিসেবে তাঁর ভূমিকার কথা জানা প্রয়োজন।

বলতে গেলে, জসীমউদ্‌দীন আজীবন লোকসাহিত্যের সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। একথা ঠিক, জীবনের যাত্রাপথে বিচিত্র কর্মাবর্তে পড়ে তিনি প্রায়শই ভিন্নতর ক্ষেত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। তথাপি লোকসাহিত্যের সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে কোন দিন তিনি অনীহা বোধ করেন নি। সুযোগ পেলেই তিনি বাংলার পল্লীতে ঘুরে বেরিয়েছেন এবং লোকসংস্কৃতির ঐশ্বর্যভাণ্ডার মন্থন করে আপন সৃষ্টির জন্য উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তবে লোকসাহিত্যের নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজে তাঁর যেরূপ আগ্রহ ছিল সেগুলো যথাযথ ভাবে গুছিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশে বোধ হয় সেরূপ উপকরণ ছিল না। তিনি সংগৃহীত লোকসাহিত্যের বহু সম্পদ আপন সৃষ্টিকর্মে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন ; কিন্তু উপযুক্ত গবেষকের ন্যায় সংগৃহীত তথ্যাবলী টীকা টিপ্পনী ও ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপিত করার চেষ্টা তেমন করেন নি। সেই জন্যেই দেখি গত দীর্ঘ চল্লিশ বছর সাহিত্য-সাধনাকালে, 'রঙিলা নায়ের মাঝি' ও 'পদ্মাপার' নামক দুটি গীতি-সংকলন ছাড়া প্রায় কোথাও তিনি সংগৃহীত পল্লীগীতি প্রকাশে উদ্যোগ নেন নি। এ দুটি গ্রন্থেও স্বরচিত পল্লীকবিতারই প্রাধান্য ঘটেছে, মাত্র কিছু সংখ্যক সংগৃহীত গান স্থান পেয়েছে। সেগুলোর পরিচয়জ্ঞাপক টীকা টিপ্পনী সংযোজনেও তিনি তেমন আগ্রহ দেখান নি। অথচ তিনি একজন সাধারণ পল্লীগীতি সংগ্রাহক মাত্র ছিলেন না ; ছিলেন একজন উচ্চমানের গবেষকের ন্যায় বিরল তত্ত্ব, তথ্য ও রসবোধের অধিকারী ব্যক্তি, যিনি অনায়াস-পটুত্ব সহকারে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় পল্লীগীতি সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজ করতে পারতেন। সেই ক্ষমতারই বিরল স্বাক্ষর বিধৃত হয়েছে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত কবির নিজস্ব মূল্যবান ভূমিকা সম্বলিত একমাত্র পল্লীগীতি সংগ্রহগ্রন্থ 'জারীগান'। সমালোচকের ভাষায় বলতে গেলে, 'এই পুস্তকে ধৃত, তাঁহার সংগৃহীত জারীগানগুলি আলোচনায় কবির তত্ত্ব ও তথ্যবোধ ব্যতীত রসবোধের যে পরিচয় ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহা অন্যত্র বিরল।"[১] বস্তুত 'জারীগানে একটি উপযুক্ত মুখবন্ধ, টীকা টিপ্পনী ব্যাখ্যা সম্বলিত সংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশ করে জসীমউদ্‌দীন প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তিনি একজন লোকসাহিত্য সংগ্রাহক মাত্র নন, তিনি একজন উচ্চস্তরের গবেষকও বটেন।

নব্বই পৃষ্ঠাব্যাপী মূল্যবান ভূমিকা সম্বলিত 'জারীগান' গ্রন্থটিতে মোট ৪৪ লাইনের ১৮ টি জারীগান সন্নিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়া দেহতত্ত্ব বিষয়ক ও ডাক গান পর্যায়ে কয়েকটি গানও সংকলিত হয়েছে। ভূমিকায় লেখক পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য সমাবেশে সহজ ভাষায়

---

১. জসীমউদ্‌দীন প্রণীত 'জারীগান' গ্রন্থের মুখবন্ধে পরিচালকের নিবেদন হিসেবে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

জারীগানের উদ্ভবের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে সংকলিত প্রত্যেকটি জারীগানের বিষবস্তু ও কাব্যরস বিশ্লেষণ করেছেন। তাছাড়া বাংলার বিখ্যাত জারীগায়কদের কথা, জারীগানের সুর, জারীগান গাওয়ার রীতি, এর ছন্দোভঙ্গি, উপমা ইত্যাদি সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রচলিত কারবালা কাহিনী ছাড়া ভিন্নতর বিষয় নিয়েও যে এদেশে জারীগান রচিত হয়েছে তারও প্রমাণ তিনি হাজির করেছেন 'গোবীনামা', 'গাভীনামা', তিলেকবান' ইত্যাদি জারীর উল্লেখ করে। তার প্রতিটি জারীগানে ব্যবহৃত, বর্তমানে অপ্রচলিত, অথবা অর্থবোধ হয় না এমন শব্দের অথবা ব্যাখ্যা সংযোজিত করেছেন। এছাড়া প্রতিটি জারীগান সংগ্রহের তথ্য নির্দেশও করেছেন গ্রন্থ শেষে কতকগুলো বাংলা গান (জারীর সুরে গীত) ও তাদের ইংরেজী লিপান্তর যেমন সন্নিবেশিত করেছিল, তেমনি মিসেস ডানহাম নাম্নী এক বিদেশিনী মহিলার সাহায্যে এসবের স্বরলিপি তৈরী করে, তাও সংযোজিত করেছেন। একটি মূল্যবান গ্রন্থপঞ্জী দিতেও তিনি কার্পণ্য করেন নি। মোট কথা, বইটি লোকসাহিত্য বিশারদ জসীমউদ্‌দীনের পাণ্ডিত্য ও রসবোধের স্বাক্ষর সম্যক বহন করে বললেও বাড়িয়ে বল হবে না।

কবির মৃত্যুর পর তাঁর সম্পাদিত আর একটি গীতি সংগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। নাম 'মুর্শিদা গান'। এককালে কবি বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো পরিভ্রমণ করে সংগ্রহ করেছিলেন বিপুল পরিমাণ মারফতী ও মুর্শিদী গান। এই জাতীয় গানগুলোর মধ্যে দিয়ে বাঙালীদের যুগ-যুগান্তব্যাপী অধ্যাত্মসাধনার কথা এবং পল্লীবাসীদের প্রাণবেদনার কথাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। আলোচ্য গ্রন্থে এদেরই এক অংশকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় সম্পাদনা করে প্রকাশের যে ক্ষমতা তিনি দেখিয়েছেন তা তাঁকেই বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করবে বলে আশা করা যায়। লোকগীতি সংগ্রহ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে জসীমউদ্‌দীনকে দীনেশচন্দ্র সেন, মনসুরউদ্‌দীন প্রমুখের উপযুক্ত দোসর বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না।

উপসংহার

জসীমউদ্‌দীনের সাহিত্য-প্রতিভা ও সৃষ্টিকর্মের বৈভব সম্পর্কিত আলোচনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের কাজ আমরা এখানেই শেষ করছি। একথা হয়তো ঠিক যে জসীমউদ্‌দীন তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য-সাধনার মধ্য দিয়ে নূতনতর কোন স্বপ্ন বা মহত্তর কোন জীবন-ভাবনা নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হতে পারেন নি। কিন্তু তিনি যে বাংলা সাহিত্যের এক ক্রান্তিকালে আবির্ভূত হয়ে একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন, তা স্বীকার করতেই হয়। নাগরিকতার মোহে লক্ষ্যভ্রষ্ট বাঙালীকে সেদিন তিনি 'পল্লীর গোষ্ঠগৃহের ' দিকে আকর্ষণ করার জন্য রাখালীয়া বাঁশীর সুরে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে আহ্বান বৃথা যায় নি। বস্তুতঃ সর্বাত্মক নাগরিক-প্রভাবের দিনেও শিক্ষিত বাঙালীর মনে পল্লীচেতনা জাগিয়ে রাখতে জসীমউদ্‌দীনের কাব্যগুলো অনেকটাই সার্থক হয়েছিল। এর ফলে আমাদের চেতনায় সঞ্জীবিত হয়ে আশু অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এ কাজে তিনি একক কৃতিত্বের দাবিদার , এমন কথা বলা নিশ্চয়ই সংগত হবে না। রাঢ়ের কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক,'পথের পাঁচালী'র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রানুসারী অনেক কবি-সহিত্যিকই এক অর্থে এ বিষয়ে জসীমউদ্‌দীনের সহযাত্রী ছিলেন। এঁরা সকলেই কমবেশী শিক্ষিত বাঙালীর পল্লীচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন। তবুও

জসীমউদ্‌দীনকেই এ পথের সবচেয়ে নিষ্ঠাবান পথিক বলে মেনে নিতে হয়। কারণ জসীমউদ্‌দীনের লেখনীমুখে বাংলার মূক পল্লী যেভাবে আপন অন্তর-ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়েছে, এমনটি আর কোথাও ঘটে নি। জসীমউদ্‌দীনের কৃতিত্ব এখানে যে, পল্লী নিয়ে কাব্য লিখলেও তিনি কোথাও গ্রাম্যকবি হয়ে দাঁড়ান নি। আধুনিক শিল্পীসুলভ মন নিয়ে, সহানুভূতি ও দরদ দিয়ে পল্লীরূপের অনুধ্যান করেছিলেন বলেই, জসীমউদ্‌দীনের পল্লীজীবনভিত্তিক কাব্যসাধনা অত প্রাণবন্ত, অত আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পেরেছিল। বস্তুতঃ 'যে বাংলার গ্রাম আমাদের জীবন থেকে অপসৃয়মান জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় তারই রূপ-সৌন্দর্য রমণীয় আভরণে চিত্রিত'[১] হয়েছে। 'কালান্তরের মোহনায় দাঁড়িয়েও' আমরা তার আকর্ষণ প্রবলভাবে অনুভব করি এই জন্যেই যে, নাগরিক-জীবন এখনও আমাদের পারিপার্শ্বিক পল্লীজীবনকে কোণঠাসা করে স্বরাট হয়ে উঠতে পারে নি। আমরা এখনও পল্লীজীবন-প্রবাহের আকর্ষণমুক্ত হয়ে নতুন কোন জীবনবৃত্তে সংস্থিত হতে পারি নি।

জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে সমকালীন দেশ ও কালের একটি সত্য-পরিচয় বিম্বিত হয়েছিল বলেই, নাগরিকতার ক্রমবর্ধমান প্রভাবের দিনেও আধুনিক শিক্ষিত পাঠকের মন জয় করতে কোন অসুবিধাই তাঁর হয় নি। আবহমান বাঙলার পল্লীজীবনের যে ঐশ্বর্য লোকসাহিত্যকে আশ্রয় করে বিচিত্র বর্ণের কলাপ মেলে যুগ যুগ ধরে বাঙালীর মনের রস-পিপাসা মিটিয়েছে, সেই লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যের সুষ্ঠু শিল্পসম্মত প্রয়োগের জন্যই যে জসীমউদ্‌দীনের কাব্য আদরণীয় হয়ে উঠেছে, তাও স্বীকার করতে হয়। আসলে পল্লীজীবনের রূপ-সৌন্দর্য আজ অনেকটাই অপগত হলেও, পল্লী এখনও আমাদের স্মৃতির জগতে অনেক মাধুর্যের স্বপ্ন নিয়েই উপস্থিত। তাই জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে পল্লীর রূপ-সৌন্দর্যের যে অপরূপ মায়ালোক সৃজিত হয়েছে, তা 'আধুনিক কবিতা পাঠকের প্রবাসী অন্তরে'...'এক জাতীয় নস্টালজিয়ার সৃষ্টি করে'।[১] অথচ জসীমউদ্‌দীন নগর-জীবনের সঙ্গে নিতান্ত অসংপৃক্ত ছিলেন না কোনদিনই। আসলে বাল্য ও কৈশোরেই পল্লী-আবহে তাঁর প্রতিভার প্রকৃতি এমন ভাবেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যে পরবর্তী কালে নাগরিক-জীবনের সংস্পর্শে এসেও তার কোন মৌল রূপান্তর ঘটে নি। তাই লক্ষ্য করি, শেষ পর্যন্ত "তাঁর কাব্যের সংগঠনে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে" পল্লীগীতি, গাথা ইত্যাদির প্রভাব সক্রিয় রয়েছে। ভিন্ন কথায় বলা চলে 'গ্রামজ ও লোকসংস্কৃতির ভূমিকা তাঁর কবি-স্বভাবের মূলে 'বৈদ্যুতিক শক্তির মত' কাজ করেছে সব সময়।[২] জসীমউদ্‌দীন সম্পর্কে এটাই শেষ কথা, এমন কথা অবশ্যই গ্রাহ্য নয়। পল্লীজীবন ও ঐতিহ্য-ভিত্তিক কাব্য লিখলেও তিনি যে মূলতঃ রবীন্দ্র বলয়ের কবি তাতে কোন সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক প্রেম ও সৌন্দর্যকল্পনার প্রভাবকে তিনি কতকটা বরণ করেও নিয়েছেন। তবে সেখানেও জসীমউদ্‌দীন নিজস্ব পথ খুঁজে ফিরেছেন। তাঁর কাব্যে প্রেম যেমন এক শাশ্বত মহিমময় অনুভূতি রূপে উদ্দীপ্ত, সুন্দরও তেমনি এক অম্লান, অক্ষয়, অব্যয় রূপে সংস্থিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মত 'চিন্তার বহুমাত্রিকতা' অথবা 'অনুভবের অর্থবহ জটিলতা' দেখা দিয়ে তাঁর প্রেম ও সুন্দরের অনুধ্যানমূলক কবিতাগুলো বিচিত্রস্বাদী, বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে নি। জসীমউদ্‌দীন সুন্দরকে 'পল্লী রাখালের হাসিতে', 'গ্রাম্যবালিকার চঞ্চল গতিভঙ্গিমায়' কিংবা 'প্রকৃতির সনাতন প্রসাধনে' সজ্জিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রেমকে দেখেছেন বৈষ্ণব কবির আকুলতা ভরা চোখে,

---

১. ডক্টর মুস্তফা নূরউল ইসলাম ঃ 'জসীমউদ্‌দীন ও তাঁর কবিতা,' মুসলিম বাংলা সাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৪৯।

[illegible] তাঁর ডাগর চোখের চাহনিতে। মোট কথা ঘুরে ফিরে এখানেও তিনি শেষ পর্যন্ত প্রাচীন পল্লীগীতি, গাথার দ্বারস্থ হয়েছেন।

জসীমউদদীন তাঁর কাব্যের ভাববস্তু যেমন আহরণ করেছেন সমাজের অভিজাত এলাকার বাইরে থেকে, তেমনি কাব্যের ছন্দ, ভাষা ও উপমা প্রয়োগেও প্রায়শঃ তিনি অভিজাত্যকে পরিহার করেছেন। সেই জন্যেই দেখি অভিজাত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পরিবর্তে অনভিজাত স্বরবৃত্তের প্রতিই তিনি সর্বদা পক্ষপাত দেখিয়েছেন। মাত্রাবৃত্ত ঐ একই কারণে অক্ষরবৃত্তের চেয়ে বেশী গ্রহণীয় বলে মনে হয়েছে তাঁর কাছে। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার যে একটা সুফল এখানে প্রত্যক্ষ করি, তা হচ্ছে এই যে কবি প্রায় সর্বদা যথাথ শিল্পীসুলভ ঔচিত্যবোধের অনুগামী হয়েছেন। তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। এই ব্যতিক্রম সেখানেই ঘটেছে যেখানে তিনি অভিজাত এলাকায় কাব্যবস্তুর সন্ধান করেছেন। নাগরিক সংস্থানে যেখানেই তিনি কাব্য রচনার প্রয়াস পেয়েছেন, সেখানেই তিনি যেন শিল্পীসুলভ মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছেন। অথাৎ পল্লীপথিক কবি পল্লীপথের বাইরে কোথাও তেমন স্বচ্ছন্দ্যবোধ করেন নি। তবু যুগধর্মে তিনি নাগরিক-জীবনের দোলাও কিছুটা অনুভব না করে পারেন নি। তাই তাঁর কাব্যে কোথাও কোথাও আধুনিক নাগরিক মানুষের রাজনৈতিক ও সমাজ-ভাবনার তরঙ্গ-দোলা লক্ষ্য করা যায়। শেষ পযন্ত তিনি অবশ্য পল্লীবৃত্তেই সংস্থিত হয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বস্তুতঃ জসীমউদদীন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পল্লীরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একজন প্রকৃত কবির হৃদয়' ও 'অতি সহজে লেখবার ক্ষমতা' তাঁর ছিল। যে গুণে তাঁর রচনা সবাইর মন হরণ করেছে, তা হল এর স্বতস্ফূর্ততা, স্পষ্টতা ও অকৃত্রিম সরলতা (unstudied simplicity)। এ বিষয়ে তিনি স্কচ কবি বার্ণসের (Robert Burns) সঙ্গে তুলনীয়। তবে যে মানসিক প্রসারতার গুণে বার্ণস ব্যাপকতর কাব্যসিদ্ধির অধিকারী হয়েছিলেন, জসীমউদ্‌দীন তা থেকে বঞ্চিত ছিলেন বলে সংকীর্ণ পল্লীবৃত্তের মধ্যেই সারাজীবন আবর্তিত হয়েছেন। চেষ্টা করেও তা থেকে মুক্তি খুঁজে পান নি। তবু একথা স্বীকার্য, খাঁটি কবিত্বের স্পর্শে সঞ্জীবিত, আবেগ-স্পন্দিত তাঁর রচনা আমাদের সকলের মনকেই কম বেশী নাড়া দিতে সমর্থ হয়েছে। তাই বলে একথা মনে করা উচিত নয় যে, তাতে কোন ত্রুটি নেই। যে কোন মনোযোগী পাঠকই লক্ষ্য করবেন, জসীমউদদীনের কাব্যের বক্তব্যে, ভাষায়, ছন্দে পুনরাবৃত্তির একঘেঁয়েমি যথেষ্ট। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর ভাষা উপযুক্ত রস-সৃষ্টিতে ব্যর্থ, বহু ব্যবহারে ম্লান। ছন্দ ভাষার অনুষঙ্গী হয়ে ভাবকে দেয় নি আশানুরূপ গতিময়তা। ভাবালুতা অনেক সময় রচনার অনাবশ্যক কলেবর বৃদ্ধির কারণ হয়ে কবিতার শৈল্পিক রসনিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে মাত্র গুটি কয়েক কাব্য ও কবিতা বিরল শিল্পসার্থকতার দাবিদার, তাও সত্য। সীমিত পল্লীজীবন বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত বলে, সে জীবনের সীমাবদ্ধতা তাঁর রচনায় দেখা দিবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? তবুও যে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা সহকারে তিনি পল্লীজীবনের উপাদান নিয়ে সাহিত্য-সাধনা করেছেন, তা কাব্য ও লোকনাট্যের মধ্য দিয়ে অনেকটাই সার্থকতা লাভ করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

---

১. ডক্টর মুস্তফা নূরউল ইসলাম ঃ জসীমউদ্‌দীন ও তাঁর কবিতা', মুসলিম বাংলা সাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ: ১৪৯

২. ডক্টর আবু হেনা মোস্তফা কামাল—'জসীমউদ্‌দীন ঃ কাব্যে লোক-ঐতিহ্যের ব্যবহার' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

গদ্য রচনায় জসীমউদ্‌দীন আপন মনের বাতায়ন খুলে দিয়েছেন। সে মনও যে পল্লীর বনফুলের সুবাসে ভরপুর বুঝতে অসুবিধা হয় না। সাগর পারের হাওয়া তাতে মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে গেলেও, তা বড় বেশী ছাপ রেখে যেতে পারে নি। জসীমউদ্‌দীনের কবি-স্বভাবের মূলটি শেষ পর্যন্ত পল্লী বাঙলার মাটিতেই প্রোথিত থেকে গিয়েছে। যুগবাঞ্ছা তাঁকে নাড়া দিলেও, বড় বেশী বিচলিত করতে পারে নি।

পরিশিষ্ট

[ক]

কবি জসীমউদ্‌দীন [জীবনের রেখাচিত্র]

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ সালের ১লা জানুয়ারী ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্বগ্রাম গোবিন্দপুর ফরিদপুর শহরের নিকটেই অবস্থিত। তাঁর পিতা মৌলভী আনসারউদ্‌দীন সাহেব গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। স্বাভাবিক কবিত্বশক্তিও তাঁর ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে জসীমউদ্‌দীন সকল পৈতৃক গুণের অধিকারী হয়েছিলেন। জসীমউদ্‌দীনের মাতা ছিলেন এক সরলা স্নেহময়ী পল্লীরমণী। জসীমউদ্‌দীনের কবি-প্রাণ এ মাতৃহৃদয়ের স্নেহধারায় নিষিক্ত হয়েই সরস হয়ে উঠেছিল।

শিক্ষা ও কর্মজীবন ঃ শৈশবে পিতামাতার তত্ত্বাবধানেই জসীমউদ্‌দীনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তিনি ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ১৯২৩ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে তিনি আই. এ পাশ করেন। ১৯২৯ সালে ঐ কলেজ থেকেই বি এ পাশ করেন। ১৯৩১ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে এম এ পাশ করেন। জসীমউদ্‌দীনের কর্মজীবনের সূচনা হয় প্রকৃত পক্ষে স্কুলের ছাত্রাবস্থায়। তিনি দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের আনুকূল্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পল্লীগীতি সংগ্রাহক নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত সংগ্রাহকের কাজ করেন। এম এ পাশ না করা পর্যন্ত তিনি পল্লীগীতি সংগ্রাহকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এম এ পাশ করার পর তিনি দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অধীনে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ এ্যাসিস্টান্ট নিযুক্ত হন। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৭ সালে কবি মৌলভী কফিলউদ্‌দীন খানের কন্যা মমতাজ বেগমকে বিবাহ করেন। পরের বৎসর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত কবি সরকারের প্রচার বিভাগে কার্যরত ছিলেন। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পরও তাঁর সাহিত্য-সাধনা অব্যাহত থাকে। অবশেষে ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে কবি পরলোক গমন করেন।

সাহিত্য-সাধনা : বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায়ই তাঁর কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। প্রথমে রবীন্দ্র-নজরুল কাব্যাদর্শের অনুবর্তন করলেও শীঘ্রই তিনি আপনার যথার্থ কবি-স্বভাবের

সন্ধান পান। কলেজের ছাত্রাবস্থায় রচিত তাঁর বিখ্যাত 'কবর' কবিতা তাঁকে প্রথম সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা দেয়। এ কবিতাটিকে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর ছাত্রাবস্থায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার বাংলা পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করে তাঁকে তরুণ বয়সে দুর্লভ কবিখ্যাতির অধিকারী করে তুলেছিলেন। 'কবর' কবিতাকে বাংলা কাব্যের এক নতুন দিগদর্শন বলা চলে। আধুনিক কালে কাব্যসাহিত্যে নাগরিকতার সর্বাত্মক প্রভাবের দিনে জসীমউদ্‌দীন নতুন করে আমাদের দৃষ্টি অবহেলিত পল্লীর দিকে আকর্ষণ করেছেন।

জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে বাংলার মাঠ, ঘাট, নদী-নালা, বালুচর, চাষীর কুটির, শ্যামশষ্পাস্তীর্ণ প্রান্তর এক মায়াময় রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। পল্লীবাংলার নর-নারীদের প্রেমে-মোহে গাঁথা অথচ দারিদ্র্য দুঃখ-কন্টকিত জীবনই জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের উপজীব্য হয়ে উঠেছে। হৃদয়ের অমৃতক্ষরা দরদ-নিষিক্ত ভাষায় রচিত বলে তাঁর কাব্য সহজেই আমাদের মন স্পর্শ করে। পল্লীপথে পরিক্রমণ করেও জসীমউদ্‌দীনের কাব্যসাধনা একেবারে যুগচেতনাবিরহিত নয়। তাঁর কাব্যের ভাষাভঙ্গিতে, আঙ্গিকের পরিচর্যায়, বিষয়-উপস্থাপনা রীতিতে সচেতন আধুনিক শিল্পীমানসের পরিচয়টি যেমন উপস্থিত, তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে আধুনিক যুগোচিত জীবনজিজ্ঞাসার পরিচয় রয়েছে। জসীমউদ্‌দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখালী'। এতেই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কবর' ও 'পল্লীজননী' স্থান পেয়েছে। জসীমউদ্‌দীনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' এক পল্লীকিশোর ও পল্লীকিশোরীর বেদনামধুর প্রেম-কাহিনীরই অপূর্ব কাব্যিক রূপ। গ্রন্থটি মিসেস এ. এম. মিলফোর্ড কর্তৃক 'Field of the embroidered quilt' নামে অনূদিত হয়ে জসীমউদ্‌দীনকে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী করেছে। জসীমউদ্‌দীনের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ও 'সকিনা' নামে দুটি কাহিনী-কাব্য এবং 'বালুচর', 'ধান খেত', 'রূপবতী', 'মাটির কান্না' নামে চারটি কবিতা-সংকলন গ্রন্থ। শিশুদের জন্যে জসীমউদ্‌দীন 'হাসু' ও 'এক পয়সার বাঁশী' নামে দু'টি কবিতার বই প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া জসীমউদ্‌দীন পল্লীসঙ্গীত রচনা করেছেন এবং গ্রাম থেকে সংগৃহীত গানের সংকলন প্রকাশ করেছেন। জসীমউদ্‌দীন বাংলার বিপুল লোকসাহিত্য সম্পদকে অতি সার্থক ভাবে আপন কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন। জসীমউদ্‌দীন কাব্য ছাড়া গদ্যে লোকজীবনভিত্তিক নাটক লিখেছেন এবং দেশ ভ্রমণ ও জীবন-স্মৃতিমূলক কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। অতি আধুনিককালে তিনি লোকজীবনভিত্তিক উপন্যাসও রচনা করেছেন। তাঁর নাটকগুলোর মধ্যে 'বেদের মেয়ে', 'পল্লীবধূ' এবং জীবন-স্মৃতিমূলক রচনার মধ্যে 'যাঁদের দেখেছি', 'ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায়', 'জীবন-কথা'—১ম খণ্ড এবং "স্মরণের সরণী" বাহী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ ছাড়া ভ্রমণাভিজ্ঞতার বিবৃতিমূলক গ্রন্থ হিসেবে 'চলে মুসাফির', 'হলদে পরীর দেশে', 'যে দেশে মানুষ বড়' এবং একমাত্র লোকজীবনভিত্তিক উপন্যাস হিসেবে 'বোবা কাহিনী' গ্রন্থটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। জসীমউদ্‌দীন লোকগল্প সংগ্রহ ও সম্পাদনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'বাঙ্গালীর হাসির গল্প" (১ম ও ২য় খণ্ড)-এর নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য

সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। তাঁর 'হলদে পরীর দেশে' নামক ক্ষুদ্র গদ্যগ্রন্থটি UNESCO পুরস্কারে ধন্য হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কাব্যের অনুবাদ প্রকাশ ও তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভারই স্বীকৃতিসূচক। তাঁর 'মাটির কান্না' গ্রন্থটি রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ ছাড়া ইংরেজী, চেক ইত্যাদি ভাষায় তাঁর কিছু কিছু রচনা অনূদিত হয়েছে।

উপসংহার ঃ জসীমউদ্‌দীন বাংলা কাব্য-জগতে একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী।

নজরুল ইসলামের পর আধুনিক কালে আর কোন বাঙালী মুসলমান কবি জসীমউদদীনের মত এত ব্যাপক কবি-খ্যাতির অধিকারী হন নি। জসীমউদদীনের মত বহু মনীষীর স্নেহানুকূল্য ও সাহচর্য লাভের সুযোগও বাংলার খুব কম কবি-সাহিত্যকেরই ভাগ্যে জুটেছে। সাদামাটা আত্মভোলা এ মানুষটি অতি সহজেই অপরের প্রাণে একটি স্থান করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। এ ক্ষমতার বলেই তিনি তাঁর অতি সাদামাটা পল্লীজীবনের চিত্র-সংবলিত কাব্যগুলোকে সকলের আদরণীয় করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।

পরিশিষ্ট
[খ]

জসীমউদ্‌দীন বিরচিত গ্রন্থপঞ্জী

[ক] কাব্যগ্রন্থাবলী ঃ

জসীমউদ্‌দীন, ১৯২৭, 'রাখালী', স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৫৯।

—, ১৯২৯, 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ', নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, নবম সংস্করণ, ১৯৬০।

—, ১৯৩০, 'বালুচর', স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৬০।

—, ১৯৩২, 'ধান-খেত', নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬০।

—,১৯৩৩, 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৬০।

—,১৯৩৫, 'রঙিলা নায়ের মাঝি', সেখ মনিরুদ্দীন এণ্ড কোং, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৫৯।

—, ১৯৩৮, 'হাসু', পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৬৪।

—, ১৯৪৬, 'রূপবতী', শেখ মনিরুদ্দীন এণ্ড কোং, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯।

—,১৯৪৯, 'এক পয়সার বাঁশী', শেখ মনিরুদ্দীন এণ্ড কোং, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৮।

—,১৯৫০, 'পদ্মাপার', পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬৯।

—, ১৯৫১, 'মাটির কান্না', পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫।

—, ১৯৫৪, 'গাঙের পার', পূর্ব পাকিস্তান সরকারের তথ্য দপ্তর থেকে প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬২।

—, ১৯৫৯, 'সকিনা', নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৯।

—,১৯৬১, 'সুচয়নী', নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬১।

—,১৯৬৩, 'মা যে জননী কান্দে', আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৩।

—, ১৯৬৬, 'হলুদ বরণী,' পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬।

—, ১৯৬৯, 'জলের লেখন', পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৯।

—, ১৯৬৯, 'পদ্মা নদীর দেশে', (রিয়াজ আনোয়ার-এর 'আওয়াজো কা ভঁওয়ার' মূল উর্দু কাব্যের বঙ্গানুবাদ), বাজমে সাকাফাত, মুলতান, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৯।

—, ১৯৭২, 'ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে', নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২।

—, ১৯৭৬, 'মাগো জ্বালায়ে রাখিস্ আলো', পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৬।

[খ] নাট্যগ্রন্থাবলী ঃ

জসীমউদ্‌দীন, ১৯৫০, 'পদ্মাপার', পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬১।

—,১৯৫১, 'মধুমালা', শেখ মনিরুদ্দীন এণ্ড কোং, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৬।

—,১৯৫৬, 'পল্লীবধূ', নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৬।

—,১৯৫৯, 'গ্রামের মায়া', পূর্ব পাকিস্তান সরকারের তথ্য দপ্তর থেকে প্রকাশিত, ঢাকা ১৯৫৯।

—, ১৯৬৮, 'ওগো পুষ্পধনু', পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৮।

[গ] গদ্য রচনাবলী ঃ

জসীমউদ্‌দীন, ১৯৫২, 'যাঁদের দেখেছি', প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫২।

—, ১৯৫৭, 'চলে মুসাফির', পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, সর্বশেষ সংস্করণ, ১৯৬৬।

—, ১৯৫২, 'ডালিমকুমার', পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৩।

—, ১৯৬০, 'বাঙালীর হাসির গল্প', প্রথম খণ্ড, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ, ১৯৬৯।

—, ১৯৬১, 'ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায়', পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৭৮।

—,১৯৬৪, 'জীবনকথা', পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৪।

—, ১৯৬৪, 'বোবা কাহিনী', পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৬৪।

--, ১৯৬৪, 'বাঙালীর হাসির গল্প', দ্বিতীয় খণ্ড, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৪।

—,১৯৬৫, 'হলদে পরীর দেশে', পূরবী পাব্‌লিশার্স, ঢাকা, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৬৫।

—, ১৯৬৮, 'যে দেশে মানুষ বড়', পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৮।

—, ১৯৬৮, 'স্মৃতির পট', পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৮।

—, ১৯৭৫, 'জার্মানীর শহরে বন্দরে', পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৫।

—, ১৯৭৮, 'স্মরণের সরণী বাহি', পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৮।

[ঘ] পল্লীগীতি-সংগ্রহ ও সম্পাদনা ঃ

জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, 'জারীগান', কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৮।

—, ১৯৭৭, 'মুর্শীদা গান', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭।

[ঙ] ইংরেজী অনুবাদ ঃ

Jasimuddin, 1939, The Fild of the Embroedered Quilt, translated by E. M. Milford, Oxford University press, Dacca, 1958.

--1969, The Gypsy Wharf, translated by B. Painter & I. Lovelock, Allen and Unwin, London For UNESCO, 1969.

--, 1974, Folk tales of Bangladesh, Tr. C. Painter, & Hasna Jasimuddin, Oxford University press, Dacca, 1974.

--, 1975, Selected Poems of Jasimuddin, Tr. by Hasna Jasimuddin Moudoud, Dacca, 1975.

সহায়ক গ্রন্থ

১। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় : দীপ্তি ত্রিপাঠী
২। আধুনিক বাংলা কাব্যের গতি প্রকৃতি : শুদ্ধসত্ত্ব বসু
৩। আধুনিক কবিতার ভূমিকা : সঞ্জয় ভট্টাচার্য
৪। কল্লোলযুগ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৫। কাব্য বিতান : প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত
৬। কাব্যমঞ্জুষা : মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত
৭। কবিতার কথা : হরপ্রসাদ মিত্র
৮। কবি জসীমউদদীন : এ, কে, এম, আমিনুল ইসলাম
৯। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' : বিষ্ণু দে
১০। বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাংলার সাহিত্য : রণজিৎকুমার সেন
১১। বাংলার লোকসাহিত্য : আশুতোষ ভট্টাচার্য
১২। বাংলার কাব্য : হুমায়ুন কবীর
১৩। বাংলার সাহিত্যের ইতিহাস ঃ ৪র্থ খণ্ড : সুকুমার সেন
১৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান
১৫। ভাষা ও সাহিত্য : মুহম্মদ আবদুল হাই
১৬। মৈমনসিংহ গীতিকা : দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত
১৭। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ : অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়
১৮। শাশ্বত বঙ্গ : কাজী আবদুল ওদুদ
১৯। সাহিত্য সন্দর্শন : শ্রীশচন্দ্র দাশ
২০। সাহিত্যের নানা কথা : হরপ্রসাদ মিত্র
২১। হঠাৎ আলোর ঝলকানি : বুদ্ধদেব বসু
২২। অলংকার চন্দ্রিকা : শ্যামাপদ চক্রবর্তী
২৩। ছন্দ ও অলংকার : অতীন্দ্র মজুমদার
২৪। অলংকার জিজ্ঞাসা : শুদ্ধসত্ত্ব বসু
২৫। আধুনিক কবি ও কবিতা : হাসান হাফিজুর রহমান
২৬। মুসলিম বাংলা সাহিত্য পাঠ-প্রক্রিয়া : ডক্টর মুস্তফা নূরউল ইসলাম
২৭। শিল্পীর রূপান্তর : আবু হেনা মোস্তফা কামাল
২৮। রেখাচিত্র : আবুল ফজল
২৯। আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক : ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
৩০। বিলুপ্ত হৃদয় : মাজাহার উদ্দীন খান

এতদ্ব্যতীত 'বিচিত্রা', 'বিজলী', 'সওগাত', 'বেতার জগৎ', 'মোহাম্মদী', 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা', ইত্যাদি বিবিধ মাসিক পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

ইংরেজী গ্রন্থ ঃ

(1) A Short History of English Literature -sir glor evans.
(2) Lyrical Ballads (1798) -William wordswarth and samuel Taylor Coleridge
(3) un Introduction to the study of Literature -William Henry Hudson